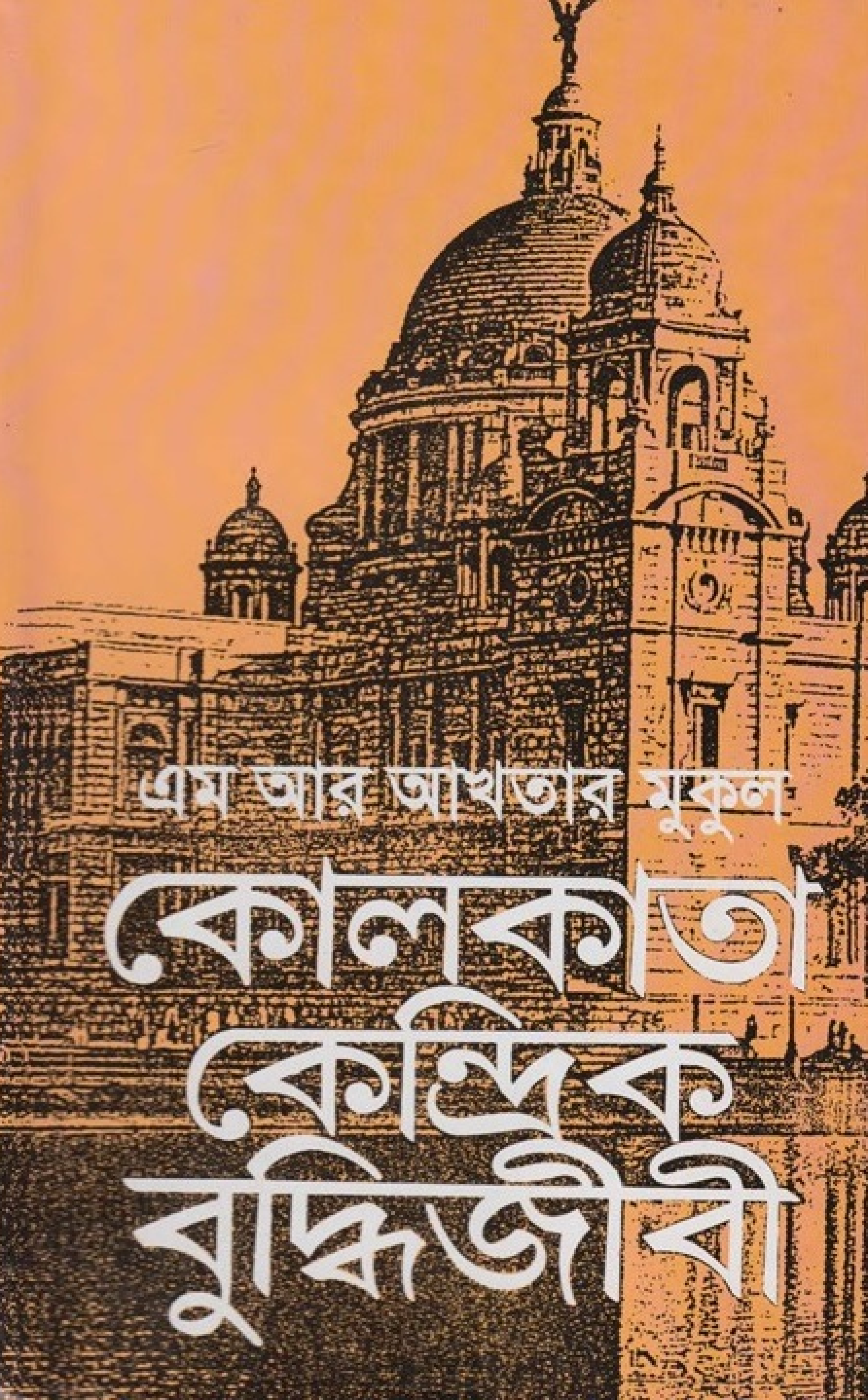

এম আর আখতার মুকুল

কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী

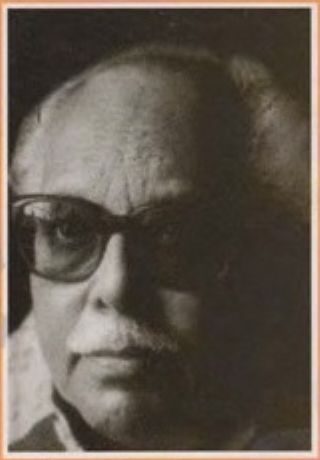

বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য, দুসাহসী অথচ সংযত ও সহিষ্ণু ৬৩ বছর বর্ষীয় 'চির যুবা' এম আর আখতার মুকুল-সেই যে ছোটবেলায় বাঙালি ঘরাণার রেয়াজ মাফিক দু'দু'বার বাড়ি থেকে পলায়ন-পর্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন জীবনের প্রথম পাঠক-তারপর থেকে আজ অবধি বহু দুস্তর ও বন্ধুর চড়াই-উৎরাই, বহু উত্থান-পতন ও প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যেতে হলেও আর কখনও তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি; রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছু পা হননি কোনও পরিস্থিতিতেই। যা আছে কপালে, এমন একটা জেদ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই তার বিজয়ী মুকুটে যুক্ত হয়েছে একের পর এক রঙ্গিন পালক।

জীবিকার তাগিদে কখনও তাকে এজি অফিসে, সিভিল সাপাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগ, বীমা কোম্পানিতে চাকুরি করতে হয়েছে। কখনও আবার সেজেছেন অভিনেতা, হয়েছেন গৃহশিক্ষক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুদূর লন্ডনে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কাটার। প্রতিটি ভূমিকাতেই অনন্য সাফল্যের স্বাক্ষর। কখনও হাত দিয়েছেন ছাপাখানা, আটা, চাল, কেরোসিন, সিগারেট, পুরানো গাড়ি বাস-ট্রাকের ব্যবসায়। করেছেন ছাত্র রাজনীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালে জেল খেটেছেন। জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন ভাষা আন্দোলনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন বিদেশের মাটিতে সাড়ে তিন বছরের নির্বাসিত জীবন; যখনই যা-কিছু করেছেন, সেটাকেই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগের মতো। কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায় বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায়। বেশিরভাগ সময় কেটেছেন দুর্ধর্ষ রিপোর্টার হিসেবে। সফরসঙ্গী হয়েছেন শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব খান, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, ভুট্টোর মতো বড় নেতাদের। সাংবাদিক হিসেবে ঘুরেছেন দুই গোলার্ধের

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন ▸

কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী

এম আর আখতার মুকুল

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম অনন্যা প্রকাশ ❑ জুন ২০১৪

স্বত্ব ❑ লেখক

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ❑ পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম ❑ ৪৫০.০০ টাকা

ISBN 978 984 90712-9-7

Kolkata Kendrik Budhijibi by M.R. Akhtar Mukul
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Anannya Published : June 2014, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 450.00 Taka Only

U.K Distributor ❑ **Sangeeta Limited**
22 Brick Lane, London

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Canada Distributor ❑ **Anyamela**
300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

অনলাইনে পাওয়া যাবে ❑ রকমারি.com
www.rokomari.com

উৎসর্গ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্রষ্টা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্য

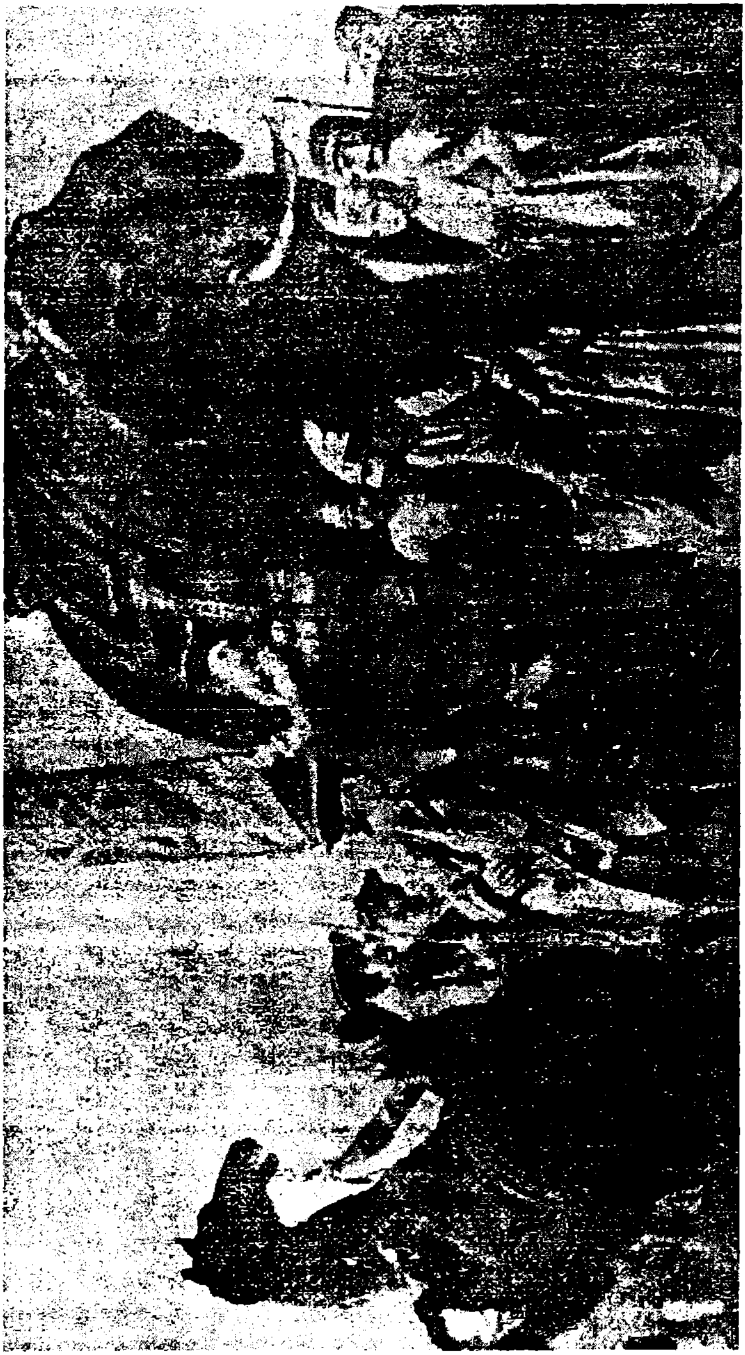

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের সঙ্গে রণক্ষেত্রে মীরজাফরের সাক্ষাৎ

কোলকাতা শহরের গোড়াপত্তন

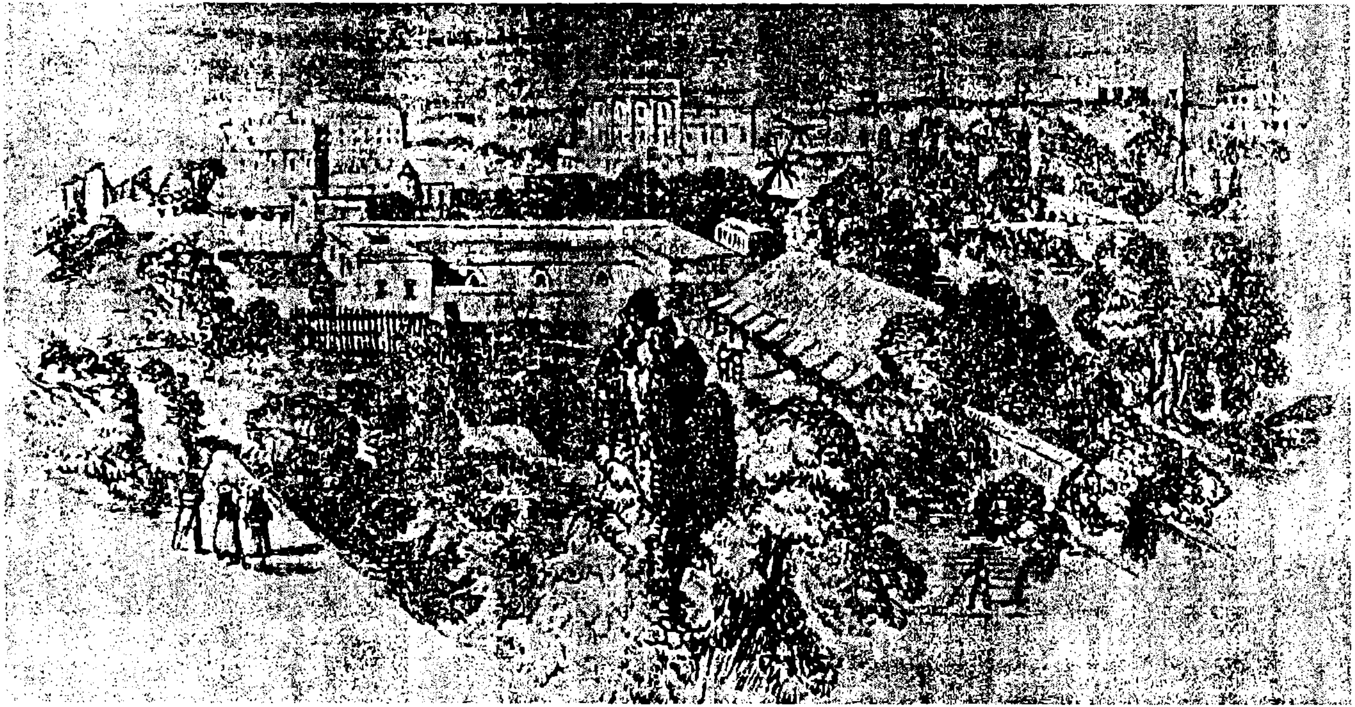

জব চার্নক-এর আমলে কোলকাতা শহরের শুরু

পুরানো কোলকাতার গঙ্গার ঘাট

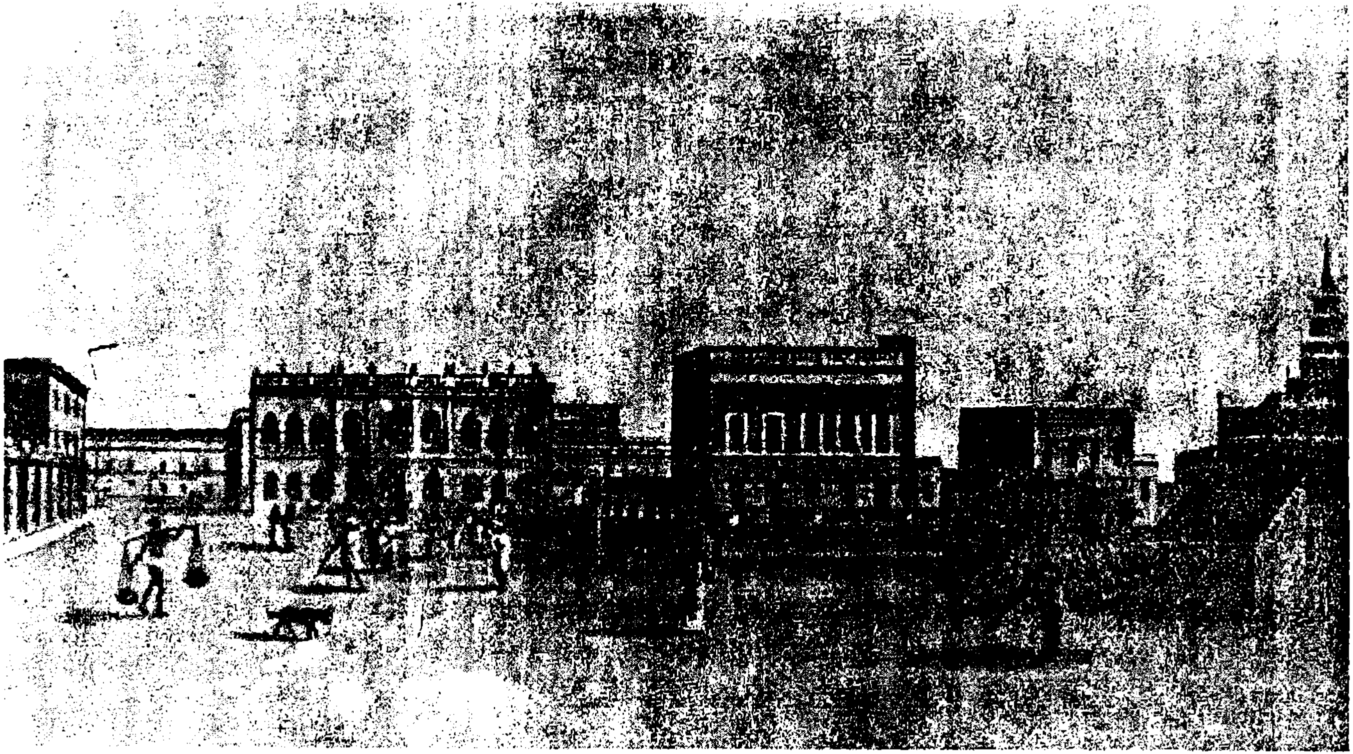

প্রথম কোর্ট বিল্ডিং ১৭৮৪

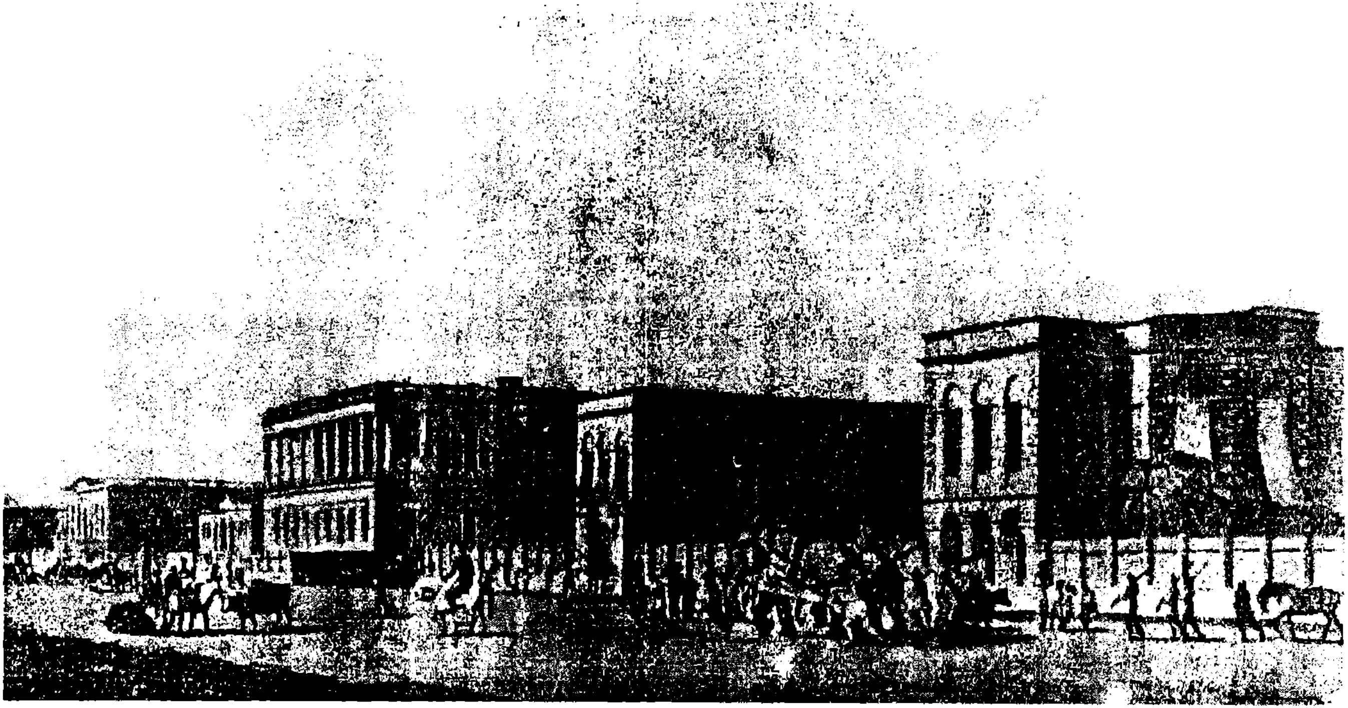

এস্‌প্লানেড ১৭৯২

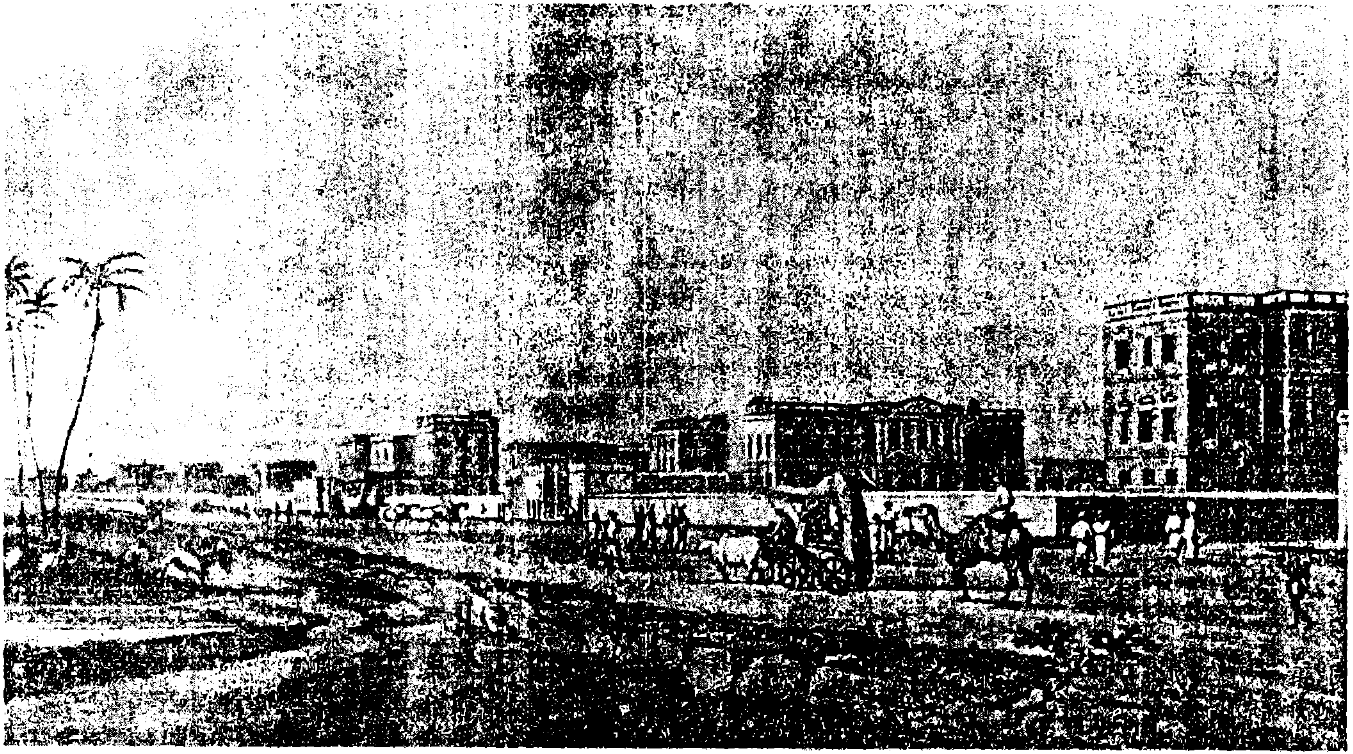

চৌরঙ্গী এলাকা ১৭৯২

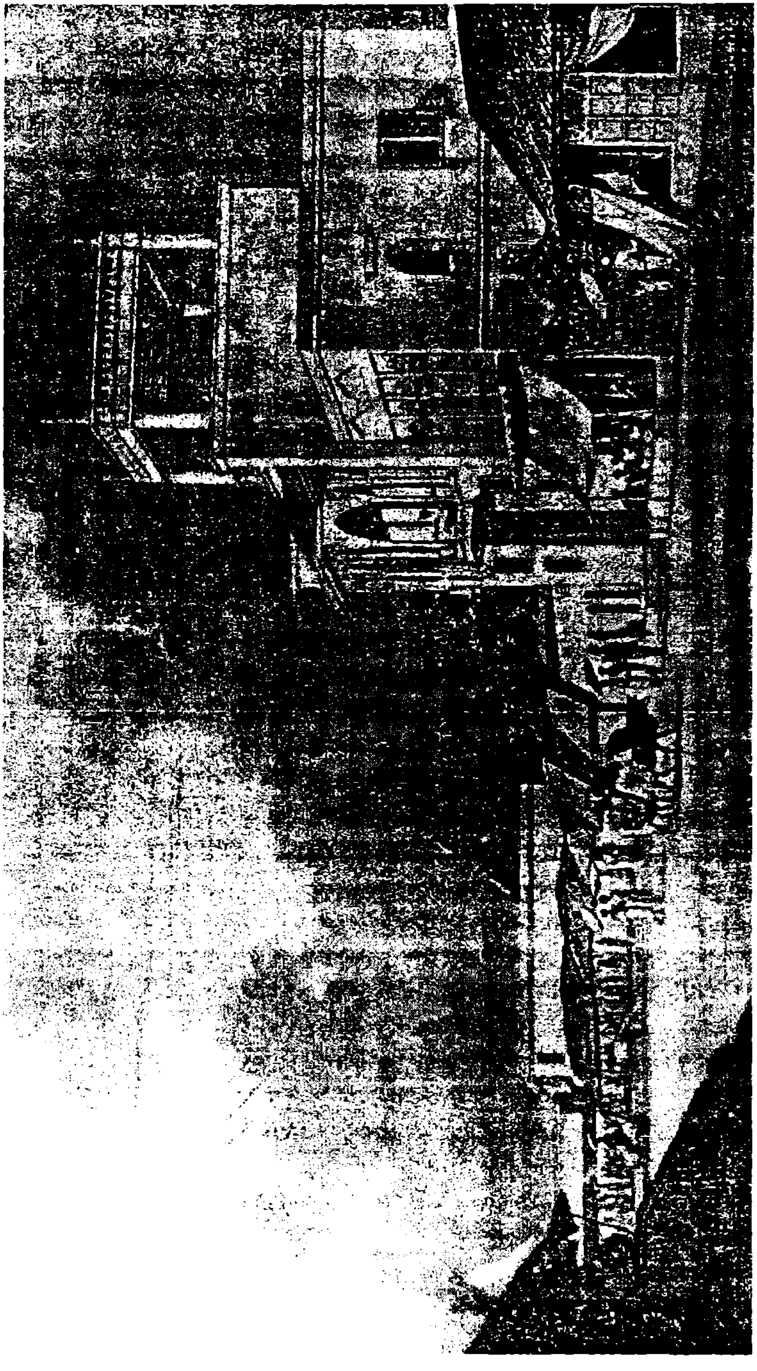

কোলকাতার বাঙালিপাড়া

ভূমিকা

১৮৫৭ সালে একটি ব্যর্থ সিপাহী অভ্যুত্থানের পর ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য প্রচণ্ড দুর্ভোগ ও অসার্থকতা নেমে আসে। ভারতের ইতিহাসে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এ বছরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ প্রশাসনের উপর ন্যস্ত হয় অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রাণীর শাসন এদেশে প্রবর্তিত হয়। এ বছর থেকেই ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়ী হলো। ভারতের ব্রিটিশদের অধিকারে কী সৌভাগ্য এল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল্যবান সম্পদ ছিল ভারতবর্ষ। অন্যপক্ষে ভারতীয়রা লক্ষ করল কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতার হস্তান্তর, কোম্পানির মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে সিপাহী বিদ্রোহে বিপর্যস্ত ভারতীয়রা চরম বিমর্ষতায় প্রভুর পরিবর্তন লক্ষ করল। তারা অনুভব করল যে এখন আর স্বাধীনতার সম্ভাবনা নেই, সম্ভবত চিরকালের জন্য ব্রিটিশরা তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছে। এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশদের কাছে মুসলমানরা কুচক্রী এবং দুরভিসন্ধিপরায়ণ বলে চিহ্নিত হলো। এভাবে চিহ্নিতকরণের ফলে মুসলমানরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হলো। একটি মুসলিম বিরোধী মনোভাব ব্রিটিশ শাসকদের মনে দানা বাঁধতে লাগল। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিরূপতার আর একটি কারণ ছিল। ব্রিটিশরা যে ধর্মের অনুসারী সে ধর্ম, অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্ম একটি বিশ্বধর্ম। তেমনি মুসলমানরা যে ধর্মের অনুসারী অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম, সেটাও বিশ্বধর্মী। উভয় ধর্মই সকল মানুষের আনুগত্য দাবি করে। ইসলাম যেমন বিশ্বজনীন ধর্ম তেমনি খ্রিস্টান ধর্মও। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুসলমানদেরকে নিষ্প্রভ প্রমাণ করবার জন্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ভাষ্য রচনা করতে লাগলেন। তাদের রচনায় ইসলামের প্রতি এক প্রকার অসহনশীল মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগল। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপের বহু অংশ অধিকার করেছিল। অটোমান তুর্কীদের প্রতি রাজনৈতিক বিদ্বেষ এবং বিরুদ্ধতার কারণে ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ ইসলামের প্রতি একটি বিকৃতী মনোভাব লালন করতে লাগলো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের বিরূপতার তিনটি কারণ সুস্পষ্ট হচ্ছে। একটি হলো সিপাহী বিদ্রোহ, দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের প্রতি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের বিরূপতা এবং তৃতীয় হলো অটোমান শাসকদের প্রতি ইউরোপীয় শাসকদের বিরূপতা। ইংল্যান্ডে সে সময় একটি বিশ্বাস ছিল যে মুসলমানদের নেতৃত্বেই সিপাহী বিদ্রোহ রূপ পেয়েছিল এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন রক্ষা পেয়েছে অংশত হিন্দুদের সহায়তায়। এ ধারণার কারণ হলো হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ ব্রিটিশরা লক্ষ করেছিল। স্যামওয়েল স্মিথ নামক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বলেছিলেন যে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের কারণেই ব্রিটিশ বিরোধিতা বিদ্যমান রয়েছে। এই চিন্তা ব্রিটিশদের মনে বহুদিন পর্যন্ত প্রোথিত ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯১০ সালে স্যার হ্যানরি জনস্টোন-এর মন্তব্যে। এত পরে এসেও জনস্টোন বলছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ভারতের একটি মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ চেষ্টা এবং এই চেষ্টায় মুসলমানরা হিন্দু এবং ইংরেজ উভয়কেই তাদের বিপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ইসলামের

সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের একটি প্রবল বিরোধ ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে ইসলামকে তাদের প্রচণ্ড বিপক্ষ হিসাবে ধরে নিয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্ম ভারতবর্ষে এসেছিল ইউরোপ থেকে এবং খ্রিস্টধর্মের প্রবক্তাগণ একটি মিথ্যা অহমিকা নিয়ে এদেশের মানুষকে আলো দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। বাইবেলের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা পেয়েছিল তারা মুসলমানদের কাছ থেকে। স্যার আলফ্রেড লায়াল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষের খ্রিস্টানদের দায়িত্ব হবে বাইবেলের প্রচারের ক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা। অর্থাৎ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এদেশে খ্রিস্টান ধর্মকে স্থায়ী আসন দেওয়ার চেষ্টা করা।

অটোমান সাম্রাজ্য নিয়ে ব্রিটিশদের চিরকাল রাজনৈতিক ভাবনা ছিল। প্রথমে ব্রিটিশরা কিন্তু রুশ ভীতির কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুরস্ককে সমর্থন জানিয়েছিল। গ্লাডস্টোন যখন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি ইউরোপের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর ঘটনা নিয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। পুস্তিকাটির নাম :– The Bulgarian Horror and the Question of the East. এই পুস্তিকা প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় দু'শ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায় এবং মূলত এই পুস্তিকা প্রচারের ফলে ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপতা গড়ে ওঠে। এই পুস্তিকাটি এমন এক সময়ে প্রচারিত হয় যখন ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট এবং ধর্মযাজকদের প্রচারণায় ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের দ্বন্দ্বও অভিব্যক্ত। এই উভয় ঘটনার সঙ্গে অটোমান তুর্কীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এসে যুক্ত হলো এবং ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ তুর্কী সাম্রাজ্যের আশু পতন কামনা করতে লাগলো। তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিক্ষোভ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের বিদ্বেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে সংশ্লিষ্ট যে, তুরস্কের সুলতান ভারতীয় মুসলমানদের কাছে খলিফা হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। তুরস্কের প্রতি বিদ্বেষ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলে। ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি বিরুদ্ধতা ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড বিরোধিতা বলে গণ্য করলেন। খলিফা সকল মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়ক নন বটে; কিন্তু ধর্মনায়ক হিসাবে তিনি স্বীকৃত ছিলেন। সুতরাং খেলাফতের উচ্ছেদের অর্থ হচ্ছে ইসলামের উচ্ছেদের সূত্রপাত। মুসলমানরা তখন এভাবেই চিন্তা করছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটি নতুন রাজনৈতিক চৈতন্যের সূত্রপাত ঘটল খেলাফতকে কেন্দ্রে করে।

এ সময় বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যে, অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রফেসর মনির উইলিয়াম (Professor Monir William) তাঁর Progress of Indian Religious Thought.নামক গ্রন্থে ইসলামকে চিহ্নিত করেছিলেন "ইহুদিবাদের জারজপুত্র' হিসেবে এবং রসূলের জীবনীকার স্যার উইলিয়াম ম্যুর লিখেছিলেন যে, বিশ্ব সভ্যতা, স্বাধীন চিন্তা এবং সত্যের কঠোরতম শত্রু হচ্ছে মোহাম্মদের তরবারি এবং কোরান। (The Sword of Muhammad and the Quran are the most Stubborn enemies of cvilization, Liberty and Truth which the world yet Known) আর একজন তথাকথিত মহাপণ্ডিত ম্যালকম ম্যাককোল ইসলামকে একটি বর্বর ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামের বর্বরতার চারটি কারণ ছিল। একটি হচ্ছে বহুবিবাহ, আর একটি হচ্ছে দাসপ্রথা, আর একটি হচ্ছে স্বাধীন চিন্তার অস্বীকৃতি এবং চতুর্থ হচ্ছে মুসলমানদের সঙ্গে পৃথিবীর অবশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর চিরকালীন ব্যবধান সৃষ্টি।

সর্বভারতের মুসলমানদের জন্য সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাঙালির জন্য বেদনাপূর্ণ একটি ঘটনা পূর্বেই ঘটেছিল। সেটা ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার

পরাজয়ে। কোম্পানির শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং এ-উপমহাদেশে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার যে প্রবল প্রতিবাদ সিরাজউদ্দৌলা করেছিলেন তার ফলস্বরূপ চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পেছনে প্রধান কারণ ছিল কুসিদজীবী মহাজন শ্রেণীর হিন্দুদের ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজদের কূটকৌশল। সিরাজউদ্দৌলার পতন বাঙালি মুসলমানদের জন্য আশাভঙ্গের কারণ হয়েছিল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৎসর হচ্ছে ১৭৯৩ সাল। ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির খাজনা এবং রাজস্ব আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। এই বিশেষ পদ্ধতির ফলে মুসলমানদের ভূস্বামীগত অধিকার কৌশলে বিলুপ্ত করা হয় এবং মুসলমান জমিদারদের হিন্দু আমলা এবং গোমস্তারা ক্রমান্বয়ে এসব জমিদারি আত্মসাৎ করে এবং প্রতাপশালী জমিদারে পরিণত হয়। অর্থাৎ সর্বতোভাবে মুসলমানরা স্বত্বহীন অসহায় মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা মুসলমানদের জন্য চরম সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই তিনটি ঘটনাই ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানদের অসহায়তা প্রমাণিত করে। মুসলমানরা রাজশক্তি হারাল। একই সঙ্গে ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য রাজস্ব ও জমিদারি ব্যবস্থার যেসব সংস্কার করল তার সবই গেল মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কর বা লাখেরাজ জমির বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমানরা কপর্দকহীন নিঃস্ব হলো এবং মুসলমান জমিদারদের হিন্দু তহশিলদার নায়েব মুহরি ও গোমস্তা ইংরেজদের কৃপা-অনুগ্রহে ভূস্বামীর অধিকার লাভ করল। শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর আরেকটি আঘাত এল যখন লর্ড বেন্টিংক ফার্সির পরিবর্তে এদেশে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসাবে ঘোষণা করলেন। দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এর ফল যে পরিবর্তন এল তা সুদূরপ্রসারী ছিল। কিন্তু মারাত্মক সর্বনাশ হলো ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য। মুসলমানদের যখন এহেন অবস্থা তখন কিন্তু বাঙালি হিন্দুরা আপন স্বার্থ চিন্তায় সুপরিকল্পিতভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা করে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করতে গিয়ে এবং বাংলা গদ্যসৃষ্টিকে উপলক্ষ করে কোলকাতার মান্যগণ্য প্রতাপশালী হিন্দুদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে। হিন্দু কলেজে বাঙালি হিন্দুরা লেখাপড়া করতে থাকে এবং ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে। এ সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় প্রমাণিত হয় যে, উনিশ শতকের সূচনা থেকেই হিন্দুরা ইংরেজদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল। রাজস্ব সংস্কারের ফলে ইংরেজদের আশাতীত লাভ হয়েছিল এবং বাংলাদেশের টাকা এবং কাঁচা মালের সাহায্যে ইংল্যান্ডের ডান্ডী, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি বাণিজ্য প্রধান শহরগুলোর দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের ভাগ্যেরও দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং এদেশে প্রতাপশালী নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ শতকে কিছু মুসলমান তাদের উপর যে অন্যায় আচরণ হচ্ছে সেজন্য বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং সেজন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তেও দ্বিধা করেননি। এক্ষেত্রে

তীতুমীরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত তীতু মিয়ার আন্দোলনের সূত্রপাত ছিল মুসলমান সমাজের জন্য একটি সংস্কার আন্দোলন। এই সংস্কার আন্দোলনকে ফারাজী আন্দোলন বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলাকে কেন্দ্র করে তীতুমীর তাঁর আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। এই সংস্কার আন্দোলনে হাত দিতে গিয়ে তীতুমীরকে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। এবং সংঘর্ষ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করে হিন্দুরা তীতুমীরের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের সহায়তা কামনা করে। তখন তীতুমীরকে বাধ্য হয়ে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে নারকেলবাড়িয়ায় একটি স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ইংরেজ সরকার তখন বিচলিত বোধ করে। বারাসাতের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার তীতুকে দমন করতে গিয়ে বিপর্যস্ত হন। শেষ পর্যন্ত তীতুকে দমন করবার জন্য মেজর স্কট নামক একজন ইংরেজ কোলকাতা থেকে একটি পদাতিক বাহিনী নিয়ে তীতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তীতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরি করে দুর্ধর্ষ ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ১৮৩১ সালের ২২ শে নভেম্বর শহীদ হন। ফারাজী আন্দোলন শুরুতে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজে ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে যেসব ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলোর সংশোধন করা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু জমিদারগণ এ আন্দোলনকে তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করল। যার ফলে শেষ পর্যন্ত ফারাজী আন্দোলনটা একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

[দুই]

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালি হিন্দুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। এ সময় কোলকাতায় অবস্থানকারী বিত্তবান এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় মধ্যযুগ অতিক্রম করে তৎকালীন ইউরোপের আধুনিকতার সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত প্রতিভাশালী হিন্দু এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই পাশ্চাত্য বিদ্যাবত্তায় দীক্ষিত এবং ভারতীয় হিন্দুর ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এঁরা একেকজন একেক ধারার উদ্‌গাতা হয়েছিলেন। কেউ ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সামাজিকতার ক্ষেত্রে, কেউবা হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইত্যাদি। এঁদের প্রত্যেকের সামগ্রিক চিন্তাধারা ছিল হিন্দু সমাজকে সমৃদ্ধ করা এবং হিন্দুত্বের সৌকর্য উদঘাটিত করা। এঁদের কারো দৃষ্টিতেই প্রতিবেশী মুসলমান চিহ্নিত হয়নি। এদের কারো বক্তব্যেই মুসলমানকে নিয়ে নয় এবং মুসলমান ও হিন্দু মিলিয়ে একটি জাতিসত্তার কল্পনা এঁদের কারোই ছিল না। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার আন্দোলন হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্যে ছিল। তিনি আচরণগত দিক থেকে হিন্দু সমাজের বিকলতা এবং বিভ্রান্তি দূর করে আর্য সমাজে উদ্ভূত আদি বৈদিকতার পুনরুজ্জীবন যাচনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজের ধর্মভিত্তিক কিছু সামাজিক আচরণের সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের প্রাচীন গৌরব সম্পর্কে হিন্দু সমাজকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মনে গর্ব এবং আত্মপ্রসাদ সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন। এঁরা কেউ ব্যক্তি জীবনে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং কর্মজীবনে এঁদের আচরণে মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশিত বা প্রমাণিত হয়নি কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন জীবনচর্চায় হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন,

মুসলমান সমাজের নয়। সুতরাং উনিশ শতকের রেনেসাঁ বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে সে কথাটি বিভ্রমাত্মক। এঁদের কারো আবেদনই নিম্নবর্ণের অচ্ছুৎ হিন্দু সমাজের প্রতি ছিল না, এঁদের আবেদন কোলকাতার বাইরে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে প্রসারিত ছিল না এবং মুসলমান সমাজ এঁদের চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। উপরন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার সাহায্যে হিন্দুকে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিবেচনায় মুসলমান ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগুলোতে হিন্দুদের বিরুদ্ধ পক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের হিন্দু নায়কগণ মুসলমানকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছে এবং করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা রাজা রামমোহন রায়ের ঔদার্যের প্রভাব তৎকালীন হিন্দু সমাজে পড়েনি। কিন্তু বঙ্কিমের মুসলিম বিদ্বেষ হিন্দু সমাজকে আনন্দিত করেছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিম অসাধারণ গুণান্বিত কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে তিনি সংকীর্ণতাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এ-কারণেই তিনি হিন্দু সমাজে ঋষি বলে সম্মানিত। তাই একথা সুনিশ্চিত করে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙালির জন্য কোনো রেনেসাঁ গড়ে ওঠেনি। এবং কোলকাতা-কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানের বিকাশে যে রেনেসাঁর আগমন ঘটেছিল বলে বলা হয় সেই রেনেসাঁ ছিল অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক লোকের জন্য। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের জন্য উপরে বর্ণিত পটভূমি যথার্থভাবে গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করেই উনিশ শতকের মুসলমানদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে আমরা সক্ষম হবো।

[তিন]

এই প্রেক্ষাপটে এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় বছর দেড়েক ধরে দৈনিক ইত্তেফাকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে এম আর আখতার মুকুল-এর যে তত্ত্ব ও তথ্যমূলক লেখা ছাপা হয়েছে তা' এখন 'কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী' নামে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এম আর আখতার মুকুল পাকিস্তান আমলের একজন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক এবং বেতার ব্যক্তিত্ব। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ইনি নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের প্রচার অধিকর্তার দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মারফত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এ সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় 'চরমপত্র' নামক অনুষ্ঠান এম আর আখতার মুকুল-এর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রায় সাত মাস ধরে প্রতিদিন এই আশাবাদী 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান গ্রন্থনা এবং স্বীয় কণ্ঠে তা প্রচার করা বিস্ময়কর ব্যাপার বৈকি! ফলে তিনি সমগ্র জাতির প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

'কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী' গ্রন্থে এম আর আখতার মুকুল অসংখ্য বই থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে উনিশ শতকের হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পরিচয় উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল উনিশ শতকের মানুষদের ভূমিকা এবং মনমানসিকতা সম্পর্কে আমাদের মনে চৈতন্যোদয়ের সৃষ্টি করা। আলোচ্য সময়ে বর্ণহিন্দুদের কর্মকাণ্ড কী ছিল এবং সেই প্রেক্ষিতে অথবা ভিন্নভাবে মুসলমানদের ভূমিকাই বা কী ছিল, এই গ্রন্থ পাঠ করলে তা' আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচনায় এবং ঐতিহ্য নির্ণয়কালে এম আর আখতার মুকুল-এর উপস্থাপিত বক্তব্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে লেখক একটা ভিন্নধর্মী অথচ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি[illegible] ১৭৫৭ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন। নিশ্চিতভাবে এম আর আখতার মুকুল-এর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, যেভাবে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষকরা 'থিসিস' রচনা করে থাকেন, এই গ্রন্থ সে ধরনের কোনো আনুষ্ঠানিক থিসিস নয়। অথচ লেখক তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের সমর্থনে অসংখ্য বই থেকে গবেষণাধর্মী উদ্ধৃতি উল্লেখ করে গ্রন্থটি আশানুরূপভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ফলে এসব ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু লেখকের বক্তব্য বিতর্কমূলক হলেও তা খণ্ডন করা খুবই দুরূহ এবং অসম্ভব মনে হয়।

গবেষণার কঠিন বিষয়বস্তুগুলোকে এম আর আখতার মুকুল যেভাবে কথকতার ভঙ্গিতে পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা' নিশ্চিতভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রবন্ধ-সাহিত্যের পাঠককুল সব সময়েই সীমাবদ্ধ বলে এতদিন ধরে আমাদের যে ধারণা ছিল, এম আর আখতার মুকুল সেই ধারণা ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছেন। দৈনিক ইত্তেফাকে যখন এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন এর জনপ্রিয়তা আমাদের হতবাক করেছে। এক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপনার ভঙ্গি ও ভাষার ব্যবহার নতুনত্বের দাবি রাখে। সাম্প্রতিকালে বহুল প্রচারিত 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থের লেখক এম আর আখতার মুকুল তাঁর 'কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী' গ্রন্থটিও জনপ্রিয় করতে চেয়েছেন এবং আমার স্থির বিশ্বাস– এই বইটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে।

(সৈয়দ আলী আহসান)

দু'টি কথা

তা'হলে খোলাখুলিভাবে বলাই ভালো। ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে আমি হচ্ছি তিন তিনটা ঐতিহাসিক 'সময়-কালের' মানুষ। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকা বাংলাদেশে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জীবনের প্রথম ১৭ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ বাল্যে ও কৈশোরে আমি ছিলাম সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ভারতের নিগৃহীত 'নেটিভ'। তখন আমার জন্মভূমির নাম বাংলা প্রেসিডেন্সি (বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলা)।

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যৌবনের বছরগুলো। আমার যৌবনের ২৪ বছর উপনিবেশবাদী পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে অতিবাহিত করলাম। প্রতি মুহূর্তে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম এই বিষ-যন্ত্রণা। ধর্মের নামে সীমাহীন অন্যায় আর অবিচারের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ অবলোকন করলাম। এ সময় আমার দেশের নাম হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান।

শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে একটা ভয়াবহ গণহত্যার পটভূমিতে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাঝ দিয়ে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার চৌহদ্দিতে যখন আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির গৌরব অর্জন করলাম, তখন আমি ৪২ বছরে পা দিয়েছি। যৌবনের এই প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করলাম। আমার মাতৃভূমিটা আবার পুরোনো ও আদি নামকরণ ফিরে পেলো। আমার দেশ হলো বাংলাদেশ। তাও তো আজ প্রায় ১৪ বছর আগেকার কথা।

১৯৮৫ সালে এসে এখন আমার প্রৌঢ়ত্বের সময় চলছে। মাঝে মাঝে মনে হয় 'তিন তিনটা ঐতিহাসিক সময়-কালের মানুষ' হিসেবে বহু উত্থান-পতন আর ভাঙা-চোরা ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়েও তো' বাঙালি জাতির একটা পরিচ্ছন্ন, প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ দেখতে পাই না। সবখানেই গরমিল।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত বাংলার ইতিহাস বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে একটা চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন। "... বাঙলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালি কখনও মানুষ হইবে না। ... বাঙলার ইতিহাস নাই, যারা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙলার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙলার ভরসা নাই। ... তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালি তাহাকেই লিখিত হইবে। ... আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক ...।"

এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি বলতে বাঙালি হিন্দুদের চিহ্নিত করেছেন এবং 'তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে' বলে তৎকালীন বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহিত করেছেন। এ জন্যই এতগুলো বছর পরে বিংশ শতাব্দীর আশি দশকের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, বাঙালি কৃষ্টি, বাংলা সাহিত্য আর বাঙালি সংস্কৃতির দ্রুত প্রবহমান এবং পরিবর্তনশীল ইতিহাসের ধারার অনুসন্ধান করতে বসে নানা বিভ্রাট ও বিপাকের মুখোমুখি হচ্ছি।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রবন্ধকার শ্রী বিনয় ঘোষ-এর মতে "ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধানকারীর একটা নিজস্ব 'দৃষ্টি' থাকা চাই। এই দৃষ্টিকোণটাই আসল। এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য ইতিহাস উপন্যাস হয়, ঘটনাপঞ্জী হয়, জীবনচরিত হয়, আবার দ্বন্দ্বমুখর বিরোধবন্ধুর বাস্তব জীবনেতিহাসও হয়।"

একজন যথার্থই বলেছেন, বাঙলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করতে এবং আর একজন দ্ব্যর্থহীনভাবে পথ-নির্দেশিকা দিয়েছেন যে, ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধানকারীর একটা নিজস্ব 'দৃষ্টি' থাকা চাই। এই প্রেক্ষিতেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে এক্ষুণে আমি বাঙালি জাতির সামগ্রিক ইতিহাস সন্ধান করছি। আমি আমার পিতা-প্রপিতামহদের আসল ইতিহাস খুঁজে বের করতে আগ্রহী। আমি বাংলাদেশের বাঙালি জাতির মূল সূত্র এবং ঐতিহ্যের সবটুকু উদঘাটন করতে চাই।

আমার মনে অনেক প্রশ্ন আর কৌতূহল। ইতিহাসের কোন্ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আদি জনগোষ্ঠী যুগের পর যুগ, এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহিরাগত আর্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং আর্যদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুকেই বর্জন করেছিল? আবার ইতিহাসের কোন্ প্রেক্ষিতে স্থানীয় এই বিশাল জনগোষ্ঠী খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে কয়েকশ' বছর ধরে এদেশে আগমনকারী সুফী পীর, ফকির, দরবেশ ও আউলিয়াদের প্রচারিত উদারপন্থী (রক্ষণশীল শরিয়তপন্থী নয়) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল? আর কেনই বা বাংলাদেশের স্থানীয় ও বহিরাগত এই মুসলিম জনগোষ্ঠী নব্য জাতীয়তাবাদ দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে সোচ্চার হয়েছিল, "এই দেশ, এই মাটি আমার, ভাষা, এই সাহিত্য আমার– এখানকার সংস্কৃতি আর লোকাচার সব কিছুই আমার। আমি এই দেশের বাঙালি সন্তান এবং আমাদের অধিকাংশই ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান।"

আমি বুঝতে চাই, কোন্ মন-মানসিকতার দরুন বাস্তবতাকে স্বীকার করতে না পেরে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের সময় আর্যদের উত্তরসূরী বর্ণ হিন্দুরা গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার বাংলাদেশ ত্যাগ করেছিল এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় 'শরাফত' ও 'খানদানী' মুসলমানত্বের দাবিদার অবাঙালি মুসলমানরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

আমি জানতে চাই, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লায়লা-মজনু, ইউসুফ-জোলেখা, ইমাম বিজয়, রসুল বিজয়, আলিফ-লায়লা, হানিফ-কয়রাপরী, দাস্তান-ই আমীর হামজা, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল প্রভৃতি আরবি ও ফারসি কাহিনীভিত্তিক পুঁথি সাহিত্যের পাশাপাশি চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, চৌতিশা, বিদ্যাসুন্দর, মনসা মঙ্গল, সোনাভান, জ্ঞান সাগর (আলীরাজা প্রণীত), জ্ঞান প্রদীপ (সারইদ সুলতানকৃত), কাফনচোর, যোগ কলন্দর (সৈয়দ মুর্তজা প্রণীত), পদ্মাবতী, মধুমালতী, মৃগাবতী, সতী ময়না ও চন্দ্রায়ন প্রভৃতি কাব্য কাহিনীগুলোও গণমানুষের হৃদয় জয় করে রয়েছে?

আমি অনুধাবন করতে চাই, আমার মায়ের মুখের ভাষা কীভাবে দ্রাবিড় সভ্যতা ও বৌদ্ধ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর মাঝ দিয়ে অগ্রসর হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের বাহক সংস্কৃত ভাষার আধিপত্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সুফি মনীষীদের প্রভাব, মুসলিম সুলতানদের অবিস্মরণীয় অবদান ও পৃষ্ঠপোষকতা, বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধুর্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আধুনিক সাহিত্যের গৌরবকে বক্ষে ধারণ করে আজ সম্মুখপানে কেমন করে ধাবিত হয়েছে?

আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চাই, প্রথমে জাতিগতভাবে বাঙালি এবং একই সঙ্গে অধিকাংশই ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান এই বিরাট জনগোষ্ঠী কেন দল বেঁধে ঈদের নামাজ পড়ে, নিয়মিত জুম্মার নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে, দাদী-নানীর কথায় বাড়িতে মিলাদ পড়ায়, জানাজায় শরীক হয়, পীরের দরগায় মানত করে, হাতে তাবিজ লাগায়, আজান শুনলে মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয়– আরও কতকিছু করে?

এঁরাই আবার কেনইবা একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনের বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী পালন করে, বাংলা নববর্ষে হালখাতা করে, বসন্তের আগমনে মেয়েরা কপালে টিপ দিয়ে বাসন্তী রঙের কাপড় পরে, অবসর সময়ে কিংবা বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত উপভোগ করে, কবিতার আসরের আয়োজন করে, নবান্নের উৎসব করে, কুনজরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শিশুদের কপালে কাজলের টিপ দেয়, উৎসব-পার্বণে বাড়ির উঠোনে আলপনা আঁকে, বিয়ে বাড়িতে কলাগাছ লাগায়, কুলায় ধান-দুর্বা দিয়ে আর বাড়ির আঙ্গিনায় ঘড়া ভর্তি পানি ঢেলে নববধূকে বরণ করে, ছেলের মুখে ভাত আর হাতে খড়ির উৎসব করে, দূর দেশে যাওয়ার আগে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে সালাম করে আরও কত কী!

এতসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবমুখী এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালি জাতির সামগ্রিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। এ ইতিহাসের মূল ধারা হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে জীবন সংগ্রামের ইতিহাস—এ ইতিহাস নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে সর্পিল রেখায় যুগ থেকে যুগান্তর অতিক্রম করে সম্মুখ পানে ধাবিত হচ্ছে।

আগেই বলেছি যে, বাঙালি জাতির একটা পরিচ্ছন্ন বাস্তব ইতিহাস দেখতে পাই না। সবখানেই গরমিল—নানা বিভ্রাট আর বাহানা। বাঙালি জাতির যেটুকু ইতিহাস পাচ্ছি, হলফ করে বলতে পারি যে, সেখানে আদি ও অকৃত্রিম বাঙালি গণমানুষের কথা তেমন করে লেখা নেই। সেখানে তো অনেকগুলো পরিচ্ছদই হয় বিকৃত না হয় অনুপস্থিত? এ সব ইতিহাস প্রণেতা আর সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে কার্যত আমাদের দৃষ্টিকোণের বিস্তর ফারাক। আমরা তো আসলে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান করছি। এ-ইতিহাস এ-দেশের মাটি আর বাতাসে গড়ে-ওঠা অকৃত্রিম সন্তানদের আদি পুরুষের জীবন সংগ্রাম এবং কৃষিভিত্তিক বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস।

এ রকম এক প্রেক্ষাপটে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সময়কালের বিবৃত ইতিহাসের গরমিল এবং বিভ্রাটের তথ্য উপস্থাপিত করেছি।

আমাদের জীবদ্দশায় যদি বাঙালি জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নাও হয়; তথাপিও আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য এই নিবন্ধগুলো একটা পথ-নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস রয়েছে।

পরিশেষে 'কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী' গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশকালে যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা লাভ করেছি তাঁদের কথা বলতে হয়। ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে পরবর্তী দেড় বছরকাল ধরে দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে এই লেখা প্রকাশের সুযোগ প্রদান করায় আমি ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এঁদের মধ্যে সর্বজনাব মইনুল হোসেন, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আখতার-উল আলম এবং কবি আল মুজাহিদী অন্যতম। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আলী আহসান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ বইটির ভূমিকা লিখে দেওয়ায় আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ গ্রন্থের প্রুফ দেখা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি বেলাল চৌধুরী। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কনে শিল্পী কালাম মাহমুদ এবং রূপায়নে মুনীর খান কৃতিত্বের দাবিদার।

'সবশেষে গ্রন্থটি রচনাকালের প্রাসঙ্গিক বিধায় আমার মরহুম পিতৃদেব সা'দত আলী আখন্দের কথা বলতে হয়। ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র ও আজীবন পড়ুয়া হিসেবে ইনি জীবদ্দশায় প্রায়শ যেসব কথাবার্তা বলতেন তারই সূত্র ধরে আমার এই রচনা। মরহুম সা'দত আলী আখন্দের জীবন থেকেই আমি অত্র গবেষণার মূল প্রেরণা লাভ করেছি। এই প্রেরণার উপর ভিত্তি করে সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফসল হচ্ছে, 'কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী'। আমার স্থির বিশ্বাস, বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

১লা ফাল্গুন ১৩৯৩, ১৪ই ফেব্রুয়ারি
১৯৮৭ রমনা, ঢাকা।

এম আর আখতার মুকুল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শেখ সেলিম (বাংলার বাণী), মিজানুর রহমান মিজান (দৈনিক খবর), খান মোহাম্মদ ইকবাল (শিল্পপতি), শফিকুল আজিজ মুকুল (সাংবাদিক), মুস্তফা হাসান নাসির কবি (প্রকাশক), গাউসউদ্দিন খান মনি (মনি প্রিন্টার্স), ওয়াহিদুল হক (গবেষক), কৌশিক আহমেদ (বেতার কথক), ড. মাহমুদা খানম (বাংলা একাডেমী), ত্রিদিব দস্তিদার (কবি), রফিকুল ইসলাম (বিসিক), পুর্ণেন্দু পত্রী (লেখক ও চিত্রশিল্পী), মোশাররফ হোসেন (শিল্পপতি ও ব্যাংকার), জাকীউদ্দিন আহমদ (স্বদেশ), আবুল মোকসেদ (সাংবাদিক), আনিসুল হক (এ্যাবিজ লি.), হাসনাত করিম (সাংবাদিক), ফজলে রাব্বি (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র), কে এম আমীর (পদ্মা প্রিন্টার্স), ইমামুর রশীদ (কবি), মোস্তফা আল্লামা (শিল্পপতি), এম এস কামাল (শিল্পী ও কলাকার) শাহ মোহাম্মদ রেজা (গবেষক), মোস্তাক আলী (পাভেল প্রিন্টিং), কালাম মাহমুদ (শিল্পী), বাদল রহমান (চলচ্চিত্র পরিচালক), গাজী শাহবুদ্দিন (সচিত্র সন্ধানী), মুনীর খান (শিল্পী), ফরিদ উদ্দিন (মুদ্রাক্ষরিক) এবং হাফিজুল ইসলাম হাবলু, এম এম সোলায়মান রানা ও আফরোজা পারভীন প্রমুখ।

পলাশীর যুদ্ধ থেকে নীল চাষিদের বিদ্রোহের আমল

ভারতীয় উপ-মহাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের জের হিসেবে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বছরের মধ্যে এদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ১৯০ বছরের মধ্যে প্রথম ১০০ বছর পর্যন্ত উপ-মহাদেশের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এবং পরবর্তী ৯০ বছরকাল ইংরেজ সরকার দ্বারা সরাসরিভাবে পরিচালিত হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এ কথা বলতে হয় যে, ১৭৬৪ সালের বকসার যুদ্ধ থেকে শুরু করে দেশীয় রাজন্যবর্গ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে যে সব লড়াই করেছে তার ইতিহাস পাওয়া গেলেও ১৭৬৯-৭০ সালের মহামন্বন্তর-এর পর থেকে শ্রেণীগতভাবে যে সব রক্তাক্ত বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে সবের তথ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও পর্যন্ত রচিত হয়নি।

এসব বিদ্রোহের মধ্যে শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩), ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক-তন্তুবায়ের লড়াই (১৭৭০-৮০) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপ-মহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বিহারের নীল চাষ-এর সূত্রপাত হয়। মঁশিয়ে লুই বন্নো নামে জনৈক ফরাসি ব্যবসায়ী ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নীল চাষ আরম্ভ করেন এবং পরের বছর ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যারল ব্লুম নামে জনৈক ইংরেজ এদেশে প্রথম নীল কুঠি স্থাপন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ড-এ শিল্প বিপ্লবের জের হিসেবে দ্রুত বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠলে নীলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে যে নীল প্রতি পাউন্ড চার আনার ক্রয় করত, ইংল্যান্ড-এ তার বিক্রয় মূল্য ছিল পাঁচ থেকে সাত টাকার মতো এবং বাংলাদেশ থেকেই সমগ্র বিশ্বের নীলের চাহিদা মেটানো হতো।

প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীলকর সাহেবরা স্থানীয় জমিদারদের সক্রিয় সহযোগিতায় তাদের প্রজাদের দিয়ে প্রজাদেরই জমিতে নীল চাষ করাতেন এবং সস্তায় ফসল ক্রয় করে নিজেদের ব্যবস্থাধীনে নীল রং নিষ্কাশন করাতেন। নীল রং নিষ্কাশন-এর এসব কেন্দ্রকেই 'কুঠি' বলা হতো। কিন্তু স্বল্পদিনের ব্যবধানে দেখা যায় যে, ইংরেজ কুঠিয়ালরা নিজেরাই জমিদারি ক্রয় করে কিংবা ইজারা গ্রহণ করে প্রজাদের জমিতে বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষের ব্যবস্থা করেছে। এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। অর্থ ও প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের এলাকা ছাড়াও অন্যান্য জমিদার ও জোতদারদের অধীনস্থ প্রজাদের জোর করে দাদন বা অগ্রিম টাকা দিয়ে চুক্তিপত্রে দস্তখত করিয়ে নিতে শুরু করল। চুক্তিবদ্ধ চাষিকে কী পরিমাণ জমিতে নীল চাষ করতে হবে এবং উৎপন্ন ফসল কী মূল্যে কুঠিয়ালদের কাছে বিক্রি করতে হবে সবই চুক্তিপত্রে লেখা থাকত।

একবার চুক্তিপত্রে দস্তখত করলে চাষিকে আমৃত্যু নীল চাষ করতে হতো। শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে চাষিদের উপর নেমে আসত "হাবিয়া দোজখ"-এর অবর্ণনীয় অত্যাচার। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হারাণ চন্দ্র চাকলাদার তাঁর 'ফিফটি ইয়ার্স এগো' (১৯০৫ জুলাই) নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "বাংলাদেশের ফৌজদারি আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই এই অকাট্য প্রমাণ

বহন করে যে, নীল চাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে শুরু করে তা একেবারে না উঠে যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হতো তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুটতরাজ, বসতবাটি জ্বালানো এবং লোক অপহরণ প্রভৃতি।"

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী' (অক্ষয় কুমার দত্ত সম্পাদিত) এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) পত্রিকা দু'টোতে এসব অত্যাচারের 'ছিটেফোঁটা কাহিনী' প্রকাশিত হতো। এমনকি প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' পুস্তকেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কিছু বিবরণ রয়েছে।

এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংরেজ আদালতে কোনও ন্যায্য বিচারের ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজ বিচারকদের আদালতে ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিটি বিচারই প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। বাস্তব অবস্থাটা ছিল খুবই করুণ। সুবিচার তো হতোই না ; বরং ইংরেজ নীলকরদের আক্রোশ আরও বেড়ে যেতো আর চাষিদের হতো সর্বনাশ।

১৭৭৮ থেকে চাষিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের নীল চাষিরা কোনো সময়েই ইংরেজ কুঠিয়ালদের এসব নৃশংস অত্যাচার নীরবে সহ্য করেনি। চাষিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এবং তা নীল চাষ উঠে যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর সংখ্যায় এ সম্পর্কে জনৈক ইংরেজের লেখা এক চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "প্ল্যান্টার্স : সাম হার্টি ইয়ার্স এগো" প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যেখানে দু'জন তিনজন এমনকি দুশ'জনও নিহত হয়েছে এবং আহতও হয়েছে সেই অনুপাতে। অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে 'ব্রজ' ভাষাভাষী অবাঙালি ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যে, তা যে কোনও যুদ্ধে কোম্পানির সৈনিকদের পক্ষে গৌরবজনক হতো। বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক: ড. প্রভাত কুমার গোস্বামী)।

সমসাময়িককালের ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবকে (বিদ্রোহ) সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও ভয়াবহ অত্যাচারের মাধ্যমে দমন করলেও সে সময় বাংলাদেশে নীল চাষিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশ তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

বাংলার নীল চাষিদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দারুণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন লেঃ গভর্নর গ্রান্ট-এর বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যা আমার বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল রং সংক্রান্ত অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন না ভেবে গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে যিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি আমার মতে সময়ের ইঙ্গিত অনুধাবন করতে মারাত্মক ভুল করছেন। "... আর সেই কৃষক অভ্যুত্থান ভারতের ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে তা যে কোনও লোকের চিন্তার বাইরে।"

এ সময়ের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনাকালে ভারতের নয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নিজেই লিখেছেন, নীল চাষিদের বর্তমান বিদ্রোহ আমার মনে এমন উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিল যে,

দিল্লীর ঘটনার (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ) সময়েও আমার মনে ততটা উৎকণ্ঠা জাগেনি। আমি সব সময়েই ভেবেছি যে, কোনও নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রাগান্বিত হয়ে একটিও গুলি ছোঁড়ে তা হলে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ বাংলার সব কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।" (বেঙ্গল আন্ডার লে. গভর্নরস : ই. বাকল্যান্ড ১ম খণ্ড)।

অবস্থাদৃষ্টে দেখা যায় যে, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নীল চাষিদের বিদ্রোহ রক্তাক্ত আকার ধারণ করে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এই কৃষক বিদ্রোহের দু'টি স্তর ছিল। প্রথমদিকে অত্যাচারিত কৃষকরা ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর মানবিকতা এবং ন্যায়বোধের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিল। এতে কোনও ফল না পাওয়ায় দ্বিতীয় স্তরে কৃষকরা নীল চাষে অস্বীকৃতি জানিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ইংরেজ কুঠিয়ালরা নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী ছাড়াও পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়।

১৭৯৩ সালটা উপ-মহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য এক উল্লেখযোগ্য বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই বছরেই প্রবর্তিত হয়েছিল কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—যাকে আমরা সহজে বোঝার জন্য জমিদারি প্রথা বলে থাকি। এই আইনের ফলে অচিরেই এদেশে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জমিদারি প্রথার সৃষ্টি হলো। (১৬২ বছর পর ১৯৫৫ সালে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ হয়)।

এই জমিদারি প্রথার দীর্ঘ পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। পাঠান ও মোঘল আমলে সরকারের প্রাপ্য জমির খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য নানা ধরনের মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করা হয়। ক্রমে এঁরাই প্রতিপত্তিশালী জমিদারে পরিণত হন। ১৭২২ সালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সমগ্র বাংলাকে ২৫টি জমিদারি ও ১৩টি জায়গীর বন্দোবস্ত করেন। ফলে রাজশক্তি বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সক্ষম হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এসব জমিদারি ও জায়গীরগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সাধারণত এই সময়সীমা ১০ বছরের জন্য ছিল বলেই এই পদ্ধতিকে দশসালা বন্দোবস্ত বলা হতো।

প্রাসঙ্গিক হবে বিধায় এখানে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধান প্রধান দশসালা বন্দোবস্তের খতিয়ান ও চুক্তির টাকা বৃদ্ধির চিত্র উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি :

বন্দোবস্ত এলাকার নাম	মুর্শিদ কুলি খাঁর আমল	মীর কাসেমের আমল
দিনাজপুর (৮৯ পরগনা)	৪,৬২,৯৬৪ টাকা	১৮,২০,৭৮০ টাকা
রাজশাহী (১৩৯ পরগনা)	১৬,৯৬,০৮৭ টাকা	৩৫,৫৩,৪৮৫ টাকা
বর্ধমান (৫৭ গরগনা)	২০,৪৭,৫০৬ টাকা	৩২,২৬,৯৩৪ টাকা
নদীয়া (৭৩ পরগনা)	৫,৯৪,৮৪৬ টাকা	১০,৯৮,৩৭৯ টাকা
বীরভূম (২২ পরগনা)	৩,৬৬,৫০৯ টাকা	১৩,৪২,১৪৩ টাকা
যশোর (২৩ পরগনা)	১,৮৭,৭৫৪ টাকা	৪,১৬,৩১৮ টাকা
ঢাকা (১৫৫ পরগনা)	৮,৯৯,৭৯০ টাকা	—
ফকিরকুণ্ডী বা রংপুর (২৪৪ পরগনা)	২,৩৯,১২৩ টাকা	৬,৩৭,৬৩২ টাকা

(এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল ১৮৭৫ (৩নং) এবং কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাংলার ইতিহাস: নবাবী আমল)

ইংরেজ শাসনের আমলে জমিদারি বন্দোবস্তের এসব টাকার অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায় এবং আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত নানা মধ্যস্বত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এসব মধ্যস্বত্বের মধ্যে জায়গীরদার, ডিহিদার, চাকলাদার, তরফদার, তালুকদার, চৌধুরী ক্রোরী, হাজারী, কানুনগো, পাটোয়ারি, আমিল, শিকদার প্রভৃতি অন্যতম। এ থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব যে, সে আমলে এদের ভরণ-পোষণ থেকে শুরু করে জমিদারদের পুরো খরচ ও মুনাফা ছাড়াও রাজশক্তির পুরো পাওনাটাই বাংলর কৃষকদের বহন করতে হতো।

হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর ব্যাপক প্রভাব

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আরও একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা' হচ্ছে কোলকাতায় ধনাঢ্য বাঙালি হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর ব্যাপক প্রভাব। এই সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হওয়ারও ইতিহাস রয়েছে। এদেশে ইংরেজদের আগমনের প্রথম থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া 'বাণিজ্যের সনদ' লাভ করেছিলেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আর কোনো ইংরেজ কোম্পানির পর্যন্ত ভারতে বাণিজ্যের অধিকার ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম থেকেই বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদেশে 'এজেন্সি হাউস' স্থাপন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণত ৩/৪ জন অংশীদার থাকত এবং এরা সবাই ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী। এসব এজেন্সি হাউসগুলো স্থাপন করতে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের কোনো মূলধনের পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি। কোম্পানির কর্মচারীদের আমানত ও বাৎসরিক সঞ্চয় প্রাথমিক মূলধন সৃষ্টির মূল সূত্র। স্থানীয় বণিক সম্প্রদায়ও এসব হাউসগুলোতে অর্থ গচ্ছিত রাখতেন। ক্রমান্বয়ে দেখা যায় যে, এরা এ সময় একচেটিয়াভাবে বাংলা তথা ভারতের রেশম, পাট, নীল ও তুলা প্রভৃতি ব্যবসা করা ছাড়াও ব্যাংকিং-এর সমস্ত রকমের কাজ করতে শুরু করেছে। দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট প্রদত্ত ধারের সুদের হার ছিল ১৮% থেকে ২০% পর্যন্ত। (বিনয় ঘোষ : বাংলার নবজাগৃতি)

দি বেঙ্গল ডিরেক্টরি এ্যান্ড আলম্যানাক (১৭৯৭)-এ কোলকাতায় স্থাপিত এ ধরনের প্রায় ১৯টি এজেন্সি হাউস-এর নাম পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে মেসার্স ককারেল ট্রেল এ্যান্ড কোং, মেসার্স বারবার পামার এ্যান্ড কোং, মেসার্স টড এ্যান্ড মিলার, মেসার্স ক্যাম্বেল এন্ড ক্লার্ক, মেসার্স হ্যামিলটন এ্যান্ড এবার্ডিন প্রভৃতি অন্যতম। ১৮১০ সাল নাগাদ কোলকাতায় এ ধরনের এজেন্সি হাউসের সংখ্যা প্রায় ২৭টি-তে দাঁড়ায়। স্বল্পকালের ব্যবধানে এই এজেন্সি হাউসগুলো অকল্পনীয়ভাবে মুনাফা অর্জন করায় খোদ ইংল্যান্ডেও এ ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। অন্যান্য ইংরেজ কোম্পানিগুলো ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ বাতিলের দাবি উত্থাপন করে। ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স-এর সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রদত্ত টমাস ব্রেকোর জবানবন্দী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন উচ্চপদস্থ সিভিল ও মিলিটারি কর্মচারিরা চাকরি ছেড়ে ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা দেখলেন যে, কোম্পানির দাসত্ব করার চাইতে এই বণিকবৃত্ত অবলম্বন করলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তাঁরা টাকা গচ্ছিত পেলেন এবং মূলধন হিসেবে সেই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা সঞ্চয় করলেন। এইভাবে তাঁরা এক-একজন বেশ মোটা পুঁজি নিয়ে ইংল্যান্ড ফিরল।"

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অধীনে কার্যকলাপের জের হিসেবে ১৮১৩ সালে ভারতে এই কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বাতিল করা হয়। বিপুল মূলধন নিয়ে স্থাপিত

অনেকগুলো ব্রিটিশ কোম্পানি তখন কোলকাতায় আগমন করে। এসব ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরোনো এজেন্সি হাউসগুলোর কয়েকটি ছাড়া বাকি সবগুলোই পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হলো। নতুন ইংরেজ কোম্পানিগুলোর মধ্যে মেসার্স র‍্যালি ব্রাদার্স, ম্যালকম এ্যান্ড কোং বেগ ডানলপ এ্যান্ড কোং, মার্টিন পিলার্স এ্যান্ড কোং প্রভৃতি অন্যতম। এঁরা এজেন্সি হাউস পরিচালনা এবং রফতানি বাণিজ্য করা ছাড়াও নানা ধরনের শিল্পের মূলধন বিনিয়োগ শুরু করল। এসবের মধ্যে কয়লা, অভ্র, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ শিল্প অন্যতম। এছাড়া চা-বাগান স্থাপনের জন্য এরা বিপুল পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করল।

হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণী কীভাবে ধনাঢ্য হলো

এটাই হচ্ছে এই উপ-মহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের বণিক স্বার্থের নব অধ্যায়ের সূচনাকাল। এ-সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয়। এঁরা ইংরেজ রাজশক্তির ছত্র-ছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হন। এসব বণিকরা প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে 'এজেন্সি হাউসগুলোর দেওয়ানী, মুৎসুদ্দীগিরি ও দালালী করতেন এবং পরবর্তী সময়ে (১৮১৩ সালের পর) এরাই আবার বড় বড় ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর বেনিয়ান ও এজেন্ট নিযুক্ত হলেন। এ ধরনের দেওয়ানী, দালালী, বেনিয়ানগিরি ও এজেন্টের কাজ করে এঁরা অভাবনীয় অর্থের মালিকে পরিণত হলেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এসব ব্যবসায়ীদের যেসব নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন :

১. লক্ষ্মীকান্ত বড়াল
২. দত্তরাম দত্ত
৩. রামমোহন পাল
৪. মথুরামোহন সেন
৫. নিত্যচরণ সেন
৬. রামসুন্দর পাইন
৭. স্বরূপ চাঁদ শীল
৮. জগমোহন শীল
৯. আনন্দমোহন শীল
১০. স্বরূপ চাঁদ আঢ্য
১১. কানাই লাল বড়াল এবং
১২. সনাতন শীল প্রমুখ

এঁরা সবাই ছিলেন বাঙালি হিন্দু এবং এঁদের স্বার্থ পরাশক্তি ইংরেজদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। (বার্ষিক ডিরেক্টরি ও আলম্যানাক ১৮০৫-০৬)

বাংলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হলে এসব ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাদান অপরিহার্য। গবেষকদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার ব্যবসায়ী লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুড় ধর, মতিলাল শীল, দ্বারকনাথ ঠাকুর, রামহরি বিশ্বাস, সুখময় রায়, রামচরণ রায়, রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখদের ধন-সম্পদ নবাবী আমলের জগৎশেঠ কিংবা উমিচাঁদের তুলনায় নেহায়েৎ কম ছিল না।

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ-দেশীয়দের মধ্যে যারা কোম্পানি আমলে এজেন্ট হাউসগুলোর দেওয়ানী ও মুৎসুদ্দীগিরি করত, পরবর্তীকালে তারাই নতুন নতুন ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এজেন্ট নিযুক্ত হলো। সবাই ধনাঢ্য ব্যক্তিত্বের মর্যাদা অর্জন করল।

শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, "তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে শহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন।" কথিত আছে যে, নকুড় ধরের অর্থ সাহায্যের দরুন ইংরেজরা পর্যন্ত অনেক সময় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তাঁর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। ফলে তাঁর কন্যার একমাত্র পুত্র সুখময় রায় উত্তরাধিকারী সূত্রে বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করেন। লর্ড মিন্টোর আমলে সুখময় 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনিই ছিলেন 'ব্যাংক অব বেঙ্গল'-এর একমাত্র বাঙালি ডিরেক্টর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ইংরেজদের উদ্যোগে শুধুমাত্র কোলকাতা নগরীতে ১১টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এসবের কোনও শাখা ছিল না।

মতিলাল শীল আদিতে বোতল ও কর্কের ব্যবসা করতেন। কিন্তু অচিরেই তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসে দালালী ব্যবসায় লিপ্ত হন। তখনকার দিনে কোলকাতার ৫০/৬০টি ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির ২০টির জন্য তিনি বেনিয়ান নিযুক্ত হন। এরপর মতিলাল বিদেশী 'এজেন্সি হাউস'-এর অংশীদার হন। এসব হাউস-এর মধ্যে ফার্গুশন ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়াও মতিলাল শীল জমির ব্যবসা করতেন এবং তিনি কয়েকটা আটা কলের মালিক ছিলেন।

বিশ্বম্ভর সেন সামান্য পুঁজি (মাত্র ১০ টাকা) নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। অচিরেই তিনি প্রায় ২০টি ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির বেনিয়ান নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁর গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল দুই লাখ পাউন্ডের মতো।

রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন মীর জাফরের নবাব হবার সময় লর্ড ক্লাইভ-এর দেওয়ান এবং তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। গভর্নর ভ্যানসিটার্ট ও জেনারেল স্মিথ-এর দেওয়ানী করে রামচরণ রায় বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন।

ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের লবণের এজেন্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ানী করে রামহরি বিশ্বাস এবং তদীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

প্রামার কোম্পানির খাজাঞ্চি গঙ্গা নারায়ণ সরকার অচিরেই কোলকাতার বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গোকুল চন্দ্র মিত্র ইংরেজদের সহযোগিতায় রসদের ঠিকাদারী করে সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী লবণের ব্যবসায় বিপুল সম্পদ অর্জন করেন।

রাম দুলাল দে বাণিজ্য সূত্রেই ধন লাভ করেন। সমসাময়িককালে তিনিই ছিলেন কোলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। দে মহাশয় প্রথমে ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন এবং পরে তাঁর ব্যবসা আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ দর্প নরায়ণ ঠাকুর হুইলার কোম্পানির দেওয়ানী করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এঁর পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় করে পৃথকভাবে বাণিজ্য শুরু করেন। এসব বাণিজ্যের মধ্যে নীল ও রেশম রফতানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কোম্পানির নাম ছিল 'টেগোর এ্যান্ড কোং, তিনি ইউনিয়ন ব্যাংক-এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে তিনিই ছিলেন এই ইউনিয়ন ব্যাংকের একমাত্র মালিক। এ থেকেই তাঁর সম্পদের পরিমাণ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারির প্রায় সর্বত্রই নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এমনকি তিনি এদেশে চিনি উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন এবং কয়লা খনির মালিকানার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। সরকার ছাড়াও কোলকাতার প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল এবং সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ।

এ সময়ের আরও কয়েকজন বাঙালি হিন্দু ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন যথাক্রমে গোবিন্দ রাম মিত্র, মথুরা মোহন সেন, শিব নারায়ণ ঘোষ, রামমোহন, বৈষ্ণব দাস মল্লিক ও নীলমণি মল্লিক প্রমুখ। (সূত্রঃ বাংলার নব জাগৃতি : বিনয় ঘোষ)

এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ইংরেজ কোম্পানিগুলোর ছত্রছায়া এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হওয়ায় ইংরেজ রাজশক্তি 'কিছুটা চিন্তিত' হলো। তাঁরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, এক্ষণে এই সঞ্চিত মূলধন স্বাভাবিকভাবেই শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ হবে এবং যা' কখনই ইংরেজদের কাম্য নয়। ইংরেজরা চা-শিল্প, খনি শিল্প এবং নতুন নতুন শিল্প ও কারখানা স্থাপনের বিষয়গুলো নিজেদের সম্পূর্ণ করায়ত্তে রাখতে আগ্রহী। এসময় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাম দুলাল দে, মতিলাল শীল, রাম গোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ স্বাধীনভাবে শিল্প স্থাপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেটাই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর উল্লিখিত চিন্তাধারাকে আরও বদ্ধমূল করে। অথচ ইংরেজরা তাঁদের এই সম্পূরক ও সহযোগী শক্তিকে কোনো অবস্থাতেই বৈরী ভাবাপন্ন করতে ইচ্ছুক নন। এজন্যই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ১৭৯৩ সালে জমিদারি প্রথার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের চাঞ্চল্যকর ইতিহাস

চিরস্থায়ী হিসেবে জমিদারির বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রস্তাব করে ১৭৯৩ সালের ৬ই মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডনস্থ ডিরেক্টরদের কাছে লেখা চিঠিতে বললেন, "বেশ কিছু সংখ্যক 'নেটিভদের হাতে যে বিপুল পরিমাণে মূলধন রয়েছে, তা' বিনিয়োগ করার আর কোনও পথ নেই। ... তাই জমিদারির বন্দোবস্ত নিশ্চিত (চিরস্থায়ী) করা হলে শিগগির উল্লেখিত সঞ্চিত মূলধন জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ হবে।"

লর্ড কর্নওয়ালিস-এর এই চিন্তাধারা ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়োপযোগী ও সঠিক ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী, মুৎসুদ্দিগিরি, বেনিয়ানি এবং ব্যবসার মাধ্যমে কোলকাতার সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর হাতে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে তা' জমিদারি ক্রয়ে বিনিয়োগ হতে শুরু করল। এই নব্য ধনীরা দলে দলে নতুন জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হলো।

লর্ড কর্নওয়ালিস এ সময় আর একটা 'অর্থবহ' পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি জানতেন যে, প্রাচীন বনেদী জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে প্রাপ্য টাকা জমা দিতে অভ্যস্ত নয়। তাই সামান্যতম গাফিলতির দরুন এবং নতুন বন্দোবস্তের কড়া আইনের দরুন এসব জমিদারি একে একে নীলামে উঠতে লাগল। আর কোলকাতার নব্য ধনী মুৎসুদ্দি বেনিয়ানরা নীলাম থেকে এসব জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হলেন।

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার-এর (বেঙ্গল এম এস রেকর্ড চার ভলিউম, লন্ডন ১৮৯৪ : ১নং ভলিউম-ভূমিকা) বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৯৬-৯৮ সালের মধ্যে ৫৫ লাখ ২১ হাজার ২৫২ টাকার রাজস্বওয়ালা জমিদারি নীলামের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই টাকা মোট জমির প্রাপ্য খাজনার এক-পঞ্চমাংশের মতো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পরবর্তী ২২ বছরের মধ্যে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পরিমাণ জমিদারি নীলামে বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়। অর্থাৎ বনেদী জমিদারদের হাত থেকে নব্য ধনীদের নিকট হস্তান্তর হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮০০ সালের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালেই বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়িতেই বন্দি করা হয়।

১৭৯৫ সালের ২৭ শে মার্চ গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল-এর নিকট দাখিলকৃত সিলেক্ট কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয়, "বাংলাদেশের বাকি রাজস্বের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই দু'জনের কাছে বাকি: বীরভূম ও রাজশাহীর জমিদার। সরকারি রাজস্ব থেকে নিজেদের ব্যভিচার ও বিলাসিতার জন্য প্রচুর অর্থ অপব্যয় করার দরুনই তাঁদের দেয় রাজস্ব তাঁরা দিতে পারেননি এবং তাদেরই বংশধরদের নির্দেশে জমিদারি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়।"

কিন্তু একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের এই নতুন গোত্রান্তরিত জমিদার গোষ্ঠীর চরিত্র বনেদী জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল। নব্য জমিদাররা তাঁদের জমিদারিকে এক ধরনের ব্যবসা বলে মনে করতেন। তাই এঁরা নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মধ্য স্বত্বভোগীদের বলগাহীন শোষণের লাইসেন্স প্রদান করল। এর ফলে গ্রাম-বাংলায় নতুন শ্রেণী বিন্যাসের সূচনা হলো।

লর্ড কর্নওয়ালিসের আরও ধারণা ছিল যে, কোলকাতার ধনাঢ্য সুবর্ণ শ্রেণীর নব্য জমিদার হিসেবে গোত্রান্তর হলে এঁদের জীবনের নতুন প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি এবং এঁরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নতুন ধরনের বিলাসিতা এবং মামলা-মোকদ্দামায় ব্যয় করবে। কার্যক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর চিন্তা খুবই বাস্তবমুখী বলে প্রমাণিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর এই নব্য জমিদাররা নিজেদের ব্যক্তিগত বিলাসিতা, যৌথ সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা এবং জমিদারিতে উদ্ধত প্রজাদের দমনে গুণ্ডা ও লাঠিয়াল বাহিনী ভাড়া করা ইত্যাদি ব্যাপারে কত লাখ লাখ টাকা যে ব্যয় করেছে তার কোনও সঠিক হিসাব পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং নারী, মদ ও জুয়াখেলায় ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণও কেউ বলতে পারে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় স্বল্প দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হলো জমির বর্গা প্রথা। এটাকেই উত্তরবঙ্গ এলাকায় আধিয়ার প্রথা বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে এই প্রথা চালু হবার প্রাক্কালে বিত্তশালীরা বর্গাপ্রথার সুযোগে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে এক সঙ্গে বহু জমি কিনে মালিকানা লাভ করল। সে আমলে এ ধরনের জমির মালিকদের 'লটদার' বলা হতো। 'লট' হিসেবে জমি কিনত বলেই এঁদের লটদার' নামকরণ হয়েছে। পরবর্তীকালে এরাই হচ্ছেন গ্রামবাংলার প্রতিক্রিয়াশীল 'কুলাক' (রাশিয়ায় জারের আমলে বিত্তশালী কৃষকদের কুলাক মলা বলা হতো) সম্প্রদায়। এক কথায় গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী 'জোতদার শ্রেণী।'

এখানে লক্ষণীয় এই যে, ১৯৫৫ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলেও এই বর্গা প্রথা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে চালু রয়েছে। শুধু মাত্র 'বর্গা প্রথা' কে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে তেভাগা সংক্রান্ত কয়েকটি বিধি জারি করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পরবর্তী প্রায় পৌনে দু'শ বছর পর্যন্ত এই বর্গা প্রথায় চাষের জন্য বাংলার কৃষকরা নির্মমভাবে শোষিত হয়েছে। আলোচ্য সময় শুধুমাত্র জমির মালিকানার বদৌলতে জোতদাররা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকটা লাভ করত। অথচ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম থেকে শুরু করে কৃষি উপকরণ সবটাই ছিল আধিয়ার কৃষকদের দায়িত্ব। এর অন্যথা হলেই যথেচ্ছভাবে জমি থেকে বর্গাচাষিদের উচ্ছেদ করা হতো। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশে জোতদার শ্রেণী গঠনের গোড়ার কথা।

বাঙালি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে দুঃসময়

মুসলমান বিত্তশালীরা নিজেদের হাত থেকে ইংরেজদের কাছে শাসনভার চলে যাওয়ার 'অভিমানে' এবং একশ্রেণীর ধর্মান্ধ মোল্লা মৌলভীদের প্ররোচনায় শাসক গোষ্ঠীর প্রতি কিছুটা 'অসহযোগিতা' প্রদর্শনের জের হিসেবে সযত্নে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখায় হিন্দু বণিক, সরকারি কর্মচারী এবং বিত্তশালীরা জমির মধ্যস্বত্ব লাভের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করে। এটই হচ্ছে বাংলাদেশে নতুন আর এক ধরনের 'জমিদার শ্রেণী' সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক পটভূমির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এরই ফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই, যেসব বাঙালি হিন্দু বিত্তশালীরা ভারতের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতা নগরীতে ইংরেজদের অনুকরণে ব্যবসা ও শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা করছিলেন, তাদের অনেকেই আবার জমির উপর প্রলুব্ধ হলেন এবং রাতারাতি জমিদার হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করলেন। এরই জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে দ্বারকানাথ ঠাকুর। 'কার ঠাকুর কোম্পানি' এবং রাণীগঞ্জ কোলিয়ারীতে মূলধন বিনিয়োগ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর একসময় বিশিষ্ট শিল্পপতি হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত জমিদারে পরিণত হলেন। তা'হলে সে আমলের সার্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে প্রায় কয়েক দশক পর্যন্ত 'অস্থিরতা' আর 'অরাজকতা'র পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নয়া সহযোগী হিসেবে স্থানীয়ভাবে বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের মাঝ থেকে শহরভিত্তিক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে জমিদারি ও জোতদারি প্রথার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা' পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলো। অবশ্য সমসাময়িককালেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার এবং চাকরিজীবী প্রভৃতি পেশায় লিপ্ত (প্রায় সবাই হিন্দু) ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটা বিষয়ের দিকে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপরিহার্য বলে মনে করছি। অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বাংলার এই মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে মোটামুটিভাবে মুসলমানেরা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমন এবং সুফী মনীষীদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু হওয়ায় ছ'শ বছরের মধ্যে এটাই ছিল বাংলার মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে দুঃসময়। মুসলমানদের হাত থেকে রাজ সিংহাসন চলে যাওয়ার বছর অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' বছর পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার মুসলমানদের জন্য "অন্ধকার কাল" বলে চিহ্নিত করা যায়।

নীল দর্পণ নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় যে সমাজ সংস্কারক রেভারেন্ড জেলং-এর জেল ও জরিমানা হয়েছিল, তিনি ১৮৬৯ সালের ২১ শে জানুয়ারি বেঙ্গল স্যোশাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে তৎকালে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এবং শোচনীয় সামাজিক দুরবস্থার দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এদেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এক সময় যাঁরা এত বড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন, আজ তাঁদের বংশধররা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছেন। ... বাংলাদেশের কোনও গভর্নমেন্ট অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী বিশেষ দেখা যায় না ; কিন্তু মুসলমান দফতরী আর পিওন সব অফিসে ভরে গেছে। ...

তাই অবস্থাদৃষ্টে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোচ্য শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ বাঙালি হিন্দুরা যেভাবে সানন্দে গ্রহণ করেছিল, বাঙালি মুসলমানরা সেভাবে করেনি। পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট মার্কসিস্ট গবেষক ও সমালোচক বিনয় ঘোষের মতে, "ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজের ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গোঁড়ামি ও গর্ববোধ থাকা তখন স্বাভাবিক। বাংলার মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই গোঁড়ামি, দম্ভ ও রক্ষণশীলতা এবং স্বাভাবিক ইংরেজ-বিদ্বেষের জন্য সে সময় ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তাঁদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি। প্রথম যুগে ইংরেজদের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনও তারা সুনজরে দেখেননি। এই অসহযোগিতার ও গোঁড়ামির জন্যই তাঁরা শিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের পিছনে পড়ে গেছেন। ... মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষভাব থাকার জন্য ইংরেজ শাসকরাও হিন্দুদের মতন শিক্ষার সুযোগ মুসলমানদের দেননি।"

এ সম্পর্কে তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, "প্রথম যুগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি মুসলমান-বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের সরকারি চাকরিও পেয়েছেন। মুসলমানরা সেরকম সুযোগ বা উৎসাহ পাননি। নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মিথ্যা অহংকার তাঁদের ছিল। ... ইংরেজদের নতুন জমিদারি ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার-জায়গীরদারেরা ধ্বংস হয়ে গেলেন তা নয়, বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হলো তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত নিঃস্ব প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দস্যুবৃত্তি (?) ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। সেই সময় এল ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ। ধর্মান্দোলনের ঢেউ, কৃষক বিদ্রোহ, মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ইংরেজ বিদ্বেষের এই সম্মিলিত প্রকাশকে ব্রিটিশ শাসকরা ব্রিটিশ-বিরোধী 'জিহাদ' বলে প্রচার করলেন।"

বাঙালি মুসলমানদের এই মনমানসিকতা সম্পর্কে লর্ড এলেনব্যুরোর মন্তব্য হচ্ছে, "ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের একটা জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" (প্রবলেমস্ অব ইন্ডিয়া : সেলভনকর : পৃ: ২২)।

১৮৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স এসোসিয়েশন'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে জনাব এ লতিফ বাংলাদেশে মুসলমানদের শিক্ষার

অবস্থা সম্পর্কে যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সে সম্পর্কে আলোচনাকালে ইংরেজ বিচারপতি জে বি ফিয়ার-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেন, "ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে এদেশের মুসলমান ভদ্রশ্রেণী লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মান লাভে তাঁরা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রশ্রেণী থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পশ্চাদগতির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।"

তাই এ-সময়কালের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ায় মুসলমান বিত্তশালীরা কিছুটা 'আক্রোশ' ও কিছুটা 'অভিমানে' ইংরেজ রাজশক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে এবং পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সব কিছুকেই বর্জন করেছে ; অন্যদিকে 'অভিভাবকহীন' বাংলার মুসলিম গণমানুষের নেতৃত্ব সবার অলক্ষ্যে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলভীর (অনেকেই উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে আগত) কুক্ষিগত হয়েছে। এঁরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে 'ফতোয়া' জারি এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করল। সর্বোপরি এঁরা বাংলার মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন এক ধরনের 'জগা-খিচুড়ি ভাষা ও তমুদ্দুন'-এর প্রবর্তন করল।

এতসব ঘটনা প্রবাহের আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হলো, বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত ও বিত্তশালীরা অন্তত তার অন্তর্ভুক্ত হলো না। এজন্য কারা দায়ী সে কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করেও শুধু এটুকু মন্তব্য করা যথার্থ হবে যে, এটাই হচ্ছে বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য। সে আমলের বাংলার এই নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুতেই ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল না। অথচ ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার চৌহদ্দিতেই গড়ে উঠে নির্ভেজাল প্রকৃত জাতীয়তাবাদ।

বাংলার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে পুরো উনবিংশ শতাব্দী ধরে কোলকাতা কেন্দ্রিক যে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, তাদের কর্ণধারেরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিদার হিসেবে যত কথাই বলে থাকুক না কেন, তা আসলে বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের কথাবার্তা। এজন্যই তো ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র মূল সুরই হচ্ছে যবন-বিরোধী। সে আমলে এঁদের রচিত বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই 'হিন্দুয়ানীর ঢক্কানিনাদ। 'বন্দেমাতরম' স্লোগানের আড়ালে সামগ্রিকভাবে বাঙালি সমাজের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেত। (পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথসহ জনাকয়েক ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। মানব প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাকার ঈশ্বরের পূজারী।)

সুষ্ঠু ও একটা পরিচ্ছন্ন আলোচনার সুবিধার্থেই বঙ্গীয় এলাকায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টির গোড়ার কথা এবং এঁদের বিকাশের ধারাবাহিকতার ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থাপিত করলাম। এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতার বাসিন্দাদের ব্যাপক বিকাশের কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তখন থেকেই এক শ্রেণীর বাঙালি শিক্ষিত হিন্দু বিদেশী রাজশক্তির সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। স্বল্প দিনের ব্যবধানে অত্যন্ত দ্রুত এরই ধারাবাহিকতার জের হিসেবে

বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (এটাকেই জাতীয়তাবাদী বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করা হয়।) পূর্ণতা লাভ করে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, মোটামুটিভাবে এর পেছনে চারটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের অসহযোগিতায় সৃষ্ট সুযোগ গ্রহণ। দ্বিতীয়ত নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলভীদের ব্যাপক প্রভাব। তৃতীয়ত ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু হওয়ায় নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি এবং চতুর্থত বর্গাচাষের ভিত্তিতে জোতদার প্রথার প্রবর্তনে গ্রামাঞ্চলে রাজশক্তির সমর্থক হিসেবে নতুন শক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন।

গবেষক বিনয় ঘোষের মতে, "১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে দেখা যায় যে, মধ্যস্বত্বের বিস্তারের ফলে জমিদারির সংখ্যা বাংলাদেশে দেড় লাখের বেশি হয়েছে, বিশ হাজার একরের উপরে বড় জমিদারির সংখ্যা পাঁচশ'র কিছু বেশি, ত্রিশ হাজার থেকে পাঁচশ একরের মধ্যে মাঝারি জমিদারি প্রায় ষোল হাজার এবং পাঁচশ' ও তার কম ছোটো জমিদারির সংখ্যা দেড় লাখের কিছু কম। এর সঙ্গে যদি জমিদার-পত্তনিদার-জোতদারদের গোমস্তা নায়েব তহশীলদার পাইক দফাদার প্রভৃতি কর্মচারী ও ভৃত্যের সংখ্যা যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে উনিশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব নীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজে কমপক্ষে সাত-আট লাখ লোকের এমন একটি 'শ্রেণী' (সামাজিক 'স্তরায়ন') তৈরি হয়েছে, যে শ্রেণী ব্রিটিশ শাসকদের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ। অবশ্য সামাজিক শ্রেণী হিসেবে বলতে গেলে একটি শ্রেণী বলা যায় না, দু'টি শ্রেণী বলতে হয়– 'একটি' নতুন জমিদার শ্রেণী, আর একটি নতুন মধ্যস্বত্বভোগী ও গ্রাম্য মধ্য শ্রেণী। নামে দুই শ্রেণী হলেও, কাজ ও স্বার্থের দিক থেকে এদের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ এক শ্রেণীর মতোই।"

নব-সৃষ্ট হিন্দু মধ্য শ্রেণীর ভুয়া রেনেসাঁ

"এ-পাশে নাগরিক সমাজে, যেমন কোলকাতা শহরে, ব্রিটিশ শাসকরা তাদের বিশ্বাসভাজন আরও দু'টি শ্রেণী তৈরি করেছিলেন– একটি নতুন নাগরিক ধনিক শ্রেণী, আর একটি নতুন নাগরিক মধ্য শ্রেণী। এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ছোটো ছোটো ব্যবসায়ী, দোকানদার, দালাল প্রভৃতির সংখ্যা অনেক, বাকি নানারকমের চাকরিজীবী। নাগরিক মধ্য শ্রেণীর একটি বিশেষ স্তর হিসেবে গড়ে উঠেছিল বাঙালি ইংরেজি শিক্ষিত এলিট শ্রেণী। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি সমাজের এই শ্রেণী রূপায়ণ নিশ্চয় একটা বড় রকমের পরিবর্তন এবং আগেকার পিরামিডের মতো স্তরিত সমাজের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। আগে বলেছি, নবযুগের নতুন শ্রেণী বিন্যাস অচল নয়, সচল– উর্ধ্বাধঃ গতিশীল এবং সেই গতির প্রধান চালিকা শক্তি 'টাকা'। টাকা সচল, শ্রেণীও তার ছন্দে সচল। বাঙালি সমাজে আঠারো উনিশ শতকে এ সত্যও নির্মম বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার জন্যই কি তাকে 'রেনেসাঁস' বলা যায়?"

পরবর্তীকালে অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার 'এই নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর দ্রুত বিকাশকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। এঁদের মতে, বাংলার এই যুগই হচ্ছে 'নব জাগরণের যুগ'। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন ইংরেজি শিক্ষায় দীক্ষিত হতে শুরু করেছে– তঁদের সম্মুখে তখন 'পশ্চিমের নতুন দুয়ার' উন্মোচিত হয়েছে। মানববাদী দর্শনের সুচতুর আবরণে পাশ্চাত্যের

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ছাড়াও আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সব কিছুই এঁদের দৃষ্টিতে 'সজীব ও মহান'। রেনেসাঁ আর নব-জাগরণের ধ্বজা উত্তোলন করে বাংলার বর্ধিষ্ণু বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তখন 'বাবু কালচারের' পাশাপাশি 'সাহেবী কালচার'কে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপকভাবে প্রয়াসী হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে আক্রমণকারী দুর্ধর্ষ হিস্পানী আর্মাডাকে যখন ইংরেজরা পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়, তখন থেকেই তীব্র জাতীয়তাবাদ বোধের ভিত্তিতে সমগ্র ইংল্যান্ডে রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের জোয়ার বয়ে যায়। ইংরেজদের এই নব জাগ্রত দেশপ্রেমের প্রতীক এবং এর কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন রাণী এলিজাবেথ।

তাই ইংল্যান্ডের রেনেসাঁর শুরু যেখানে হিস্পানী আর্মাডার বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিজয়ের মাঝ দিয়ে ; সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রেনেসাঁর সূচনা হচ্ছে জাতির পরাজয়ের মাঝ দিয়ে। এই রেনেসাঁ বা নবজাগরণই হচ্ছে, কখনও পরোক্ষভাবে আবার কখনওবা নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর গুণকীর্তন করে। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হয় যে, সে আমলে বাংলার মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 'নবজাগরণ' হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে। এই নবজাগরণের' মোদ্দা কথাটাই হচ্ছে 'বশ্যতা মেনে নিয়ে পরাধীনতার শৃংখল সুদৃঢ় করা'।

এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "... বাংলার নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী ও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপোস করে, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সরকারি চাকরির মাধ্যমে নিম্নস্তরের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সন্তুষ্ট করে।

ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যেভাবে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমানেরা সেভাবে করেননি।" শ্রী ঘোষ সে আমলের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার সরাসরি সমালোচনা করতে সাহসী হননি। তিনি মোদ্দা কথাগুলো কিছুটা ঘুরিয়ে বলেছেন, "প্রধানত ব্রিটিশ কূটকৌশলের জন্য এবং আংশিকভাবে মুসলমান সমাজের আত্মভিমান, অসহযোগিতা ও গোঁড়ামির ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধিজীবীরা এই সামগ্রিক বিষয়টাকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ভ্রমাত্মক আদর্শ কোনও ইজম-এর সুদৃঢ় ভিত্তি হতে পারে না

সে আমলের এই মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ 'বাঙালি হিন্দুয়ানীকেই' 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বলে এক রকম নিশ্চিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত এই চিন্তাধারা অনেকের কাছেই সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাস্তবে এই ব্যাপারটা কত 'নাজুক' ও 'ঠুনকো' ছিল। একটা ভ্রমাত্মক আদর্শ কোনও ইজম-এর জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি হতে পারে না। প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে 'বাঙালি হিন্দুয়ানীকেই' 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাকে বিলীন করতে 'অপরিপক্ক' প্রতিপক্ষের চার যুগের বেশি সময়ের প্রয়োজন হলো না। প্রথম পর্যায়ে ধর্মীয় স্লোগান উচ্চারণ করে এই প্রতিপক্ষ 'বাঙালি হিন্দুয়ানীকে' পদ্মার ওপারে বিশাল অবাঙালি জনসমুদ্রে ঠেলে দিল। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষ মাত্র ২৪

ছরের ব্যবধানে নির্ভেজাল বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগান উচ্চারণ করে রক্তাক্ত পথে র্মান্ধদের হটিয়ে দিয়ে পৃথক আবাসভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করল।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার পুরো জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে এখানকার দ্রুত সৃষ্ট নয়া মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী এর কিছুটা স্পর্শ থাকাটা স্বাভাবিক। তবুও একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির দুর্গম পথ অতিক্রম করে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। এখন বাংলাদেশে প্রকৃত বাঙালি জাতীয়তাবাদের শৈশবকাল চলছে। অবশ্য টাকার এ-পিঠে বাঙালি হিন্দুয়ানীর মতো ও-পিঠের বাঙালি মুসলমানী'র প্রবক্তারা মাঝে মাঝে কিছুটা 'ধূলিঝড়ের' সৃষ্টি করবে বৈকি ! কিন্তু তা হচ্ছে নিতান্তই সাময়িক। বাংলাদেশের তরুণ সমাজই এদের মোকাবেলা করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে সক্ষম।

বাঙালি হিন্দু পরিচালিত তৎকালীন সংবাদপত্রের নিন্দনীয় ভূমিকা

যা হোক, অত্র নিবন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দেড়শত বছরে বঙ্গীয় এলাকায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টির অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সংক্ষিপ্ত আকারে কিছুটা উপস্থাপিত করেছি। এক্ষণে আলোচ্য সময়ে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কর্মকাণ্ড এবং বিরাজমান মনমানসিকতা অনুধাবনের লক্ষ্যে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা অপরিহার্য মনে করছি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালিত্বের দাবিদার কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু এই বুদ্ধিজীবী সমাজ নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে কীভাবে ইংরেজ পরাশক্তির 'লেজুড়' হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আদর্শ দেশপ্রেম আর রেনেসাঁর কথাবার্তা বলে এরা যত ধূলিঝড়ের-ই সৃষ্টি করুক না কেন এ কথা আজ গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আলোচ্য সময়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে গণমানুষের আন্দোলনে নেতৃত্বদান কিংবা 'ভ্যানগার্ড' হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত প্রচেষ্টাকে হয় এঁরা বিদ্রুপ করেছে— না হয় উলঙ্গভাবে বিরোধিতা করেছে।

এই প্রেক্ষিতে প্রথমেই কোলকাতা থেকে প্রকাশিত তৎকালীন সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে হয়। সে আমলে অবিভক্ত বাংলার 'কৃষক বিদ্রোহ', 'সিপাহী বিদ্রোহ' কিংবা 'নীলচাষিদের বিদ্রোহ' কোনোটাকেই এসব পত্র-পত্রিকা সুনজরে দেখেনি। সর্বত্রই শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার উদগ্র বাসনায় এসব সংবাদপত্রের পরাশক্তির সমর্থক হিসেবে অতি নিন্দনীয় ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। সংবাদপত্রে সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'সিপাহী বিদ্রোহ'র সময়ে কোলকাতার সংবাদগুলোতে সিপাহীদের এসব কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ইংরেজের প্রতি দাসসুলভ মনোভাবের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করা যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "যে হতভাগ্যরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণের মারফত যাঁদের অস্ত্রধারণপূর্বক নিজেদের মানব জীবনের অবমাননা করেছেন অথচ এঁদেরই পূর্বসুরীদের রাজত্বকালে এসব হতভাগ্যরা এবং এদের পূর্ব-পুরুষরা গত একশ বছর ধরে জীবন ও ধন-

সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ করেছেন এবং গত দশ শতাব্দীর মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের দরুন সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত যাঁদের রাজত্বে আমরা বসবাস করছি, আমি নিজেকে আমাদের সমাজের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যে সমাজের প্রতিটি সদস্যই দেশবাসীর মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও যাঁরা মহারাণীর দেশীয় প্রজাসাধারণের অধিকাংশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন, আমি তাঁদেরই একজন হিসেবে সবার জন্য প্রযোজ্য একটা কথা সোচ্চার করে উচ্চারণ করতে চাই যে, সরকার আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি এবং এতে করে সরকারের শত্রুদের এমন কোনো যুক্তি নেই যাতে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিথিলতার উদ্রেক হতে পারে।"

ঝাঁসির রাণীকে 'কুলটা' বলে ভর্ৎসনা

সে আমলের বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলের শ্রেণী স্বার্থের পক্ষে দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায় অকাট্য সত্য ভাষণ করেছেন। এসময় সাময়িকভাবে হলেও কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতো ব্যক্তিত্বের চিন্তাধারাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি ঝাঁসির রাণীকে 'কুলটা' বলে ভর্ৎসনা করলেন।

সার্বিকভাবে বলতে হলে, এ সময় কোনও কোনও বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ভিন্ন মত পোষণ করলেও তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় নেহাৎই নগণ্য এবং সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, 'সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল, এক নবশক্তির সূচনা হইল, এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল'। (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ)

ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড থমসন এবং জি টি গ্রান্ট যৌথভাবে তাঁদের রচিত 'রাইজ এ্যান্ড ফুলফিলমেন্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' (এলাহাবাদ ১৯৬২) গ্রন্থে যথার্থভাবে মন্তব্য করেছেন, "সিপাহী যুদ্ধের মতো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা যখন দূরে সরে যাচ্ছে মনে হলো, তখন ভারতবাসীর এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করলেন এবং এই নতুন শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে কী উপায়ে নিজেদের এবং বংশধরদের উন্নতি হতে পারে তারই চেষ্টা শুরু করলো।"

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৎকালীন বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কর্ণধারেরা শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিরাজমান মনমানসিকতাকে মধ্যযুগের ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণে আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বা 'মানববাদী জীবনাদর্শের নব জাগরণ' হিসেবে আখ্যায়িত করল। অথচ এই নব জাগরণের শুরুটা হচ্ছে পরাধীনতার সুদৃঢ় বন্ধনে।

১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথমে সূত্রপাত হয় বহরমপুর ও ব্যারাকপুরে। এরপর এই বিদ্রোহ দ্রুত সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও জলপাইগুড়ির সৈন্য ছাউনিতে এই বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই সিপাহী বিদ্রোহ কোনো অবস্থাতেও সে আমলে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলের সামান্যতম সমর্থন লাভ করেনি। বরং এই বিদ্রোহ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলের 'বিরক্তির' কারণ হয়েছিল।

সম্প্রতি এ সম্পর্কে মূল্যায়ন করে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় মন্তব্য করেছেন, "বাংলাদেশের জনসাধারণ বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি কোনও সহানুভূতি দেখায় নাই। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজও ইহাকে কোনও জাতীয় অভ্যুত্থান বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম বলে মনে করে নাই।" (বাংলাদেশের ইতিহাস আধুনিক যুগ: রমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৩৭৮)।

যে যুগের প্রখ্যাত কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৭ সালের ২০শে জুন তারিখে প্রকাশিত মন্তব্যে বলা হয় যে, "কয়েক দল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত-বিবেচনাবিহীন এতদ্দেশী সেনা অধার্মিকতা প্রকাশপূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবা-রাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, 'এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববৎ শান্তি স্থাপিত হউক। হে বিঘ্নহর ! তুমি সমুদয় বিঘ্নহর, সকল উপদ্রব নিবারণ কর ... যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে তাহাদিগ্যে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ বৃক্ষের ফল ভোগ করুক।" ব্রিটিশদের মতো একটা পরাশক্তির পক্ষে এর চেয়ে বড় ধরনের দালালী আর কী হতে পারে?

এখানেই শেষ নয়। সে আমলের কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের মনমানসিকতার প্রতিধ্বনি করে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আরও লিখলেন, "এই রাজই (ইংরেজ রাজত্ব) তো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজত্ব হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মন্ত্র বিদ্যা এবং ধর্ম-কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি, কোনো বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তকরণে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলন্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।"

একই দিনে (২০ শে জুন ১৮৫৭) পণ্ডিত গৌরী শংকর ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার মন্তব্য আরও ভয়াবহ, চাঞ্চল্যকর ও লজ্জাকর। সম্পাদক পণ্ডিত গৌরী শংকর লিখেছেন, "হে পাঠক সকল, উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয় ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর ... আমাদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চা শিবিরাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বাহিরে যুদ্ধে আসিয়াছিল, আমাদের তোপমুখে অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যরা ন্যূনাধিক ৪০ তোপ এবং শিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠারা দুর্গ প্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সৈন্যরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে।

এছাড়াও তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং বাঙালি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছেন যে, 'সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে সিপাহীদের ব্যাপার এবং এর সঙ্গে জনসাধারণের কোনোই সম্পর্ক নেই।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের কেউই এমনকি পরোক্ষভাবেও সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে কোনও কথাই বলেননি। আধুনিক যুগের ভাষায় এঁদের 'হিন্দু রাজাকার' নামে আখ্যায়িত করা যায়।

এক্ষণে সমসাময়িককালে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা এবং মনমানসিকতা অনুধাবন করার লক্ষ্যে সে আমলের নাট্য আন্দোলন ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটক এবং মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের কথা বলতে হয়। এই দু'টি নাটকের রচনার ইতিহাস এবং তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করলেই, সে আমলের বুদ্ধিজীবী সমাজের 'দাস সুলভ' মনোভাব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, 'নীল দর্পণ' নাটকের পরিণতি হতাশাব্যঞ্জক এবং নাটকটি সংস্কারপন্থী। 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি সিরাজগঞ্জে ১৮৭২-৭৩ সালে রক্তাক্ত কৃষক বিদ্রোহের সময় রচিত হলেও এতে কোনো বিদ্রোহী কৃষকের চরিত্র পর্যন্ত নেই এবং নাটকটির পরিণতি নৈরাশ্যজনক। তবুও তৎকালীন কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজ এ দু'টো নাটকের একটিকেও সহ্য করতে পারেনি।

নীল দর্পণ ও জমিদার দর্পণ নাটক এবং সে আমলের বুদ্ধিজীবী

১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং ১৮৫৯ সালের নীল চাষিদের সার্থক বিদ্রোহের বহ্নিশিখার মাঝে দাঁড়িয়ে ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকে বাংলার কৃষকদের গৌরবজনক প্রতিরোধ সংগ্রামের সার্বিক প্রতিচ্ছবি অনুপস্থিত এবং নাটকের ভূমিকায় মিত্র মহাশয় নীলকর সাহেবের চরিত্র সংশোধন আর ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর মহানুভবতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। মোদ্দা কথায় নাটকটি নীল বিদ্রোহের সমর্থনে লেখা হয়। তবুও নীলকরদের নির্যাতনের কথা এত স্পষ্ট করে এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি।

দীনবন্ধু মিত্র পেশায় সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। মিত্র মহাশয় চাকরির প্রথম জীবনে ডাক বিভাগে পোস্ট মাস্টার ছিলেন। পরে তিনি সুপারিনটেনডেন্ট পদে প্রমোশন লাভ করেন। এই ডাক বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তিনি ব্যাপকভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেন এবং মানব-চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শুধু তাই-ই নয়, এ-সময় তিনি প্রত্যক্ষ করলেন নীল চাষিদের উপর ইংরেজ কুঠিয়ালদের ভয়াবহ ও পৈশাচিক অত্যাচার। দীনবন্ধু মিত্র আরও লক্ষ করেছিলেন যে, বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় মিলিতভাবে হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা অস্ত্র হাতে সাফল্যজনকভাবে পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করেছে। শাসক গোষ্ঠী তখন ভীত ও আতঙ্কিত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে 'নীল দর্পণ' নাটকটিতে বাংলার কৃষকদের এই গৌরবজনক প্রতিরোধ সংগ্রামের সার্বিক প্রতিচ্ছবি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। (কেবলমাত্র দু'একটা জায়গায় ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন নবীন মাধবকে লক্ষ করে কৃষক তোরাপ আলীর বক্তব্য : "বড় বাবু সমিন্দির কি এমান আছে তা' ধরম কথা শোনাবে। ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা।")

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নাটকে শুধু একটি মাত্র দিকই তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং সেই ভয়াবহ অত্যাচারের মোকাবেলায় কৃষকদের করুণ অবস্থা। অথচ এদিকে তৎকালীন গ্রামবাংলার পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে ১৮৬০ সালের ৩১ শে মার্চ নীল চাষিদের এ ধরনের সশস্ত্র পাল্টা হামলার কারণ অনুসন্ধান ও তদন্ত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের 'ইনডিগো কমিশন' বা 'নীল কমিশন' গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই কমিশনের দাখিলকৃত রিপোর্টের ভিত্তিতে এ মর্মে আইন বিধিবদ্ধ করা হয় যে, "নীলের চাষ করা কৃষকদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কোনও নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

বলপূর্বক কৃষকদের দিয়ে নীলের চাষ করাতে পারবে না"। এটাই হচ্ছে উপ-মহাদেশের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর ১৯০ বছরকাল শাসনকালে কৃষকদের সর্বপ্রথম সফল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই কৃষক বিদ্রোহকে অনায়াসে একটা সফল বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

নীল দর্পণ নাটক রচনার চমকপ্রদ পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। এসময় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র সংবাদের প্রতি নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঘটনাস্থল যশোর জেলার বেগুনবেড়ের কচিকাটা নীল কুঠি। অদূরে সমৃদ্ধশালী স্বরপুর গ্রাম। সংবাদটি ছিল নিম্নরূপ :

"আর্চিবলড্ হিলস্ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এক কৃষক কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। ঐ কৃষক কন্যার নাম হরমণি। বালিকা যখন একদিন দীঘি হইতে জল আনিবার জন্য বাড়ির বাহির হয়, তখন আর্চিবলড্-এর লোক হরমণিকে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার কুঠিতে লইয়া যায় এবং দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আটক রাখে"।

নীল দর্পণ নাটকে কৃষক বিদ্রোহ অনুপস্থিত

এই নির্দিষ্ট ঘটনা এবং তৎকালীন সমাজ জীবনের আরো কিছু ঘটনার ভিত্তিতে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করলেন প্রখ্যাত নাটক 'নীল দর্পণ'। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই নাটকে ইংরেজ নীলকর কুঠিয়ালদের ভয়াবহ অত্যাচারের বিস্তারিত চিত্র উপস্থাপিত করা হলেও, বাংলার কৃষকদের অবস্থা অসহায় হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অবস্থাটা হচ্ছে বেশ কিছুটা ভিন্নতর। বাংলার কৃষকদের প্রতিরোধ সংগ্রামের জের হিসেবে শাসক গোষ্ঠী তখন আতংকগ্রস্ত। কিন্তু নাট্যকার তাঁর রচিত নাটকে প্রচ্ছন্নভাবেও এই প্রতিরোধ সংগ্রামের এবং বিদ্রোহের কিছুই চিত্রিত করেননি। বরং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ-এর ভূমিকায় নীলকর সাহেবদের চরিত্র সংশোধনের এবং ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর মহানুভবতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি ইংরেজ কুঠিয়ালদের সম্পর্কে লিখেছেন :

"এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাহাদিগেরে ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলংকতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোক্ষভাবে শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারের প্রাতঃস্মরণীয় সিডনী, হাইয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অবলংক ইংরেজকুলে কলংক রটিয়াছে"।

ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর মহানুভবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দীনবন্ধু মিত্র ভূমিকায় স্পষ্টভাবে আরও লিখেছেন :

"প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীন সুবিজ্ঞ সাহসী উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভর্নর জেনারেল হইয়ছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পরায়ণ গ্রান্ট মহামতি লেফটেন্যান্ট গভর্নর হইয়াছেন এবং ক্রমশ সত্যপরায়ণ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিভিল সার্ভিস সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শন-চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইতেছে"।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নিশ্চিত ধারণা এই যে, দর্পণে মুখ দেখার পরও যদি অত্যাচারী ইংরেজ কুঠিয়ালরা নিজেদের চরিত্র সংশোধন না করে, তা'হলে অন্তত ইংল্যান্ডের শাসক শক্তি এক্ষেত্রে ন্যায়ের সপক্ষে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে।

নাট্যকারের মতে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে উপ-মহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং মহারাণীর নিজস্ব প্রতিনিধিরা যখন শাসন কার্যের দায়িত্বে রয়েছেন তখন ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের কোনো চিত্র নীল দর্পণে নেই। বরং এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে পাশ কাটিয়েও নাটকের বলিষ্ঠতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে নাট্যকার পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। 'নীল দর্পণ' নাটকটির অভিনয় দেখে কিংবা নাটকটি পড়ার পর ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রতি মানুষের মনে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অব্যাহতি লাভের কোনও পথ উন্মুক্ত নেই। মনে হয় ক্রন্দন ও মৃত্যুই হচ্ছে এসবের স্বাভাবিক পরিণতি। এজন্যই নাটকে একের পর এক মৃত্যুর দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছে। ক্ষেত্রমণি, গোলকচন্দ্র ও নবীন মাধবের মৃত্যু এবং মা সাবিত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ও পুত্রবধূ সরলতাকে নৃশংসভাবে হত্যার পর করুণ মৃত্যু সবকিছুই লোকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কিন্তু নাটকে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বা ইশারা পর্যন্ত কিছুই নেই। সবকিছুর শেষে নাট্যকার যেন বোঝাতে চাচ্ছেন যে, "মাথাবনত অবস্থায় করজোড়ে স্বৈরাচারী রাজশক্তির কাছে সুবিচারের আবেদন করাই বাঞ্ছনীয়। ইংল্যান্ড থেকে আগত কোনও কোনও রাজপুরুষ অত্যাচারী হইলেও আসলে এই রাজশক্তিই হচ্ছে প্রজাহিতৈষী। অতএব 'বিদ্রোহ' আর 'প্রতিরোধের' পথ কোনও অবস্থাতেই সঠিক ও সুষ্ঠু হইতে পারে না"।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে সে আমলে কেন এই ধরনের 'দাসসুলভ' মনমানসিকতা বিরাজ করছিল? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে, তৎকালীন অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবকালীন (বিদ্রোহী) এবং তৎপরবর্তী সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা অপরিহার্য।

সংস্কারপন্থী নীল দর্পণ নাটকও সহ্য করা সম্ভব হয়নি

এর পরেও যে যুগের ইংরেজ শাসকরা এবং ইংরেজ রাজপুরুষরা এই 'নীল দর্পণ' নাটকের কাহিনী সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় সর্বপ্রথম যশোর জেলার বেগুনবেড়ের কচিকাটা নামক নীলকুঠিতে কুঠিয়াল আর্চিবলড্ হিলস্ কর্তৃক কৃষক কন্যা হরমণির উপর নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হলে হিলস্ সাহেব এই পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটা মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেন। মোকদ্দমা চলাকালীন সময়েই সম্পাদক হরিশ চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন হরিশচন্দ্রের বিধবা স্ত্রীর নামে এই মামলা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বিচারকের রায় মোতাবেক এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে হরিশচন্দ্রের স্ত্রীকে এই মোকদ্দমা মেটাতে হয়। তবুও কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এ ব্যাপারে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি।

এ সময় ফাদার জেমস্ লং নামে কোলকাতার জনৈক ইংরেজ পাদ্রী ' নীল দর্পণ' নাটকের অনুবাদ করেন। তিনি এই অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করে ইংল্যান্ড ও ইউরোপে প্রেরণ করেন। ফলে লন্ডনস্থ সুপ্রিম কোর্টে ফাদার লং-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনীত হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত ফাদার লং-এর এক মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

মজার ব্যাপার এই যে, নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি সংস্করণের কোথাও রেভরেন্ড জেমস্ লং মূল লেখক দীনবন্ধু মিত্রের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। ফলে মিত্র মহাশয়কে এই মামলায় আসামী হিসেবে জড়িত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাংলা সরকারের তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি মি: সিটন কারকে ইংরেজি নীল দর্পণ নাটকের জন্য চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে হয়। কারণ মি: কার-এর নির্দেশে এই ইংরেজি সংস্করণ নাটকটি বাংলা সরকারের নিজস্ব ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, প্রকৃতপক্ষে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীল দর্পণ নাটকটি জেমস্ লং-এর পক্ষে কোনো রকম স্বীকৃতি ছাড়াই অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। ফলে মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও এই মামলার আসামী হিসেবে জড়িত করা যায়নি। কিন্তু তাঁকেও প্রকারান্তরে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলীতে (বসুমতী সংস্করণ ১ম ভাগ, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। "আর নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন ... শেষে তিনি তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রিম কোর্টের চাকুরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"।

মধুসূদন কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি তৎকালীন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গবেষক ড: প্রভাত কুমার গোস্বামীর মতে, "প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাভাবিক মমতাবোধ থাকলেও বিদ্রোহকে এঁরা ভয় পেতেন। তাঁরা জানতেন কৃষক বিদ্রোহ শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই উৎখাত করে থামবে না, সেই সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সহযোগী সমাজের পত্তন করেছিল তারও ভিত্তি ধ্বংস করে দেবে। এইসব বুদ্ধিজীবীরা যে সমাজ থেকে এসেছিলেন সেই সমাজের একাংশই একদিন নিজের এলাকায় রাজার জাতকে (নীলকর সাহেবদের) ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছিলেন"।

নীল দর্পণ নাটকের ভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্র স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মুষ্টিমেয় নীলকর সাহেব খারাপ হতে পারে, কিন্তু ইংরেজ জাতি কলংকশূন্য। সর্বোপরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরা যখন দেশ শাসন করেছেন তখন সুবিচার পাওয়া যাবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ইংরেজ সিভিল সার্ভিসের উপর এরকম অগাধ বিশ্বাস সেখানে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নিশ্চিতভাবে নির্যাতিত চাষিদের সাফল্যজনক নীল বিদ্রোহের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করতে পারেন না। তাই দীনবন্ধু বাবু নীল বিদ্রোহকে ভিত্তি করে এ নাটক রচনা করেননি। নাটকে নীল বিদ্রোহের নায়কদের চরিত্র নেই বললেই চলে। এতে রয়েছে নীলকরদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষিদের গুটিকয়েক বলিষ্ঠ সংলাপ আর অসহায় ক্রন্দন ও মৃত্যুর ঘনঘটা।

এতদসত্ত্বেও সে যুগের ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এই 'নীল দর্পণ' নাটকের ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর কোলকাতার শ্যামবাজারে নাট্য সমাজে 'নীল দর্পণ' নাটক মঞ্চস্থ হবার পর, তৎকালীন কোলকাতার ইংরেজ সমাজে মারাত্মক ও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নাটকটি দ্বিতীয় রজনী (২১/১২/১৮৭২) অভিনীত হওয়ার আগেই ইংরেজদের মুখপত্র দি ইংলিশম্যান পত্রিকায় (বর্তমানে স্টেটস্‌ম্যান) নীল দর্পণের অভিনয় বন্ধ করার দাবি উত্থাপিত হয়। ১৮৭২ সালের ২০ শে ডিসেম্বরের

ইংলিশম্যান পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, "একটা নেটিভ পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, জোড়াসাঁকোর ন্যাশনাল থিয়েটারে শীঘ্র এই নাটক আবার অভিনীত হতে যাচ্ছে। এই নাটকটি অনুবাদ করার দরুন ইউরোপীয়দের মানহানি হয়েছে বলে হাইকোর্টের বিচারে রেভারেন্ড মি. লং-কে যেখানে এক মাসের কারাদণ্ড দেখা হয়েছে, সেখানে সরকার কর্তৃক একটা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সেন্সরের মাধ্যমে মানহানির অংশগুলো বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াই নাটকটি মঞ্চায়নের বিষয়টি আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে।"

এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামবাজারের ন্যাশনাল থিয়েটারের সেক্রেটারি 'দি ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লিখিত এক পত্রে জানান যে, "২১ শে ডিসেম্বর নাটকটির দ্বিতীয় রজনী অভিনয়ের সময় নাটকের মানহানির অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে"। সেক্রেটারি মহোদয় উল্লিখিত পত্রে বিনীতভাবে আরও জানান যে, নীল দর্পণ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখান, ইংরেজদিগকে বিরূপ করা নয়। ইংরেজ চরিত্রের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। (২৩/১২/১৮৭২ তারিখে দি ইংলিশম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ন্যাশনাল থিয়েটারের সেক্রেটারীর পত্র)।

'মানহনির অংশ' বাদ দিয়ে সে আমলের সংস্কারপন্থী এবং পরোক্ষভাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজশক্তির ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থাশীল নাটক 'নীল দর্পণ' এভাবেই রক্ষা পেল। আজও পর্যন্ত 'নীল দর্পণ' নাটকে উক্ত 'মানহানির' অংশের সংযোজন হয়নি।

এতদসত্ত্বেও কোলকাতা কেন্দ্রিক উক্ত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলের শ্রেণী স্বার্থে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নীল দর্পণ'-এর মতো সংস্কারপন্থী নাটককে সহ্য করতে পারেননি। তিনি ১৮৭৩ সালে (ভাদ্র ১২৮০) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নীল দর্পণ নাটকের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "নীল দর্পণকার প্রভৃতি যাহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থে নাটক প্রণয়ন করেন আমাদিগকে বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, সমাজ সংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারাভিপ্রায়ে প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না"।

এ প্রসঙ্গে মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। লেখক মীর মোশাররফ হোসেন স্বয়ং জমিদার-নন্দন। তিনি ১৮৭৩ সালে এই নাটক রচনা করেন। ১৮৭২-৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ এলাকায় যে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়, তারই চৌহদ্দির একটা বিশেষ দিক নিয়ে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে জমির উপরে এ দেশের কৃষকদের যে অধিকার ছিল ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অত্যন্ত সন্তর্পণে সেসব অধিকার হরণ করে জমিদারদের হাতে অর্পণ করল। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট এসব জমিদার বাংলার গ্রামীণ এলাকায় লাগামহীন অত্যাচার আরম্ভ করে। এসব অত্যাচারের মধ্য দিয়ে 'দফায় দফায় অবৈধ আদায়, নতুন জরিপ প্রণালী প্রবর্তন করে জমি চুরি, খাজনা বৃদ্ধি ও কবুলিয়ত গ্রহণ' প্রভৃতি ছিল অন্যতম। পাবনার সিরাজগঞ্জ এলাকায় জমিদারদের এসব লাগামহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে অচিরেই বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এই বিক্ষোভই সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহকে দমন করা হয়। অবশ্য এই রক্তাক্ত বিদ্রোহের মাঝ দিয়ে কৃষকরা তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করে।

জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন দুঃসাহসিক কাজ

আগেই উল্লেখ করেছি যে, জমিদার-নন্দন মীর মোশাররফ হোসেন সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি রচনা করেননি। এমনকি কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতেও নাটকটি রচিত হয়নি। মোদ্দা কথায় নাটকটির মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী জমিদাররা শ্রেণী সৃষ্টি করে সরাসরিভাবে প্রজা পালনের যে দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছে, জমিদার তা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পালন করছে না। জমিদাররা চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

নাটকের ভূমিকার মীর সাহেব লিখেছেন, "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালোমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখ তত ভালো দেখা যায় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার। সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক করে না"।

'জমিদার দর্পণ' নাটকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা যে সম্মিলিত সংগ্রাম করে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার কোনো দিক-নির্ণয় কিংবা ইঙ্গিত পর্যন্ত লেখক দেননি। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কৃষক সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিধায় নাটকে এদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং জমিদারদের অত্যাচারের মুখে কৃষকদের অসহায় অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই নাটকে জমিদারের শ্রেণী চরিত্র অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রকেই অঙ্কন করার প্রয়াস বিদ্যমান। দীনবন্ধু মিত্রের সংস্কারপন্থী 'নীল দর্পণ' নাটকে তবুও কৃষক তোরাপের মতো একটা বলিষ্ঠ চরিত্র রয়েছে। কিন্তু 'জমিদার দর্পণে' তোরাপের মতো প্রতিবাদমুখী চরিত্রও অনুপস্থিত। এই নাটকে প্রজাদের দেখানো হয়েছে জমিদারদের শিকার হিসেবে।

নাট্যকার মীর মোশাররফ হোসেন সমস্যার সুরাহা হিসেবে একাধিকবার তৎকালীন ভারত-ঈশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

> "কাতরে ডাকি তোরে শুন না ভারতেশ্বরী।
> অবহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি।
>
> ...　　　...　　　...
> রক্ষা কর প্রজা কিঙ্করে বিনয়ে করি মিনতি।"

তবে একটা কথা ঠিক যে, ১৮৭২-৭৩ সালে যখন সিরাজগঞ্জ এলাকায় জমিদার তথা শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকদের সশস্ত্র ও রক্তাক্ত বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল, ঠিক তখনই স্বয়ং একজন জমিদার-নন্দন হয়েও মীর মোশাররফ হোসেনের পক্ষে ১৮৭৩ সালে রচিত তার 'জমিদার দর্পণ' নাটকে জমিদারদের বীভৎস অত্যাচারের নমুনা উপস্থাপনা করাটাও দুঃসাহসিকতার কাজ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

'জমিদার দর্পণ' নাটক সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশকালে গবেষক ড: প্রভাত কুমার গোস্বামী 'দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক' গ্রন্থে (১৩৮৫ : সাহিত্য প্রকাশ : কলিকাতা) লিখেছেন "সাধারণভাবে দেখতে গেলে সে যুগের এটাই বাস্তব অবস্থা। ইংরেজ জজ সাহেবের সামনে ইংরেজ ডাক্তার (যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের অতি পরিচিত) বাইবেল ছুঁয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছেন। যে মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছে পাশবিক অত্যাচারের ফলে এবং ডাক্তার রিপোর্টে 'স্ত্রী লোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত হয়েছে', 'গলার চর্মের নীচে রক্ত

জমা' হয়েছে এসব বলেও "ব্রেন ডিজিজ"-এ তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে ঘোষণা করেছেন এবং জজ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। অন্যদিকে জমিদারের হিন্দু দালাল নামাবলী গায়ে, কৌপিন পরে সর্বাঙ্গে তিলক লেপে, তুলসীর মালা হাতে হরিনাম জপ করতে করতে' আবোল-তাবোল মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে এবং জজ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। সর্বোপরি থানা-পুলিশ সবই জমিদারের হাতে। এই অবস্থায় সুবিচার পাওয়ার আশা কোথায়? তাই আকুল কান্না ছাড়া গতি নেই এবং নাট্যকারের পক্ষে সেই ক্রন্দনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নট ও নটীর বেদনার্ত গান ('কবে পোহাইবে এই দুঃখ বিভাবরী)' দিয়ে নাটক শেষ করাই হয়তো স্বাভাবিক। নাট্যকার তাই-ই করেছেন। নির্যাতিত প্রজার দুঃখে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে– নির্যাতিত ও অত্যাচার দূর হোক এটাও তিনি চান। নটীর উক্তির মধ্যেও এই সহানুভূতি ও আশা প্রকাশিত :

"হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?"

নাট্যকার মীর মোশাররফ হোসেন পরোক্ষভাবে নাটকে একথাটাই বলতে চেয়েছেন যে, প্রজা সাধারণের উপর জমিদারদের এই লাগামহীন অত্যাচার বন্ধ না হলে পরিণাম শুভ বলে মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক জমিদার দর্পণ বেআইনী ঘোষণার দাবি

প্রসঙ্গত এ সময়ে কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের ইংরেজ এসডিওপি নোলান-এর প্রদত্ত রিপোর্ট (২৩ শে এপ্রিল ১৮৭৪) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "আগে থেকেই কয়েকটি গ্রামের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদারের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্ত্বেও সাফল্যের সঙ্গে জমিদারের অতিরিক্ত কর আদায় ও কবুলিয়ত আদায়ে বাধা দিয়ে আসছিল। তারা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা অন্যসব কৃষকের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল যে, একতা ও দৃঢ়তা দ্বারা জমিদারের সব অবৈধ দাবি এবং উৎপীড়নে বাধা দান করা সম্ভব"।

এরই প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সিরাজগঞ্জের সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ফল হিসেবে ইংরেজ সরকার ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তনে বাধ্য হয়। এই আইনে ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি এবং চাষিদের কৃষিভূমি থেকে উচ্ছেদ রদ হয়ে কৃষি ভূমির ওপর চাষিদের দখলীস্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এখন বিচার করা দরকার যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসব ব্যাপারে কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মনমানসিকতা ও ভূমিকা কিরূপ ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এঁরা ১৮৫৭ সালের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা; বরং প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে ইংরেজদের মদত যুগিয়েছে। এরপর নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের পটভূমিতে ১৮৬০ সালে লেখা সংস্কারপন্থী নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'কে এঁরা সহ্য করতে পারেনি। প্রধানত বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের সমবায়ে গঠিত কোলকাতা কেন্দ্রিক এই নব্য সমাজ এ সময় শ্রেণী স্বার্থে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এঁরা লালিত-পালিত এবং আশ্রিত। তাই বাংলার রেনেসাঁ (নবজাগরণ) এবং মানবতাবোধের আদর্শ সম্পর্কে এঁরা যত 'ফুটানী'-ই করুক না কেন, শ্রেণী স্বার্থে কিংবা আশ্রয়দাতা ইংরেজদের স্বার্থবিরোধী সব রকম কর্মকাণ্ডকে এঁরা ধিক্কার দিয়েছে এবং পরিত্যাজ্য হিসেবে বিবেচনা করেছে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারপন্থী ও আপোষকামী হওয়া সত্ত্বেও 'জমিদার দর্পণে'র মতো নাটককেও কোলকাতা কেন্দ্রিক এই নব্যসৃষ্ট সমাজ সহ্য করতে পারল না। সে যুগের বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষকদের অসহায় ও করুণ চিত্র সংবলিত 'জমিদার দর্পণ' নাটক সম্পর্কে বিষোদগার করলেন। কারণটা আরো সুস্পষ্টভাবে বলতে হলে বলতে হয় যে, নাটকটি রচনার সময় সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ চলছিল। আর সমাজের এসব নিম্নশ্রেণীর বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানকে কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা খুব বেশি ভয় করত।

১৮৭৩ সালে 'বঙ্গ দর্পণ' (ভাদ্র ১২৮০ সংখ্যা) পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিতভাবে 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি বেআইনী ঘোষণার দাবি জানালেন। (তখনও পর্যন্ত ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী নাটক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। কুখ্যাত 'ড্রামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল' বিলটি ১৮৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আইনে পরিণত হয়।)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "বঙ্গ দর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজাহিত কামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এ সময়ে এ গ্রন্থের (জমিদার দর্পণ) বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক"।

সম্প্রতি এ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী যথার্থই লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের এই আচরণে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ সমাজের মধ্যশ্রেণীর যে অংশ ভূমিস্বত্বের অধিকারী বা প্রধানত ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই অংশেরই লোক। সুতরাং তাঁর পক্ষে কৃষক বিদ্রোহকে ভয় করারই কথা। এ বিষয়ে তিনি অনেক বেশি সচেতনও ছিলেন। তাই 'বঙ্গদেশের কৃষক' (দেশের শ্রীবৃদ্ধি) প্রবন্ধে স্বশ্রেণীকে সতর্ক করে লিখেছিলেন– "তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ– দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?"

ডঃ গোস্বামী আরও লিখেছেন, "ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবী বঙ্কিম কতখানি শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন ছিলেন এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত। এজন্যই বঙ্কিম যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণী যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী, তাদের ভিত্তিকে যে নাড়া দেয় তাকে বঙ্কিম সমর্থন করতে পারেননি ... শুধু 'জমিদার দর্পণ' নয়, 'নীল দর্পণকেও' বঙ্কিমের পক্ষে সহ্য করা কঠিন"। (দেশাত্মবোধকও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক : ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী : কলিকাতা)

'বাংলা নাটকের মুক্তি' এবং 'একটি অতিকথা'

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে বাঙালিত্বের নামে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টি হয়ে দ্রুত পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, সে অবস্থাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আরও কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে করছি।

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর কোলকাতার জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সান্যাল-এর বাড়িতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় (থিয়েটার) স্থাপন করে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটক অভিনীত হয়। এর আগে কোলকাতার বিত্তশালীদের বাসভবনে যে

সৌখিন নাট্যাভিনয় হতো, এদিক থেকে তা সর্বপ্রথম পেশাদার-এ পরিণত হয়। এটাকেই 'বাংলা নাটকের মুক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, "এদেশে যখন নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, তখন দেশে একটা অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি ভাব, ইংরেজি চিন্তা, ইংরেজি সভ্যতা, ইংরেজি আচার ব্যবহার নিষ্ঠা বাংলার অচলায়তনের শতমুখী যে শিকড়, তাহাকে শতদিক হইতে নাড়াইয়া দিয়াছে ও বাঙালি জীবনের ধারা এই সময় হইতে সকল দিকেই বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সাহিত্যও এই সময় নবকলেবর ধারণ করে"। (বাংলা নাটক ও গিরিশ যুগ– অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রূপ ও রঙ্গ কলিকাতা, আশ্বিন– ১৩৩২)

শুধু নাটক কেন, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নানাদিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটা সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যে এবং দলে দলে হিন্দু শিক্ষিত যুবকদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রবণতাকে রোধ করার তাগিদে এসব কর্মকাণ্ডের আগেই রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য রাজা রামমোহন ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গোঁড়া সমর্থক ছিলেন।

এরই পরবর্তী সময়ে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৪-৮৬) হিন্দু ধর্ম সংস্কারের জন্য সোচ্চার হন। শ্রীরামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরই ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু দর্শন প্রচারে লিপ্ত হন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবর্তন করেন।

সমসাময়িককালে ডিরোজিও-র নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' এর সমর্থকরা সমাজ জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এঁরা মূলত বুদ্ধিজীবী হওয়া সত্ত্বেও এঁদের সঙ্গে বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। এঁদের মধ্যে সে আমলে পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় অসাধারণ কর্মপুরুষ রাম গোপাল ঘোষ প্রথমে ইহুদী ব্যবসায়ী জোসেফের অফিসে চাকরি করতেন। পরে তিনি আর জি ঘোষ এ্যান্ড কোং' নামে নিজস্ব কোম্পানি স্থাপন করেন।

'ইয়ং বেঙ্গল'-এ অর্থনৈতিক আদর্শ ছিল 'অবাধ বাণিজ্যের আদর্শ' এবং অনেক গবেষকের মতে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এঁদের অবদান 'যুগান্তকারী'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরও এই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্ধ সমর্থক ছিলেন। তিনিও 'কালাচাঁদ শেঠ এ্যান্ড কোম্পানিতে' ১৮৩৯ সালে একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৫৫ সালে তিনি স্বয়ং 'প্যারীচাঁদ মিত্র এ্যান্ড সন্স' কোম্পানি গঠন করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোং লিঃ, পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং, হাওড়া ডকিং কোং লিঃ, বেঙ্গল টি কোম্পানি এবং ডারাং টি কোং লিঃ-এর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

অন্যদিকে প্যারীচাঁদ ১৮৩৮ সালে 'সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ'-এ রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪৩ সালে প্যারীচাঁদ 'দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির' অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ ব্যবসায়ী জর্জ টমাসন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। এছাড়া প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় 'দি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১), 'বিটন সোসাইটি' (১৮৫১), 'দি ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু এ্যানিমেলনস' (১৮৬১), 'এ্যাগ্রিকালচার এ্যান্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' (সহাঃ ১৮২০) প্রভৃতি সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স'-এর যুগ্ম-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক শ্রী বিনয় ঘোষ-এর দু'টি মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দু'টি মন্তব্য তিনি ৩০ বছরের ব্যবধানে করেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি লিখেছেন, "রামমোহনের যুগ থেকে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগের প্রসারতা ও ব্যাপকতাই এখানে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপক শক্তিসঞ্চার ও আলোড়নের ফলেই নবজাগৃতির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে এবং পরে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবল গতিশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে আত্মস্থ হয়েছে। এই ধারাতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং এই ধারাই বিংশ শতাব্দীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে মিশে গেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই ধারা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে প্রবাহিত হয়েছে। ... নবজাগরণের এই ধারার পাশাপাশি আর একটি ধারাও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাকে আমরা রাধাকান্ত, ভূদেব, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধারা বলতে পারি। এই দুই ধারা ঠিক প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দু'টি পরস্পর-বিরোধী নির্দিষ্ট ধারা নয়। ... প্রগতির সাধারণ ধারাই নতুন-পুরাতনকে স্বীকৃত করে নিজস্ব গতিবেগে সমন্বয়ের পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। ... (বাংলার নবজাগৃতি : পৃঃ ১৩৮-১৩৯, বিনয় ঘোষ : ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা)

প্রায় ৩০ বছরের ব্যবধানে গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর এই বক্তব্য সংশোধন করেছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করলেন, "মাত্র তিরিশ বছরের ব্যবধান যা এক পুরুষের ব্যবধান হওয়ার কথা, তা ১৯৭৮-৭৯ সালে মনে হয় যেন বহু পুরুষের ব্যবধান। তাই এই এক পুরুষকালের দূরত্বের মধ্যেই 'বাংলার নবজাগৃতি'– যা একদিন ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয়েছিল– আজ তা মনে হয় 'একটি অতিকথা' ... চিন্তাধারার কেন পরিবর্তন হয়েছে, এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হলো, যেহেতু সমাজের রূপ ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এবং সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন আলোকরশ্মির সাহায্যে আমরা সেই পরিবর্তনের স্বরূপ আগের চেয়ে অনেক বেশি বুঝতে পেরেছি এবং পারছি"।

(বাংলার নবজাগৃতি : ১৯৭৯ পরিবর্ধিত সংস্করণ : ভূমিকা বিনয় ঘোষ)

গবেষক বিনয় ঘোষের সৎসাহস রয়েছে। তাই তিনি ৩০ বছরের ব্যবধানে স্বীয় ভ্রমাত্মক চিন্তাধারা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত বিশ্লেষণের সংশোধন করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, 'বাংলা নবজাগৃতি'– যা একদিন ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে হয়েছিল– আজ তা' মনে হয় 'একটি অতিকথা'। এই প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোলকাতা তথা বাংলাদেশের সমাজ জীবনের ঘটনাবলীর বিবর্তন আরও কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং ইংরেজ রাজশক্তিকে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এ সময় নানা ধরনের সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় চার বছর আগে ১৮৫৩ সালে কোলকাতায় সর্বপ্রথম 'বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ড এসোসিয়েশন' গঠন করা হয়। অবিভক্ত বাংলার বনেদী হিন্দু জমিদাররা নিজেদের "বক্তব্য ও আব্দার" সুষ্ঠুভাবে ইংরেজ সরকারের নিকট উপস্থাপনা করার জন্য এই সমিতি গঠন করে।

এরপর কোলকাতার বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী এবং হিন্দু সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিতে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর সদস্য ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার পর্যন্ত ছিল না।

কোলকাতা 'হিন্দু মেলার' প্রথম অধিবেশন

এর পাশাপাশি পরোক্ষভাবে ইংরেজ রাজশক্তির মদদ যোগানো এবং ইংরেজের ছত্রছায়ায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রী রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ১৮৬১ সালে কোলকাতার 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপিত হল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনা-পত্র প্রকাশিত হলে বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত সমাজে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬৭ সালে (১২৩৭) সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন কোলকাতার 'বেলগাছিয়া ভিলায়' প্রস্তাবিত 'হিন্দু মেলার' প্রথম অধিবেশন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনায় যেটুকু বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, এতদিন পর্যন্ত রাজশক্তির সহযোগিতাকে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী লালিত-পালিত হচ্ছে, অতঃপর পরাশক্তির সেই সহযোগিতাকে গৌণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এখন থেকে 'আত্মনির্ভর' হওয়ার জন্যই এই 'হিন্দু মেলার' জন্ম।

এরপর বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা'। পদচ্যুত প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

অবশেষে লর্ড এ, ও, হিউম-এর উদ্যোগে ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে আয়োজিত এক বৈঠকের মাধ্যমে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' জন্ম হয়। বাংলাদেশের ভূস্বামী এবং বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে এই প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতি লাভ করে। প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যায়, তৎকালীন ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠান গঠনে সমর্থন দান করেন এবং বেশ কিছুসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সরকারি কর্মচারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ পর্যন্ত লাভ করেন। এদের মধ্যে মিঃ এ, ও, হিউম কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এমনকি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তিনজন ইংরেজ রাজপুরুষের (অবসরপ্রাপ্ত) নাম পাওয়া যায়।

১৮৬৭ সালে স্থাপিত 'হিন্দু মেলা' সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান বাঞ্ছনীয় মনে হয়। হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলা হয়েছে, "আমাদের মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ভারত ভূমির জন্য। ইহার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির একটি মহৎ গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের একটি প্রধান অভাব— আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষদের সাহায্য যাঞ্চা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয় ... যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়— ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য"। ("মুক্তির সন্ধানে ভারত" : যোগেশ চন্দ্র বাগল)।

দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনের উদ্দেশ্য নয়

তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোনো 'রাজবিরোধী কার্যকলাপ' কিংবা দেশ মাতৃকার শৃংখল মোচনের' জন্য আলোচ্য 'হিন্দুমেলা' গঠিত হয়নি। এটা গঠিত হয়েছিল রাজদণ্ডের ছত্রছায়ায় সৃষ্ট বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে।

এই হিন্দুমেলার প্রথম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ') এবং গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে) সঙ্গীত রচনা করলেন। এই অনুষ্ঠানেই গঠিত হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্বোধনী কবিতা "জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান। মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?" এরপরেই দেশে একই ধরনের ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হওয়ার জোয়ার বইল। কিন্তু সর্বত্রই জাতীয়তাবাদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, সমসাময়িককালে রচিত প্রায় সবগুলো নাটকে একই ধরনের মনোভাব বিরাজমান। নাট্যকার হরলাল রায় রচিত 'বংগের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীকে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করার প্রচেষ্টাকে এখানে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা যায়।

আদিতে পশ্চিম ভারতের কর্নাটক থেকে আগত অবাঙালি হিন্দু রাজবংশের শেষ বংশধর রাজা লক্ষণ সেনের ভয়াবহ অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু প্রজাসাধারণের জীবন যখন অতিষ্ঠ, তখন (১১৯৯) খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন অনুচর নিয়ে বাংলার তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করলে, স্থানীয় অধিবাসীদের কেউই অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসার প্রেক্ষিতেই রাজা লক্ষণ সেনের পলায়নই হচ্ছে ইতিহাস-ভিত্তিক তথ্য। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে, সেন রাজাগণ বিদেশী ছিলেন বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। উপরন্তু তারা ঘোরতর ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী ও স্মার্ত সংস্কারপন্থী ছিলেন। – (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ)

অথচ নাট্যকার হরলাল রায় 'বংগের সুখাবসান' নাটকে অবাঙালি হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে দেশপ্রেমিক বীর হিসেবে উপস্থাপিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আলোচ্য নাটকে রাজা লক্ষণ সেনের মুখের সংলাপ হচ্ছে,"বঙ্গভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই? যবনেরা জয় পতাকা তুলে, জয় বাদ্যে গগণ প্রতিধ্বনিত করবে আর বঙ্গভূমি বিনা বাতাসে শুষ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে এবং কাপুরুষ লাক্ষণ্য সেন জীবিত থাকবে। ... গুরুদেব, লাক্ষণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করবো"।

বাংলা নাটকে ভয়াবহ মুসলিম বিদ্বেষ

কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় রচিত অন্যতম দেশাত্মবোধক (?) নাটক হচ্ছে 'ভারত যবন'। এই নাটকের– ভারত মাতার দুঃখে ভারত সন্তানেরা যবন (মুসলমান) বধ করে স্বাধীনতা (?) অর্জনের জন্য কীভাবে প্রচেষ্টা করছে তা-ই উপস্থাপিত করা হয়েছে। নাট্যকারের লিখিত বক্তব্য হচ্ছে :

> "স্বাধীনতা সম কি আছে আর?
> পামর যবনে করি কি ভয়?"

প্রায় একই সময়ে প্রখ্যাত নাট্যকার জ্যোতিবিন্দ্র নাথ ঠাকুর 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) এবং 'স্বপ্নময়ী' নামে চারটি নাটক রচনা করেন। প্রথম নাটকটি আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে রাজা পুরুর লড়াই-এর শৌর্যবীর্যের ঘটনা। বাকি তিনটি নাটক হচ্ছে (এক) 'সরোজিনী'– সম্রাট আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে মেবারের রাজপুত রাজা লক্ষণ সিংহের লড়াই (দুই) অশ্রুমতী– সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে রাজা প্রতাপ সিংহের লড়াই। (তিন) 'স্বপ্নময়ী'– সম্রাট আওঙ্গজেব-এর বিরুদ্ধে শুভ সিংহ-এর বিদ্রোহ।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর মতে, "... মুসলমান আমলের বিষয়বস্তু লিখিত নাটকেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দু রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই নাটকগুলোতে যে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ রয়েছে তার মধ্যে হিন্দু-প্রবণতা লক্ষ্যণীয়"। (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক : সাহিত্য প্রকাশ, ১৩৮৫ কলিকাতা)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এসব লেখকদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, এরই ফলে গণমানুষের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবে এবং জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সবচেয়ে জনপ্রিয় (জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত) 'সরোজিনী' নাটকের (১৮৭৫) সংলাপের নমুনা হচ্ছে :

"সরোজিনী" ।। মা চতুর্ভুজা ! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর !

লক্ষণ।। বৎসে মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে"।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আর একটি নাটক 'স্বপ্নময়ী'র (১৮৮২) অন্যতম চরিত্র সুরজমল-এর সংলাপ হচ্ছে :

"যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়।"

এই 'স্বপ্নময়ী' নাটকের আর এক জায়গায় বিশিষ্ট চরিত্র শুভ সিংহ-এর সংলাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংলাপটি কবিতার মাধ্যমে রয়েছে :

"... দেব মন্দির সকল,
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদ-মন্ত্র ধর্ম করিতেছে লোপ,
গো-হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে।"

এরচেয়ে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য আর কী হতে পারে? ঠাকুর মহাশয় এখানে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চেয়েছেন যে, ... মুসলিম রাজশক্তিই শুধু অত্যাচারী নয়, বরং পুরো মুসলমান সমাজটাই এই পদাংক অনুসরণ করছে।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "বিধর্মী ঔরঙ্গজীব হিন্দুদিগকে নানা দিক হইতে উৎপীড়ন করিতেছেন, এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে শুভ সিংহের বিদ্রোহ। অতএব, ধর্ম ইহার লক্ষ্য নয়, দেশ ইহার লক্ষ্য নহে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হিন্দুমেলার' ভিতর দিয়ে যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।" বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড ১৯৬০ কলিকাতা)- ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

মাইকেল মধুসূদন-এর উদার মনোভাব

অবশ্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেশ কিছুটা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটককে বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এটাকেই প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বয়ং শ্রীকেশব বন্দোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটককে 'হিস্টরী অফ ট্র্যাজেডি (ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, সে আমলে কোলকাতায় পেশাদার নাট্যমঞ্চ হিসেবে একমাত্র বেলগাছিয়া নাট্যশালার অস্তিত্ব ছিল। এই মঞ্চের মালিকদের অভিরুচি অনুসারেই নাট্যকারদের নাটক রচনা করতে হতো। প্রস্তাবিত নাটকে ক'টি পুরুষ এবং ক'টি স্ত্রী চরিত্র থাকবে সেটাও মঞ্চের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই বলে দিতেন। এমনকি নাটকের মূল বক্তব্য ও পরিণতি সম্পর্কেও বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ নির্দেশিকা দিত। তাই যুগোপযোগী স্বাদেশিকতা ভাবাপন্ন বলিষ্ঠ নাটক রচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বিরাজমান ছিল। মাইকেল মধুসূদনকেও এই অদ্ভুত প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়েছে।

তিনি নিজে আগ্রহী হয়ে যেসব নাটক রচনা করেছেন, সেসব তৎকালে কোলকাতার একমাত্র পেশাদার' বেলগাছিয়া নাট্যশালায়' অভিনীত হতে পারেনি। এরই ফলে তাঁর 'সুভদ্রা' নাটক অসমাপ্ত রয়ে গেছে। প্রহসনমূলক দু'টি নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ওই নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়নি। এজন্য নাটক দু'টি প্রকাশিত হওয়ার পর মঞ্চায়ন করার জন্য তাঁকে প্রায় ছ'বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর মতে, " মাইকেলের মতো নাট্যকারও এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেখানেই তিনি নিজের ভাবনা-চিন্তা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে।" ইতিহাস থেকে মুসলমান চরিত্র গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন 'রিজিয়া' নামে একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যশালার মালিকরা এ ধরনের নাটকের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং মঞ্চায়ন করতে দেওয়া হবে না বলে পূর্বাহ্নেই মধুসূদনকে জানিয়ে দেন। ফলে 'রিজিয়া' নাটক রচনার প্রয়াস তিনি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ সময়ের প্রভাবশালী অভিনেতা কেশবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পরামর্শে রাজপুত জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচনা করেন "কৃষ্ণ কুমারী' ট্র্যাজেডি নাটক।

বাংলা নাটকে রাজপুত কাহিনীর প্রভাব ও অন্তর্নিহিত কারণ

এই প্রেক্ষিতে ১৮৮০ সাল থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর সময়কালের নাটকগুলো (১৮৭৬ সালে নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হওয়ায় নাটকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য প্রায় অনুপস্থিত) ইংরেজ সামরিক কর্মচারী লেঃ কর্নেল জেমস টড-এর রচিত 'এ্যানালস এ্যান্ড এ্যানটিক্স অব রাজস্থান' 'গ্রন্থের উপাদানে ভরপুর। ইংল্যান্ড-এর রাজা ৪র্থ জর্জকে পুস্তকটি উৎসর্গ করে লেখক জেমস টড এ মর্মে উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন যে, "ব্রিটিশ শক্তি স্বাধীনতা হারানো রাজপুত জাতি এবং বাঙালি জাতি ... এই দু'টো জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে"। "অথচ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বঙ্গীয় এলাকা এবং ১৮১৭ সাল নাগাদ রাজপুত রাজ্যগুলো কীভাবে ছলে বলে ও কৌশলে কুক্ষিগত

করেছে, তা' শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে অজানা ছিল না। এই গ্রন্থের ভূমিকায় একদিকে আটশ' বছরের মুসলিম রাজত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করা হয়েছে এবং অন্যদিকে হিন্দুদের অতীত মহত্ত্বের কথা ও হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। লেখক বলতে চেয়েছেন যে, ইংরেজরাই হচ্ছে বাঙালি হিন্দু এবং রাজপুতদের মুক্তিদাতা।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত টড-এর প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। লেঃ কর্নেল জেমস টড কৃত এ্যানালস এ্যান্ড এ্যানটিক্স অব রাজস্থান বইটি সর্বপ্রথম বরদা কান্ত মিত্র 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' নামে অনুবাদ করেন। এরপর অঘোরচন্দ্র বরাট এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে আরও দু'জন 'রাজস্থান' নাম দিয়ে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

গবেষক ডঃ গোস্বামী যথার্থই মন্তব্য করেছেন "... টড সাহেবের প্রভাব এড়ানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। কারণ ঐতিহাসিক তথ্যের নানা অসঙ্গতির মধ্যেও যেমন বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য ছিল 'হিন্দু বাহুবল', তেমনি ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নাট্যকারেরা যে দেশাত্মবোধক নাটকগুলো লিখেছিলেন তার মধ্যে বহুসংখ্যক নাটকের জাতীয় ভাব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ... প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে যে, নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে আঁকড়ে থাকেননি। ইংরেজকে সোজাসুজি আক্রমণ করার অসুবিধা থাকার জন্যও কেউ কেউ রাজপুত– মোগল বা রাজপুত-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও হিন্দু-মানসিকতা এড়ানো যায়নি। এর ফল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুখকর হয়নি, তাকে অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উদগীরিত হয়েছে।" (ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী : দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক : ৩০-৩৯ সাহিত্য প্রকাশ : কলিকাতা ১৯৭৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা রঙ্গমঞ্চে সিপাহী বিদ্রোহের যুগে একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেও এই ধারা বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। শীঘ্রি কোলকাতার রঙ্গালয় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাসের নামে কাল্পনিক রোমাঞ্চ এবং হিন্দু ধর্মীয় প্লাবনে ভেসে গেল। এই প্লাবন সৃষ্টি করলেন জ্যেতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ইনিই রঙ্গমঞ্চে 'সামন্তবাদ' ও 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আর কোলকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারীরা একটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসব নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করল।

মোদ্দা কথায় বলতে গেলে, "গিরিশচন্দ্র এ-সময়ের পূর্ব পর্যন্ত সদাগরী অফিসে চাকরি করিতেন। মারবাড়ি ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া থিয়েটার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র অফিস ছাড়িয়া থিয়েটারে কায়েমীভাবে যোগ দিলেন। সে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা। নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারেই আরম্ভ হইল।" (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' (১৯৭২) পৃঃ ২৮-২৯)

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় 'আনন্দ' ও 'উল্লাস'

ইতিহাসের এই চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপট স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার জন্য এসব ঘটনাবলীর আরও কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে হয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহল কোন্ প্রেক্ষিতে নিজেদের শ্রেণী

ও গোষ্ঠী স্বার্থে 'সিপাহী বিদ্রোহের' (বিপ্লব) বিরোধিতা করেছিল এবং এই 'বিদ্রোহ' ব্যর্থ হওয়ার পর এঁরা কীভাবে 'আনন্দ' ও 'উল্লাস' প্রকাশ করেছিল। এর পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, বাঙালি তথা ভারতীয় 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'- কে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বাংলা কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক ও যাত্রাগানে' কীরকম নগ্নভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অবশ্য এর আগেই প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে কোলকাতা কেন্দ্রিক এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী পাশ্চাত্যের ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ, অনুসরণ ও গলাধঃকরণ করে সাম্রাজ্যবাদী সম্পূরক হিসেবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক অশুভ আঁতাত।

এরকম এক পটভূমিতে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকের ঘটনাবলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৮৬৯ সাল নাগাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাংলা গদ্য প্রকৃত সাহিত্য রূপ লাভ করেছে। ১৮৬০ সালে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকে সকলের গ্রহণযোগ্য সংলাপের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৮৭২ সালে কোলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ হয়েছে। একই বছরে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' সাধারণ রঙ্গালয়ে রূপান্তরিত হয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামকরণে চিহ্নিত হয়েছে। ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা' এবং ১৮৭৬ সালে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। রোমাঞ্চধর্মী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ সালে 'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাস দিয়ে শুরু করে ১৮৮১ সালে 'রাজসিংহ' পর্যন্ত বেশ কিছুসংখ্যক উপন্যাস লেখা সমাপ্ত করেছেন এবং বাঙালিত্বের নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান উচ্চারণ করেছেন। তাঁর শক্তিশালী লেখনী তখন সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণী বিদ্বেষে ভরপুর। এ সময়ের বাংলা নাটকগুলোতে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' আদর্শ অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হাতে-গোণা গুটিকয়েক বাদ দিয়ে এসব নাটকগুলোর মধ্যে হরলাল রায়-এর 'হেমলতা' (১৮৭৩) ও 'বংগের সুখাবসান' (১৮৭৪) কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়-এর 'ভারতে যবন' (১৮৭৪), হারাণচন্দ্র ঘোষ-এর 'ভারত দুঃখিনী' (১৮৭৫), নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'এই কি সেই ভারত' (১৮৭৫), কুঞ্জবিহারী বসুর 'ভারত অধীন' (১৮৭৬), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) ও 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) এবং গিরিশ ঘোষ-এর 'আনন্দ রহো' ১৮৮১ প্রভৃতি অন্যতম।

এখানে পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে, এসব নাটক রচিত হওয়ার আগে উদার মনোভাবাপন্ন কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসদন দত্ত 'কৃষ্ণ কুমারী' (১৮৬১) রচনার পরে স্বার্থান্বেষী মহলের বিরোধিতার দরুন 'সুভদ্রা' নাটক সমাপ্ত করতে পারেননি এবং 'রিজিয়া' নাটক লেখার প্রচেষ্টা বাধ্য হয়ে বাদ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর দু'টি প্রহসন নাটক 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বেলগাছিয়া নাট্যশালার মালিকরা মঞ্চস্থ হতে দেয়নি। আলোচ্য সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' (১৮৬০), মীর মোশাররফ হোসেন-এর 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) এবং দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-এর 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫) নাটক তিনটি বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী বলে এই তিনজন লেখককে প্রচণ্ড রকমের সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য ১৮৮৩ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম নাটক 'বৌঠাকুরানীর হাট' রচনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সামাজিক ইতিহাস পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭২ সালের জুলাই

মাসে (ভাদ্র ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় মীর মোশাররফ হোসেন কৃত 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি বেআইনী ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে এবং দীনবন্ধু মিত্রের রচিত 'নীল দর্পণ' নাটকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে।

এরই পাশাপাশি ১৮৭২ সালের ২১শে ডিসেম্বর কোলকাতার 'দি ইংলিশম্যান' (ক্যালকাটা স্টেটসম্যান) পত্রিকায় 'নীল দর্পণ'-এর প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরেই ইংরেজদের 'মানহানির' অভিযোগ উত্থাপন করে নাটকটির অভিনয় বন্ধের দাবি জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ের পূর্বে কথিত সম্মানহানিকর' অংশ বাদ দেওয়ায় নাটকটি সে যাত্রায় রক্ষা পায়।

নাট্যকার গিরিশ ঘোষ-এর হিন্দু ভক্তি-দর্শন প্রীতি

এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য সময়ে প্রখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষের কর্মময় জীবন সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব এমন একটা যুগে হয়েছে যখন হিন্দুমেলার (১৮৬৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী')১৮৭৯) এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৭৯) নাটকগুলোর মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষ-এর প্রচারণা তুঙ্গে রয়েছে এবং সমসাময়িককালে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৮৮৩ সালে নাট্যকার কেদার চৌধুরী 'আনন্দমঠ'-এর নাট্যরূপ দান করেন এবং এ বছরেই কোলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারের আনন্দমঠ মঞ্চস্থ হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মূলত হিন্দু পৌরাণিক নাট্যকার। তিনি সর্বমোট ৭৭টি নাটক ও প্রহসনাদি রচনা করে গেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার বছর অর্থাৎ ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ নাটক হিন্দু ধর্মীয় দর্শনভিত্তিক এবং তিনি ভক্তির প্লাবনে কোলকাতার রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক কথায় এসব নাটককে গীতিনাট্য, রোমান্টিক নাটক এবং পৌরাণিক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কিন্তু এসব নাটকের সর্বত্রই হিন্দু ভক্তি দর্শনের জন্য তাঁর সোচ্চার কণ্ঠস্বর। অবশ্য এই সময়কালে তিনি বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেছেন। এসবের মধ্যে 'আনন্দে রহো' (১৮৮১), 'মহাপূজা' (১৮৯১), 'চন্ডু', (১৮৯১), 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬), 'সৎনাম বা বৈষ্ণবী' (১৯০৪) এবং 'রাণা প্রতাপ' (১৯০৪) অন্যতম। শেষোক্ত নাটকখানি তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা।

কিন্তু সুষ্ঠুভাবে বিচার করলে এগুলোকে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। তাঁর পূর্বসুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুসরণে তিনি এসব নাটকে অবাধ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং এ সবগুলোতে যাত্রার প্রভাব বিদ্যমান। সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এসব নাটক রচনার সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো তিনিও জেমস টড-এর 'এ্যানালস এ্যান্ড এ্যানটিকস অব রাজস্থান' পুস্তকের বক্তব্যের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক (?) নাটকগুলো রাজপুত চরিত্র-ভিত্তিক। উপরন্তু তিনি হিন্দু ধর্মবোধ ও দেশাত্মবোধের সংমিশ্রণে 'মুক্তির সন্ধান' দেখতে পেয়েছিলেন বলে নিজেই দাবি করে গেছেন। এটাকেই তিনি জাতীয়তাবোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক সময় বলতে গেলে তিনি হিন্দু রিভাইজালিজম-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, "... যদি নাটকের সার্বজনীন হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে। ... হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে

ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয়নি"। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রবন্ধ)।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ধর্মবোধ এবং হিন্দু পুরানের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার দরুন গিরিশচন্দ্র ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন, তার সবগুলোতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বাহন হওয়া ছাড়াও স্বাভাবিকভাবেই পরধর্ম বিদ্বেষী হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে গিরিশচন্দ্রের রচিত 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' (১৯০৪) নাটকে অন্যতম চরিত্র বৈষ্ণবীর সংলাপ হচ্ছে, "... এই তো, এ বাড়িতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে, ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী সুর লহরী শোনো— তলোয়ার হাতে আছে, যাও গিয়ে বধ করো"।

এই 'সৎনাম' বা বৈষ্ণবী' নাটক এতো বেশি মুসলিম বিদ্বেশী ছিল যে, কোলকাতার তৎকালীন সংখ্যালঘু মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ উত্থাপন করে। এ সম্পর্কে ১৯০৪ সালের ২৭ শে মে তারিখে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :

"গিরিশবাবুর সৎনাম মহানাটক লইয়া গত শনিবারে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানদের কুৎসাপূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা শহরের প্রায় ২/৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন, শহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, নাটক অভিনয় বন্ধও হইয়াছিল"।

"সৎনাম' নাটক রচনা পর্যন্ত তাঁর অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, "তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়েছেন এবং নাটকে স্বদেশপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন"। অথচ বাস্তবে 'সৎনাম' নাটকটি হচ্ছে বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে পরিবেশিত এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে জর্জরিত।

এজন্যই দেখা যায় যে, 'হিন্দুমেলার' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সরোজিনী' নাটকের পর আর নাটক রচনা না করে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার কারণ হিসেবে সত্য ভাষণ করে গেছেন। অমৃতলাল বসু একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঐতিহাসিক নাটক রচনা বন্ধের কারণ জিজ্ঞেস করলে, শ্রীঠাকুরের জবাব হচ্ছে, "নাট্য জগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই"। (মন্মথনাথ ঘোষ : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পৃ: ১০৯)।

অবশ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে একটা মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। ১৯০৫ সাল নাগাদ বড়লাট লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গভঙ্গ করে পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে একটা পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করা হলে, বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবী মহল শ্রেণীস্বার্থে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে এসময় গিরিশচন্দ্রের ভেতর মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর কিঞ্চিৎ 'মোহমুক্তি' ঘটে। যে গিরিশচন্দ্র ১৯০৪ সালে মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক রচনা করে চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রই মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে রচনা করলেন 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬) ও'মির কাশিম' (১৯০৬) জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি সর্বপ্রথম মূল শত্রু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করতে উদ্যোগী হলেন। তথাপিও সিরাজদৌল্লা নাটকের গানগুলোতে আশ্চর্যজনকভাবে দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই নাটকের সংলাপ এবং গানের মর্মকথা প্রকটভাবে বিপরীতমুখী। যেখানে

সিরাজদৌল্লা নাটকের সংলাপগুলো স্বদেশ প্রেমের উদ্রেক করে, সেখানে নাটকের গানগুলো পরাশক্তি ইংরেজদের জয়গানে সোচ্চার। এই নাটকে সিরাজ হত্যার পর গানের নমুনা হচ্ছে :

"উড়ছে কোম্পানির নিশান
বাহাদুর কলির ঠাকুর, ভুবন কাঁপায় যার কামান,
...
থাকবে না ডাকাতি, কুকি, আঁধারেতে চোরের উঁকি,
থাকবে না আর কুলনারীর মানের দায়ে লুকোলুকি",

তবুও তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'সিরাজদৌল্লা' ও 'মির কাশিম' নাটক দু'টির অভিনয় ও মুদ্রণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

তাই সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। ১. ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় মেনে নিয়ে চাতুর্যের সঙ্গে সম্পূরক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে এবং ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে হবে। ২. ইংরেজদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ভাষা সাহিত্য ইত্যাদি সবকিছুই আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে অনুকরণ করতে হবে। ৩. ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে হবে। ৪. বাংলা সাহিত্য উপন্যাস নাটকে ইংরেজ রাজশক্তির বদলে অতীতের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে নির্বিবাদে লিখতে হবে। ৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপর স্লোগান উচ্চারণ করে 'বাঙালি হিন্দুয়ানী জাতীয়তাবাদ' প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং ৬. সর্বশেষ সাম্প্রদায়িকতার বীজ এমনভাবে সমাজ জীবনে বপন করতে হবে যার ফলে নীলচাষিদের 'বিদ্রোহ' কিংবা 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর মতো অসাম্প্রদায়িক কোনো আন্দোলন ও অভ্যুত্থান কিছুই আর সংগঠিত না হয়।

রোম নগরী যখন পুড়িতেছিল সম্রাট নীরো তখন–

আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহলের মানমানসিকতা লক্ষ করলে বিস্মিত হতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী নীল চাষিদের সাফল্যজনক বিদ্রোহ, পাবনায় কৃষকদের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান, এমনকি 'সিপাহী বিদ্রোহ' প্রভৃতি কোনও কিছুরই উত্তাপ এদের স্পর্শ করেনি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থে এসবের সমর্থনে কোনও সার্থক রচনা পর্যন্ত এঁরা করেননি। এটা অনেকটা "রোম নগরী যখন পুড়িতেছিল, সম্রাট নীরো তখন বাঁশি বাজাইতেছিলেন"-এর মতো। এজন্যই ১৮৫৭ এবং ১৮৫৮ এই দুই বছর ধরে যখন সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী 'সিপাহী বিদ্রোহ' দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী রচিত নাটকগুলো হচ্ছে : কালী প্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) ও 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) প্রভৃতি।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় পুনরায় উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, সে যুগের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকাগুলো 'সিপাহী বিদ্রোহের' বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। এমনকি পরাশক্তি ইংরেজদের পক্ষে জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করে। ইংরেজদের বিজয় সংবাদ কোলকাতায় পৌঁছলে ১৮৫৭ সালের ২০ শে জুন 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদকীয়

হচ্ছে, "যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্দ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহাদিগকে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ বৃক্ষের ফল ভোগ করুক"।

একই দিনে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য হচ্ছে, "আমাদিগের সৈন্যরা (ইংরেজ) দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। ... ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও ... "

এর প্রায় মাসাধিককাল পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের ২৬ শে মে তারিখে ইংরেজদের সমর্থনে কোলকাতার হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কোলকাতার "সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা" যোগদান করেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দানের প্রস্তাব পাস করেন।

গবেষক ও মনীষীরা প্রায় বলে থাকেন যে, "নাটক হচ্ছে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং নাটকের সঙ্গে জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান"। কিন্তু আলোচ্য সময়ের নাটকগুলোতে জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবিতো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত? এমনকি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ১৮৫৮ সালের শেষ ভাগে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন, তবুও বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর বীভৎস অভিযান অব্যাহত রয়েছে। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হবার সময় সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক বেরেলীর খানকে গুলি করে হত্যার পর হাজার হাজার সিপাহীকে কামানের তোপের মুখে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধগুলোকে অত্যন্ত নৃশংসতার মাঝ দিয়ে অপসারণ করে এতদিন পর্যন্ত যে বিশাল উপ-মহাদেশ কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া গোষ্ঠীগত লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল, তা ১৮৫৮ সালের শেষ নাগাদ ইংরেজ রাজশক্তির করায়ত্ত হওয়ায়, ব্রিটিশ শোষক শ্রেণীর লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হলো।

তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেদিন কোলকাতা কেন্দ্রিক নবসৃষ্ট এবং পূর্ণতার পথে অগ্রসরমান বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা, নীরবে সমর্থন পর্যন্ত করেনি। এঁরা সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদও কামনা করেনি। এ সম্পর্কে ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, "— নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে আঁকড়ে থাকেননি। ইংরেজকে সোজাসুজি আক্রমণ করার সুবিধা থাকার জন্যও কেউ কেউ রাজপুত মোগল বা রাজপুত-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও হিন্দু মানসিকতা এড়ানো যায়নি। এর ফল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুখকর হয়নি এবং এগুলোকে অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প উদগীরিত হয়েছে"। (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক: সাহিত্য প্রকাশ : কলিকাতা)

একথা স্পষ্ট বলা যায় যে, 'সিপাহী বিদ্রোহের' পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলা তথা উত্তর ভারতীয় অঞ্চলগুলোতে এক ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে। বিজয়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লেলিয়ে দেওয়া সৈন্যেরা পলায়মান দেশীয় সৈন্যদের এবং এঁদের সহযোগীদের নিশ্চিহ্ন করার অভিযানে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যে বীভৎস অত্যাচার করেছিল তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কোলকাতা কেন্দ্রিক তৎকালীন সংবাদপত্রগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই এসবের বিশেষ উল্লেখ নেই। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেও কোলকাতা কেন্দ্রিক

বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল নিজেদের শ্রেণী ও গোষ্ঠী স্বার্থে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের নিকট একথা প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছিল যে, আবার ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে মূলত মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের ফসলই হচ্ছে এই 'সিপাহী বিদ্রোহ'।

মঞ্চে মহিলাদের অভিনয় বন্ধের জন্য সংবাদপত্রের চড়া সুর ও আব্দার

সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় ১৫ বছর পরে বিভিন্ন বিষয়ে কোলকাতার সংবাদপত্র গুলোর বক্তব্য উপস্থাপনা এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবির সুর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ সময়কে বাংলা নাটকের যুগ-সন্ধিক্ষণের সময় বলে অভিহিত করা যায়। এই সর্বপ্রথম কোলকাতার নাট্যমঞ্চে ভদ্রঘরের মেয়েরা অভিনয়ের জন্য এগিয়ে এসে কোলকাতা কেন্দ্রিক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলো এর তীব্র বিরোধিতা করল।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া নিউজ' পত্রিকায় ১৮৭৩ সালের ১৭ই মার্চ সংখ্যায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত উগ্র মন্তব্য হচ্ছে : 'এই কলঙ্কিত কোম্পানির প্যাভেলিয়ানের দেওয়ালগুলো পোড়াইয়া মাটির সহিত মিশাইয়া না দেওয়া অবধি এবং ইহার আসবাবপত্রসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া রাষ্ট্রের হাতুড়ির আঘাতের মাধ্যমে নিলাম বিক্রয় না করা পর্যন্ত আমাদিগের পরিপূর্ণ সন্তোষ লাভ হইবে না। এই কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, নাট্যমঞ্চে বেশ্যাগিরির প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং ইহাতে নাট্যমঞ্চসমূহ দুর্নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে'।

১৮৭৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় মঞ্চনাটকে মহিলাদের অভিনয় সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করা হলো। পত্রিকাটিতে এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হলো যে, নাটকে "কুরুচি স্থান পাচ্ছে এবং অসম্মানিত স্ত্রীলোকেরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছে"। ভারত সংস্কারক পত্রিকায় বলা হয় যে, "এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি সংবাদপত্রের আহবান

তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সে আমলের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ছাড়াও সংবাদপত্রগুলোও অযাচিতভাবে নানা ঘটনার বিরুদ্ধে গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের যুবরাজ এডোয়ার্ড-এর (পরে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতা আগমন উপলক্ষে সর্বপ্রথম হিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল দ্বিধাবিভক্ত হলো। ইংরেজঘেঁষা মহলের অন্যতম নেতা ভবানীপুরের প্রখ্যাত উকিল ও ব্যবস্থাপকসভার মনোনীত সদস্য শ্রী জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজ এডোয়ার্ডকে নিজ বাটিতে আমন্ত্রণ করে কুল মহিলাদের দিয়ে বরণ করলেন। উপরন্তু ইংরেজ যুবরাজকে বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য জোরজবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করা হয়েছিল। ফলে বুদ্ধিজীবীদের অন্য মহলে এ সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এঁদের উদ্যোগে ১৮৭৬ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে জগদানন্দ ও যুবরাজ নামে এক প্রহসনমূলক নাটক মঞ্চস্থ হয়। সরকার তৎক্ষণাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারি করে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করলে, ২৬ শে ফেব্রুয়ারি 'হনুমান চরিত্র' এই ভিন্ন নামে আবার প্রহসন নাটকটি অভিনীত হয়। এবারও পুলিশ

নাটকটির অভিনয় বন্ধ করল। পলাশী যুদ্ধের ১১৮ বছর পরে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের সঙ্গে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এই সর্বপ্রথম মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলো।

১৮৭৫ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারি বড়লাট নর্থব্রুক নাটক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যে অর্ডিন্যান্স জারি করেন, তাতে অনতিবিলম্বে অশ্লীলতার (?) অভিযোগে উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের সঙ্গে জড়িত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। নিম্ন আদালতে মূল দু'জন আসামীর শাস্তি হলেও হাইকোর্টে এঁরা মুক্তি লাভ করেন। ফলে বড়লাট নর্থব্রুক এতদসম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট আইন প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ইতোপূর্বে কোলকাতার সংবাদপত্রগুলো শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে যেভাবে সমর্থন দিয়েছে তাতে করে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল যে, এ ধরনের আইন প্রণয়ন করলে খুব একটা বিরোধিতা হবে না।

১৮৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর "ডরামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল বিল" আইন হিসেবে পাস হয়। গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর মতে, "নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনটি পড়লেই দেখা যাবে যে বিদেশী সরকার নাটকের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের (কোলকাতা কেন্দ্রিক সংবাদপত্রের) সমালোচনাকে লুফে নিয়েছিলেন এবং আইনে রাজদ্রোহ, মানহানিকর প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে কুৎসা, অশ্লীলতা প্রভৃতিও যোগ করে দিয়ে আইনটি জারি করেছিলেন"।

১৮৭৬ সাল বছরটি আরও কয়েকটি ঘটনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এ বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি দেওয়া হয়। এসময় গোঁড়া রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন নতুন বড়লাট লর্ড লিটন দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবে ঘোষণা করেন। অথচ এ বছরেই পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' হিসেবে ঘোষণা সম্পর্কিত বিরূপ মন্তব্য এবং দুর্ভিক্ষে ৫০ লাখ লোকের মৃত্যু সংক্রান্ত কোনও খবরাদি যাতে করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়, এজন্যই বড়লাট লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনতা খর্ব করলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় জারি হলো, 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'। উপমহাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের এটাই হচ্ছে প্রথম সূচনা। অবশ্য সে আমলের ইংরেজি পত্র-পত্রিকাগুলো ইংরেজ মালিকানাধীনে ইংরেজদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো বলে উল্লিখিত আইনটি ইংরেজি ভাষার পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রতি প্রযোজ্য ছিল না।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, পলাশীর যুদ্ধের ১১৮ বছর পর যুবরাজ এডোয়ার্ড-এর কোলকাতা সফর উপলক্ষে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একাংশের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর প্রথম মনোমালিন্য দেখা দেয়। রক্ষণশীল বড়লাট লর্ড লিটন একদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং অন্যদিকে এ ধরনের মনোমালিন্যের প্রেক্ষিতে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই পদক্ষেপই হচ্ছে 'অস্ত্র আইন' প্রবর্তন। এই আইনের ফলে সরকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া ভারতবাসীদের পক্ষে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

হিন্দু মধ্যশ্রেণীর শৈশব ও কৈশোর কাল অতিক্রম

লর্ড লিটন-এর আমলে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে 'নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন', দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার স্বাধীনতা হরণ সম্বলিত "ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট" এবং 'অস্ত্র আইন' প্রবর্তনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলের ক্ষোভের সঞ্চার হলো। রক্ষণশীল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বুঝতেই পারেননি যে, অবিভক্ত ভারতে একমাত্র বৃহত্তর বাংলায় তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে অত্যন্ত দ্রুত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এই নব্য সৃষ্ট শ্রেণী নিজেদের গোষ্ঠী ও শ্রেণীস্বার্থে খুবই সচেতন ; উপরন্তু এঁরা 'বন্দেমাতরম' স্লোগান এবং 'ভারত মাতার' 'হিন্দুয়ানীর আদর্শকে' আঁকড়ে ধরে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ইংরেজ শাসকরা অনুধাবন করতে পারেননি, কোলকাতা কেন্দ্রিক নেতৃত্বে সৃষ্ট এই মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সবার অলক্ষ্যে তার শৈশব ও কৈশোরের কাল অতিক্রম করেছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক পারসিভাল স্পিয়ার-এর (এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৬৫ লন্ডন) মতে, "উভয়পক্ষে (ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী) মনোভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির ঘটনাপ্রবাহ মোটেই আশা করা যায়নি। আলোচ্য মধ্যশ্রেণীর গঠন এত দ্রুত সংগঠিত হয়েছিল এবং এর ব্যাপ্তি এত ত্বরিতগতিতে হয়েছিল, যা সাধারণ পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ধরাই পড়েনি"।

পরবর্তীতে লর্ড ডাফরিন এ মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, "—কিন্তু তখন এই সংখ্যালঘুরা (বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী) একটা ভাষা ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী হয়েছে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, মান-মানসিকতা ও বক্তব্য অভিন্ন ধরনের। ভারতের আর কোথাও এবং কখনও ইতোপূর্বে এ ধরনের মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়নি। এই ব্যাপারটা অচিরেই সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে"।

আলোচ্য সময়কালের সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সন্তর্পণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রশ্রয় ও আনুকূল্য এর অন্যতম কারণ। উপরন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র, পৌরসভাগুলোতে স্বায়ত্তশাসন-এর প্রবর্তন এবং আইসিএস পরীক্ষায় ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দেওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসরমান বাঙালি মুসলমানদের তখনও 'অন্ধকার যুগ' চলছে এবং তাঁরা নিদারুণভাবে পশ্চাদপদ (বাঙালি) হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ব্যাপক উৎসাহ লাভ করে এবং অধিকার আদায়ে সচেতন হয়। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন লর্ড লিটন-এর পর বড়লাট হিসেবে ১৮৮০ সালে উদারপন্থী লর্ড রিপনের আগমনে এ ধরনের একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়।

এই প্রেক্ষিতে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে ১৮৮২ সালে কোলকাতায় ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন পদচ্যুত আইসিএস সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী। ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। আন্দোলনকারীদের অন্যতম দাবি ছিল ভারতীয় বিচারকদের অবিলম্বে ইংরেজ বিচারকের সমপর্যায়ভুক্ত করতে হবে। লর্ড রিপন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এই দাবি মেনে নেন।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় সমসাময়িককালের রাজনৈতিক পরিবেশ-এর কিঞ্চিৎ বর্ণনা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার হিন্দু ভূস্বামী এবং পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলের উঠতি শিল্পপতিদের সহযোগিতার ফলে ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দু'টি স্রোত পরিলক্ষিত হয়। একটির নেতৃত্বে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং অপরটির নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক। গোখলে ছিলেন মূলত রাজা রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সমর্থক এবং তিনি কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করেন। এই প্রেক্ষিতেই গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তাঁর ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন যে, "বাঙালিরা আজ যা চিন্তা করে, সমস্ত ভারত আগামীকাল তা করে"। এক কথায় বলতে গেলে 'চিৎপভন' গোত্রীয় ব্রাহ্মণ গোখলে ছিলেন পুরোপুরি সংস্কারপন্থী।

এরই পাশাপাশি একই 'চিৎপভন' গোত্রীয় অপর মারাঠা কংগ্রেসী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন চরম উদারপন্থী এবং হিন্দু 'রিভাইভালিজম'-এ বিশ্বাসী। তিনি পর্যালোচনা করে দেখলেন যে, কেবলমাত্র মোগলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনীর মাধ্যমে ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। কেননা রাজপুত ইতিহাস হচ্ছে প্রায়শঃই মোগল রাজশক্তির সঙ্গে সমঝোতা এবং সময়বিশেষে আত্মরক্ষামূলক লড়াই-এর ইতিহাস। রাজপুতরা কখনই রাজস্থান ... পাঞ্জাব এলাকা থেকে শক্তির দাপটে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

শিবাজী উৎসব এবং হিন্দু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

অথচ অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের ইতিহাস 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর জন্য অনেক বেশি কার্যকর হবে। মারাঠারা শক্তির দাপটে সাময়িকভাবে হলেও উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ছাড়াও উত্তরে দিল্লীর উপকণ্ঠ থেকে শুরু করে পূর্বে বঙ্গাল এলাকা (বর্গী হামলা) পর্যন্ত আগ্রাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই মারাঠাদের দেশপ্রেম এবং শৌর্য-বীর্যের ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে নতুন 'হিন্দু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ'।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের প্রিয় দেবতা গণপতিকে (গণেশ) নিয়ে 'গণপতি উৎসব-এর প্রবর্তন করেন। এটাই হচ্ছে 'শিবাজী উৎসব'। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে (১৩-১৫ই জুন) গঙ্গাধর মহারাষ্ট্রের পুনা নগরীতে তিনদিন ব্যাপী 'শিবাজী উৎসব' পালন করেন। অত্যন্ত দ্রুত শিবাজীভিত্তিক মনোভাব ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মান-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে একথা সুস্পষ্টভাবে বললে যথার্থ হবে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কালটা এমন ছিল যখন পরাশক্তি ইংরেজদের সৃষ্ট রাজধানী কোলকাতা নগরীতে রাজ ছত্রচ্ছায়ায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তি সুদৃঢ় হতে চলেছে। বাহ্যত মানবতাবোধ, রেনেসাঁ ও দেশপ্রেম-এর আদর্শের জন্য সুচতুরভাবে সোচ্চার (?) হলেও বাস্তবে এঁরা সব সময়েই ধর্ম, শ্রেণী ও গোষ্ঠীস্বার্থে সচেতন ছিলেন।

তাই এ সময় ইংরেজ রাজ-প্রভুদের বিরুদ্ধে এই মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সমাজ কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। বরং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত সময়কাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর

পরিবারের সন্তান প্রখ্যাত নাট্যকার ও সমাজ সংস্কারক এবং হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মকাণ্ড ও মন-মানসিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঠাকুর মহাশয় তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে তথ্য বিকৃত করে উপস্থাপনা করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে তাঁর ভূমিকার সমর্থনে সাফাই গেয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি কোলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরির অবৈতনিক সম্পাদক কেশব প্রসাদ মিত্রকে লিখিত এক পত্রে এসব ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,"ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস নহে। কোনও দেশের কোনও নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে রচিত হয় না"। অর্থাৎ এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, ঠাকুর মহাশয় সজ্ঞানে ইতিহাসভিত্তিক তথ্য বিকৃত করেছেন। স্বীয় নাটকের প্রয়োজনে তিনি যথেচ্ছভাবে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়ই কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লিখিত নাটকগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে হিন্দু রাজ রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে তিনি যে শুধু ইতিহাস বিকৃত করেছেন তাই-ই নয়, তাঁর লেখনী অবলীলাক্রমে মুসলিম বিদ্বেষে ভরপুর হয়েছে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলোতে যে জাতীয়তাবোধ (?) রয়েছে তার মধ্যে প্রকটভাবে হিন্দু-প্রবণতা বিদ্যমান।

তবুও একটা কথা বলতে হয় যে, জাতীয়তাবাদ-এর প্রশ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কেননা, এই উপমহাদেশের অর্থাৎ ভারতবাসীর অখণ্ড জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে তিনি শেষ পর্যন্ত সংশয় প্রকাশ করে গেছেন। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে 'প্রবন্ধ মঞ্জরী" পুস্তকে 'ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না ? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবাসী মুসলমান ও খ্রিস্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দু জাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়?"

একটু লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, সে আমলে যাঁরা বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরা পরোক্ষভাবে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। কেননা, এই পৃষ্ঠপোষকতার দরুনই বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ পূর্ণতা লাভ করেছে। অথচ প্রকাশ্যে এই সত্য স্বীকার করার সৎসাহস পর্যন্ত অনেকেরই ছিল না এবং এখনও পর্যন্ত নাই। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে সে আমলে বাংলা সাহিত্যের নাটক উপন্যাসের নব রাজশক্তি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার চেয়ে অতীতের মোগল-পাঠান রাজন্যবর্গের চরিত্র হনন সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবোধে হিন্দু প্রবণতা

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহের' বছর থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই ৪৮ বছরকাল সময়ে ইংরেজ রাজত্বে, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস খুবই চাঞ্চল্যকর। ১৮৫৭ সালে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের 'দালালী' করেছে এবং ১৮৮৫ সাল নাগাদ শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারের সমীপে 'বিনীতভাবে দাবি-দাওয়া' উত্থাপন এবং 'আত্মনির্ভর' হওয়ার লক্ষ্যে বোম্বাই-এর নব্যসৃষ্ট গুজরাটি ও মারাঠি শিল্পপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" গঠন করেছে, তাঁরাই আবার ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন-এর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের দরুন স্বীয় শ্রেণী ও গোষ্ঠীস্বার্থে

আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বাঙালি হিন্দু যুবসমাজকে ইংরেজ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ইন্ধন যুগিয়েছে।

এখানে আবার উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলোতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং বাল্য ও কৈশোর উত্তীর্ণের পর যৌবনে পদার্পণ করেছে। কিন্তু এঁরা বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে 'ইচ্ছাকৃত' অথবা 'অনিচ্ছাকৃত' যেভাবেই হোক না কেন, জলাঞ্জলি দিয়েছে। এজন্যই তো শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৯০৫ সালে এসেও 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের' একটা পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা খুঁজে না পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত গবেষক শ্রী বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে (ওরিয়েন্ট লংম্যান: কলিকাতা) (১৯৪৯ : ২ সং) এই অবস্থাটার বর্ণনা দিয়েছেন। "সেই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোগামী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং বাংলার উদীয়মান হিন্দু প্রধান বুর্জোয়া শ্রেণী। একটা হিন্দু প্রধান ভাবধারা সেই কারণেই কখনও ক্ষীণ, কখনও প্রবল বেগে, বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অন্তঃসলিলার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছে। ... বাঙালির নবজাগৃতি তাই সমগ্র ভারতের নবজাগৃতির উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি" (পৃ: ৭৬) এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে, "বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলনের পুরোটা হিন্দুপ্রধান উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী, নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী"।

১১৮ বছর পর ইংরেজদের সংগে প্রথম মনোমালিন্য

তথাপিও শেষ পর্যন্ত পলাশী যুদ্ধের প্রায় ১১৮ বছর পর ১৮৭৬ সাল (মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ) নাগাদ সর্বপ্রথম কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে রাজশক্তি ইংরেজদের প্রকাশ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বড়লাট লর্ড লিটন এই ১৮৭৬ সালেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ নিন্দনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলো হচ্ছে ১. নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন ২. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং ৩. অস্ত্র আইন।

অতএব এই প্রেক্ষাপটে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৮৭৬ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী ৩০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এতদঞ্চলের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সম্পর্কে শ্রী বিনয় ঘোষ যথার্থই বলেছেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রধানত ব্রিটিশ কূটকৌশলের জন্য এবং আংশিকভাবে মুসলমান সমাজের আত্মাভিমান, অসহযোগিতা ও গোঁড়ামির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আজও তাই হিন্দুপ্রধান (পশ্চিম বাংলার)। তাই হিন্দুপ্রধান বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলনের (?) অগ্রদূত এবং তা প্রধান হিন্দু সমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত"। (বাংলার নবজাগৃতি (১৯৪৮) : বিনয় ঘোষ : ওরিয়েন্ট লংম্যান : কলিকাতা)

এই প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ২৫/৩০ বছরে উপমহাদেশে সংগঠিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশেষভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কেননা, এই বছরগুলোই

হচ্ছে ইংরেজ পরাশক্তির সঙ্গে হিন্দু বাঙালি মধ্যশ্রেণী তথা হিন্দু ভারতীয় উচ্চ বর্ণের 'দর কষাকষি' এবং 'মনোমালিন্যের' যুগ। এ সম্পর্কে আগেই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছি।

এখানে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্য শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী মহল যখন 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮২), জমিদারদের দাবি-দাওয়া, আইসিএস পরীক্ষা দেয়ার জন্য বয়ঃসীমা বৃদ্ধি, সরকারি চাকরিতে আরোও অধিকসংখ্যক ভারতীয়দের গ্রহণ, মনোনয়ন প্রথার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার গঠনের অধিকার দান, ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং ভাইসরয় কাউন্সিলে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবিতে সোচ্চার, তখন বোম্বাই কেন্দ্রিক উঠতি গুজরাটি এবং মারাঠি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দল ব্রিটেনের ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ১৮৭৯ সালে ল্যাংকাশায়ার-এর কাপড়ের কলগুলোকে পরোক্ষভাবে সহায়তার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক সমস্ত ট্যারিফ ডিউটি প্রত্যাহার এবং ১৮৯৫ সাল নাগাদ ভারতে তৈরি সকল ধরনের কাপড়ের উপর শতকরা পাঁচভাগ কর ধার্য করলে বিশেষ করে বোম্বের উঠতি শিল্পপতিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলেও সর্বভারতীয়ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বছরগুলোতে একদিকে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বাঙালি জমিদার শ্রেণী এবং অন্যদিকে বোম্বাই এলাকার উঠতি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অপরূপ মিলন সাধিত হয়েছিল।

এটা এমন একটা সময় ছিল, যখন প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বাঙালি হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী মহলের শ্রেণীস্বার্থে বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য কোলকাতায় একটার পর একটা আন্দোলন পরিচালনা করেছেন এবং এরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অল্প সময়ের ব্যবধানে বোম্বাই নগরীতেও গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং বাল গংগাধর তিলক-এর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও উত্থাপিত হচ্ছে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নানা সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড করেও এঁদের সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এখানে একটা প্রশ্নের অবতারণা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বিশ্বের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, যে কোনো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় চেতনাবোধ তথা জাতীয়তাবাদে জাগ্রত করার লক্ষ্যে একটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য, এই বিষয়টি হচ্ছে সেই জাতির অতীত কিংবা বর্তমান ইতিহাস থেকে এক বা একাধিক সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্বের বীরগাঁথার বহুল প্রচার। আলোচ্য জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাটক-উপন্যাস এবং কাব্য সর্বত্রই এসব ব্যক্তিত্বের বিভিন্নমুখী প্রতিভার জয়গানে মুখরিত করে উপস্থাপনা করাটাই, স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে (ইংরেজ আমলে) যখন পরাশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতাকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশ হয়, তখন এঁরা বাঙালি হিন্দুর ইতিহাস থেকে সর্বজনস্বীকৃত এ ধরনের একটা ব্যক্তিত্ব খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাঙালিত্বের (?) শ্লোগান উচ্চারণ করে এঁরা যে বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছিলেন, তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এঁদের সুদূর রাজপুতনা থেকে একাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে খুঁজে আনতে হয়েছিল। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়।

এ ব্যাপারে লে. কর্নেল জেমস টড (১৭৫২-১৮৩৫) নামক জনৈক ইংরেজ সামরিক কর্মচারী রাজপুত শৌর্য-বীর্য কাহিনী সম্বলিত 'এ্যানালস এ্যান্ড এ্যান্টিকস্ অব রাজস্থান' নামীয়

পুস্তক রচনা করায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 'আলোকবর্তিকার' সন্ধান লাভ করে। এক কথায় বলতে গেলে এই পুস্তক সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হবার পর থেকেই তৎকালীন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে 'আনন্দের হিল্লোল' বয়ে যায়। কারণ ছিল একটাই এবং তা হচ্ছে 'হিন্দু' জাতীয়তাবাদ-এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে রানা প্রতাপ সিংহের মতো ব্যক্তিত্বের সন্ধান লাভ। এজন্যেই সে আমলের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত প্রতাপ সিংহ এবং মেবার কাহিনী এতো বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা নাটক ও উপন্যাসে বাঙালি হিন্দু লেখকসমাজ রাজপুত চরিত্রের গুণকীর্তন এবং শৌর্য-বীর্যের বীরগাঁথা উপস্থাপনা কিংবা বর্ণনা করতে যেয়ে এতো বেশি 'উত্তেজিত' ছিলেন যে, তাঁরা ইতিহাসকে নিজেদের লেখার প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করেছেন এবং প্রায়শঃই তার স্বীকৃতি পর্যন্ত দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় ১৩৩ বছরে জেমস টড-এর এই বইটি ইংরেজি ভাষায় মাত্র তিনটি সংস্করণ (পারসিভাল স্পিয়ার : এ হিস্টরি অব ইন্ডিয়া (২) : পেংগুইন বুকস লন্ডন ১৯৮২ পৃ. ১৬৭) প্রকাশিত হলেও ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এর অসংখ্য অননুমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এবং বাংলায় এটাই ছিল সর্বাধিক প্রচারিত পুস্তক।

জেমস টড-এর আলোচ্য বইটি প্রকাশিত হবার স্বল্পদিনের মধ্যেই কোলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হলে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই (?) শ্রী বরদাকান্ত মিত্র সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করেন এবং 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' নামে বইটি প্রকাশিত হয়। এরপরেই 'রাজস্থান' এই একই নামে বাংলায় আরো দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রচয়িতা ছিলেন যথাক্রমে শ্রী অঘোরনাথ বরাট এবং শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এর পর পরই রাজপুত শৌর্য-বীর্যের জয়গান করে বাংলা ভাষায় উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশের হিড়িক পড়ে যায়। কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৮৭৩), জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' (১৮৭৫) এবং 'অশ্রুমতি' (১৮৭৯), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'আনন্দে রহো' (১৮৮১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' (১৮৮২), গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রানা প্রতাপ' (অসম্পূর্ণ : ১৯০৪), ডি, এল রায়-এর 'রানা প্রতাপ' সিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) এবং 'মেবার পতন' (১৯০৮), ক্ষীরোদ প্রসাদ-এর পদ্মিনী ১৯০৬ এবং নিশিকান্ত বসুর 'বাপ্পারাও' (১৯১৪) প্রভৃতি নাটক ও উপন্যাস-এর সবগুলোই জেমস টডের আলোচ্য রাজস্থান বইটির কাহিনী ও উপাখ্যানকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

একমাত্র মাইকেল মধুসূদন-এর 'কৃষ্ণকুমারী' (যদিও কোলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্মকর্তাদের নির্দেশে মুসলিম চরিত্র-ভিত্তিক 'রিজিয়া' নাটককে বাদ দিয়ে এটি রচিত) ব্যতিক্রমধর্মী নাটকটি ছাড়া উপরে বর্ণিত সমস্ত সাহিত্যকর্মের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল রাজপুত ব্যক্তিত্বগুলোকে মহান ও শক্তিধর হিসেবে চিত্রিত করে 'হিন্দু জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা।

অথচ ন্যায়তই একথা উল্লেখ করতে হয় যে, রাজপুতনার পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট লে. কর্নেল জেমস টড-এর লিখিত আলোচ্য গ্রন্থটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর সহায়ক হিসেবে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে ভূমিকা পালন করেছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে রাজস্থানের ছোট-বড় রাজপুত রাজ্যগুলো আনুষ্ঠনিকভাবে ইংরেজের 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত হয় এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় লাভ করে। এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য।

"লর্ড হেস্টিংস-এর মন্তব্য অনুযায়ী যেসব রাজপুত রাজ্যগুলো কোম্পানির 'স্বাভাবিক মিত্র' ছিল, সে সব রাজপুত রাজ্যগুলো আশ্রিতদের জন্য এভাবেই তাঁদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিল এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে গ্রহণ করলো।"

(অ্যান অ্যাডভান্স হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া : মজুমদার, রায় চৌধুরী এবং দত্ত : নিউইয়র্ক (১৯৬৫) পৃ. ৭২৭)

এ ধরনের একটা প্রেক্ষাপটে জেমস টড রচিত সুবৃহৎ 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিক্স অব রাজস্থান বইটির মূল বক্তব্য ও উপস্থাপনা সম্পর্কে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। কেননা, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত যে বইটির উপাদান বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা' নিশ্চিতভাবে দীর্ঘ আলোচনার দাবিদার। প্রথমেই বলতে হয় যে, জেমস টড জীবনে বিশ্ববিদ্যলয়ের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করেননি। গবেষক, লেখক কিংবা ইতিহাসবিদ হিসেবেও তাঁর কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। একজন সামরিক কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবনের অনেকগুলো বছর তিনি রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করার পর কূটনীতিক হিসেবে রাজস্থানে দায়িত্ব পালন করেন। নিজে কোথায়ও ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব কিংবা মর্যাদাও দাবি করেননি।

রাজপুতনা অঞ্চলে প্রচলিত চারণগীতি এবং মধ্যযুগে রাজস্থানী ভাষায় রচিত কয়েকটি কাব্য-গাথাকে ভিত্তি করে জেমস টড তাঁর এই বিতর্কিত বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে রাজপুত জাতির সমগ্র ইতিহাস অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেসব রাজপুত রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল, টড শুধু তাদেরই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এসব রাজ্যের মধ্যে মেবারের গল্প কাহিনী এই গ্রন্থে প্রাধান্য লাভ করেছে। মোগলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে মেবারের রাজন্যবর্গের দীর্ঘকালব্যাপী লড়াই-এর ঘটনাবলী ইংরেজ লেখক টড তাঁর গ্রন্থে অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে উচ্চ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেছেন। অথচ জেমস টড মারাঠাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত মেবারের ঘটনাবলী অত্যন্ত সুচতুরভাবে এড়িয়ে গেছেন।

এ সম্পর্কে কলিকাতাস্থ বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ড: প্রভাত কুমারের মন্তব্যগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "যে চারণগীতিকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আফিমখোরের গালগল্প বলে অবহেলা করেছেন, টডের তাই-ই ছিল উপজীব্য। ...যদিও টড যে যুগে মেবারের কাহিনী লিখেছেন সে যুগের মেবার মারাঠার আক্রমণে বিপর্যস্ত, কুশাসনে দুর্বল এবং আফিম-এর প্রতি আসক্তিতে মেরুদণ্ডহীন। .: কিন্তু আমার বিশ্বাস কবির দৃষ্টিভঙ্গি নয়, রীতিমতো সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই টড ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করেছেন। ... অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জয়লাভে রাজপুত জাতি একটি উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছে। শুধু টড নন, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা সবাই এইটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ব্রিটিশ শক্তি স্বাধীনতা হারানো রাজপুত জাতি এবং বাঙালি জাতি, দুই জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। অথচ ১৮১৭ সালে রাজপুত রাজ্যগুলোকে এবং তার আগে ১৭৫৭ সালে বঙ্গদেশকে কীভাবে ব্রিটিশ রাজশক্তি কুক্ষিগত করেছে, তা কারও অজানা নেই। ... টডের

গ্রন্থের ভূমিকায় পাতার পর পাতা একদিকে আট শতাব্দীর মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার, অন্যদিকে 'হিন্দু' অতীত মহত্ত্বের কথা আছে। সেটা কিন্তু হিন্দু বা রাজপুত প্রীতিবশত নয়। কারণ ওই দু'টি পাশাপাশি ধরে তারই মধ্য দিয়ে তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসন হিন্দুদের মুক্তি দিয়েছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক নাট্যকারদের তাই এ ব্যাপারে যতটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা হতে পারেননি।"

(দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক: সাহিত্য প্রকাশ: কলিকাতা ১৩৮৫)।

পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট গবেষক শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। "... রাজপুতদের রাজনৈতিক দৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ দূরে থাকুক সমগ্র রাজস্থান এমনকি কোনো রাজপুত রাজার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ... এমন কি, 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' রাজস্থানকে এক রাজছত্রতলে আনয়নের স্বপ্নও কোনও রাজপুত রাজার নিদ্রাভঙ্গ করে নাই। ... প্রধানত : এই কারণেই রাজপুতের শৌর্য কখনও ভারতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারে নাই।"

(বেতার জগৎ : শারদীয় সংখ্যা : ৪৮ বর্ষ ১৮ সংখ্যা : পৃষ্ঠা ৪৪)।

এহেন এক পরিস্থিতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ নাগাদ কোলকাতায় সুবর্ণ শ্রেণীও বিত্তশালী মহল এবং বোম্বাই-এর উঠতি শিল্পপতি গোষ্ঠীর সমর্থনে যে বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবিদরা রাজপুত বীর প্রতাপ সিংহ প্রমুখের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের মোহমুক্তি ঘটল। তাঁরা প্রায় সতেরো বছর পর উপলব্ধি করলেন, যেহেতু রাজপুত জাতির ইতিহাস হচ্ছে মোগলদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক লড়াই ও প্রায়শঃই মোগলদের সঙ্গে সমঝোতার ইতিহাস, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজপুতদের কোনো ভূমিকা নেই সেহেতু এক্ষণে মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীর ব্যক্তিত্ব এবং মারাঠা শক্তির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী ও বীর-গাথাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বোম্বাই নগরীতে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠনের প্রায় আট বছর পর এই মৌলিক বিষয়টিকে চিহ্নিত করে সর্বসমক্ষে একটি রূপরেখা উপস্থাপিত করা হলো।

এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন কংগ্রেসের চরম দক্ষিণপন্থী নেতা মারাঠা ব্রাহ্মণ বাল গঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৩ সালে গঙ্গাধর তিলক 'গণপতি উৎসব'-এর প্রবর্তন করলেন। এঁরই উদ্যোগে মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ১৮৯৬ সালের ১৫ই এপ্রিল 'শিবাজী উৎসবে'র আয়োজন করা হয়। এর পরের বছর পুনা শহরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে তিন দিনব্যাপী 'শিবাজী উৎসব' পালিত হয়। এমনকি গঙ্গাধর তিলক জাতীয় বীর হিসেবে ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসব-এরও প্রচলন করেন। শিবাজী ছিলেন ভবানী দেবীর ভক্ত। তাই ভবানী পূজা শিবাজী উৎসব-এর মূল অঙ্গস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হলো। মারাঠাদের অনুসরণে ১৯০২ সাল নাগাদ কোলকাতায় শিবাজী উৎসব-এর সূচনা হলো। এর পরেই বাংলা সাহিত্য, নাটক, কবিতা ও গানগুলো ছত্রপতি শিবাজীর জয়গানে মুখরিত হলে উঠল। সবার (রবীন্দ্রনাথসহ জনাকয়েক ব্যতিক্রম) উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই। বাঙালিত্বের নামে হিন্দু বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠা (?) করার পর 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর মাধ্যমে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

এদিকে ক্লাইভের পর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার নয়া গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। হেস্টিংস-এর ১৩ বছরব্যাপী গভর্নর-এর সময়কাল নানা ঐতিহাসিক ঘটনায় ভরপুর। কোম্পানি কর্তৃক বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভের পূর্বে ইংরেজদের এরকম বিশ্বাস

ছিল যে, আদায়কৃত রাজস্বের উদ্বৃত্ত থেকে কোম্পানির বার্ষিক মূলধন বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধ সম্ভব হবে। কিন্তু ক্লাইভ কর্তৃক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত এদেশীয় ব্যক্তিদের যোগসাজশে কোম্পানির কর্মচারীরা এতদূর দুর্নীতিপরায়ণ ছিল যে, বাস্তবে আদায়কৃত অর্থের বিরাট অংশই আর কোম্পানির তহবিলে জমা হতো না। ফলে হেস্টিংস নয়া গভর্নর জেনারেল হয়েই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করলেন। রাতারাতি বঙ্গীয় এলাকার ভূমিকর দ্বিগুণ হয়ে গেল। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে যেখানে মোট আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৮১ হাজার পাউন্ড, ১৭৬৬-৬৭ সালে সেই রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লাখ ২৭ হাজার পাউন্ড। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংস যে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করেন তা ইতিহাসে বিরল।

গবেষক বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' (ওরিয়েন্ট লংম্যান : কলিকাতা : পৃ: ২২) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বর্ণনাদানকালে লিখেছেন, "এইভাবে ইংরেজ বণিকদের নির্লজ্জ শোষণ ও লুটতরাজ চলতে লাগল। কারুশিল্প ও কুটিরশিল্প ধ্বংস তো হলই, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাংলার কৃষক ও কৃষির চরম অবনতি ঘটল।"

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, একদিকে কোম্পানির দেওয়ানী লাভের পর আকস্মিকভাবে ভূমি রাজস্বের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং তা আদায়ের জন্য কৃষকের উপর ভয়াবহ অত্যাচার ও অন্যদিকে অনাবৃষ্টির দরুন ১৭৭১-৭২ (বাংলা ১১৭৬ সন) সালে বাংলা ও বিহারে দেখা দিল মানব ইতিহাসের এক হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষ। এটিই হচ্ছে কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ইংরেজদের স্বীকৃতি অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এই ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরকম অবস্থাতেও ১৭৭২ সালে বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস লন্ডনস্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সদের কাছে দম্ভোক্তি করে চিঠি লিখলেন, যদিও ওই প্রদেশের তিন ভাগের একভাগ লোক মরে গেছে এবং চাষাবাদের চরম অবনতি হয়েছে তবুও ১৭৭১ সালে নিট আদায় ১৭৬৮ সালেরও বেশি।

গবেষক ও ইতিহাসবিদ ড: আজিজুর রহমান মল্লিক সে আমলের এই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "... বাংলা এবং বিহারে প্রকট দুর্ভিক্ষের প্রথম ছয় মাসে কর আদায় পূর্ববর্তী বছরের চাইতে ছয় লাখ টাকা বেশি হয়েছিল এবং পরবর্তী বছরে হয়েছিল চৌদ্দ লাখ টাকা"। (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা : ১৯৮২ : বাংলা একাডেমী ঢাকা)

সমসাময়িককালে নব্য শাসকগোষ্ঠী আরও যে সব কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তার সবগুলোই বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ-বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ একেবারে ভেঙে পড়ে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, তৎকালীন বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী ও সুবর্ণ শ্রেণী এসময় ইংরেজ পরাশক্তির সহযোগীর ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছিল।

ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর রচিত বিখ্যাত অথচ অধুনা প্রায় দুস্প্রাপ্য 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান্স (লন্ডন : ১৮৭১) গ্রন্থে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে এক অপূর্ব মন্তব্য করেছেন। মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

"১৭০ বৎসর (১৭০০ খ্রি.) পূর্বে বাংলাদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল; আজ ধনী থাকাই তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব"। (অনুবাদ : কাজী আবদুল ওদুদ)

এই প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও যথাক্রমে সেনা রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে কয়েক শ' বছর ধরে বাংলার যে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, সেই চারটি বিভাগ থেকে অত্যন্ত দ্রুত এঁদের অপসারণ করায় বাংলার সব শ্রেণীর মুসলমানরা সেদিন নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হলো।

প্রথমত : সৈন্য বিভাগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ১৭৬১-৬৩ সালে যখন তাদের শিখণ্ডী মীরজাফর আলীকে দ্বিতীয়বারের মতো নবাবের গদিতে অধিষ্ঠিত করে, তখন এই মীরজাফরকে দিয়ে দিন কয়েকের মধ্যে ৮০ হাজার নবাবী সৈন্য বরখাস্ত করানো হয়েছিল। এছাড়া অযোধ্যার নবাবকেও সীমিত সংখ্যক সৈন্য রেখে বাকি সব সৈন্যকে বরখাস্ত করার জন্য ইংরেজরা বাধ্য করল। এদিকে গিরিয়া, উদয়নালা ও বক্সার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর নবাব মীর কাসেম মধ্য ভারতের দুর্গম এলাকায় পলায়ন করলে, তখন তাঁর অধীনস্থ প্রায় ৪০ সহস্রাধিক সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এদের প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। এরা সবাই হঠাৎ করেই বেকার হয়ে পড়ল। উপরন্তু কোম্পানির বাহিনীতেও বাংলা মুসলমানদের নিয়োগ তখন প্রায় নিষিদ্ধ। এর ফলে বাংলার মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর মনে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব দেখা দিল। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, এ সময় সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে নবাব বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের সমস্ত মুসলিম অফিসারও চাকরিচ্যুত হয়ে বেকার অবস্থায় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে কৃষিজীবীকেই উপজীবিকা হিসেবে বেছে নিল। এছাড়া এদের জন্য অন্য সব পথই তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত রাজস্ব বিভাগ। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে বাংলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এতদূর ক্ষিপ্ত হলেন যে, তিনি রাজস্ব আদায়ের পুরো দায়িত্বটাই রাতারাতি ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্যই ১৭৭২ সালে গঠিত হলো কেন্দ্রীয় বোর্ড অব রেভেন্যু। হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতিটি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করলেন। এর পরেই চালু হলো পাঁচসালা (৫ বছর মেয়াদী) বন্দোবস্ত। ফলে রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত সমস্ত মুসলমান কর্মচারী অপসারিত হলো। ইংরেজ কালেক্টররা জেলায় জেলায় গিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই নিলাম ডাকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালাভিত্তিক পত্তনি দিল। স্বাভাবিকভাবেই কোলকাতার বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী এবং সুবর্ণ শ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণ করল আর রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী বেকার হয়ে পড়ল। এখানেই শেষ নয়। বছর কয়েক পরে অর্থাৎ বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর আমলে ১৭৮৯ সালে স্যার জন শোর ভূমি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন দাখিল করলেন। স্যার জনের সুপারিশ ছিল তিনটি :

১. ভূমি রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গে করতে হবে, ২. আদায়কৃত রাজস্বের দশ ভাগের নয় ভাগ পাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও এক ভাগ হচ্ছে জমিদারদের প্রাপ্য এবং ৩. জমিদারদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হবে দশ বছর ভিত্তিক। ১৭৯১ সালে দশসালা বন্দোবস্তের আইন পাস হলে রাজস্ব বিভাগ থেকে বাংলার মুসলমানদের অবস্থান প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন

হয়ে যায়। এদিকে বিভিন্ন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের প্রথম বছরে আদায়কৃত রাজস্বের চেয়ে ১৭৯০-৯১ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এর পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকায় দাঁড়ায়।

এর পরের ইতিহাস তো আরও চাঞ্চল্যকর। লর্ড কর্নওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারি প্রথা সংক্রান্ত আইন চালু করলেন। সূর্যাস্ত আইনের অছিলায় মাত্র দু'বছরের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলে বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারি নিলাম হয়ে গেল। নিলামে এসব জমিদারি ক্রয় করল কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বিত্তশালী ও সুবর্ণ শ্রেণীর 'মহাশয়েরা'। শুরু হলো নতুন উদ্যোগে অত্যাচার। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের এই সম্পূরক শক্তির পূর্বাপর ইতিহাস আগেই উল্লেখ করেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিরাজমান অবস্থার কথা আজ প্রায় দু'শ বছর পরে লিখতে বসে শিহরিত হতে হয়। ছিয়াত্তরের (১৭৭১ খ্রি.) মহামন্বন্তরের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও সেদিন ইংরেজ বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। এরপর পাঁচসালা, দশসালা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামবাংলার নব্য জমিদার শ্রেণী ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে রায়তদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তা ইতিহাসে বিরল। বাংলার অধিকাংশ কৃষক মুসলমান বলে এর পুরো ধাক্কাটাই মুসলিম কৃষকদের সহ্য করতে হয়েছে। প্রায় একই সময়ে এদের জন্য নতুন বিপদ দেখা দেয়। জমিদারদের (অধিকাংশই বর্ণ হিন্দু) যোগসাজশে গ্রাম বাংলায় শুরু হয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। চাষিরা নীলচাষে অস্বীকার করলে নীলকরদের পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল সেই চাষিদের বাড়িঘর লুট করত, ঘর জ্বালিয়ে দিত আর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের পথের ভিখারী করে ছাড়তো। এসব নীলকর সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করেও কোনো ফায়দা হতো না। বিচার তখন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হারানচন্দ্র চাকলাদার-এর একটিমাত্র মন্তব্যের মাঝ দিয়ে এ-সময়ের নজীরবিহীন অত্যাচারের একটা চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "...ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল দাস-মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবরা এদেশে প্রয়োগ করেছিল। ... সে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হতো তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুটতরাজ, গৃহদাহ, লোক অপহরণ।"

('ফিফটি ইয়ার্স এগো' : ডন ম্যাগাজিন জুলাই ১৯০৫)

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত শতাধিক বছরের মধ্যে এই বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৪০টির মতো কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। (এসবের মধ্যে ফকির বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩), ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক তন্তুবায়ের সংগ্রাম (১৭৭০-৮০), পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), তিতুমীরের লড়াই (১৮২৭-৩১), ফরাইজী আন্দোলন (১৮৩১-৫৭) এবং সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩) অন্যতম ছিল। কিন্তু সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং সাফল্যজনক হিসেবে নীলচাষিদের বিদ্রোহকে (১৭৭৮-১৮৬০) আখ্যায়িত করতে হয়।

১৮৪৮ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় সে আমলে বাংলার কৃষকদের প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রকাশিত এক নিবন্ধে জনৈক ইংরেজ সমালোচকের মন্তব্য হচ্ছে, "... বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সমস্ত আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি ধুলিসাৎ করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।" এরই ফলে ১৮৬০ সালে আইন পাসের মাধ্যমে নীল চাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন ব্যাপারে পরিণত হয়।

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যারা এ বঙ্গীয় এলাকায় কয়েকশ' বছর ধরে শাসক ছিল কিংবা শাসকদের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে বিরাজমান ছিল, বাংলার সেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমস্ত শ্রেণীর লোক মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে বুভুক্ষু কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে পরিণত হলো। এসময় প্রায়শঃই কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে মুসলিম প্রজাসাধারণের স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে হয় যে, বঙ্গীয় এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠী এই দেশ, এই মাটি, এই ভাষা আর এই লোকাচারকে এর আগেই নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে বাঙালি হিসেবে গর্বের পরিচয় দেওয়ার যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, সেটাই ছিল তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

এ সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষের বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "প্রথম যুগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতি মুসলমান-বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাই হিন্দুরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছেন, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং ইংরেজদের অধীনে কিছু কিছু মোটা বেতনের সরকারি চাকরিও পেয়েছেন।" শ্রী ঘোষ আরও লিখেছেন, "মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের অবিচার ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নতুন জমিদারি ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার-জায়গীরদারেরা ধ্বংস হয়ে গেলেন তা নয়, বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হল তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। বাংলার প্রায় প্রত্যেক জেলায় এই উৎখাত নিঃস্ব প্রজাদের ধূমায়িত বিক্ষোভ দস্যুবৃত্তি (?) ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। সেই সময় এল ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ। ধর্মান্দোলনের ঢেউ, কৃষক বিদ্রোহ, মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ইংরেজ বিদ্বেষের এই সম্মিলিত প্রকাশকে ব্রিটিশ শাসকরা ব্রিটিশ-বিরোধী 'জিহাদ' (জেহাদ) বলে প্রচার করলেন।"

(বাংলার নবজাগৃতি: ওরিয়েন্ট লংম্যান কলিকাতা (১৯৭৯) পৃষ্ঠা ৭৪)

বাংলার রাজস্ব বিভাগ থেকে মুসলমানদের কৌশলে বিতাড়ন সম্পর্কে ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সত্য ভাষণ করে গেছেন। তিনি 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, "ইংরেজরা বাংলাদেশ লাভ করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহের প্রধান তহশিলদাররূপে মাত্র। মোটা ঘুষ না দিয়ে তলোয়ারের জোরে আমরা (ইংরেজরা) এই পদ পেয়েছিলাম। কিন্তু আইনত আমরা (ইংরেজরা) লাভ করেছিলাম মাত্র দেওয়ানের পদ অথবা প্রধান রাজস্ব আদায়কারীর পদ (১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্টের ফরমান)।... সেই আঘাত হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিশ ও স্যার জন শোর প্রবর্তিত সংস্কার পরম্পর যার পরিণতি হলো ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই সংস্কারের ফলে আমরা (ইংরেজরা) অধিকার করলাম সেইসব উচ্চ মুসলমান রাজপুরুষদের আসন যাঁরা রাজশক্তি ও প্রজার নিকট থেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব সংগ্রহকারী এই দুয়ের মধ্যবর্তী ছিলেন, আর যাদের নিযুক্ত কর্মচারীদের হাতেই ছিল ভূমিকর

আদায় সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থাভার। 'ঢালী-ঘোড়সওয়ার সমন্বিত মুসলমান তহশিলদারদের পরিবর্তে আমরা জেলায় জেলায় স্থাপন করলাম এক একজন ইংরেজ কালেক্টর। এঁদের আদালতের সঙ্গে সংযুক্ত হলো ধর-পাকড়, নিলাম ইত্যাদির ক্ষমতাযুক্ত আমলাদের মতো অস্ত্রহীন বরকন্দাজ। ... আর একভাবে বড় বড় মুসলমান ঘরের পক্ষে এটি বিষম ক্ষতির কারণ হলো—এই বন্দোবস্তের প্রবণতা হলো যেসব হিন্দু কর্মচারী সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়-আদি করতে তাঁদের জমিদার বলে স্বীকার করার দিকে। ... এর ফলে যে সমস্ত হিন্দু ভূমিকর আদায়কারী এতদিন নগণ্য পদের অধিকারী ছিলেন তাঁরা হলেন জমিদার, জমিদার মালিকানা স্বত্ব তাঁদের হলো, আর মুসলমান আমলে যেসব টাকা মুসলমানদের ঘরে যেত তা গেল তাঁদের (হিন্দুদের ঘরে)।"

পরিশেষে শিক্ষা ও বিচার বিভাগের কথা বলতে হয়। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা এলাকায় যেখানে একসময় শিক্ষা ও বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল, ইংরেজরা কোলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলে স্বল্প দিনের ব্যবধানে অত্যন্ত দ্রুত তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে লর্ড এলেনবারো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের এক জন্মগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"প্রবলেমস অব ইন্ডিয়া : সেলভেনকার : (পৃষ্ঠা ২২)

লর্ড এলেনবারোর এই মন্তব্যের ব্যাখাদান করলে বলতে হয় যে, পরাশক্তি ইংরেজের বশ্যতা যত সহজে এবং আগ্রহের সাথে বাঙালি হিন্দুরা মেনে নিয়েছিল, এদেশের সন্তান হিসাবে বাঙালি মুসলমানরা তা' মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং প্রায়শঃই বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথ অনুসরণ করেছিল। এরই ফল হিসাবে ইংরেজ শাসনের আমলে বাঙালি মুসলমানদের বিরাজ 'কাফফারা' দিতে হলো। কয়েক দশকের ব্যবধানে বঙ্গীয় এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। বাঙালি মুসলমানরা প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো থেকে বিতাড়িত হলো এবং বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক নব্য সৃষ্ট মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে ইংরেজি শিক্ষায় 'বলীয়ান' হয়ে সেসব পদ দখল করলো।

মুসলমানদের অদৃষ্টে জুটেছে দফতরী বেয়ারা পিওন ও ড্রাইভারের চাকরি :

এ সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষ বলেছেন, "বাংলার নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণী ও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আপোষ করে, শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সরকারি চাকরির মধ্য-নিম্নস্তরের উচ্ছিষ্ট দিয়ে সন্তুষ্ট করে। তাই শিক্ষিত হিন্দুরা সিভিলিয়ান বিচারপতি, গেজেটেড পুলিশ অফিসার, গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা কাস্টমস অফিসার না হলেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ছোট আদালতের জজ, মুন্সেফ ইত্যাদি হয়েছেন, হিন্দু উকিল মোক্তার কেরানীর সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু মুসলমানদের অদৃষ্টে জুটেছে দফতরী, বেয়ারা, পিয়ন, ড্রাইভার, কোচোয়ান আর লশকরের কাজই বেশি। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুরা যেভাবে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমানরা সেভাবে করেনি।'

১৮৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স এসোসিয়েশন'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে স্যার আব্দুল লতিফের পঠিত মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ আলোচনাকালে বিচারপতি জেবি ফিয়ার সত্য ভাষণ করে গেছেন। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে,

"ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে এদেশের মুসলমান ভদ্রশ্রেণী লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মান লাভে তাঁরা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পশ্চাদগতির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।"

পরের বছর উল্লেখিত সোশ্যাল সাইন্স এসোসিয়েশন-এর বার্ষিক অধিবেশন ১৮৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারি বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রেভারেন্ড জে লং সাহেবের মন্তব্যে করুণ বাস্তব সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বললেন, "... এক সময় যারা এত বড় একটা রাজ্য শাসন করেছেন, আজ তাঁহাদের বংশধররা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছেন। ... বাংলাদেশের কোনও গভর্নমেন্ট অফিসে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু মুসলমান দফতরী আর পিওনে সম অফিস ভরে গেছে।..."

এদিকে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা তখন যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যস্ত সেগুলো হচ্ছে ১. জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭ খ্রি.) ২. বঙ্কিম চন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৮৮২ খ্রি.) এবং ৩. ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজ কর্মচারী এ ও হিউম এবং বাঙালি হিন্দুর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডব্লু সি ব্যানার্জীর (প্রকৃত বাংলা নাম উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী হলেও ইংরেজিতে উমেশ-এর বানান ইউ-এর পরিবর্তে ডব্লিউ দিয়ে লিখতেন) নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৬ খ্রি.)। ইতিপূর্বে এসব ব্যাপারে উল্লেখ করা সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার জন্য আবারও বলতে হয় যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে স্থাপিত এসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল :

ক. আরও সুশৃংখলভাবে সাম্রাজ্যবাদ শাসকগোষ্ঠীর মদদ যুগিয়ে আস্থাভাজন হওয়া ও বিশ্বস্ত থাকা; খ. তৎকালীন ভারতের রাজধানী কোলকাতা এবং অন্যান্য এলাকার বাঙালি হিন্দুদের নব্য সৃষ্ট উচ্চ মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মহলের অর্থাৎ বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করা; গ. ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা সংস্কারপরন্থী মনোভাব থেকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে বাংলার রেনেসাঁ বলে সোচ্চার হওয়া এবং ঘ. পরাশক্তি ভারতেশ্বর ও জগদীশ্বর ইংরেজ শাসকদের বিশেষ কোনোরকম 'বিরক্ত না করে' আবেদন-নিবেদন, আলোচনা, কথাবার্তা, বক্তৃতা, বিবৃতি এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে শুধুমাত্র নিজেদের শ্রেণী ও গোষ্ঠীস্বার্থে 'বিবেক-সম্পন্ন দাবি-দাওয়া এবং সুবিধার' ব্যবস্থা করা।

বাঙালি মুসলিম অবস্থাপন্নরা তখন প্রায় নিশ্চিহ্নের পথে

বঙ্গীয় এলাকায় যখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বশ্যতা পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়ে নানাভাবে 'ফায়দা' গ্রহণে লিপ্ত তখন বাঙালি মুসলিম অবস্থাপন্ন শ্রেণীর উপর একের পর এক আঘাত এল।

এসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে অফিস-আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন। অফিস-আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনের কাজ যখন চলছিল, তখনই অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন টি মেকান সিলিক্ট কমিটির কাছে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সুপারিশ করেছিলেন যে, অফিসের ভাষার পরিবর্তনটা যেন খুবই মন্থর গতিতে করা হয়। অন্যথায় বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হলট ম্যাকেঞ্জি এ মর্মে সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে, অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার প্রবর্তনটা জেলাওয়ারি হিসেবে করা সমীচীন হবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসবের কিছুই হলো না। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাত্র ৫/৬ বছর সময়কালের মধ্যে ইংরেজ ভারতের সর্বত্র অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু হয়ে গেল। শিক্ষা, বিচার এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগ থেকে দলে দলে বাঙালি মুসলমানরা চাকরিচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হলো।

বাংলাদেশের জীবিত ইতিহাসবিদদের মধ্যে প্রবীণতম এবং এককালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক এ সম্পর্কে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

"এ পরিবর্তন অপর সম্প্রদায়ের (বাঙালি হিন্দু) জন্য খুব সুখকর হয়ে উঠল। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ইংরেজি শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে ইংরেজি শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং হিন্দু কলেজের (পরবর্তীকালে কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ) ছাত্ররা এই পরিবর্তনের পূর্ণ উপকার ভোগ করেছে। অপরপক্ষে মুসলিম আপার ক্লাস নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পারায় সর্বস্তরের অফিস-আদালত থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

এ ধরনের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, বঙ্গীয় এলাকার প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনী ছাড়াও রাজস্ব, বিচার এবং শিক্ষা বিভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশ দশক নাগাদ বাঙালি মুসলমানদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৮৩৭ সালে অফিস-আদালতে এবং ১৮৪৪ সালে সরকারি সমস্ত বিভাগে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে চালু করায় এই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হলো। এ বছরের ১৪ই অক্টোবর সরকারিভাবে এ মর্মে নির্দেশ জারি করা হলো যে, 'অতঃপর সরকারের সমস্ত দফতরে কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে'।

১৮৩৭-এ ফার্সির বদলে ইংরেজি চালু হওয়ায় মুসলিমরা বিপাকে পড়ল

ইংরেজ সরকারের এই নির্দেশে বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো বলা চলে। কেননা তখনও পর্যন্ত সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। উপরন্তু এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়ে সরলমনা মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং সীমিতসংখ্যক মুসলিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ 'পরাভব চেতনা'র দরুন সবকিছুতেই নির্লিপ্ত হয়ে রইল। এর পাশাপশি ডঃ এ আর মল্লিকের মতে "বাঙালি মুসলমানদের জন্য বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে তাদের মন্থর ও বিলম্বিত অভ্যুত্থান।"

কিন্তু অন্যদিকে ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদের সম্পূরক হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রিক সুবর্ণ শ্রেণী, কর্নওয়ালিশ-মার্কা নব্য জমিদার শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী তখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এর মধ্যেই পরাশক্তি ইংরেজের সঙ্গে কোলকাতা কেন্দ্রিক এই বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা চমৎকার বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দেই ইংরেজি শিক্ষার জন্য কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বৈদ্যনাথ বাবুকেই এদেশে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজ মহলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এছাড়া, বিশেষ করে কোলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইংরেজি

শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন রাধাকান্ত দেব মহাশয়। এই প্রেক্ষিতে ১৮৪৪ সালের নির্দেশের ফলে নব ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু যুবকরা দলে দলে চাকরিতে যোগদানের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করল। বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুদের জন্য নব্য যুগের সূচনা হলেও বাঙালি মুসলমানরা এক ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে পতিত হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, অফিস-আদালত থেকে শুরু করে সরকারের সমস্ত বিভাগে ইংরেজি ভাষা চালু করার জন্য ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী উদ্যোগ গ্রহণ করার আগেই ১৮৩৫ সালে কোলকাতার বর্ণ হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে শ্রী রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায়, শ্রী প্রশান্ত কুমার ঠাকুর এবং আরও ৬,৪৯৭ জন এক যুক্ত দরখাস্তে অবিলম্বে ইংরেজি ভাষা চালু করার দাবি জানান। (ইন্ডিয়া পাবলিক কনসালটেশন্স : ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫, নং ২৮)। এই দরখাস্তে দাবির স্বপক্ষে বলা হয় যে, "এরকম অনেক বাঙালি আছে, যারা ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে তাদের শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

গবেষক বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন যে : " ... যেমন কোলকাতা শহরে, ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের বিশ্বাসভাজন আরও দু'টি শ্রেণী তৈরি করেছিলেন –একটি নতুন নাগরিক ধনিক শ্রেণী, আর একটি নতুন নাগরিক মধ্য শ্রেণী। ...নাগরিক মধ্যশ্রেণীর একটি বিশেষ স্তর হিসেবে গড়ে উঠেছিল বাঙালি ইংরেজি শিক্ষিত এলিট শ্রেণী। ... প্রধানত হিন্দু সমাজের উচ্চস্তর থেকে, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্তের স্তর থেকে আধুনিক বাঙালি এলিটের উদ্ভব হয়েছে। এককথায় উনিশ শতকের বাঙালি এলিটকে উচ্চবর্ণের সঙ্গতিপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত 'এলিট' বলা যায়। তার ফলে এই এলিটগোষ্ঠী অনুপ্রাণিত ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলন হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিক্ষিত মুসলমান এলিটগোষ্ঠীর বিকাশ হয়নি বলা চলে।"

রেনেসাঁসের কারণ সম্পর্কে মার্কসিস্ট বিনয় ঘোষের নানা প্রশ্ন

পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক এবং মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী বিনয় ঘোষ এতদবিষয়ে আরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। "মুচ্ছুদ্দিগিরি বেনিয়ানি করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন কারা ? কারা সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করে জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হয়েছিলেন ? গ্রাম ও শহরের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ? কারা নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষিতশ্রেণী হয়ে সেকালের ভাষায় 'রুলার্স এ্যান্ড রুলড'-এর মধ্যে 'ইন্টারপ্রিটার্স' হয়েছিলেন ? অধিকাংশই হিন্দু এবং হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ্ প্রভৃতি উচ্চবর্ণভুক্ত যারা তাঁদের নিয়েই প্রধানত এই তিনটি শ্রেণী (নাগরিক কমপ্রাডর শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী) গঠিত হয়েছিল। মুসলমান ও অনুচ্চবর্ণ বলে হিন্দু সমাজে যারা উপেক্ষণীয়, তাঁদের সংখ্যা এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে খুবই সামান্য। কেন সামান্য? কেন অনুচ্চবর্ণের লোকেরা অর্থনীতি-রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন যুগে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ গ্রহণ করেননি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বাংলার তথা ভারতের, ভুয়ো রেনেসাঁসের মূল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং বোঝা যাবে কেন বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা ছাড়া কিছু নয়। ... বাংলার তথা ভারতের নবজাগৃতি যে একটি অতিকথা, এ সত্য বাস্তব ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে।" (বাংলার নবজাগৃতি: ওরিয়েন্ট লংম্যান : কলিকাতা, ১৯৭৯)।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক ডক্টর আনিসুজ্জামান এ প্রশ্নের কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করলেও আলোচনাকালে এ মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, "কিন্তু যেহেতু এই উদীয়মান উচ্চবিত্ত শ্রেণী (কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু) ছিল ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতিদের পার্শ্বচর, তাই ইংরেজ শাসকদের শুভেচ্ছায় এঁদের আস্থা ছিল যথেষ্ট।"

(মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৭৫৭-১৯১৮: ঢাকা ১৯৬৪)

এ প্রশ্নে কোলকাতার গবেষক কাজী আবদুল ওদুদ-এর বক্তব্য হচ্ছে, "হিন্দু সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্যে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।"

(শাশ্বত বঙ্গ : ব্রাক প্রকাশনী, ঢাকা)

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের জারিকৃত আলোচ্য নির্দেশে বাঙালি মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকরি লাভের সমস্ত সম্ভাবনা বিলীন হয়ে গেল। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভার এককালীন অর্থমন্ত্রী ডক্টর এ আর মল্লিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে পরিচ্ছন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, "...এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্য চিরতরে মুদ্রিত হয়ে গেলো।" ১৮৪৫-৫২ খ্রিস্টাব্দে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকাতেও কোনো মুসলমান লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আসল কথা হচ্ছে, এসব পরীক্ষার মান এত উচ্চ ছিল যে, মক্তব-মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে মুসলমানরা সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সরকারি দফতরের একজন পুরাতন ছাত্রের বিবৃতি ঢাকা কলেজের কর্তৃপক্ষ মুসাবিদা করেছিলেন। তাতেও ১৯৫০-৫১ সালের তালিকায় মুসলমানদের মান হতাশাব্যঞ্জকভাবে অনুপস্থিত। ১৮৫১-৫২-এর তালিকায় ৭৭টি নামের মধ্যে মুসলমানদের নাম ছিল মাত্র একজনের। সে বছর হুগলী কলেজের তালিকাতে কোনো মুসলমানদের নাম দৃষ্ট হয় না। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরিতে অথবা তারও উপরে আইন আদালত এবং রাজস্ব বিভাগের চাকরিতে ১৮৫৬-৫৭ সালে ৩৩৬ জন লোককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে মুসলমান ছিল মাত্র ৫৪ জন, ৯ জন খ্রিস্টান, বাকি সব হিন্দু। অন্যান্য বিভাগেও মুসলমানদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। ১৮৫৩ খ্রি. পর্যন্ত গভর্নমেন্ট নিয়োজিত মেডিকেল কলেজের ৪৯ জন সহকারী সার্জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন ছিল মুসলমান। শিক্ষা বিভাগের দ্বারও রুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্যে। কেবলমাত্র মাদ্রাসায় আরবি ও ফার্সি শিক্ষার জন্যে কিছুসংখ্যক মুসলিম নিয়োজিত ছিল।

বাঙালি মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে পরাশক্তি ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যে ক'টা নীতি গ্রহণ করল, তার সব ক'টিই বাঙালি মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই নির্দেশগুলো নিম্নরূপ :

১. ১৮৩৭ সালে অফিস-আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালুর নির্দেশ।

২. ১৮৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবরে সরকারের সমস্ত বিভাগে শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের নিয়োগের আদেশ।

৩. ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চের জারিকৃত নির্দেশে লাখেরাজ সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রিকরণ পদ্ধতি বন্ধ ঘোষণা।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মাত্র ৭০/৮০ বছরে সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমান সম্ভ্রান্ত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়া বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও ইতিপূর্বে

বর্ণিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু এবং ১৮৪৪ সালে সরকারের সমস্ত বিভাগে শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের নিয়োগের নির্দেশ জারির দরুন এ সময় বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী 'একেবারে হতভম্ব' হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে নিত্যনতুন আইন জারি ও সরকারি নির্দেশের জের হিসেবে অসংখ্য লাখেরাজ অর্থাৎ ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা হাতছাড়া হলে এই মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সবার অলক্ষ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরকম অবস্থায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মধ্যবিত্ত পরিবার বঙ্গীয় এলাকা থেকে উপমহাদেশের অন্যত্র বাস্তুত্যাগ করেছে বলেও তথ্য পাওয়া গেছে।

এরকম এক নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় বঙ্গীয় এলাকায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানেরা অত্যন্ত দ্রুত পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। এ বিষয়টা সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়কালে বিরাজমান অবস্থায় একটা চিত্র উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়।

১৮৪৬ সালের ছাত্র সংখ্যা

হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য	মোট
৩৮৪৬	৬০৮	৮৭	৪৫৪১

১৮৫২ সালের ছাত্র সংখ্যা

হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য	মোট
৬৩৩৮	৭৩১	১৪৭	৭২১৬

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৪৬ সাল থেকে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ-এ (পূর্বের হিন্দু কলেজ) একজন মুসলমান ছাত্রও ভর্তি হতে পারেনি।

আরও উল্লেখ্য যে, সিপাহী বিদ্রোহের (বিপ্লব) বছরে অর্থাৎ ১৮৫৬-৫৭ সালে অবিভক্ত বাংলার সরকার পরিচালিত যে ৭০টি বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ইংরেজি ও বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো সেসব প্রতিষ্ঠানে মোট ৮,১৭৫ জন ছাত্রের মাত্র ৩৪৯ জন ছিল মুসলমান এবং কোলকাতার আশেপাশে অবস্থিত সরকারের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত স্কুলে অধ্যায়নরত ২০,৬৪৭ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫৮৬ জন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড: এ আর মল্লিক এ-সময়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করে এ-মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, "হিন্দুরা সরকারের অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করতো। বিভিন্ন সরকারি কাজকর্ম দেখে একথা প্রমাণ করা যায়। যেমন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান হিন্দুপ্রধান অঞ্চলেই ছিল। বাংলার পূর্ব এবং উত্তরাঞ্চলে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল স্থাপন করা হয়েছে অনেক পরে। পশ্চিম বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অনেক আগে। ...মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল কলেজের শ্লথ প্রসারের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা এতো পিছিয়ে পড়ে।"

তৎকালীন নথিপত্র পরীক্ষা করে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। ১৮৪৭-৪৮ সালে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বছরে যে ৬১ দিন ছুটির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার মধ্যে মুসলমানদের উৎসবের জন্য একদিনও নির্দিষ্ট ছিল না। এমনকি বছরে দুইটি ঈদের দিনেও ছুটি ছিল না। এ সময় সরকারের শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য যে শিক্ষা কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তাতে ইউরোপীয়রা ছাড়া বাকি সমস্ত সদস্যই নিযুক্ত হয়েছিল কোলকাতার হিন্দু বুর্জোয়াদের মাঝ থেকে। এই হিন্দু সদস্যরাই সেদিন ছুটির তালিকা প্রণয়ন করে সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন।

বঙ্গীয় এলাকায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক 'নিষ্কর জমির বাজেয়াপ্তকরণ' এর ফলে শুধু যে বাঙালি সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা আর্থিক দিক দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তাই-ই নয়; এইসব জমির আয় থেকে পরিচালিত মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও হয় আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হলো, না হয় একের পর এক বন্ধ হয়ে গেল। যুগের পর যুগ ধরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব মুসলমান ছাত্র বিনা মাহিনা ছাড়াও বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়াশোনা করছিল, তার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সাংবাদিক ও গবেষক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মতে, "মুসলমানদের নিকট হইতে নানা ভুয়া অজুহাতে জমিদারি, তালুকদারি, লাখেরাজ সম্পত্তি ইত্যাদি কাড়িয়া লওয়ার ফলে দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎসটি বন্ধ হইয়া যায়। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে সকল ওয়াকফ্ সম্পত্তির আয়ের টাকায় পরিচালিত হইত সে সকল সম্পত্তির বেশিরভাগ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অপমৃত্যু ঘটে।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম: বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮)

গবেষক কাজী আবদুল ওদুদ-এর এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে, "মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো দশসালা বন্দোবস্ত থেকে, আর তাদের সম্ভ্রান্তদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌছালো সনদ দেখাতে না পেরে যখন তাঁদের বহু নিষ্কর জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলো।" (শাশ্বত বঙ্গ: ব্রাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩)।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম শাসন আমলে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব আদায়ের পদগুলো ছিল মুসলমানদের হাতে এবং তাঁদের অধীনে কর্মরত হিন্দু কর্মচারীরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রথম দিকেও এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয় এবং স্যার জন শোর-এর সুপারিশ মোতাবেক বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ইংরেজ কালেক্টার নিয়োগের ফলে রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদগুলো থেকে মুসলমানদের অপসারণের ফলে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। অথচ রাজস্ব বিভাগের মধ্য ও নিম্নপদগুলোতে বাঙালি হিন্দু কর্মচারীদের অবস্থানের কোনোই হেরফের হলো না। এঁরা কেবলমাত্র মুসলমান কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে ইংরেজ 'বস' লাভ করল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিজেরাই সম্পদশালী হয়ে উঠল।

লাখেরাজ সম্পত্তি হস্তান্তরের চাঞ্চল্যকর ইতিহাস

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে এদেশে লাখেরাজ বা নিষ্কর জমির ব্যাপারে এক বিরাট পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড: আজিজুর রহমান মল্লিক চমৎকারভাবে এর বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বহুদিন থেকে ভারতবর্ষের শাসনকর্তাগণ সাধারণ মানুষের বিদ্যাশিক্ষার জন্য লাখেরাজ জমি মঞ্জুর করতেন। দেবদেবীর পূজার্চনা করার জন্যও তাঁরা ভূমির ব্যবস্থা করতেন। শাসনকর্তাগণ অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী থাকতেন। মুসলমান শাসনের দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদেরকে তাদের চাকরির ভাতা ছাড়াও প্রত্যেকের জ্ঞানবুদ্ধি, সত্যতা, অন্যান্য গুণের ভিত্তিতে জায়গীর, আলতামা, আইমা এবং মদদ-ই-মাশ দেওয়া হতো। (জায়গীর এবং আলতামা সাধারণত সিভিল এবং সামরিক অফিসারকে দেওয়া হতো, আর আইমা এবং মদদ-ই-মাশ দেওয়া হতো জ্ঞানী-গুণীগণকে। জায়গীর সাধারণভাবে দিলেও

রাষ্ট্রীয় নিযুক্তির সময় উত্তরাধীকারিকেই দেওয়া হতো। .. আর মসজিদ, মাজার ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের জন্য ভূমি মঞ্জুর করা হতো)। এছাড়াও তারা নানা প্রকার বৃত্তি ভোগ করতো। শুধু মুসলমানদের জন্যই এসময় পনের প্রকারের আয়কর মওকুফের মঞ্জুরী ছিল, তিন প্রকারের ছিল হিন্দুদের... ।" (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা।)

পলাশী যুদ্ধের প্রায় ১৫ বছর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তরবারির জোরে বঙ্গীয় এলাকায় তহশিলদারি আদায়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর ভেবেছিল যে, জমির খাজনা আদায়ের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে কোম্পানির প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও কিছু লভ্যাংশ লন্ডনস্থ কোম্পানির হেড অফিসে পাঠানো সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ার ফলে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম হিসেব করে বের করলেন যে, বাংলাদেশের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ জমি একেবারে নিষ্কর অর্থাৎ লাখেরাজ হয়ে রয়েছে। এরপর থেকেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নানা বাহানায় এইসব জমি খাজনাযুক্ত করার জন্য এক "অঘোষিত যুদ্ধ" অব্যাহত রাখে। জমির প্রকৃত মালিকানা স্থিরকরণ-এর অছিলা এসব বাহানার অন্যতম। এসবের মধ্যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯নং এবং ৩৭নং আইন; ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ৮নং আইন; ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ১১নং এবং ১৩নং আইন; ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২নং আইন; ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং আইন; ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের কোর্টের নির্দেশ প্রভৃতি অন্যতম। ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে জারিকৃত এক সরকারি নির্দেশে বলা হয় যে, লাখেরাজ ভূমির মালিকানা নির্ধারণ এবং রেজিস্ট্রিকরণ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হলো। বোর্ডস কালেকশন নং ৭৪০৭৩ সূত্র মোতাবেক দেখা যায় যে, ইংরেজ সরকারের কাছে পেশ করা ২০ হাজার লোকের যুক্ত দরখাস্তের এ সময় আর ন্যায় বিচার পাওয়া যায়নি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, মাঝে মাঝে দেশের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও রোগ মহামারী, চোর, ডাকাত, গৃহবিবাদ, মারাঠা আক্রমণ এবং আভিজাত্যের বড়াই-এর দরুন মুসলমানেরা এসব দলিল-দস্তাবেজ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। কেননা অতীতে মুসলিম কিংবা বর্তমানে ইংরেজ এই দুই-ই ছিল তাঁদের দৃষ্টিতে শাসক গোষ্ঠী। তাই অনুগত প্রজা হিসেবে হিন্দুদের দলিলপত্র মোটামুটিভাবে সঠিকভাবে রক্ষিত ছিল।

অন্যদিকে এ সময় আরও দু'টি সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিল। প্রথমত দলিল রেজিস্ট্রি করতে কালেক্টারদের শৈথিল্য। প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায় যে, একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই এ সময় ৭২ হাজার নিষ্কর জমি রেজিস্ট্রির আবেদনের প্রায় ৬৭ হাজারই কেবলমাত্র নকল করে কোর্টে ফেলে রাখা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত ত্রুটিপূর্ণ বিচার পদ্ধতি। এ সম্পর্কে ডঃ এ আর মল্লিক লিখেছেন, "সনদ রেজিস্ট্রি না করার অজুহাতে অধিকাংশ মোকদ্দমা সরকারের পক্ষেই রায় হতো। কষ্ট, হয়রানি ও ব্যয় নির্বাহের ভয়ে এ সমস্ত মামলায় আপিলও করা হতো না। আর যদি কোনো ব্যক্তি আপিল করতো, তবে কালেক্টাররা শুধু রেজিস্ট্রি না করার কারণই দর্শাতো এবং বিশেষ কমিশনার কোনো প্রকার বাদ-বিচার না করেই তা মেনে নিতো।

... মুসলিম লাখেরাজদের মধ্যে যারা পল্লী এলাকায় বাস করতো, তারা এ সমস্ত আইন সম্পর্কে অনেক সময় কিছুই জানতো না। ...লাখেরাজ সম্পত্তি পূর্ব আইনানুসারে রেজিস্ট্রি করিয়ে না নিলে, তা বৈধ বলে গৃহীত হতো না এবং তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হতো। ষাট-সত্তর বছরের পূর্বের পূর্বপুরুষের ত্রুটির প্রত্যক্ষ শিকার হতো তারাই (লাখেরাজদার)। মূলত দোষ ছিল কালেক্টারদেরই। তারা বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচার করতে পারতো না এবং

কর্মচারীর অভাবে সমস্ত রেজিস্ট্রেশনও শেষ করতে পারতো না।" (ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।

তৎকালীন ভারত সরকারেরই একজন ইংরেজ সদস্য স্যার চার্লস মেটকাফ রাজস্ব নীতি সম্পর্কে ১৮২০ সালে মন্তব্য করেছেন যে, "...এ নীতি হচ্ছে অন্যায়-অবিচারের চূড়ান্ত; কোনো দেশেই এরকম নীতির নজির নেই যেখানে সমস্ত জমিজমা যাদের প্রাপ্য তাদেরকে না দিয়ে অন্য এক গোষ্ঠী বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হলো যারা নানা দুর্নীতি ও উৎকোচের আশ্রয় নিয়ে দেশের ধনসম্পত্তি চুষে খেতে চায়।"

"এটা এখন স্পষ্ট হলো যে, ১৮৫৬ খ্রি.-এর দিকে সরকারি সমস্ত বিভাগেই মুসলমানদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হলো। তাছাড়া অফিস-আদালতের ভাষার পরিবর্তন এবং চাকরি নিয়ুক্তি নীতি মুসলমানদের চরম অসুবিধের সৃষ্টি করলো এবং সরকারি চাকরিতে এভাবে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত বৈষম্য গড়ে উঠলো। বস্তুত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জুরি পর্যায়ের উচ্চ চাকরি থেকে সামান্য কেরানী অথবা ব্যবসা কেন্দ্রে নগণ্য ম্যানেজারের চাকরি পর্যন্ত হিন্দুরাই পড়ালেখার দিক থেকে প্রবলভাবে সাড়া জাগালো। সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় যেকোনো অবস্থায় থাকাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, চাকরিতে অতি সামান্য বেতন পাওয়া কখনো তাদের দুঃখের কারণ ছিল না। অবশ্য এরও একটি পরোক্ষ সুবিধে মনে করতো তারা। কারণ, মোটামুটি একটি ভালো অবস্থায় থাকতে পারলে সমস্ত পরিবারের জন্যেই তা আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল, একজন হিন্দু এভাবে তার শক্তি অনুসারে পরিবারের সমস্ত লোককেই চাকরিতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হতো।

এই অবস্থায় মুসলিম উচ্চবিত্তদের আয় কমে গেল। নবোদ্ভূত হিন্দু মধ্যবিত্তরা সরকারি সকল প্রকার চাকরি-বাক্‌রি থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে দিল। রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের ফলে নেতৃস্থানীয় মুসলিম পরিবারগুলো বিনষ্ট হয়ে গেল।"

(ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২)।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, 'অনুগত' বাঙালি বর্ণহিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করা ছাড়াও বাঙালি মুসলমানদের স্বাধীনতার মনোভাব এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমান কৃষকদের অনেকটা ব্যর্থ বিদ্রোহ-এর জের হিসেবে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও একটার পর একটা বাঙালি হিন্দু-ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেছিল। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এদেশে ইংরেজদের আগমনের প্রথম দেড়শ' বছর পর্যন্ত এঁদের নীতি মুসলিম বিদ্বেষ এবং হিন্দু পক্ষপাতিত্বের মধ্যে উলঙ্গভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইংল্যান্ডে ও তৎকালীন ভারতে নেতৃস্থানীয় ইংরেজদের বক্তব্য-বিবৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এসব সুদূর-প্রসারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

মুসলমানরা এসময়ে সন্তুষ্ট ছিল কিনা সে বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে ১৮৯৩ সালে লন্ডনে সিলেক্ট কমিটির নিকট স্যার জন ম্যাকন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন– "আমি মনে করি, মুসলিম জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ঠিক সে রকম সন্তুষ্ট নয়। কারণ তাদের স্মৃতিতে কেবল বিলুপ্ত ক্ষমতার দহন আছে, যা হিন্দুদের স্মৃতিতে নেই। ... আমাদের সঙ্গে এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনই ভারতবর্ষে আমাদের প্রধান নিরাপত্তার অবলম্বন।"

কর্নেল থমাস মনরু নামক আর এক ইংরেজ সিলেক্ট কমিটিতে বলেছেন, "হিন্দুরা কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে অসন্তুষ্ট মুসলমানরা বহুল পরিমাণে শক্তিশালী হয়েও কোনো ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না।"

ক্যাপ্টেন টি, মেকান সিলেক্ট কমিটির কাছে যে মন্তব্য করেছেন তা আরও চমকপ্রদ। "মুসলমানরাও কৃতকার্যতার বিন্দুমাত্র আশা পেলেই ইউরোপীয় যে কোনো শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কারণ তাদের বর্তমান পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করার ক্ষীণ আশা পোষণ করাও ভবিষ্যতের জন্যে সুখকর। হিন্দুরা সবসময় মুসলমানদের তুলনায় ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অধিক আস্থাবান।"

ইতোপূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে একথা সুস্পষ্টভাবে বললে যথার্থই হবে যে, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পরাশক্তি ইংরেজদের গৃহীত প্রতিটি নীতিই যেমন মুসলিম স্বার্থবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে, কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ডও তেমনি নিজেদের গোষ্ঠী ও শ্রেণী স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্পূরক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তা অন্ততঃপক্ষে বাংলার মুসলমানদের জন্য খুব একটা সুখকর হয়নি। তাহলে বিষয়টা আরও পরিষ্কারভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে সে আমলে বাংলা তথা ভারতের মুসলিম নেতৃত্ব কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা সঠিক, সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ছিল কিনা, সেটাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা অবশ্য বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

আলোচ্য সময়কালে বহুসংখ্যক কৃষক বিদ্রোহ ও সিপাহী বিপ্লব ছাড়াও শুধুমাত্র মুসলমানদের দ্বারা মূলত ধর্মীয় স্লোগান দিয়ে পরিচালিত বঙ্গীয় এলাকায় হাজী শরিয়তউল্লাহ ও পীর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন, পশ্চিম বাংলার বারাসতে তিতুমীর-এর বিদ্রোহ এবং সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীর ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ মন্তব্য করেছেন, "ইহাদেরই (ইংরেজদের) হাতে নির্যাতনের ভয়ে মুজাহিদগণ (ওহাবী) অতঃপর কখনও সাধু-ফকিরের বেশে এবং কখনও ব্যবসায়ীর বেশে প্রচারকার্য চালাতে থাকেন। তবু এদেশে ব্রিটিশ শাসন তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই।" গবেষক ও ইতিহাসবিদ ডঃ এ আর মল্লিক এসব ধর্মীয় আন্দোলনকে "ভারতীয় ইসলামে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কার আন্দোলন" নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কিত স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে বহু তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনা ছাড়াও প্রসঙ্গতভাবে নানা মূল্যবান পুস্তকাদি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

বিশিষ্ট গবেষক কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন, "মুসলমানেরা যে দুটি কারণে ইংরেজি শিখতে এগুলো না, তার প্রথমটি ধর্মনাশভয়—এ সময়ে দেশে খ্রিস্টান করবার ও হবার হিড়িক পড়ে যায়—কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণের চাইতে অনেক বড়, সেটি—নব রাজশক্তির প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা দীর্ঘ ওহাবী বিদ্রোহের ভিতরে রয়েছে যার সুস্পষ্ট পরিচয়। ... এর সঙ্গে মুসলমান জগতে মুস্তফা কামালের (তুরস্কের) আবির্ভাবের কথাও স্মরণীয়। ওহাবীদের আদিম ইসলামে প্রত্যাবর্তনবাদ আজো যত প্রবলই হোক কামালের বিজ্ঞানবাদ ও জাতীয়বাদের অপূর্ব সাফল্য যে তার যোগ্য প্রভাব বিস্তারে অপারগ হবে না, এ আশা করা যায়। (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)।"

অবশ্য এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত গবেষণার পূর্বে কোনো রকম সুস্পষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব না হলেও এটুকু বলা যায় যে, বঙ্গীয় এলাকায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে নিজেদের শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতাবিহীন অবস্থায়

ধর্মনিরপেক্ষতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে পরাশক্তির সহযোগী হিসেবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাষা, কৃষ্টি ও রীতিনীতিকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করে 'বাঙলার রেনেসাঁ' নামীয় স্লোগানে সোচ্চার হয়েছিল। পক্ষান্তরে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ১৮৭০ সাল নাগাদ ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আব্দুল লতিফ, বিচারপতি আমীর আলী, মীর মোশাররফ হোসেন, রেভারেন্ড জেমস লং প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়। ডক্টর এ আর মলিক-এর মন্তব্য আবারো প্রণিধানযোগ্য যে, "মুসলমানদের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্লথ অভ্যুত্থান। অথচ আধুনিককালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই একটি জাতির সকল প্রকার উন্নতির সোপান। ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাবার আর কেউ রইল না। ফলে নতুন সরকারের (ইংরেজের) কাছে থেকে তারা কোনো উপকারও আদায় করে নিতে পারল না।"

ওহাবী আন্দোলনের গোড়ার ইতিহাস

তা'হলে এই উপমহাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত ইসলামী কট্টর শরিয়ত পন্থীদের সংস্কার আন্দোলনগুলোর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়েক দশক ধরে যে ওহাবী আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের বঙ্গীয় এলাকা থেকে শুরু করে সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এক্ষণে আলোচনার সুবিধার্থে সেই ওহাবী আন্দোলনের গোড়ার কথা বলতে হয়। ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব-এর ঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি। (কোনো গবেষকের মতে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম) তবে তিনি ছিলেন সৌদি আরবের নজদ প্রদেশের জনৈক সম্ভ্রান্ত সরদারের পুত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবদুল ওহাব মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থানসমূহে অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে খুবই রুষ্ট হন এবং এর প্রতিকারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অধ্যয়নের পর বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণকালে প্রকৃত ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করেন এবং তীব্র ভাষায় শাসক কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মুখর হন।

এ সময় আরবের অধিকাংশ এলাকাই তুরস্কের সুলতানের (খলিফা) অধীনে ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই আবদুল ওহাবের এ সব বক্তব্য তুর্কী সুলতানের জন্য খুবই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অচিরেই তাঁকে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই-ই নয়, তুর্কী শাসন কর্তৃপক্ষ আবদুল ওহাবকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সিরিয়ার দামেস্ক শহর থেকে বহিষ্কার করে। সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মতে, "তিনি এ-স্থান, সে-স্থান পরিভ্রমণে বহুদিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেরইয়ার সরদার মোহাম্মদ ইবনে সৌদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারই সাহায্যে তিনি বেদুঈনদের সমবায়ে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বাহিনী গঠনপূর্বক প্রথম সুযোগে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দেন।

...এরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে মরু অঞ্চলে বিশেষ করিয়া নজ্‌দ প্রদেশে আবদুল ওহাবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। মোহাম্মদ ইবনে সৌদের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়া আবদুল ওহাব সমগ্র নজ্‌দের শাসন ক্ষমতা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে স্বয়ং সর্বময় কর্তা হইয়া রহিলেন। পবিত্র কোরআনে নির্দেশিত নিয়ম-কানুন অনুসারে এই নতুন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা রচিত ও প্রবর্তিত হয়।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৭৮)

বাগদাদের তুর্কী শাসনকর্তা নজ্‌দ-এর আবদুল ওহাবকে দমন করার লক্ষ্যে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে তুর্কী বাহিনী পরাজিত হলে আবদুল ওহাব একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই আল্লামা আবদুল ওহাব ইন্তেকাল করেন। কিন্তু এঁর অনুসারীরা অচিরেই আরও শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। ১৭৯১ সালে ওহাবীরা পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ সফলকাম হতে পারেনি। ১৭৯৭ সালে এঁরা বাগদাদ আক্রমণ করে ইরাকের একটি এলাকা নজ্‌দ-এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তুর্কীর সুলতান এই ওহাবীদের কার্যকলাপে এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন যে, এঁদের হজ্জ্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করেছিলেন।

এখানে আরও একটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল ওহার-এর অনুসারীরা সব সময়েই নিজেদের মুজাহিদ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজরাই এঁদের 'ওহাবী' নামকরণ করেছে। ১৮০১ সালে এ ধরনের প্রায় লক্ষাধিক মুজাহিদ পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে। কয়েক মাসব্যাপী এই যুদ্ধে মক্কা নগরী মুজাহিদদের দখলে আসে এবং মক্কায় তুর্কী শাসনের বিলুপ্তি ঘটে। ১৮০৩ সাল নাগাদ মুজাহিদরা পবিত্র মদিনা নগরীর উপর কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। কিন্তু মুজাহিদরা কবরপূজা ও এ ধরনের অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধের লক্ষ্যে এসব যুদ্ধের সময় মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত দরবেশ ও পীর-ফকিরদের কবরের উপর নির্মিত কতিপয় সৌধ ভেঙে দেয়। "এমনকি হযরত মোহাম্মদের (দঃ) রওজার একটা অংশ তাঁহাদের হাত হইতে সে সময় রক্ষা পায় না।"

এদিকে পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরী দু'টি হস্তচ্যুত হওয়ায় তুর্কী খলিফা খুবই রাগান্বিত ছিলেন। তাই ওহাবীরা (মুজাহিদ) হযরত মোহাম্মদের (দঃ) রওজার অংশবিশেষ ভেঙে দিয়েছে... এই কথাটা এবং অন্যান্য কয়েকটি অভিযোগ তুর্কীরা সমগ্র বিশ্বে বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে রটিয়ে দিল। এরই দরুন ১৮০৩ থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরবের বাইরে থেকে হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা দারুণভাবে হ্রাস পেল।

এ রকম এক পরিস্থিতিতে মিসরের শাসনকর্তা (খেদিব) মোহাম্মদ আলি পাশা তুরস্কের সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং এঁদেরই সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে কন্সটান্টিনোপল-এর (ইস্তাম্বুল) নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত লড়াই-এ মুজাহিদরা পরাজিত হয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে মিসরীয় বাহিনীর সেনাপতি স্কটিশ টমাস কীথ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদিনা দখল করে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি কীথ মক্কা নগরীও অধিকার করে নেয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে মুজাহিদদের সামরিক শক্তি একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর নজ্‌দ প্রদেশকে কেন্দ্র করে আবদুল ওহাব-এর অনুসারী মুজাহিদরা শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারে লিপ্ত থাকে।

অন্যদিকে ইসলামী মুল্যবোধ এবং প্রকৃত ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে আল্লামা আবদুল ওহাব যে ব্যাখ্যাদান করেছিলেন, সেই দর্শন অচিরেই ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর কৃতিত্বের দাবিদার যথাক্রমে হাজী শরিয়তউল্লাহ ও তদীয় পুত্র মুহম্মদ মহসীন ওরফে পীর দুদু মিয়া, নিসার আলী ওরফে তীতুমীর এবং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী।

হাজী শরিয়তউল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন

প্রথমেই হাজী শরিয়তউল্লাহর কথা বলতে হয়। এঁর জন্ম ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর অঞ্চলের এক অজ্ঞাত পরিবারে। সম্প্রতি এরই নামানুসারে ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চলের একটি নতুন জেলার নামকরণ হয়েছে শরিয়তপুর। হাজী শরিয়তউল্লাহ প্রবর্তিত মতবাদের নাম ফারায়েজী।

যদিও ওহাবী মতবাদের মূল আদর্শের সঙ্গে এই মতবাদের বিশেষ কোনো তফাৎ নেই, তবুও ফারায়েজী সম্প্রদায় এই সত্যকে স্বীকার করতে চান না । বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, হাজী শরিয়তউল্লাহ দুইবার পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য গমন করেছিলেন এবং প্রায় ২০ বছরকাল আরবদেশে অবস্থান করেন। এই সময়েই আরবের নজদ প্রদেশে কট্টর রক্ষণশীল ওহাবী নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি দারুণভাবে প্রভাবান্বিত হন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর হাজী শরিয়তউল্লাহ এদেশকে 'দারুল হরব' অর্থাৎ বিধর্মীর এলাকা ঘোষণা করে এ মর্মে নির্দেশ জারি করলেন যে, অতঃপর ফারায়েজীরা দুই ঈদের এবং শুক্রবার জুম্মার নামাজ আদায় করতে পারবেন না। হাজী সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামের এসব ধর্মীয় রীতিনীতি কেবলমাত্র মুসলিম শাসিত রাজ্যগুলোতে উদযাপিত হতে পারে, বিধর্মীর এলাকায় নয়। তিনি কঠোর নির্দেশ দিলেন যে, পবিত্র কোরানকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং এর বাইরের সবকিছুই বর্জনীয়। হাজী সাহেব মহররম উৎসব উদ্যাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তিনি 'পীর-মুরিদ' জাতীয় শব্দগুলো উঠিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক এবং শিষ্য শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই মুক্তবুদ্ধির সুফী মতাবলম্বীদের সঙ্গে ফারায়েজীদের সংঘাত দেখা দিল। অন্যদিকে তিনি ফারায়েজীদের জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় দক্ষিণবঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার প্রায় এক-ষষ্ঠমাংশ মুসলমান এই মতবাদে আস্থা স্থাপন করে।

হাজী শরিয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মুহম্মদ মোহসীন ওরফে পীর দুদু মিয়া তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। এঁর জন্ম ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ইনি পিতার মতাদর্শের বেশ কিছুটা সংশোধন করেন এবং অনেক সময় রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে পীর সাহেব ঘোষণা করেন। পিতা শরিয়তউল্লাহর মতো তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব না থাকলেও পীর দুদু মিয়া অভূতপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এঁদের কর্তব্য ছিল স্বীয় অনুসারীদের সুসংবদ্ধ করা এবং ফারায়েজী সম্প্রদায়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা আদায় করা। তাই এরপর এই আন্দোলন আর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত বাংলার মুসলমান কৃষকদের এ আন্দোলন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলো এবং এই আন্দোলনের মধ্যে বেশ কিছুটা জমিদার বিরোধী ও নীলকর-বিরোধী চরিত্র প্রকাশ পেল। কিন্তু অনেকেই এ মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, পীর দুদু মিয়া প্রজাদের তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত করতে বাধ্য করতেন এবং অস্বীকার করলে মারধোর করতেন। এছাড়া সবার নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের জন্যও বল প্রয়োগ করা হতো। তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল শরিয়তপুরের বাহাদুরপুর নামক স্থানে এবং যেকোনো ধরনের কাজ করতে রাজি এরকম শিষ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় কয়েক লাখের মতো। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ফারায়েজীরা পানচুর নামক স্থানে অবস্থিত ডানলোপ নামক এক নীলকর সাহেবের ফ্যাক্টরি প্রতিশোধমূলক আক্রমণে ধূলিসাৎ এবং এর ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ফলে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ফারায়েজীদের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে। এরপর থেকে দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দায়ের করা হয় এবং এসব মামলা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এমনকি পীর সাহেবকে কিছুদিনের জন্য আলীপুর জেলে রাজবন্দি হিসেবেও আটক রাখা হয়। পীর দুদু মিয়া অগণিত মামলা-মোকদ্দমায় জর্জরিত হয়ে ভাগ্য

বিড়ম্বিত হন বলা চলে। তাঁর ইন্তেকালের পরেই কট্টর শরিয়তপন্থী ফারায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, হাজী শরিয়তউল্লাহ এবং তদীয় পুত্র পীর দুদু মিয়া কর্তৃক প্রবর্তিত এই 'ফারায়েজী আন্দোলন' সম্পর্কে আশানুরূপ গবেষণা হয়নি। তবে পীর দুদু মিয়া সম্পর্কে ড: এর আর মল্লিকের মত হচ্ছে "কিন্তু তাঁর কোনো কার্যকলাপের মধ্যে আমরা এমন কোনো নিদর্শন পাইনে, যেখানে তিনি ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে মুসলিম শাসন প্রবর্তন করার কথা বলেছেন অথবা কোথাও তাঁর সেভাব প্রকাশ পেয়েছে।"

দক্ষিণ বাংলায় যখন হাজী শরীয়তউল্লাহ এবং তদীয় পুত্র পীর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে রক্ষণশীল শরিয়তপন্থী ইসলামের আদর্শে ফারায়েজী আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করছিল এবং উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওহাবী আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু করেছিল, তখন প্রায় একই সময়ে পশ্চিম বাংলার বারাসত অঞ্চলে নিসার আলী ওরফে তিতুমীর নামে আর এক দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তিতুমীর হজ্ব করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করলে সেখানেই ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিতুমীর ইসলাম ধর্মের সংস্কারক হিসেবে স্বীয় মতাদর্শ প্রচার শুরু করেন এবং অচিরেই বারাসত-এর নারকুলবাড়িয়া অঞ্চলে মুসলমান কৃষক ও তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি উপমহাদেশের অন্যান্য ওহাবী নেতাদের চেয়েও রক্ষণশীল ছিলেন বলা যায়। তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের নিয়মিত নামাজ আদায় ছাড়াও দাড়ি রাখা ও স্বতন্ত্র ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। এমনকি বিধর্মীতো দূরের কথা স্বীয় মতাবলম্বী ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে পর্যন্ত পানাহার বর্জনীয় বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনিও অন্যান্য ওহাবীদের মতো মহররম উৎসবের নিন্দা এবং পীরের মাজার পূজার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কোনো কোনো গবেষকের মতে কঠোরভাবে এসব ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার দরুন তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা সীমিত ছিল এবং ইংরেজ ও হিন্দুদের বিরোধিতা ছাড়াও এঁরা সুফী মতাদর্শী মুসলমানদেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

তিতুমীর-এর অতুলনীয় দেশপ্রেম ইতিহাসের বিরল ঘটনা

নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এবং তাঁর অনুসারীদের কর্মকাণ্ড ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরকাল সময়ের মধ্যে বিপুলভাবে এতদঞ্চলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এঁরা হিন্দু জমিদার এবং নীলকর সাহেবদের ভয়াবহ অত্যাচারের বিরুদ্ধে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তা নিশ্চিতভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। এমনকি জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপগুলোও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, স্বীয় মতাদর্শের প্রতি এঁদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও অবিচল আস্থা এবং অতুলনীয় সাহসিকতা ও দেশপ্রেম ইতিহাসে বিরল।

এই আন্দোলন সম্পর্কে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ওয়ালিউল্লাহর মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'সীমান্তে মোজাহিদ বাহিনী কর্তৃক পেশোয়ার দখলের (১৮৩০ খ্রি.) সংবাদ বাংলায় পৌছিলে, তিতুমীরের অনুচরদের সাহস অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়।

গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজও জোরেশোরে চলিতে থাকে। পাঞ্জাবী মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার যেভাবে ব্রিটিশকে বাদ দিয়ে সৈয়দ আহমদকে শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করিয়াছিল, বাংলায় হিন্দু জমিদারদের ঔদ্ধত্যও অনুরূপভাবে তিতুমীরকে ব্রিটিশের পরিবর্তে তাহাদের হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রথমে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য করে।'

জমিদারদের অনুরোধে ইংরেজ সরকার প্রেরিত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী দুই দফায় তিতুমীরের অনুসারীদের নিকট পরাজিত হলে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা মিলিশিয়া'র মেজর স্কট একদল অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে তিতুমীরকে দমনের উদ্দেশ্যে বারাসত অভিমুখে রওয়ানা হয়। ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। বাঁশের কেল্লার এই যুদ্ধে তিতুমীরসহ ৫০ জন নিহত হন এবং গ্রেফতারের সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। মেজর স্কট-এর ইংরেজ বাহিনী শহীদ তিতুমীর ও নিহত অন্যদের লাশ পুড়িয়ে ফেলে। প্রাপ্ত নথিপত্র মোতাবেক দেখা যায় যে, বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং ১২৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বিচার চলাকালীন সময়ে জেলখানায় চারজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে তিতুমীরের অনুসারীদের ঘরবাড়ি এবং সহায়-সম্পত্তি সবকিছুই ছিনিয়ে নেয়া হলে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এখন ভারতে ওহাবী আন্দোলনের গোড়ার কথা বলতে হলে প্রসঙ্গত দাক্ষিণাত্য এবং মধ্য ভারতীয় অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পিণ্ডারীদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। পিণ্ডারীদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সময় পিণ্ডারীরা আহমদ শাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে মারাঠাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল এবং মারাঠাদের মতোই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোপূর্বে দাক্ষিণাত্যে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এই পিণ্ডারীরা হীরু ও বরুণ নামে দুই ভ্রাতার নেতৃত্বে মারাঠাদের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ করে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে একই বছরে পিণ্ডারীদের নেতা হীরু ও বরুণ উভয়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। ফলে আমীর খান, করিম খান ও চিতু খান—এই তিনজন পিণ্ডারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মূলত নিরপরাধ পথচারী ও তীর্থ যাত্রীদের নির্বিচারে হত্যা এবং আকস্মিক আক্রমণে জনপদ লুণ্ঠনই এদের পেশা ছিল। ইতোমধ্যে মারাঠা শাসক দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সঙ্গে হায়দ্রাবাদের নিজামের যুদ্ধে করিম খান মারাঠাদের পক্ষে অপরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করলে, তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই করিম খান ভূপালের নবাব পরিবারে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সেখানেই এক স্বাধীন নৃপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু করিম খান স্বীয় পিণ্ডারী বাহিনী নিয়ে মধ্য ভারত ও রাজপুতনা অঞ্চল ছাড়া ইংরেজ এলাকাতেও লুঠতরাজ অব্যাহত রাখে। এ সময় পিণ্ডারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশীয় নৃপতিরা ইংরেজদের শরণাপন্ন হন। ইংরেজরাও ভারতে তাঁদের রাজ্য আরও বিস্তারের লক্ষ্যে এ রকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল।

১৮১৫ সালে ইউরোপে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে সম্পূর্ণ ভারত উপ-মহাদেশকে পদানত করার জন্য ইংরেজরা মনস্থ করে। তখন এদেশে ইংরেজ রাজ প্রতিনিধি ছিলেন মার্কুইস অব হেস্টিংস। এঁরই পরিকল্পনা মোতাবেক ১৮১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে গুর্খা শক্তিকে চূর্ণ করা হয়। এরপর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত মারাঠা নেতা পেশোয়াকে পেনশন প্রদান করে কানপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরাজিত পিণ্ডারী নেতা আমীর খানকে রাজপুতনার অন্তর্গত ক্ষুদ্র টংক রাজ্যের নবাবী দিয়ে নিশ্চুপ করে রাখা হয়। প্রায় একই সময়ে গাজীপুরে নজরবন্দি হিসেবে অবস্থানকালে পিণ্ডারীদের অন্যতম নেতা ওয়াসিল মোহাম্মদ বিষপানে আত্মহত্যা করে।

এদিকে আর একজন স্বাধীনচেতা পিণ্ডারী নেতা চিতু খান বিতাড়িত অবস্থায় মধ্যভারত অঞ্চলে পলায়নকালে নর্মদা নদীর তীরে বাগলা উপত্যকার জঙ্গলে ব্যাঘ্রের আক্রমণে নিহত হন। উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় পিণ্ডারী নেতা করিম খান সেনাপতি স্যার ম্যালকম-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাঁকে গোরক্ষপুর জেলায় বার্ষিক ২০ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দানপূর্বক স্বাভাবিক জীবনযাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে ১৮১৮ সাল নাগাদ মূলত পেশাদার নরহত্যাকারী পিণ্ডারীরা নিশ্চুপ হয়ে যায়।

ভারত উপমহাদেশে ওহাবী আন্দোলনের গোড়াপত্তন

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন, "যেই পরিবারে তাঁহার জন্ম, তাহার সহিত পিণ্ডারী সরদার আমীর খানের আত্মীয়তার বন্ধন ছিল বলে অনেকের ধারণা।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : পৃ: ৪৭) কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সৈয়দ ব্রেলভী প্রথম জীবনে সরদার আমীর খানের দলভুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে তিনি অসি বিদ্যা ও অশ্ব চালনায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন। উপরন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা-আক্রোশের সৃষ্টি হয়।

এদিকে সরদার আমীর খান ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বেরেলী থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গমন করে তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা শাহ আবদুল আজিজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি রোহিলা খণ্ডসহ উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করেন এবং বহু ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা দান করেন। ১৮১৮ সালে তিনি পাটনায় একটি শক্তিশালী প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। অচিরেই তিনি হজ্ব গমনের উদ্দেশ্যে কাবার পথে কোলকাতায় আগমন করলে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়। তিনি কোলকাতা থেকে বিপুলসংখ্যক অনুচর নিয়ে ১৮২২ সালে হজ্ব যাত্রা করেন। এরকম তথ্য রয়েছে যে, সে সময় শুধু তাঁর অনুচরদের জন্য সবশুদ্ধ ১১টি জাহাজ ভাড়া করতে হয়েছিল।

পবিত্র হজ্ব যাত্রার প্রাক্কালে সৈয়দ সাহেব এ মর্মে সংবাদ লাভ করেন যে, বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলে সেখানকার শিখ শাসন কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বাধাদান ছাড়াও নানা ধরনের অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছে। তিনি বিধর্মী শিখদের এ ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে অর্থ এবং বিরাট সংগঠনের। ফলে তিনি পাটনা কেন্দ্রের দুইজন বিশ্বস্ত অনুসারী শাহ ইসমাইল ও আবদুল হাইকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত করে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার অব্যাহত রাখা ছাড়াও অত্যন্ত সঙ্গোপনে জেহাদের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। পরবর্তীকালে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অত্যন্ত গোপনে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি সংগঠন সৃষ্টি এবং বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য মুজাহিদ রিক্রুট ও নিয়মিতভাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

গবেষক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মতে পবিত্র হজ্ব পালনের পর সৈয়দ সাহেব মধ্যপ্রাচ্যে বহু দেশ সফর করেন এবং একমাত্র কনসতান্তিনোপলেই (ইস্তাম্বুলেই) শিষ্য ও দর্শনার্থীদের নিকট থেকে নয় লক্ষাধিক টাকা নজরানা পেয়েছিলেন। এ সময় তিনি মরহুম আল্লামা আবদুল ওহাব-এর বেশ ক'জন অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর চিন্তাধারা পরিধির ব্যাপ্তি ঘটে। অতঃপর সৈয়দ আহমদ ১৮২৩ সালের অক্টোবরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে

দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইসলামী দর্শনের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তাকে "তরীক-ই-মোহাম্মদিয়া" বা 'মোহাম্মদের নীতি" বলে অভিহিত করেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবার তাঁর মুখে উচ্চারিত স্লোগান হচ্ছে "মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম।" অর্থাৎ খ্রিস্টান ইংরেজদের অধীনে ভারতবর্ষ হচ্ছে "দারুল হরব"—বিধর্মীর এলাকা। তাঁর এই মতবাদ-এর আরও ব্যাখ্যাদান করলে বলতে হয় যে, যতদিন পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ খ্রিস্টানদের পদানত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই "দারুল হরব"-এ ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণের পর দ্বিতীয় দফায় কোলকাতা পর্যন্ত আগমন করেন। প্রতিটি এলাকাতেই তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন অত্যন্ত সঙ্গোপনে, বিশেষ করে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ অথবা 'দারুল হরব' এই হিন্দুস্থান থেকে হিজরতের আহবান জানালেন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি সবার অলক্ষ্যে এই জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সদলবলে ইংরেজদের করদ রাজ্য টংক-এ উপস্থিত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তার সক্রিয় সমর্থনে দুর্গম এলাকার মাঝ দিয়ে সৈয়দ আহমদ তাঁর সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আফগান এলাকায় গিয়ে পৌছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মুসলমানদের সমর্থনে এখান থেকেই শিখ নেতা রণজিৎ সিংহ-এর শাসনাধীন পাঞ্জাব আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করা।

সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সীমান্ত প্রদেশের আফগান এলাকায় পৌছানোর পর তাঁর প্রতিনিধিরা যেভাবে বাংলা ও বিহার এলাকা থেকে অর্থ ও নতুন রিক্রুট করা মুজাহিদদের ট্রেনিং প্রদানের পর নিয়মিতভাবে প্রেরণ করেছে তা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এজন্য পাটনা শহরেই প্রতিষ্ঠিত হলো ওহাবীদের প্রধান কেন্দ্র আর দ্বিতীয় কেন্দ্রটি গড়ে উঠল মালদহে। এ সময় মওলবী বেলায়েত আলী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশাল এলাকায় এবং পাটনার এনায়েত আলী পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া, রংপুর এলাকায় কট্টর রক্ষণশীল ওহাবী মতাদর্শ প্রচার ছাড়াও অসংখ্য বাঙালি মুসলমান যুবককে মুজাহিদ হিসেবে সংগ্রহ করেন।

অনেক গবেষক দ্বিমত পোষণ করলেও এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক ডব্লিউ হান্টার রচিত "আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস" গ্রন্থে বর্ণিত মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

"পূর্ববংগের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওহাবী প্রচারকেরা সাধারণত বিশ বৎসরের কম বয়সের শতশত সরলমতি যুবককে অনেক সময় তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে, নিশ্চিত প্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্র্য ও শোক প্রবিষ্ট করিয়েছে, আর আশা-ভরসাস্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা স্থায়ী দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওহাবী পিতার বিশেষ গুণবান অথবা বিশেষ ধর্মপ্রাণ পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না কোন্ সময়ে তার পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে। এইভাবে যেসব যুবককে উধাও করা হয়েছে তাঁদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে।" (অনুবাদ : আবদুল ওদুদ)

অচিরেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় ওহাবী শিবিরগুলোতে নিদেনপক্ষে ১২ হাজার মুজাহিদ জমায়েত হয় এবং প্রতিনিয়তই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রিটিশ কূটনীতিক মি: ওয়েড এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সৈন্যবাহিনীতে অসংখ্য

লোক যোগদান করে সত্যের পথে (জেহাদ) শহীদ হবার যে আগ্রহ দেখায় তা' অবিস্মরণীয়। (বেঙ্গল পলিটিক্যাল কনসালটেশন্স : ৩০শে মার্চ, ১৮২৭)। শিখ নেতা রণজিং সিং-এর মতে, সৈয়দের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারের মতো।

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। এই প্রচারপত্রে পাঞ্জাব এলাকায় মুসলমানদের ওপর শিখদের ভয়াবহ অত্যাচারের বর্ণনা প্রদানপূর্বক প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সৈয়দ আহমদ-এর পতাকাতলে একত্র হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আলোচ্য প্রচারপত্রের নামকরণ ছিল, 'তার্গের আল জেহাদ।' (জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল: ১৮৩২ খ্রি. পৃষ্ঠা ৪৮২)।

শিখ-ওহাবী যুদ্ধের সূত্রপাত

সীমান্ত এলাকায় ওহাবীদের দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের সংবাদে লাহোরে শিখ শাসকরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে এবং এদের দমনের উদ্দেশ্যে সেনাপতি বুধ সিং-এর নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। ফলে শিখ সৈন্যদের সঙ্গে ওহাবীদের আকুরা নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সেনাপতি বুধ সিং বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, অতঃপর ওহাবীদের সঙ্গে যোগদানকারী পাঠান উপজাতিরা ছাড়াও সৈয়দ-এর হিন্দুস্থানী অনুসারীরা বেশ কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলার পরিচয় দেয় এবং এদের নিয়ন্ত্রণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এতদসত্ত্বেও সৈয়দ আহমদ-এর শক্তি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সীমান্ত প্রদেশ এলাকায় তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেন এবং স্বয়ং খলিফা নিযুক্ত হন। এই ঘোষণায় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আনুগত্য স্বীকার করা সমগ্র মুসলিম সমাজের অবশ্য করণীয় এবং এর বিরোধীরা বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হয়। অচিরেই বিভিন্ন মসজিদে সৈয়দ সাহেবের নামেই জুম্মার নামাজের খোত্‌বা পাঠ শুরু হলো।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওহাবীরা বিচ্ছিন্নভাবে গোটা কয়েক যুদ্ধের পর পেশোয়ারস্থ শিখদের নিযুক্ত গভর্নর ইয়ার মোহাম্মদকে হত্যা করে। অতঃপর পরবর্তী গভর্নর হিসেবে ইয়ার মোহাম্মদের ভ্রাতা সুলতান মোহাম্মদ দায়িত্ব গ্রহণ করলে ওহাবীরা ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে প্রচণ্ড লড়াই-এর পর পেশোয়ার দখল করে। ঐতিহাসিকদের মতে 'মহিয়ান'-এর এই যুদ্ধে বাঙালি মুজাহিদরা অপূর্ব শৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এত বড় বিজয়ের পর সৈয়দ আহমদ পেশোয়ারে অবস্থান করে তাঁর শক্তি সুসংগঠিত না করেই প্রিয় শিষ্য মাজহার আলীর নিকট পেশোয়ারের দায়িত্ব অর্পণ করে পার্বত্য পঞ্জতর এলাকায় গমন করেন। ফলে শিখ সমর্থিত সুলতান মোহাম্মদ পাল্টা আক্রমণ করে পেশোয়ারের সমস্ত ওহাবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এতদিন পর্যন্ত মিত্রভাবাপন্ন ও আশ্রয়দাতা উপজাতি মুসলমানরা এ সময় ওহাবীদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। জেহাদের জন্য কৃষকরা তাদের আয়ের এক-দশমাংশ আল্লাহর ওয়াস্তে দান করতে আপত্তি না করলেও বিবাহযোগ্য কন্যাদের কোনোরকম টাকা-পয়সা ছাড়াই সৈয়দ আহমদ-এর উত্তর ভারতীয় অনুসারীদের নিকট বিবাহ দেওয়ার বাধ্যবাধকতায় এদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। উপজাতীয় অভিভাবকদের কাছে বিষয়টা বেশ 'অপমানকর' ও 'ন্যক্কারজনক' বলে বিবেচিত হলো। প্রায় একই সময়ে শিখ নেতা রণজিৎ সিং-এর পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ উপজাতি নেতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এমনকি এক শ্রেণীর ভাড়া করা মোল্লা-মওলবীরা উপজাতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই মর্মে রটনা করলো যে, 'সৈয়দ আহমদ হচ্ছেন আসলে ইংরেজদের অনুচর এবং এজন্যই বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও ওহাবীরা খ্রিস্টান ধর্মীয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি।'

পেশোয়ার হস্তচ্যুত হওয়া ছাড়াও উপজাতীয়দের মধ্যে বিরূপ মনোভাব ক্রমবর্ধমানরূপে দেখা দেওয়ায় এবং অন্যদিকে নানা কারণে উত্তর ভারতের সঙ্গে সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সৈয়দ আহমদ এ সময় বাকি অনুসারীদের নিয়ে আরব ভূ-খণ্ডে হিজরত করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কাঘান উপত্যকা দিয়ে মোজাফফরাবাদে পৌঁছালে সেনাপতি খড়্গ সিং-এর নেতৃত্বে এক শিখ বাহিনী ওহাবীদের আক্রমণ করে। স্থানীয় মুসলমানরা এ যুদ্ধে ওহাবীদের পক্ষে লড়াই করায় শিখ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। এই পরাজয় সংবাদ লাহোরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে শিখ শাসনকর্তা রণজিৎ সিং আটক দুর্গে অবস্থানরত রাজা শের সিংকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুনরায় ওহাবীদের আক্রমণের নির্দেশ দেন।

১৮৩১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত বালাকোট নামক স্থানে শিখ ও ওহাবীদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন, "...সৈয়দ আহমদ তাঁহার মূল বাহিনীর জন্য সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় সেস্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাজকুমার শের সিংহ ইহার কিছুই জানিতেন না। কিন্তু রণজিং সিংহের বিঘোষিত পুরস্কারের লোভে জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান তাঁহার উপস্থিতির কথা গোপনে শিখ সেনাপতির কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।... সৈয়দ আহমদ স্বয়ং তাঁহার প্রধান শিষ্য মওলানা ইসমাইল ও বেশির ভাগ অনুচরসহ এই যুদ্ধে শহীদ হন। যুদ্ধ অবসানের কয়েক ঘণ্টা পর মূল মুজাহিদ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখে শিখেরা তাহাদের ঘাঁটিতে ফিরিয়া গিয়াছে।

"সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের ন্যায় উপজাতীয় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ামাত্রই অর্থলোভী সরদার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা-মওলবিগণের প্ররোচনায় ধর্মান্ধ লোকেরা মুজাহিদ বাহিনীর হতাবশিষ্ট লোকজনকে যত্রতত্র আক্রমণ করিতে থাকে। ফলে ইহাদের হাতে বহু মুজাহিদ প্রাণ হারান। স্বভাবতঃই এ সময় দলের মধ্যে ভাঙন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। উপজাতীয়দের বিরুদ্ধাচরণের দরুন পূর্ব এবং উত্তর ভারতের মুজাহিদগণের অনেকের মনে জেহাদের পরিণতি সম্পর্কেও সংশয় জাগিয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক লোক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। জেহাদে একবার বহির্গত হইলে মনস্কাম পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন অধর্মাচরণেরই সামিল, ইহাই ছিল বাঙালি মুজাহিদগণের বিশ্বাস। তাই তাঁহাদের অধিকাংশকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা যায় নাই।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম: ১৯৭৮ : পৃ: ৫১-৫৩)।

নৃশংসভাবে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে শিখরা হত্যা করল

বালাকোটের এই লড়াই সম্পর্কে গবেষক ডক্টর মল্লিক লিখেছেন, "...বালাকোটের প্রধান প্রধান প্রবেশপথ এবং সেতুগুলো পাহারাদানের ব্যবস্থা করা হলো, যাতে শিখরা কোনোক্রমেই প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু পাঠান পাহারাদাররা শিখদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।...এই যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল এবং ওহাবী মতবাদের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হতাহত হন। সৈয়দ আহমদের মৃতদেহ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ১৮৩১ সালের ২০শে জুনের ইন্ডিয়া গেজেট অনুসারে সৈয়দ আহমদের শবদেহ যে শের সিং-এর সামনে শনাক্ত করা হয়েছিল তার উল্লেখ আছে এবং শিখরা যে তাঁর মস্তক এবং হস্ত কেটেছিল এবং অগ্নিদগ্ধ করে ফেলতে চেয়েছিল তারও উল্লেখ আছে।

রাজা এমন নৃশংস কাজ করতে দেননি। শবদেহ শালু কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দাফন-কাফন করে সম্মানের সাথে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

এস এম লতিফ (ষাট বছর পর লিখেছেন)-এর অভিমত হচ্ছে "সৈয়দ আহমদ এবং শাহ ইসমাইলের মস্তক ছেদন করে রণজিৎ সিং-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন ওয়েড যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারীর নিকট তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, সৈয়দের শবদেহ শনাক্ত করে শিখরা অগ্নিদগ্ধ করে ফেলেছে।...শিখরা যে তার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে পারে, সেসব দিক বিচার করে ক্যাপ্টেন ওয়েড-এর অভিমত স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।" (পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬: ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান : ১৯৮২)।

এখানে দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে ওহাবী আন্দোলন মূলত বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল। দ্বিতীয়ত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বালাকোটে সৈয়দ ব্রেলভী এবং শাহ ইসমাইল-এর ইন্তেকালের পরেও ওহাবী আন্দোলন দমিত হয়নি। এই আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে পরবর্তী আরও ৪০ বছর অর্থাৎ ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ওহাবী আন্দোলন এবার বিধর্মী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, লাহোর-কেন্দ্রিক শিখ নেতা রণজিৎ সিং-এর ১৮৩৯ সালে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী শিখদের সঙ্গে একটা সমঝোতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং ওহাবী ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষেরই শক্তি ক্ষয় হোক—এটাই ইংরেজদের কাম্য ছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৮৩১ সালে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদ-এর ইন্তেকাল এবং ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর লর্ড ডালহৌসী একে একে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকা ইংরেজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

এদিকে দ্বিতীয় দফায় রক্ষণশীল ওহাবীরা আটক দুর্গ থেকে ৪০ মাইল উত্তরে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে মহাবন পর্বতের পাদদেশে সিতানা নামক স্থানে শাহ জামিন শাহ-এর নেতৃত্বে আস্তানা স্থাপন করেন এবং পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেন। প্রধানত জামিন শাহের প্রচেষ্টায় ওহাবী এবং উপজাতি নেতৃবৃন্দের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়। এর মূল কারণ হিসেবে এটুকু বলা যায় যে, ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর ইংরেজরা পাঞ্জাব এলাকা দখল করায় সিতানার ওহাবী সম্প্রদায় এবং ইংরেজদের অবস্থান মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। উপজাতি নেতৃবৃন্দ শ্বেতাঙ্গদের রাজ্যসীমা বৃদ্ধির বিষয়টা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিকে দ্বিতীয় দফা ওহাবী আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই বিধর্মী ইংরেজদের বিরুদ্ধে হওয়ায় উপজাতিদের (গোটা কয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া) পক্ষে ওহাবীদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন প্রদান সহজতর হলো। এ সময় উত্তর ভারতীয় এলাকায় ওহাবীদের মূল প্রাণকেন্দ্র পাটনা ঘাঁটিকে পুনরুজ্জীবিত করে পুনরায় লোকবল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রচারের নামে প্রতিনিধিরা পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ফয়জাবাদের মওলানা আহমদ উল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় দফায় ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ওহাবী আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫০-৫৬ নাগাদ) যখন দ্বিতীয় দফায় ওহাবীদের শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তুতিপূর্ণ অব্যাহত ছিল, ঠিক এমনি সময়ে সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী বিশেষত পূর্ব ও উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে সিপাহী বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হলো। অনেক ঐতিহাসিকের মতো এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, এই সিপাহী বিপ্লবে ওহাবীরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালনে সক্ষম হননি। এর কারণ হিসেবে এটুকু বলা চলে যে, ওহাবীদের সামরিক কেন্দ্রের অবস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। এলাকার সিতানা ও মুলকাতে এবং পাঞ্জাব এলাকার ইংরেজ সামরিক ছাউনিগুলো থেকে এঁদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছিল। ফলে ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে ওহাবীদের পক্ষে দিল্লী ও উত্তর ভারতীয় এলাকার বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয়নি। তবুও পাটনা কেন্দ্র থেকে অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রায় ১২ হাজার ওহাবী গাজী শাহাদৎ বরণ করেছিল বলে ইতিহাস উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিপাহী বিপ্লব দমন করার পর ওহাবীদের শক্তি বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় ১৮৬১ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের প্রায় দশ বছরকাল সময় ব্যয় করতে হয়। ইংরেজদের এসব প্রচেষ্টা দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় অভিযান। ১৮৫৯ সালে পার্বত্য এলাকা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সেনাপতি স্যার সিডনি কটন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আকস্মিকভাবে ওহাবীদের সামরিক ঘাটি সিতানা আক্রমণ করলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুজাহিদরা (ওহাবী) নিকটবর্তী মহাতব পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেনাপতি সিডনি এরপর সিতানা গ্রামটি উৎমানজাই উপজাতিকে উপহার হিসেবে প্রদান করে।

[এই উৎমানজাই পাঠান উপজাতির এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে বর্তমানে জীবিত উপমহাদেশের সবচেয়ে বর্ষীয়ান নেতা ও আজীবন স্বাধীনতা-সংগ্রামী খান আবদুল গফফার খান ওরফে বাদশা খানের জন্ম]। কিন্তু মুলকাত ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে মুজাহিদরা গেরিলা পদ্ধতিতে ইংরেজদের উপর তাঁদের হামলা অব্যাহত রাখে, এমনকি এঁরা একবার রাওয়ালপিণ্ডির ইংরেজ সামরিক ছাউনিতে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছিল । প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, এ সময় মুজাহিদদের মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

[অত্র প্রবন্ধকার প্রায় ৩০ বছর আগে ১৯৫৬ সালে সাংবাদিক হিসেবে তৎকালীন আজাদ কাশ্মীর এলাকা সফরকালে মোজাফফরাবাদ-এর সন্নিকটে এক পাহাড়ের গায়ে বত্রিশজন বাঙালি মুজাহিদ-এর কবর পরিদর্শন করেছেন। অনেক ক'টা কবরের উপর রক্ষিত শহীদদের নাম পর্যন্ত উর্দুতে খোদাই করা রয়েছে। কিন্তু লেখাগুলো বেশ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রবন্ধকার অনুরোধ করায় দোভাষী এরকম একটি ফলকের নাম পাঠ করলেন "শেখ মেঘু বরিশাল, বঙ্গাল"]

সীমান্ত এলাকার মুজাহিদদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আরও বছর চারেক পরে ১৮৬৩ সালের ১৩ই অক্টোবর ১০ সহস্র সৈন্যসহ ইংরেজ সেনাপতি স্যার নেভিল চেম্বারলেন সোয়াত এলাকায় উপস্থিত হন। ফলে উপজাতীয় নেতা শেখ আবদুল গফফার শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ-এর ঘোষণা দেন। মাত্র মাসাধিককালের মধ্যে সংঘটিত কয়েক দফা সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বিপুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেনাপতি চেম্বারলেন উপায়ন্তরহীন অবস্থায় আরও সাহায্যের জন্য সংবাদ প্রেরণ করলে ৪ হাজার উট এবং ২ হাজার খচ্চর বোঝাই গোলাবারুদ ও রসদপত্র রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পাঠানো হয়। কিন্তু অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হলো না। ১৪ই ও ১৫ ই নভেম্বর মুজাহিদের হামলায় ইংরেজ পক্ষে নিহতের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। ওহাবীদের এই আক্রমণে ইংরেজ সেনাপতি চেম্বারলেন স্বয়ং আহত হন। এ ধরনের এক নাজুক অবস্থায় ১৮৬৩ সালে ২৫শে ডিসেম্বর ইংরেজ অভিযাত্রী বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। এই অভিযানে প্রায় দুই সহস্র ইংরেজ ও এদেশীয় সৈন্য নিহত

হলেও সেনাপতি চেম্বারলেন এ মর্মে রিপোর্ট দান করেন যে, মুজাহিদদের শক্তি চূর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ১৮৬৪ সালে ওহাবী নেতা আবদুল্লাহ্ এক অতর্কিত হামলায় সিতানা পুনর্দখল করে নেন। (সিলেকশন্স ফ্রম দি রেকর্ড অব দি বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নং -৬২, পৃঃ ১৩৪) শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার অত্যন্ত সন্তর্পণে উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে উপজাতীয় সরদারদের নিরপেক্ষ করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করে বহু আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে।

এদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে ওহাবীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ক্যাপ্টেন পারসন্স-এর পরিচালনাধীন গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট মোতাবেক ইংরেজ পুলিশ ও সামরিক বাহিনী যুগপৎভাবে ১৮৬৩ সালে থানেশ্বর, আম্বালা, মুলতান, দিল্লী, কানপুর, এলাহাবাদ, পাটনা এবং মালদহের মুজাহিদ শিবিরগুলোর উপর হামলা চালায় এবং ২২ জন ওহাবী নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। এঁদের মধ্যে ১১ জনই ছিলেন বাংলা ও বিহার এলাকার। এটাই হচ্ছে বিখ্যাত 'আম্বালা ষড়যন্ত্র মামলা'। এঁদের মধ্যে ১১ জনকে সেশন কোর্টে পাঠানো হয়। বিচারে মওলানা এহিয়া আলী, মুন্সী মোহাম্মদ জাফর এবং মোহাম্মদ শফির ফাঁসি এবং বাকি ৮ জনের দ্বীপান্তরের শাস্তি হয়। উপরন্তু সবারই সম্পত্তি ক্রোক-এর নির্দেশ জারি হয়। (সিলেকশন্স ফ্রম দি রেকর্ডস অব দি বেঙ্গল গভর্নমেন্ট : ৫২ নং পৃঃ ১৩৮ এবং পৃঃ ১৪২)-এর পর যথাক্রমে 'মালদহের মামলা' এবং 'পাটনার ষড়যন্ত্র মামলা' অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মামলায় অভিযুক্ত ওহাবীদের হয় দীপান্তর, না হয় ফাঁসির রায় দেওয়া হয়। কিন্তু এসব মামলা চলাকালে একটা বিষয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে হত্যার পরেও অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে ওহাবীরা গোপনে সরকার-বিরোধী মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৮৬৯ সালের ১২ই জানুয়ারি সুদূর আন্দামানে বড়লাট লর্ড মেয়ো এবং ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুরে কোলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস নর্মানকে ওহাবী মতাবলম্বী দু'জন হত্যা করেছিল। বিচারে তাঁদের ফাঁসি হয়।

প্রাপ্ত রেকর্ডপত্রে দেখা যায় যে, ১৮৭০-৭১ সালে নাগাদ একদিকে নেতৃত্বের অভাব এবং অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী ইংরেজদের ভয়াবহ দমন নীতির ফলে উপমাহদেশে ওহাবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। আর ঠিক এমনি সময়ে দিল্লী ও উত্তর ভারতীয় এলাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বঙ্গীয় এলাকায় ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর হোসেন প্রমুখের ভিন্নধর্মী কর্মকাণ্ড একটা পূর্ণ অবয়ব গ্রহণ করতে শুরু করেছে। প্রায় একশ' বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠা কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর মোকাবেলায় এঁদের কার্যপদ্ধতি তো' আর এক বিশাল ইতিহাস।

এই প্রেক্ষাপটে ভারত উপমহাদেশে ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ ধর্মীয় দিক দিয়ে রক্ষণশীল মতাদর্শের ওহাবী আন্দোলন যখন ব্যর্থতার মাঝ দিয়ে দ্রুত পরিসমাপ্ত হতে চলেছে, বঙ্গীয় এলাকায় তখনকার বিরাজমান অবস্থাটা সঠিকভাবে অনুধাবন করা অপরিহার্য মনে হয়। এ সময় নবাবী আমলের বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অবলুপ্তপ্রায়। অবশ্য দেশের এককালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র করে মুসলমান আমলে যে বনেদী মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তার বিলুপ্তির কারণগুলো ইতিপূর্বেই উপস্থাপিত করেছি। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোবরের ঘোষণায় সরকারের সমস্ত বিভাগে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তিত হলে দেশরক্ষা, রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা দফতর

থেকে বিতাড়িত হয়ে উপায়ন্তর বিহীন অবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী পরিবার উপমহাদেশের অন্যত্র বাস্তুত্যাগে বাধ্য হয়। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় অবশিষ্টরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেয়ে কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে অচিরেই বাংলার মুসলিম সমাজ নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়ে এবং এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যে বঙ্গীয় এলাকায় শতশত বছর ধরে উদার মনমানসিকতার সুফী পীর, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ ও মনীষীদের প্রচেষ্টায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল; সেই বাংলাদেশের অত্যাচারিত, নিগৃহীত ও নেতৃত্ববিহীন মুসলিম সমাজে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রথম দফায় শিখ বিরোধী ও দ্বিতীয় দফায় ইংরেজ বিরোধী রক্ষণশীল ওহাবী আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। মূলত এই আন্দোলন ধর্মীয় হলেও, এর রাজনৈতিক চরিত্র খুবই স্পষ্ট ছিল। উপরন্তু একদিকে ইংরেজ পরাশক্তি এবং অন্যদিকে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের জের হিসেবে ভয়াবহ দুর্গতির মোকাবেলায় বাংলার মুসলমানরা তখন মুক্তির একটা পথ অনুসন্ধান করছিল।

এখানে পাটনার ইংরেজ কমিশনার কর্তৃক ১৮৫৮ সালে কোলকাতাস্থ বাংলা সরকারের কাছে লিখিত ৩২৫৩ নং পত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সমীচীন হবে।"... প্রচারকদের (ওহাবী) প্রচারের ফলে এ ধরনের নিরক্ষর জনসমাজ অতি সহজেই এঁদের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে। একবার দীক্ষিত হলে অনুসারীদের দলপতিদের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাটা বাধ্যতামূলক। এসব লোকের বসবাস হচ্ছে অনুন্নত এলাকায়। শিক্ষার আলো লাভের কোনো সুযোগ-সুবিধাই এদের নাই। তাই বর্তমান সমাজের প্রতি এদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। এজন্যই কোনো পথ না পেয়ে ওহাবী নেতারা ধর্মের নামে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের যে বাণী প্রচার করছেন, এরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশে এর ব্যাপ্তি খুবই বেশি। কারণ সেখানকার অধিকাংশ মুসলমানের বসবাস হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের অনুন্নত এলাকায়। সেখানে সরকার কোনো সময়েই শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করেনি।"

এ প্রসঙ্গে গবেষক কাজী আবদুল ওদুদ-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, "এই সমাজ (বাঙালি মুসলমান) মানস-শক্তির দিক দিয়ে তেমন সবল না হলেও ওহাবী প্রভাবকে বাধা দিতে যে চেষ্টা না করেছে তা নয়। লালন ফকির প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান বাউলদের গানে রয়েছে সেই প্রতিবাদের ঝংকার। সে চেষ্টা সফল হয়নি...। বস্তুত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ওহাবী আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক আন্দোলন বলেও গণ্য করা যেতে পারে– ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের গা ঝাড়া দেবারও এক চেষ্টা। ভারতে অথবা বাংলায় রাজনৈতিক কারণ যে এর প্রভাবের মূলে তা বোঝা যায় ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলমানদের অবস্থার ইতিহাসের কথা ভাবলে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই: হিন্দু সমাজের পদস্থ ব্যক্তিদের আনুকূল্যে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।... মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো দশসালা বন্দোবস্ত থেকে, আর তাদের আর্থিক দুর্গতি চরমে পৌঁছাল সনদ দেখাতে না পেরে যখন তাঁদের বহু নিষ্কর জমিজমা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল– ইংরেজিতে এর নাম 'রিজাম্পশন প্রসেডিংস'—আর যখন আদালতের ভাষা পার্সির পরিবর্তে ইংরেজি হলো।"

বাংলার মুসলমানদের জন্য 'অতীব দুঃসময়'

তা'হলে বর্ণিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার মুসলমানদের জন্য অনায়াসে 'অতীব দুঃসময়' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ঠিক এমনি সময়ে বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাঙালি

মুসলমানদের সমাজ জীবনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিরাজমান শূন্যতার দরুন উত্তর ভারতীয় অঞ্চল থেকে বঙ্গীয় এলাকায় এক শ্রেণীর অবাঙালি মোল্লা মওলভীর আবির্ভাব ঘটে। এদের কর্মপদ্ধতিও প্রকারান্তে কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুর্জোয়াদের সুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব অবাঙালি মোল্লা মওলভীরা ধর্মের নামে সরলমনা গ্রাম্য মুসলমানদের বিভ্রান্ত করল। তাঁরা এ মর্মে বোঝাতে শুরু করলো যে, বিধর্মীর ইংরেজি ভাষা শেখা উচিত নয় এবং বাংলা ভাষা হচ্ছে 'কাফের'-এর ভাষা। এঁদেরই কর্মকাণ্ডে অচিরেই বাঙালি মুসলমানদের জন্য আধুনিকতা বিবর্জিত এক 'জগাখিচুড়ি' ভাষার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হয় এবং এতদিন ধরে বাঙালিত্বের দাবিদার বাঙালি মুসলমানরা বহুলাংশে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে।

পরবর্তীকালে এঁদের উত্তরসূরিরা পাকিস্তান আমলে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার দাবি উত্থাপন করার পাশাপাশি ধর্মের দোহাই দিয়ে রাতারাতি বাংলা ভাষার চেহারাটা বদলিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। (নমুনা : "... এই বিষয়ে তর্কতকরাবের গোঞ্জায়েস নাই।... পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবার কাবেলিয়াত উর্দুর রয়েছে।... আনজামের এন্তেজাম শুধু বাকি। ... মুসলিম হুকুমাতের মাকরাজ দিল্লীর সামরিক ছাউনিতে উর্দুর পয়দায়েশ। ... তথাকথিত সাহিত্যিক বাংলা মাশরেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। মোকামী জবান এবং আদাবি জবানের পার্থক্য সকল দেশেই বর্তমান। মোকামী জবানই আসলে মাদেরী জবান।"— রচনা মিজানুর রহমান : মাহেনও: ১৯৪৯)।

এর জবাবে জ্ঞানতাপস ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর পরিচ্ছন্ন বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবি-ফারসি ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে 'বলি' দিতে, আর একদল চাচ্ছে 'জবে' করতে। একদিকে কামারের খাঁড়া, আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি।" (সাহিত্য সম্মেলন-এর উদ্বোধনী ভাষণ : ১৯৫৪ কার্জন হল, ঢাকা)।

সে যাই হোক; এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাটা অনুধাবন করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এটা এমন একটি সময়, যখন ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব নিশ্চিহ্ন হয়েছে, ১৮৭০ সাল নাগাদ ধর্মীয় ওহাবী আন্দোলন স্তিমিত হয়েছে, বঙ্গীয় চাষিদের নীল বিদ্রোহ-এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজের ছত্রছায়ায় বাল্য ও কৈশোর অতিক্রম করে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে।

এ কথা ভাবলে আশ্চর্য মনে হয় যে, এ সময় ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্মকাণ্ডে এতদূর সন্তুষ্ট ও নির্ভরশীল ছিল যে, অনেক সময় সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগকালে 'শুধুমাত্র হিন্দুদের মাঝ থেকে নেওয়া হবে" বলে প্রকাশ্যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রচারে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করত না। হান্টার সাহেবের রচিত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে প্রসঙ্গত এ ধরনের একটা সুস্পষ্ট ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি "দূরবীণ" নামক একটি পত্রিকা থেকে সম্পাদকীয় মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ১৮৬৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে ফারসি ভাষায় প্রকাশিত 'দূরবীণ' পত্রিকায় প্রকাশিত চাঞ্চল্যকর মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

"বড় ছোট সমস্ত রকমের চাকরি মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতীয় লোকদের, বিশেষ-করে হিন্দুদের দেওয়া হচ্ছে। সরকার বাহাদুরের কর্তব্য হচ্ছে সর্বশ্রেণীর প্রজার উপরে সমদৃষ্টি হওয়া। কিন্তু এখন এমন কাল এসেছে যখন সরকারি চাকরি থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে গেজেটে লেখা হয়। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনারের আপিসে কতকগুলো চাকরি খালি হলে উক্ত রাজকর্মচারী সরকারি গেজেটে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দেন যে, এইসব পদ হিন্দু ভিন্ন আর কাউকে দেওয়া হবে না। মোটের উপর মুসলমানদের এখন এমন দুর্গতি হয়েছে যে, সরকারি চাকরির যোগ্যতা তাদের লাভ হলেও সরকারি ইস্তাহার সহযোগে ইচ্ছা করে তাঁদের দূরে রাখা হয়। কেউ তাঁদের অসহায় অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। তাঁরা যে আছে এই কথাটা উচ্চতর রাজকর্মচারীদের মনে স্থান পায় না।"

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ ডক্টর আনিসুজ্জামান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসিকতার যে বর্ণনা দান করেছেন এখনো তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

"এই হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চেতনা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। সামাজিক ক্ষেত্রে দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চমন্যতাকেই তখন সকলে মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চেতনা বলে। জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হলো সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। এর আরেকটি অভিব্যক্তি দেখা যায় হিন্দুমেলার মধ্যে। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর বাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ, গনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের উৎসাহে ১৮৬৭ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়। "যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য;" কিন্তু এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে অহিন্দু জনসংখ্যার কথা কেউ ভাবলেন না। জাতি ও হিন্দু কথাটা সমার্থক হয়ে দাঁড়াবার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিত্বের একটি মূলসূত্র প্রতিষ্ঠিত হল। স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলনও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের উপরে জোর দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধে প্রথম সংঘর্ষ বাঁধল ১৮৮২ তে যখন দয়ানন্দ সরস্বতী গোহত্যানিবারণী আন্দোলন শুরু করলেন এবং ১৮৯৫ তে যখন বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনা দিলেন।" (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : লেখক সংঘ প্রকাশনী : ঢাকা ১৯৬৪)।

তা'হলে বলতে হয়, কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) ও যুদ্ধোত্তরকালে পরাশক্তি ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন।

খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট ও বেনিয়ান হিসেবে বিপুল পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ।

গ. পাঁচ-সালা, দশ-সালা এবং সবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩ খ্রি.) বদৌলতে 'কর্নওয়ালিশ মার্কা' নব্য জমিদারে পরিণত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ।

ঘ. প্রথম সুযোগেই ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ এবং 'বাংলার রেনেসাঁ' স্লোগান উচ্চারণ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার ও সার্থকভাবে সম্পূরক ও সহযোগীর ভূমিকা পালন।

ঙ. হেনরী লুইস ডিরোজিও-র (১৮০৯-৩১) ইয়ং বেঙ্গল, রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সমাজ সংস্কার এবং রাধাকান্ত-ভূদেব রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে বাঙালি বর্ণ হিন্দু সমাজে ভিত্তি সুদৃঢ় করা।

চ. ইংরেজ স্বার্থের পরিপন্থী প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহ ছাড়াও সিপাহী বিপ্লবের (১৮৫৭) সময়কালে সক্রিয়ভাবে বিরোধিতার ভূমিকা পালন।

ছ. বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ডস এসোসিয়েশন (১৮৫৩), হিন্দু মেলা (১৮৬৭), ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৭৬) এবং মারাঠা ও গুজরাটি উঠতে শিল্পপতিদের যোগসাজশে এবং ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ সালে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। এবং সবশেষে

জ. সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর সন্ধানে জেমস টড-এর (১৭৫২-১৮৩৫) 'এ্যানালস এ্যান্ড এ্যান্টিকস অব রাজস্থান'-এর ভিত্তিতে রাজপুতদের মহিমা কীর্তন এবং একই উদ্দেশ্যে কট্টর রক্ষণশীল বাল গঙ্গাধর তিলক-এর আহ্বানে কোলকাতায় ১৮৯৫ সাল নাগাদ মারাঠা শাসক শিবাজী পূজার প্রবর্তন।

ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলমানদের সহযোগিতা শুরুর ইতিহাস

এ-ধরনের এক প্রেক্ষাপটে সিপাহী বিপ্লবের পরিসমাপ্তিতে দিল্লী ও আলীগড় অঞ্চলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান-এর (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রি.) কর্মকাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করে। শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও স্যার সৈয়দ-এর বক্তব্য হচ্ছে, শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এক্ষণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এদেশে ইংরেজদের শাসনভার গ্রহণ করার প্রায় একশত বছর পরে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে এই সর্বপ্রথম মুসলমান সম্প্রদায় বিদেশী শাসন-এর বাস্তবতাকে স্বীকার করতে শুরু করল। ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন ধর্মীয় ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, ঠিক তখনই দিল্লী এলাকায় স্যার সৈয়দ আহমদ এবং প্রায় একই সময়ে বঙ্গীয় এলাকায় খান বাহাদুর মওলবী আবদুল লতিফ খান এবং সৈয়দ আমীর আলীর মতো উদারমনা সংস্কারপন্থীদের আবির্ভাব হলো।

গবেষক ড: আনিসুজ্জামানের মতে, "তবে অনতিবিলম্বে বাঙালি মুসলমানও নবোৎসাহে আধুনিক জগতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু সমাজের চেয়ে একটু পরবর্তী সময়ে হলেও একই পথ ধরে সামাজিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টায় তাঁরাও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।"

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের প্রাক্কালে ১৮৬৬ সালে নবাব আবদুল লতিফ কর্তৃক কোলকাতায় "মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি" স্থাপন এবং এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ নিতান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের হৃদ্যতা স্থাপন করা।

অবস্থাদৃষ্টে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, বাঙালি মুসলমানদের মন থেকে তরীকা-ই-মুহম্মদীয়ার অর্থাৎ ওহাবীদের ইংরেজ বিরোধী প্রভাব দূর করার লক্ষ্যে ১৮৭০ সালে কোলকাতায় এই লিটারারি সোসাইটির এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী। ধর্মীয় বিধানসমূহ আলোচনার পর এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ হচ্ছে 'দার-উল-ইসলাম'—'দারুল হরব' নহে এবং

এখানে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ধর্মীয় নির্দেশের পরিপন্থী।" (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যঃ পৃষ্ঠা ৮৬)। এ সময় মক্কার হানাফী, শাফায়ী ও মালেকী সম্প্রদায়ের তিনজন মুফতী ভারতবর্ষকে 'দারউ-উল-ইসলাম' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ১৮৭০ সালেই নবাব আমীর হোসেন খান বাহাদুর তাঁর রচিত পুস্তকে এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, 'শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ অসিদ্ধ।" এদিকে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর উল্লেখিত বক্তব্য ১৮৭১ সালে ফতোয়া আকারে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

আবারও বলতে হচ্ছে যে, ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরেজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলন সম্পূর্ণ স্তিমিত হয়ে পড়লে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ মর্মে উপলব্ধি দেখা দেয় যে, উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনকে মেনে নেয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এর প্রবক্তারা হচ্ছেন দিল্লীর স্যার সৈয়দ আহমদ, ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ, কোলকাতার সৈয়দ আমীর আলী এবং জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলী প্রমুখ। কোলকাতা কেন্দ্রিক 'সম্ভ্রান্ত ' হিন্দুরা যেখানে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে ১৭৫৭ সালের পূর্ব থেকেই নানা অছিলায় ইংরেজদের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সম্পূরক শক্তির ভূমিকা পালন করছিল, সেখানে প্রায় ১১৩ বছর পরে এক শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজ শাসকদের বিরোধিতার পথ পরিহারের জন্য সোচ্চার হলো। এজন্যই কোলকাতায় ১৮৭০ সালে 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপিত করে সে বছরেই বিশেষ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, "ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ হচ্ছে দারুল ইসলাম।" এই অধিবেশনে সুদূর দিল্লী থেকে স্যার সৈয়দ আহমদও যোগ দিয়েছিলেন। এরপরেই প্রচারিত হলো জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলীর এতদসম্পর্কিত ঐতিহাসিক ফতোয়া।

স্যার সৈয়দ আহমদের 'বিতর্কিত' কর্মকাণ্ড

কোলকাতা তথা বঙ্গীয় এলাকায় নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনার প্রাক্কালে দিল্লী এলাকায় সমসাময়িককালে স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করা সমীচীন হবে। ১৮১৭ সালের ১৭ই অক্টোবর দিল্লী নগরীতে সৈয়দ আহমদের জন্ম হয়। পিতা সৈয়দ মোহাম্মদ তকী ছিলেন শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-এর (শাসনকাল ১৮৩৭-১৮৫৭) সভাসদ। (উল্লেখ্য যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর ১৭০৭ সালে মৃত্যুর পর ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ১৫০ বছরে মোট ১২ জন মোগল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন এবং এই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশেষ মোগল সম্রাট। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব নিশ্চিহ্ন করার পর ইংরেজরা সম্রাট বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। রেঙ্গুনেই তিনি ইন্তেকাল করেন)। পিতার মৃত্যুর পর সৈয়দ আহমদ ক্ষয়িষ্ণু মোগলদের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিল্লীতে ইংরেজদের অধীনে ফৌজদারী বিভাগে সেরেস্তার-এর চাকরি গ্রহণ করেন। এরপর চাকরিতে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। ১৮৩৯ সালে সৈয়দ আহমদ আগ্রায় কমিশনার অফিসে নায়েব মুনশি এবং ১৮৪১ সাল নাগাদ ফতেপুর সিক্রিতে মুন্সেফ-এর পদ লাভ করেন। ১৮৫০ সালে তিনি সাবজজের পদে উন্নতি লাভ করেন। এবং রোহটা নামক স্থানে বদলী হন। ১৮৮৫ সালে তিনি যখন বীজনূর-এর চাকরিরত, তখন সিপাহী বিপ্লবের শুরু হয়ে গেছে। অনেকের মতে এ সময় সৈয়দ আহমদ-এর স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, দেশীয় সিপাহীদের এই অভ্যুত্থান সফল হবে না এবং এর জের হিসেবে দেশে দুর্যোগ-এর সৃষ্টি হবে। ফলে সৈয়দ আহমদ প্রকাশেই এ ধরনের বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। আর সিপাহী বিপ্লবের সময় সৈয়দ আহমদের ভূমিকা দারুণভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে একথা বলা অন্যায় হবে না

যে, এ সময় কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সামগ্রিকভাবে ও গোষ্ঠীগতভাবে যেরকম ইংরেজদের সক্রিয় সহযোগিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, দিল্লী এলাকায় সৈয়দ আহমদ-এর এই একমাত্র পরিবার ইংরেজদের সমর্থনে সেই রকম সোচ্চার হয়েছিল। এর দরুন সৈয়দ আহমদকে দারুণভাবে 'কাফফারা' দিতে হয়। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহী সিপাহীগণ কর্তৃক স্বল্প সময়ের জন্য দিল্লী অবরোধকালে সৈয়দ আহমদ-এর চাচা সপুত্র নিহত হন এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় মাতার মৃত্যু হয়, কথিত আছে যে, এ সময় ইংরেজরা সৈয়দ আহমদের প্রাণ রক্ষার জন্য সামরিক প্রহরার ব্যবস্থা করা ছাড়াও মাসিক ২০০ টাকা অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করে।

সৈয়দ আহমদের ভূমিকা সম্পর্কে স্যার জন স্ট্রাচীর মন্তব্য হচ্ছে : "১৮৫৭ সালে তিনি (সৈয়দ আহমদ) যেভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সমর্থনে অদম্য সাহসিকতার ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য কারও পক্ষে এর চেয়ে মহৎ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, আমার পক্ষে যে ভাষায় তার বর্ণনা দেই না কেন তা সঠিক হবে না।"

সৈয়দ আহমদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর থেকেই মুসলমানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৮ সালে তিনি "সিপাহী বিদ্রোহের কারণ" এই নামকরণে উর্দু ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এর দরুন ইংরেজ শাসকদের মুসলিম বিরোধী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালের ভয়াবহ অবস্থা

এ সম্পর্কে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ লিখেছেন, "...ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তি-সংগ্রাম এইরূপে শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল বটে, কিন্তু উহার জের চলিল একটানাভাবে আরও প্রায় এক যুগ। বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বড়লাট ক্যানিং উক্ত দিবস এলাহাবাদে এক দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পাঠ এবং ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ...মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যেই অর্ধ লক্ষাধিক নর-নারী মধ্য ভারতও নেপালের জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে, বিদ্রোহোত্তরকালে প্রথম আঘাত পড়িয়াছিল তাহাদেরই উপর। বিদ্রোহ, ইংরেজ হত্যা, ট্রেজারি ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি অভিযোগে ইহারা অভিযুক্ত হয়। ...কত জনের যে ফাঁসি হইল কত হাজার হাজার লোকের প্রতি যে স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের আদেশ হইল তাহার হিসেব এক্ষণে পাওয়া দুষ্কর। যাবজ্জীবন দীপান্তরবাসে যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছিল, শুধু তাঁহাদেরই সংখ্যা ছিল দশ হাজারের ঊর্ধ্বে।...বিদ্রোহে উস্কানি, ইংরেজ নর-নারী হত্যায় প্ররোচনা, পলাতকদের আশ্রয় এবং আর্থিক সাহায্য দান, বিদ্রোহীদের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্যাদি ও সংবাদ গোপন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক অভিযোগে হাজার হাজার মুসলমান তাহাদের জোত-জমি, তালুকদারী, জমিদারি, নগদ টাকা-পয়সা ব্রিটিশের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। সদাশয় সরকার ইহার সমস্ত নিজেরা হজম না করিয়া কিছু কিছু হিন্দুদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করিয়া দিয়া নতুন আর একটি রাজভক্তের দল সৃষ্টির প্রয়াস পান।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : পৃ: ১২৪-১২৭ : বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৮)

এ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত গবেষক কাজী আবদুল ওদুদ-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, "ওহাবীদের দমন করতে ইংরেজ গভর্নমেন্টের লোকবল ও অর্থবল দুইয়েরই অপচয় হয়েছিল। পরিশেষে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বহু ওহাবীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে শাসকবর্গ কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দমন ও ওহাবী বিদ্রোহ দমন এই দুইয়ের প্রভাবে মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো, অথবা তাদের দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট হলো এবং শাসকবর্গের কৃপাভিক্ষা ভিন্ন তাদের গত্যন্তর রইল না। বিফল বিদ্রোহের এমন বিনীত স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বড় করুণ। এই দুর্দিনে তাদের চললো ধর্ম সম্বন্ধে নূতন চিন্তা। ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে অমুসলমান রাজ্যে 'দারুল হরব" নয়, কেননা মুসলমানের দৈনন্দিন ধর্মকর্মে এদেশের শাসকবর্গ বাধা দেয় না—এই মতের প্রসার লাভের দিন এলো" (শাশ্বত বঙ্গ (২য় সং) ব্র্যাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩)।

এরকম এক বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামানের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরিচ্ছন্ন বক্তব্য হচ্ছে, "সিপাহী অভ্যুত্থানের সমস্ত দায়িত্বটাই কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে ও বিলেতে শাসক মহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানেরা এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশটাই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।" (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : ১৯৬৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

এ ধরনের এক প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদের কর্মময় জীবনের বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় রচিত "রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান" শীর্ষক পুস্তকে সৈয়দ আহমদ সরাসরিভাবে লিখলেন যে, "বিদ্রোহের সময়ে মুসলমানেরাই সব চাইতে রাজভক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় যেভাবে গোটা মুসলমান জাতটাকেই এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে, সেটা খুবই শোচনীয়।"

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজদের সমর্থনে মুসলিম মধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্যার সৈয়দের সার্বিক প্রচেষ্টা ছিল মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করানো। এজন্যই তাঁকে উপমহাদেশে সংঘটিত দুই-দুটো সুদূরপ্রসারী ঘটনা যথাক্রমে সিপাহী বিপ্লব এবং ওহাবী আন্দোলন-এর প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

ড: আনিসুজ্জামান এ সম্পর্কে আরও মন্তব্য করেছেন যে, "ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ক্রোধ প্রশমিত করার পর স্যার সৈয়দ আহমদ এবারে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করলেন। তাই আন্দোলনের মূল কথা হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক লাভ করা এবং দেশের শাসন ব্যবস্থার অধিকার লাভ করা।"

অতঃপর সংক্ষেপে স্যার সৈয়দ আহমদ-এর কর্মজীবন নিম্নরূপ :

১৮৬২ : 'বাইবেল সম্পার্কিত টীকা' প্রকাশ।

১৮৬৪ : গাজীপুরে অনুবাদ সমিতি গঠন।

১৮৬৯ : বিলেত গমন।

১৮৬৯-৭১ : লন্ডনে অবস্থানকালে হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী এবং এতদসম্পর্কিত ২টি পুস্তক রচনা।

১৮৭৩ : আলীগড়ে মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের সূচনা।

১৮৭৬ : সরকারি চাকরি থেকে অবসর।
১৮৭৮-৮২ : ভাইসরয় কাউন্সিল -এর সদস্য।
১৮৯৮ : ইন্তেকাল।

রামমোহন এবং সৈয়দ আহমদের তুলনামূলক বিচার

স্যার সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে আলোচনার সমাপ্তিতে ড: আনিসুজ্জামানের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে নিঃসন্দেহে তা সমর্থনযোগ্য বলা যায়। ড: আনিস লিখেছেন, “রামমোহনও তাঁর (সৈয়দ) মতোই ভারতীয় জনসাধারণকে রাজভক্ত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যেমন সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন, রামমোহন তেমনি নীলকরদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রশমন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৈয়দও বিলেতে গিয়েছিলেন (১৮৬৯) এবং ফিরে এসে ‘মহামেডান সোশ্যাল রিফরমার’ নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ‘দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন’-এর সম্পাদক দেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের যে চেষ্টা করেন, তার ফলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮১৬)। আর স্যার সৈয়দের চেষ্টায় ১৮৭৩-এর আলীগড়ে মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের সূচনা হয়।”

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ সুদীর্ঘ ৯ বছর ধরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ফলে রক্ষণশীল মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সৈয়দের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেন। এমনকি তাঁকে ধর্মত্যাগী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সৈয়দ আহমদ এতে বিচলিত না হয়ে স্বীয় আদর্শের প্রচার অব্যাহত রাখেন।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই একই সময়ে বঙ্গীয় এলাকায় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ও নয়া চিন্তাধারার সূত্রপাত হয় এবং ১৮৭০ সালে কোলকাতায় ‘মহামেডান লিটারেরি সোসাইটির’ প্রকাশ্যে অধিবেশনে এর বহিঃপ্রকাশ হয়। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যথাক্রমে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলী প্রমুখ।

এজন্য একতরফাভাবে তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বলে কোনোক্রমেই চিহ্নিত করা সমীচীন হবে না। এর সমর্থনে পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি শিক্ষিত সমাজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, “প্রথম ও প্রধান ট্র্যাজেডি হল, বাংলার এই বিদ্বৎসমাজ (কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী) প্রায় সম্পূর্ণ ‘মুসলমানবর্জিত’ রূপ ধারণ করল এবং সেই জন্য একে সাধারণভাবে ‘বাঙালি বিদ্বৎসমাজ’ না বলে বিশেষ অর্থে ‘বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজ’ বলা যুক্তিসঙ্গত। আমরা যখন নব্যবঙ্গের বা নবযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি তখন কতকটা সচেতনভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজের এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই।’ (বাংলার বিদ্বৎসমাজ (২য় সং) প্রকাশ ভবন কলিকাতা : ১৯৭৮)।

এক্ষণে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য ‘কোলকাতা কেন্দ্রিক সুবর্ণ শ্রেণী এবং সম্ভ্রান্ত মহাশয়দের কিঞ্চিৎ পূর্ব ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হবে তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। পুরানো দলিলদস্তাবেজ থেকে একথা বলা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথমে পর্তুগিজ এবং এরপর ওলন্দাজ ও আর্মেনিয়ানদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এই কোলকাতা (সুতানুটি) অঞ্চলে। সবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জব

চার্ণকের নেতৃত্বে ইংরেজদের কোলকাতা আগমনের বছর হচ্ছে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ। এখানেই পারস্পরিক স্বার্থে ইংরেজদের সঙ্গে অর্থবহ কারণে বাঙালি শেঠ, বসাক, শীল, সিংহ, ঘোষ, দত্ত, মিত্র, সেন, বন্দোপাধ্যায় ও ঠাকুর প্রভৃতি পরিবারের যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং অচিরেই সঞ্চিত অর্থের দাপটে এসব পরিবার সম্ভ্রান্তের মর্যাদা লাভ করে। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বনেদী হিন্দুরা নবাবদের অধীনে প্রভাবশালী অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়া সত্ত্বেও প্রায় একই সময়ে কোলকাতার আলোচ্য পরিবারগুলো কার্যত শ্বেত বণিকদের 'বিকল্প প্রভু' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের প্রতি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করে। ফলে ইংরেজদের এজেন্ট, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি হিসেবে নানা ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাঝ দিয়ে কোলকাতার এসব বাঙালি হিন্দু পরিবার থেকেই সুবর্ণ শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে মুর্শিদ কুলী খাঁ 'মহাপাপিষ্ঠ'

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খ্রি.) তাঁর রচিত সর্বশেষ সীতারাম (১৮৮৭ খ্রি.) উপন্যাসে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দুদের 'নবাগত' বিকল্প 'প্রভু' ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সামগ্রিক বিষয়টি যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরোক্ষভাবে প্রচেষ্টা করেছেন। বাস্তবে এসব কর্মকাণ্ড ছিল বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। বঙ্কিম বাবুর 'সীতারাম' উপন্যাসের কাহিনীকাল হচ্ছে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর (১৭১০-১৭১৭ খ্রি. পর্যন্ত দেওয়ানী এবং ১৭১৭-১৭২৭ খ্রি. পর্যন্ত নবাবী) আমল। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের পরিষ্কার ভাষায় মন্তব্য হচ্ছে, "আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ, মনুষ্যধাম মুর্শিদ কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে আরূঢ় থাকায়, সুবে বাংলার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল– বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লিখে না।"

অথচ 'বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর রচিত 'বাংলার ইতিহাস (নবাব আমল)' গ্রন্থে মুর্শিদ কুলী খাঁ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "মুর্শিদ কুলী খাঁ কর্মনিষ্ঠ ও আলস্য বিরহিত ছিলেন। রজনীতে অল্পকাল মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন।... সুরা বা অন্য কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য তিনি কোনোকালেই ব্যবহার করেন নাই। নর্তকীর নৃত্যগীত শ্রবণ করিতেন না। স্বীয় একমাত্র পত্নীতে চিরদিন অনুরক্ত ছিলেন। ... তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও লিখন ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণ দক্ষতা থাকায় সর্বপ্রকার হিসাব-নিকাশ শীঘ্র প্রণিধান করিতেন। হিসাবে তাঁহাকে প্রতারিত করে, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না। সমস্ত নিকাশী কাগজ ও হুকুম স্বয়ং লাল কালিতে করিতেন। মাসের শেষ দিবসে সকল সেরেস্তার মাসকাবারের কাগজপত্র স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন। ... মুর্শিদ কুলী খাঁ যুদ্ধে বীর, পরোপকারে মুক্তহস্ত, দানে হাতেম ও বিচারে নসেরুয়াঁর সাদৃশ্য ছিলেন।' (বাংলার ইতিহাস– নবাবী আমল: কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়)।

তা'হলে একথা বলাটা নেহায়েৎ অন্যায় হবে না যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দুদের সুবর্ণ শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়েছিল মুর্শিদাবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং শ্রেণীস্বার্থে ইংরেজদের লেজুড় হিসেবে পরবর্তীকালে নানা আদর্শের কথা উচ্চারণ করে, কিংবা বাঙালিত্ব ও জাতীয়তাবাদ এবং প্রগতি ও আধুনিকতার বুলি কচলিয়ে যত কথাই বলা হোক না, কেন, প্রকৃত ইতিহাস এখন আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

এদিকে কোলকাতায় বাঙালি হিন্দু সমাজে সুবর্ণ শ্রেণী গঠন পূর্ণতা লাভের পরবর্তীকালে এদেরই অনেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ নিলামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি ক্রয়ের মাধ্যমে 'কর্ণওয়ালিশ-মার্কা' নব্য জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়। এখানেই শেষ নয়। অনেকের মতে এই উপমহাদেশে ইংরেজদের এদেশীয় দালাল ও সমর্থক হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন এবং স্বীয় শ্রেণীর বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এঁরাই আবার এই ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ইংরেজি ভাষা শেখা ছাড়াও রেনেসাঁর স্লোগানের আড়ালে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে রপ্ত করে। ঐতিহাসিকরা কোলকাতার এই সমাজকেই "বাবুসমাজ" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে এঁরাই হচ্ছেন কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী। বিশিষ্ট মার্কসিস্ট গবেষক বিনয় ঘোষের ভাষায় বলতে হলে, "বিত্তের সঙ্গে বিদ্যারও মণিকাঞ্চন যোগ হল। ... কলকাতা শহরের নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা– দেওয়ান-মুন্সী বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি-ব্যবসায়ীদের পরিবার নিয়ে গঠিত নতুন শহুরে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই সমাজই তখন কলকাতা শহরে 'বাবু সমাজ' বলে পরিচিত ছিলেন।... মুৎসুদ্দিগিরি বেনিয়ানি করে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছিলেন কারা? কারা সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করে জমিদারি কিনে নতুন জমিদার হয়েছিলেন? গ্রাম ও শহরের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল? কারা নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল? কারা নতুন পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে সেকালের ভাষায়, 'রুলার্স অ্যান্ড রুল্ড'-এর (শাসক এবং শাসিতের) মধ্যে ইন্টারপ্রিন্টার্স (মাধ্যম) হয়েছিলেন? অধিকাংশই হিন্দু এবং হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণভুক্ত যারা তাঁদের নিয়েই প্রধানত এই তিনটি শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। মুসলমান এবং অনুচ্চবর্ণ বলে হিন্দু সমাজে যারা উপক্ষেণীয়, তাঁদের সংখ্যা এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে খুবই সামান্য। কেন সামান্য? কেন অনুচ্চ বর্ণের লোকেরা অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন যুগে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ গ্রহণ করেননি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বাংলার, তথা ভারতের, ভুয়ো রেনেসাঁসের মূল কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং বোঝা যাবে কেন বাংলার নবজাগৃতি (রেনেসাঁ) একটি অতিকথা ছাড়া কিছু নয়।" (বাংলার নবজাগৃতি: ২য় সং ১৯৭৯: ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা)।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, বঙ্গীয় এলাকায় এ ধরনের এক সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পলাশীর যুদ্ধের প্রায় ১১৩ বছর পরে ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়। আর পরাশক্তির বিরোধিতা নয়। এক্ষণে মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের লক্ষ্যে রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই। ১১৩ বছর যাবৎ মুসলমানরা প্রায়শই একাকী হত্যাকাণ্ড ও বিপ্লব পর্যন্ত সংঘটিত করার পর স্তিমিত হয়ে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, দিল্লীতে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং কোলকাতায় নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ এই নতুন চিন্তাধারার পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ১৮৬৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ কোলকাতায় 'বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের' দ্বিতীয় অধিবেশনে 'বাংলায় মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত মতামত' শীর্ষক নিবন্ধে আক্ষেপের সুরে এ মর্মে মন্তব্য করলেন যে, "বাংলার মুসলমানরা যদি ইংরেজি শিক্ষিত হতেন তাহলে ভারতীয় রাজনীতির ধারা বদলে যেত এবং ভারতে শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধেও জনমত সজাগ হত।"

কোলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জে বি ফেয়ার এই একই অধিবেশনে আবদুল লতিফের (১৮২৮-৯৩ খ্রি.) পঠিত নিবন্ধের আলোচনা কালে পরিচ্ছন্ন ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, "ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকে এদেশে মুসলমান ভদ্র শ্রেণী লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। শিক্ষায় ও সামাজিক সম্মানলাভে তাঁরা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্র শ্রেণীর অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই পশ্চাদগতির রাজনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।"

মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো নিশ্চিহ্নের পথে

এই প্রেক্ষিতে ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যখন ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার চিন্তাধারার সূত্রপাত হলো, তখনকার বিরাজমান অবস্থাটা কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা অপরিহার্য মনে হয়। ১৮৭০-৭১ সালে কোলকাতার প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক হান্টার সাহেব লিখেছেন, "গেল পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলো (সম্ভ্রান্ত) হয় এই ভূখণ্ড থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, না হয় আমাদের শাসনে সৃষ্ট নতুন সমাজ ব্যবস্থার চাপে অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে।" (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার– দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স : কলিকাতায় পুনর্মুদ্রণ ১৯৪৫ : পরিচ্ছেদ ৪, পৃষ্ঠা ১৫৭)

গবেষক বিনয় ঘোষ এই সময়কালের চমৎকার বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন, " ... অর্থাৎ শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, বাগবাজার, শ্যামবাজার, কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে নতুন রাজধানী কলকাতায় যখন ইংরেজ আমলের সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার প্রতিষ্ঠাতারা ধন-সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মুর্শিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান শাসনকেন্দ্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছিল। বাঙালি দেওয়ান বেনিয়ান মুৎসুদ্দিদের মধ্যে মুসলমানদের নাম এরকম পাওয়াই যায় না বলা চলে। তার প্রধান কারণ বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষ সেই সময় অনেক বেশি তীব্র ছিল। ... মুসলমান সমাজ এইসব ক্ষেত্রে, রাজ্যচ্যুতি ও মর্যাদাহানির বিক্ষোভ থেকে; ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন। শিক্ষা, রাজসম্মান ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই তাঁরা কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে চাননি, বরং তাঁদের অসহযোগ নীতির পূর্ণ সুযোগ ইংরেজরা তাঁদের শাসনস্বার্থে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজরা সেই সুযোগে, শিক্ষা ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে হিন্দু সমাজকে সাহায্য করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বীজ বপন করে ভবিষ্যতের জন্য তাঁদের সিংহাসনটিকে অটল করার চেষ্টা করেছেন।" (বিনয় ঘোষ : বাংলার বিদ্বৎসমাজ ২য় সং ১৯৭৮ : প্রকাশ ভবন কলিকাতা)।

১৮৭১ সালটি নানা দিক দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের জন্য এক উল্লেখযোগ্য বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই বছরের ১১ই মার্চ আন্দামান দ্বীপে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগকারী পাঠান ওহাবী কর্মী শের আলী খান কর্তৃক বড়লাট লর্ড মেয়োকে হত্যা এবং ২০শে সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ নামে পাঞ্জাবের অপর এক ওহাবী কর্মীর হাতে কোলকাতায় টাউন হলের সম্মুখে প্রকাশ্য দিবালোকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস নর্মাণ নিহত হন। বিচারে উভয়েরই ফাঁসি হয় এবং ঐতিহাসিকদের মতে এই দু'টিই হচ্ছে গোঁড়া শরীয়তপন্থী ওহাবী আন্দোলনের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এখানেই নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় এই আন্দোলনের যবনিকাপাত ঘটে। আবার এই ১৮৭১ সালেই মুসলিম সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরোধিতার পথ পরিহারের আহ্বান জানান এবং জৌনপুরের

মওলানা কেরামত আলী ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' হিসেবে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, এই ১৮৭১ সালেই তা ফতোয়া আকারে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে ১৮৭১ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে জারিকৃত এক নির্দেশনামায় লর্ড মেয়ো সবগুলো প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেন। এরই ফলে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৮৭২ সালের ১৭ই আগস্ট পত্র নং ২৯১৮ মারফত এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে বলা হয় যে, "আমার ভয় হয়, আমরা মুসলমানদের প্রতি শিক্ষার দিক দিয়ে সুবিচার করিনি। আমি বানার্ডের 'নোট' থেকে যেটুকু তথ্য গ্রহণ করতে পেরেছি, তাতে দেখেছি, শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেকটিং এজেন্সিতে একজনও মুসলমান কর্মচারী নেই। গভর্নমেন্ট স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে একজনও মুসলমান আছেন কিনা সন্দেহ। বাংলার সরকারি শিক্ষা বিভাগ হিন্দুদের বিভাগ বললেও ভুল হয় না। উপরের স্তর থেকে নিম্নের স্তর পর্যন্ত চাকরি হিন্দুদের একচেটিয়া দখলে।" (এম আজিজুল হক: হিস্ট্রি এ্যান্ড প্রোবলেমস্ অফ মোসলেম এ্যাডুকেশন ইন বেঙ্গল : কলিকাতা ১৯১০)।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ কোলকাতায় মুসলিম সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত দ্রুত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের উদগ্র বাসনায় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সোচ্চার হলো। এঁরা এই উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সমস্ত পন্থা গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করেননি। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, দিল্লী এলাকায় সমসাময়িককালে স্যার সৈয়দ আহমদ-এর নেতৃত্বে প্রায় একই আদর্শের সংস্কারপন্থী ও ইংরেজি শেখার আন্দোলনে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট থেকে বাধাগ্রস্ত হলেও বঙ্গীয় এলাকায় লতিফ-আমীরের নেতৃত্বের আন্দোলন কিন্তু সে ধরনের বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। অনেকের মতে খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দী থেকে বঙ্গীয় এলাকায় যে উদারমনা সুফী দর্শনের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সর্বাত্মক বিকাশ ঘটেছিল এবং প্রায় ছ'শ' বছর ধরে যে সুফী মতবাদ বাঙালি মুসলমানদের হৃদয়ের বিশালতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে বিরাজমান পরিস্থিতির মোকাবেলায় অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং সবার অলক্ষ্যেই সেই মন-মানসিকতার পুনর্জাগরণ ঘটে। এর মোদ্দা কথাটাই হচ্ছে, আর গোঁড়ামি নয়—পরিস্থিতির মোকাবেলায় সংস্কারপন্থী হওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এতে ভবিষ্যৎ হবে মঙ্গলদায়ক।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রাক্কালে শুধু একটা কথাই বলব যে, ১৮৭১ থেকে ১৯৭১-এর সময়ের দূরত্ব ঠিক একশ' বছরের। ১৮৭১- এ যেখানে বঙ্গীয় এলাকায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিশ্চিহ্ন প্রায় এবং সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজ অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেদিনের সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষাটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এরপর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে মাত্র ১০০ বছরের ব্যবধানে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় এরাই অকৃত্রিম বাঙালিত্বের দাবিদার হিসেবে ১৯৭১-এ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ করেন এবং 'এদের মাতৃভূমির নাম বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, লোকাচার—সবকিছুর গার্জিয়ান এঁরাই। জাতি হিসেবে এঁরা বাঙালি এবং এঁদের অধিকাংশই হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান। আর এজন্যই বাংলাদেশের বাঙালিত্বে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-আচরণের কিছুটা প্রভাব পড়লে আপত্তিটা কোথায়?'

ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ভয়াবহ দমননীতির ফলে ১৮৭০-৭১ সাল নাগাদ ওহাবী আন্দোলন (চরিত্রগতভাবে প্রথমে শিখ-বিরোধী ও পরবর্তীকালে ইংরেজ-বিরোধী) স্তিমিত হয়ে পড়লে বাংলার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কে এক ভয়াবহ দুর্যোগের মাঝ থেকে উদ্ধারকল্পে কোলকাতায় নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলী প্রমুখ নেতার আবির্ভাবে সংস্কারপন্থী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার জন্য আবার বলতে হচ্ছে যে, সেদিন এঁদের ঘোষিত নীতি ছিল আর পরাশক্তি ইংরেজদের বিরোধিতা নয়—এক্ষণে বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের লক্ষ্যে রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে কোলকাতা কেন্দ্রিক এই মুসলিম সংস্কারপন্থীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনার আগে প্রাসঙ্গিক বিধায় আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

পলাশী যুদ্ধের পর প্রথম ৫৬ বছর এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার বেআইনী ছিল

প্রথমেই বলতে হয় যে, উপমহাদেশে ইংরেজ রাজশক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস খ্রিস্টধর্ম এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও প্রচারটা কবে থেকে আর কীভাবে শুরু হয়েছিল। একথা চিন্তা করলে আজকের দিনে বিস্ময়কর মনে হয় যে, উদারমনা মোগল সম্রাট ও মুসলিম নবাবদের শাসনাধীন উপমহাদেশীয় অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের অনুমতি থাকলেও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ-এর বিজয়ের পর থেকে প্রথম ৫৬ বছর অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার কার্যত বেআইনী ছিল। এর চাঞ্চল্যকর পূর্ব ইতিহাস থেকে এটুকু অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, সে আমলে কোলকাতায় কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং ডিরেক্টরবৃন্দের চিন্তাধারা নিজেদের স্বার্থে কতদূর পরিপক্ক ছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পারসিভ্যাল স্পিয়ার-এর রচিত এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া -২ (পেংগুইন বুকস লিঃ লন্ডন : পুনর্মুদ্রণ ১৯৮২ : পৃষ্ঠা ১২২-১২৩) গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের কমন্সসভায় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক সনদ পরবর্তী ২০ বছরের জন্য নবায়ন করার সময় তুমুল বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তখন ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দল হচ্ছে রক্ষণশীল টোরী পার্টি। মূলত দু'টি প্রশ্নে এই বিতর্ক দেখা দেয়। প্রথমত ভারতের পূর্বাঞ্চলের ইংরেজ শাসিত এলাকায় শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার একচেটিয়া বাণিজ্য করার অর্থাৎ মনোপলি অব্যাহত রাখার আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করবে কি-না। লন্ডন নগরীতে এর মধ্যেই এমন অনেক ক'টা বড় বড় বাণিজ্যিক কোম্পানির সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মূলধন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়েও অনেক বেশি এবং যাদের সমগ্র বিশ্বব্যাপী শাখা অফিস রয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটেনের টোরী দলীয় সদস্যদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের অকল্পনীয় প্রভাব এবং এই কোম্পানির সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার ফল হিসেবে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হওয়ার প্রেক্ষিতে কমন্সসভার রায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে প্রদত্ত হলো। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮১৩ সাল পর্যন্ত

ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করল। এজন্যই এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, পুরানো 'ক্যালকাটা এ্যালমানাক'-এ কোলকাতা ভিত্তিক যে সব ইংরেজ কোম্পানির নাম পাওয়া যায়, তার সবগুলোই হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমিশন ও অন্যান্য শর্ত ভিত্তিক এজেন্সি হাউস। আসলে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনও স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক মর্যাদা ছিল না এবং বিদেশ বাণিজ্যের অধিকারও ছিল না। ১৭৯৭ সাল নাগাদ কোলকাতায় এ ধরনের প্রায় ১৯টি এবং ১৮১০ সালে ২৭টি এজেন্সি হাউসের নাম পাওয়া যায়।

এসব এজেন্সি হাউস-এর গুটিকয়েক নামের পুনরুল্লেখ করলেই প্রতিষ্ঠানগুলোর চরিত্র অনুধাবন করা যায়। যেমন : টড এ্যান্ড মিলার, ক্যাম্বেল এ্যান্ড ক্লার্ক, বারবার পামার এ্যান্ড কোং, ল্যামবাট রস এ্যান্ড কোং, ফেয়ারলি গিলমোর এ্যান্ড কোং প্রভৃতি। এ সম্পর্কে ইংরেজ গবেষক ক্রোকর্ড-এর মন্তব্য হচ্ছে, "এজেন্সি হাউসগুলোর সাধারণত তিন-চার জন করে অংশীদার থাকত এবং সকলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী। হাউসগুলোর প্রতিষ্ঠার সময় অংশীদারদের নিজেদের কোনো মূলধন ছিল না, কোম্পানির কর্মচারীদের আমানত থেকে মূলধন সংগ্রহ করা হতো। কোম্পানির কর্মচারীদের বাৎসরিক সঞ্চয় থেকে আমানত যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেত। এ দেশীয় ধনিক বণিকরাও এইসব হাউসে (অর্থ) গচ্ছিত রাখতেন। (স্কেস অব কমার্শিয়াল রিসোরসেস : লন্ডন ১৮৩৭)।

তাহলে দেখা যায় যে, এই এজেন্সি হাউসগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে মধ্যস্বত্বের বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। কেননা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পণ্য সংগ্রহ করে সরবরাহ করার আসল কাজটি কিন্তু অর্পিত ছিল এদেশীয় কোম্পানির উপর। এই কোম্পানিগুলোকেই বলা হতো বেনিয়ান। মোদ্দা কথায় বলতে গেলে সে আমলে একচেটিয়া রফতানী ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এরপর মধ্যস্বত্ব মুনাফা লাভ করত কোম্পানির কর্মচারীদের বেনামীতে সৃষ্ট ইংরেজ এজেন্সি হাউসগুলো। আর সবশেষে হচ্ছে এজেন্সি হাউসগুলোকে অর্ডারের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহক এদেশীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বেনিয়ান। আশ্চর্যজনকভাবে কোলকাতা কেন্দ্রিক এ সবগুলো বেনিয়ান প্রতিষ্ঠানই ছিল বাঙালি বর্ণ হিন্দু মালিকানায়। এঁরাই হচ্ছেন কোলকাতার সুবর্ণ শ্রেণী এবং এদেরকেই কেন্দ্র করে কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী যৌবনপ্রাপ্ত হয়।

এই প্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের কমন্সসভায় রক্ষণশীল টোরী সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তার একচেটিয়া বাণিজ্যিক সনদের নবায়ন লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর মেয়াদ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং কোলকাতাস্থ ইংরেজ এজেন্সি হাউসগুলো ছাড়াও কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী বেনিয়ানদের বাণিজ্যিক স্বার্থ চমৎকারভাবে রক্ষিত হয়।

কমন্সসভায় আইন পাস করে বঙ্গীয় এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার বন্ধ হলো

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সনদ পরবর্তী ২০ বছরের জন্য নবায়নের সময় কমন্স সভায় এর একটি বিশেষ শর্ত নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মারাত্মক মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টি হচ্ছে পূর্ব ভারতে ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে দেওয়া হবে কি না। আগেই উল্লেখ করেছি যে, আলোচ্য সনদটি নবায়নের সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী আরও ২০ বছরের জন্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এক্ষণে কোন্ প্রেক্ষাপটে

এবং কীভাবে কমন্সসভায় এ ধরনের একটা বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা কৌতূহলী পাঠকদের সমীপে উপস্থাপিত করব। ইংরেজ জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কয়েক শত বছর ধরে সমগ্র বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ড এবং অগণিত রাজ্য ইংরেজদের করতলগত হলে সর্বত্রই দলে দলে ইংরেজ খ্রিস্টান পাদ্রীরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ শাসিত বঙ্গীয় তথা পূর্ব ভারতীয় এলাকার জন্য কেন এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা? কমন্স সভার সমস্ত সদস্য খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আইন পাসের মাধ্যমে কেন এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

সঠিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দানকালে সত্যভাষণ করতে হলে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রসঙ্গটা আবারও উত্থাপন করতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে এঁরা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে এত নিষ্ঠার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজদের প্রতি সক্রিয় সমর্থন অব্যাহত রেখেছিল তা তুলনাহীন বলা চলে এবং যুগের পর যুগ ধরে কোলকাতা কেন্দ্রিক এই বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী এদেশে প্রকৃত অর্থেই ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিতে পরিণত হয়। সে আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজদের সঙ্গে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুদের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ছাড়াও সামাজিকভাবে দহরম মহরম ও মাখামাখিটাও মাত্রাতিরিক্তভাবে অব্যাহত ছিল। এ সম্পর্কে আলোচনাকালে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর অতুল সুর-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, হিন্দুর পালা পার্বণে যেখানে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় ও স্বজনবর্গ নিমন্ত্রিত হতো, মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ করে দিলেন সাহেব-মেমদের। পূজা বাড়িতে তখন প্রবেশ করল বিদেশী সুরা ও নিষিদ্ধ খানা। সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রবেশ করল যবনী নর্তকীর দল। সাহেবদের অনুগ্রহলাভের জন্য আরও পাঁচজন বড়লোক নবকৃষ্ণকে অনুসরণ করল। শহরে এক নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। যে সকল সুযোগ সন্ধানী ও স্বার্থান্ধ বঙ্গসন্তান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে গেছেন (ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুৎসুদ্দি কৃষ্ণকান্ত নন্দী) তাঁদের অন্যতম। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন।

বস্তুত কোলকাতায় বসতি স্থাপনের পর সাহেব-মেমরা দু'টো জিনিস রপ্ত করে নিয়েছিল। একটা পালকি চাপা ও আর একটা হুকোয় তামাক খাওয়া। আবার কোনো কোনো সাহেব এদেশে থেকে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু স্টুয়ার্ড (মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ড) প্রসিদ্ধ। তিনি প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা করাতেন। তাঁর বাড়িতে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছিল। (আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালি : সাহিত্যলোক কোলকাতা-৬ এপ্রিল (১৯৮৫ পৃ- ১২৭)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু সমাজের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ সাহেবদের পারস্পরিক স্বার্থে সৃষ্ট হৃদ্যতার আরও চিত্র উপস্থাপনার প্রাক্কালে সে আমলের পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিদ্যমান পরিস্থিতিটাও মনে রাখা প্রয়োজন। এটা এমন একটা সময় ছিল, যখন ইউরোপ থেকে আগত ফরাসি, পর্তুগিজ, দিনেমার, গ্রিক, আর্মেনিয় প্রভৃতি উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক শক্তিগুলোও উপমহাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিভিন্ন শহর ও বন্দরে ঘাঁটি স্থাপন করে বসে রয়েছে।

ইংরেজদের সঙ্গে বৈরী ভাবাপন্ন এদেশীয় যে কোনো এক বা একাধিক শক্তির সঙ্গে এসব ইউরোপীয় উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক শক্তির যোগসাজশ-এর বিষয়টা ইংরেজদের জন্য কিছুতেই শুভ হবে না। দ্বিতীয়ত দিল্লীতে মোগল এবং বেরার, অযোধ্যা ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের ক্ষয়িষ্ণু শাসক শ্রেণী ও নবাবদের ইংরেজদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বাংলা ও বিহার অঞ্চলের মুসলিম এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের সঠিক মনোভাব আঁচ করা তখন খুবই দুরূহ ছিল। অন্যদিকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার, নাগপুরে ভোসালা, বরোদাতে গায়কোয়ার এবং খোদ পুনাতে পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। উপরন্তু দক্ষিণ ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলোও তখন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে সত্যিকারভাবে বলতে গেলে প্রথমে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু সুবর্ণ শ্রেণী এবং পরবর্তীতে এঁদেরই উত্তরসুরী বাঙালি হিন্দু বিদ্বোৎসমাজ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজদের জন্য সবচেয়ে নির্ভরশীল সম্পূরক শক্তি। কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় যেমন শ্রেণী স্বার্থে এই অবস্থার পূর্ণ ব্যবহার করেছে, ইংরেজরাও তেমনি এই বশংবদ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিজেদের স্বার্থে মাত্রাতিরিক্তি ফায়দা উঠিয়েছে।

বর্ণ হিন্দু বুর্জোয়াদের সন্তুষ্ট করতে ৫৩ দিন সরকারি ছুটি

এ সময় ইংরেজরা কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুদের উপর কতদূর সন্তুষ্ট ছিল, তা একটা মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে অনুধাবন করা যাবে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে (১১৯৪ বঙ্গাব্দ) কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জারিকৃত ৫৩ দিনের সরকারি ছুটির তালিকা ছিল নিম্নরূপ :

অক্ষয় তৃতীয়া (১ দিন), নৃসিংহ চতুর্দশী (২ দিন), জ্যৈষ্ঠের একাদশী (২দিন), স্নান যাত্রা (১ দিন), রথযাত্রা (১দিন), পূর্ণ যাত্রা (১দিন) জন্মাষ্ঠমী (২দিন), শয়ন একাদশী (১ দিন), রাখী পূর্ণিমা (১ দিন), উত্থান একাদশী (২দিন), অরন্ধন (১দিন), দুর্গাপূজা (৮দিন), তিলওয়া সংক্রান্তি (১দিন), বসন্ত পঞ্চমী (১দিন), গণেশ পূজা (১দিন), অনন্ত ব্রত (১দিন), বুধ নবমী (১ দিন), নবরাত্রি (১দিন), লক্ষ্মীপূজা (১দিন), অন্নকুট (১দিন), কার্তিক পূজা (১ দিন), জগদ্ধাত্রী পূজা (১দিন), রাস যাত্রা (১দিন), অগ্রহায়ণ নবমী (১দিন), রটন্তী অমাবশ্যা (২দিন), মৌনী সপ্তমী (১দিন), ভীমষ্টমী (১দিন), বাসন্তী পূজা (৪দিন), শিবরাত্রি (২দিন), দোলযাত্রা (৫দিন), বারুনী (১দিন), চড়ক পূজা (১দিন) এবং রামনবমী (১দিন)। এই ৫৩ দিন সরকারি ছুটির তালিকায় বাঙালি মুসলমানদের জন্য কোনো ধর্মীয় ছুটির উল্লেখ নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ এদেশে গভর্নর জেনারেল হিসেবে আগমনের পর তাঁরই নির্দেশে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে এ ধরনের একটা সরকারি ছুটির তালিকা ঘোষণা করা হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিশ ছিলেন আদিতে ইংরেজ ভূস্বামী এবং ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট-এর (১৭৫৯-১৮০৬) নিজস্ব গ্রুপের অন্যতম নেতা। ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে আগমনের পর লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রথমেই রাজস্ব বোর্ড পুনর্গঠিত করেন এবং বেশ কিছুসংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ ইংরেজ অফিসারকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে কর্নওয়ালিশই হচ্ছেন উপমহাদেশে পদ্ধতিগত ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিস-এর স্রষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম কোলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এদের প্রথম শ্রেণীর চাকরিজীবীদের বাৎসরিক ৫০০ পাউন্ড

বেতনে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট করা হলো। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা (বেনামীতে ব্যবসা করার কারণে) তুলনামূলকভাবে কম বেতনে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যাদি সম্পন্নের জন্য নিয়োগ করা হলো। তিনিই ফৌজদারি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ইংরেজ শাসিত এলাকায় ২৩টি জেলা কোর্ট এবং ৪টি আপিল কোর্ট স্থাপন করলেন। উপরন্তু কর্নওয়ালিশ সৈন্য বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পুনর্গঠিত করলেন।

ইংরেজ স্বার্থে কর্নওয়ালিশ-এর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একসালা, পাঁচসালা, দশ সালা এবং সবশেষে ১৭৯৩ সাল নাগাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করা। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এই কারণে কীভাবে একান্ত অনুগত কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণীর নব্য জমিদার শ্রেণীতে গোত্রান্তর হলো এবং ইংরেজরা বিশেষ করে পূর্ব ভারতে শিল্প স্থাপন ও কোলিয়ারি এবং চা শিল্পে কোলকাতার সুবর্ণ শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রক্ষা পেল।

এমনি এক অবস্থায় যখন লন্ডনের কমন্স সভায় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পরবর্তী ২০ বছরের জন্য নবায়নের প্রশ্নটি তুমুলভাবে বিতর্কিত হচ্ছিল, তখন লর্ড কর্নওয়ালিশের কাছ থেকে বন্ধু প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট-এর কাছে এ মর্মে অনুরোধ যেয়ে পৌঁছাল যে, ভারতে বিরাজমান নাজুক পরিস্থিতিতে ইংরেজদের পক্ষে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না যাতে ইংরেজদের জন্য পরীক্ষিত এবং একান্ত অনুগত কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থহানি ঘটে। এই অনুরোধের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাদান করে বলা হয় যে, ভারতে ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দান করলে তা কোলকাতা কেন্দ্রিক ধর্মভীরু বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের জন্য নিশ্চিতভাবে মনোকষ্টের কারণ হবে এবং সেমতাবস্থায় আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিথিলতার উদ্রেক হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এই অবস্থাটা বৃহত্তর স্বার্থে ইংরেজ সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের জন্য কাম্য হবে না।

ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলীয় সদস্যরা নিজেদের ধর্মীয় স্বার্থের উর্ধ্বে সাম্রাজ্যের স্বার্থকে স্থান দিলেন। কমন্স সভায় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এ মর্মে আইন পাস হলো যে, আপাতত ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে পারবে না। এটাই হচ্ছে ইতিহাসভিত্তিক বাস্তব তথ্য।

এ জন্যই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরি এবং ডা: টমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করলে কোলকাতায় কিংবা ইংরেজ শাসিত এলাকায় তাঁকে বসবাস করতে দেওয়া হয়নি। গবেষক ড: অসিত বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "প্রথমে এঁরা কলকাতাকে প্রচার কেন্দ্ররূপে বেছে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের প্রতিকূলতার জন্য এঁরা বাধ্য হয়ে কলকাতার অদূরে দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮০০)। এঁদের সঙ্গে এর পূর্বেই যোগ দিয়েছিলেন অন্যান্য মিশনারি। যথা–ওয়ার্ড, বার্নস্‌ডন, মার্শম্যান প্রভৃতি" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (৪র্থ সং:) কলিকাতা ১৯৭৮।

ড: বন্দোপাধ্যায়-এর এই ভাষ্য আরও ইতিহাসভিত্তিক করতে হলে বলতে হয় যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দেই কমন্সসভায় ২০ বছর মেয়াদী আইন পাসের দরুনই সেদিন ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এজন্যই বঙ্গীয় এলাকা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ শাসনাধীন থাকা সত্ত্বেও অবিভক্ত বাংলায় ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম প্রোটেস্টান্ট মিশন ও গির্জা (১৮০০ খ্রি.) স্থাপিত হয়েছিল দিনেমার কলোনি

শ্রীরামপুরে। সেদিন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে উইলিয়াম কেরি, ডাঃ টমাস, মার্শম্যান, বার্নস্ডন প্রমুখ উদ্যোগী ইংরেজ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুরে আস্তানা স্থাপন করতে হয়েছিল। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তাঁদের ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য এঁরা শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে এতগুলো বছরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। মিশন ও গির্জা স্থাপন ছাড়াও এঁরা বসেই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে রপ্ত করা ছাড়াও বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন।

এরই ফলে উপমহাদেশে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শিক্ষা এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও লোকাচার সম্বন্ধে জ্ঞানদানের লক্ষ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত করা হলে খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরিকেই এই কলেজ বাংলা, মারাঠি ও সংস্কৃতি ভাষার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তবে মূল শর্ত একটাই—১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ শাসিত এলাকায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা যাবে না।

সে আমলের বিরাজমান পরিস্থিতি অনুধাবনের লক্ষ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারের গোড়ার দিকের এই চাঞ্চল্যকর বিষয় দু'টোর উল্লেখ করতে হলো। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত উপমহাদেশে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইতোপূর্বেই উপস্থাপিত করেছি।

এক্ষণে পরবর্তী পরিচ্ছেদে ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্গীয় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের লক্ষ্যে কোলকাতায় অবস্থানকারী আবদুল লতিফ, আমীর আলী প্রমুখ আপোষমুখী ও সংস্কারপন্থী মুসলিম নেতৃবৃন্দের কর্মতৎপরতা এবং ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর ধাপে ধাপে প্রথমে মান-অভিমান, আবেদন— নিবেদন, দর-কষাকষি ও আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩৫ বছরের ব্যবধানে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদীমূলক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান যথার্থ হবে বলে মনে হয়।

১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে গুটিকয়েক হাতে-গোনা মুসলিম সমাজ সংস্কারকের প্রচেষ্টায় একটা নয়া চৌহদ্দিতে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের ক্রমবিকাশের সময় একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিবেশী কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর মতো এদের ভিত্তি কিন্তু ততটা মজবুত ছিল না। কারণ হিসেবে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, ইংরেজ আমলের শুরুতে আমরা যে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান দেখতে পাই, ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, সেটাও কিন্তু নবাবী আমলে যথেষ্ট পরিমাণে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম ছিল। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৭০-৭১ পর্যন্ত ১১৩ বছরে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী ইংরেজদের সহযোগিতায় ধাপে ধাপে সুবর্ণ শ্রেণী ও নব্য জমিদার শ্রেণীর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মাঝ দিয়ে তথাকথিত রেনেসাঁ আর 'বাঙালিত্বের' ধ্বজা উড়িয়ে নিজেদের উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বৎসমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এরই পাশাপাশি ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের পর বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের প্রচেষ্টার প্রাক্কালে কিন্তু দু'টো স্তরের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

বাঙালি মুসলমানরা প্রথম থেকেই ইংরেজবিরোধী কর্ম পদ্ধতিতে লিপ্ত থাকায় সুবর্ণ শ্রেণী এবং নব্য জমিদার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। এজন্যই বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর আট দশকে যখন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের

প্রক্রিয়া শুরু হলো, তখন এর ভিত্তিটা পরিপক্ক ছিল না। এরই ফল হিসেবে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের গতি ছিল মন্থর।

এ সম্পর্কে মার্ক্সীয় গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "প্রধানত হিন্দু সমাজের উচ্চস্তর থেকে, অর্থাৎ উচ্চ বর্ণে ধনিক ও সচ্ছল মধ্যবিত্তের স্তর থেকে আধুনিক বাঙালি এলিটদের উদ্ভব হয়েছে। এক কথায় উনিশ শতকের বাঙালি এলিটকে উচ্চ বর্ণে সঙ্গতিপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত 'এলিট' বলা যায়। তার ফলে এই এলিটগোষ্ঠী অনুপ্রাণিত ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন হিন্দু সমাজ কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।"

রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ট্রাজেডি

এই প্রেক্ষাপটে বিনয় বাবু বাঙালি মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে যথার্থই সত্য ভাষণ করেছেন। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, "প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিক্ষিত মুসলমান এলিট গোষ্ঠীর বিকাশ হয়নি বলা চলে। ব্রিটিশের ক্রমবর্ধমান প্রশাসন যন্ত্রের নিম্ন শ্রেণীর চালক ও কর্মচারী সরবরাহের জন্য যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রবর্তন করা হয়েছিল, তা হিন্দুরাই বেশি আয়ত্ত করেছিলেন বলে এই স্তরের চাকরিজীবীদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ধনিক ও মধ্যবিত্তের স্তরে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের বিচ্ছেদ তো হয়েছিলই, শিক্ষিত এলিটের স্তরেও হয়েছিল। এই কারণে বাংলাদেশে যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ট্রাজেডি ঘটেছে, তাও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে অস্বীকার করা যায় না। যদি ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত না করে বাংলাদেশ থেকে আধুনিক জাতীতাবোধের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয় তাহলে তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিকাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।" (বাংলার নবজাগৃতি : পৃ: ১৫৮: ওরিয়েন্ট লংম্যান : কলিকাতা ১৯৭৯)।

১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের লক্ষ্যে সত্যিকার অর্থে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় কালচারকে রপ্ত করার যখন প্রক্রিয়া শুরু হলো, তখনকার বিরাজমান পারিপার্শ্বিক আর্থসামাজিক পরিবেশ অনুধাবন করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। এ সময় মুসলিম সমাজ সংস্কারক ও সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব পালন কতদূর দুরূহ ছিল তা নিম্নের চিত্র থেকে সহজে বোধগম্য হবে।

ইতিপূর্বে বারংবার একটা কথা উল্লেখ করেছি যে, এদেশে ইংরেজদের ১৯০ বছর শাসনামলের ১৫৫ বছরই ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কোলকাতা মহানগরীতে। এই নগরীই ছিল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু এবং এখানেই উপমহাদেশের তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে অগ্রসরমান বাঙালি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিশালী দুর্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময়কালটা এমন ছিল, যখন কোলকাতা-কেন্দ্রিক এই বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজশক্তির সম্পূরক হিসেবে যে কেবলমাত্র বঙ্গীয় প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অপর সম্প্রদায়কে কোণঠাসা করে রেখেছিল তা-ই নয়, উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর এলাকার অন্যান্য প্রদেশের সকল ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষীর জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়াবহ দুরবস্থার চিত্র

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হলো তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ২৪৪ জন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এর সংখ্যা প্রায় ৩৫ গুণ বেড়ে দাঁড়াল ৩০০০ জন এবং এর প্রায় সবাই হচ্ছেন বাঙালি উচ্চবর্ণের হিন্দু। ১৮৫৮ সালে কোলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিএ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ জন। ২৩ বছরের ব্যবধানে ১৮৮১ সালে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা হচ্ছে ১৭১২। এর মধ্যে ১৪৮০ জনের মতো বাঙালি বর্ণহিন্দু। বাকিদের মধ্যে বিহারী, আসামী, ওড়িয়া এবং বাঙালি মুসলমান। ১৮৮১ সাল নাগাদ উপমহাদেশের সমস্ত প্রদেশের একত্রিত হিসাবে এমএ পাস মোট শিক্ষিত লোক ছিল ৪২৩ জন। এর মধ্যে ৩৪০ জনের মতো বাঙালি হিন্দু।

প্রাসঙ্গিক বিধায় ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দুদের শিক্ষার দাপটের পাশাপাশি বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সমসাময়িককালীন বিরাজমান পরিস্থিতি উপস্থাপনা সমীচীন হবে মনে হয়। যেখানে ১৮৯৮ সালে শুধুমাত্র কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬১ জন; সেখানে সমগ্র বিহার এলাকার সবগুলো কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ২০৫ জন।

উড়িষ্যার অবস্থা আরও শোচনীয়। এক খতিয়ানে দেখা যায় যে, ১৯০৫ সালে কটকের বিখ্যাত রাভেন্‌শ কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ২ জন।

উড়িষ্যার বালেশ্বর গভর্নমেন্ট ইংরেজি স্কুল থেকে যে একজন মাত্র ছাত্রকে এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কোলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, আশ্চার্যজনক হলেও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন একজন বাঙালি হিন্দু। নাম রাধানাথ রায়। পরবর্তীকালে ইনিই হচ্ছেন রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর। উড়িষ্যাবাসীদের সন্তুষ্টির জন্য এর পরিচয় হচ্ছে উৎকল নিবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ। প্রথমে বাংলায় এবং পরবর্তীতে ওড়িয়া ভাষায় কবিতা রচনা করে রাধানাথ বাবু বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আসামের অবস্থা কিন্তু সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ সময় অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষারই একটা উপভাষা হিসেবে গণ্য হতো, এ কথা আজ রূপকথার মতো মনে হলেও এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৮৭৩ সালের পূর্বে আসামের সমস্ত স্কুলে বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষাই শেখানো হতো না। ১৮৯৯-১৯০০ সাল নাগাদ সমগ্র আসামে একটি মাত্র আর্টস কলেজ ছিল। ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৩০ জন। অথচ কোলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল এর ৮২ বছর আগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দুরা এর পূর্ণ সুবিধা আদায় করে নেয়। এক কথায় বলতে গেলে এরা বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করা ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সর্বত্র ইংরেজ ছত্রচ্ছায়ায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী কোনো কিছুই মুক্তবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যন্ত বিচার করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো এতো বড় একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকও শিক্ষা ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করেছেন। প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যায় যে, ১৮৫৯ সালে বাংলা সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি হচ্ছে,“আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের সর্বোত্তম এবং হয়ত একমাত্র উপায় হিসেবে সরকারের উচিত উচ্চতর শ্রেণীগুলোর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রসার করেই ক্ষান্ত থাকা।” (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ১৯৭৮)।

সামগ্রিক বিষয়টি অনুধাবনের লক্ষ্যে ইংরেজ রাজশক্তির বশংবদ ও নিতান্ত অনুগত হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালিরা কীভাবে ‘সর্বভুক’ হিসেবে সরকারি চাকরি দখল করেছিল, নিচে ১৮৫৬-৫৭ সালের চিত্র প্রদত্ত হলো :

বিভাগ	বাঙালি	অন্যান্য ভারতীয়	মোট
ভারত সরকারের অর্থ স্বরাষ্ট্র শিক্ষা ইত্যাদি	১১৭	১২	১২৯
বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট	৬৫	৩	৬৮
আদালত সমূহ	৩৪	৩	৩৭
রাজস্ব অফিস	৫৮	১১	৬৯
একাউন্টস অফিস	১১১	৪	১১৫

অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, বাঙালি বলতে সে সময় শতকরা ৯৮ জনই হচ্ছেন বাঙালি বর্ণহিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মনমানসিকতার আরও সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়ার লক্ষ্যে মাত্র ২৯ বছরের ব্যবধানে.১৮৮৬ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ডব্লিউ সি ব্যানার্জী প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ উল্লেখ যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

শ্রী ব্যানার্জী উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "...ইংল্যান্ডের মহারাণী এবং জনগণের শাসনে সুসভ্য হইয়া অদ্য আমরা এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি এবং কোনো প্রকার বাধা ব্যতিরেকেই আপনাপন চিন্তার অর্গল উন্মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি। ব্রিটিশ শাসন, একমাত্র ব্রিটিশ শাসনেই ইত্যাকার ঘটনা সম্ভব (উচ্চরোল হর্ষধ্বনি) এই কংগ্রেস কি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অথবা বিদ্রোহ লালনের প্রতিষ্ঠান (চিৎকার-না না); নাকি উক্ত সরকারের স্থিতিশীলতার ভিত্তিভূমিতে আরো একটি প্রস্তরখণ্ড যোজন? ("চিৎকার হ্যাঁ, হ্যাঁ)"?

এই যখন অবস্থা, তখন কোলকাতার পাইওনিয়ার পত্রিকার ১৭ই নভেম্বর (১৮৮০) সংখ্যায় এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশ হলো যে, 'ব্যক্তিগত জীবনেও মুসলমানরা হিন্দুদের পিছনে পড়ে আছেন। জমিদারি সম্পত্তি মুসলমানদের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে, অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো প্রায় সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং শহরে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়ে দিন কাটাচ্ছেন। গভর্নমেন্ট অফিসার এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য।"

বাঙালি মুসলমানদের দুঃসময়

সংস্কারপন্থী মুসলিম নেতা সৈয়দ আমীর হোসেন এমতাবস্থায় 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' নিবন্ধে সরাসরি বললেন, "ক্রমবর্ধমান মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার সুবিধার জন্য কলিকাতার মুসলমান মহল্লায় একটি কলেজ (বি, এ, ডিগ্রি পর্যন্ত) স্থাপন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সি কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ হলেও হিন্দু মহল্লায় স্থাপিত এবং মুসলমান মহল্লা থেকে এত দূরে যে ছাত্রদের যাতায়াতের খরচই প্রায় ২০ টাকা পড়ে যায়।"

.ইংরেজদের বিভেদ নীতি বলে আখ্যায়িত করলেও বলতে হয় যে, এই সর্বপ্রথম (১৪ই আগস্ট ১৮৮০) ক্যালকাটা স্টেটসম্যান পত্রিকা এ ধরনের একটা দাবি সমর্থন করে এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করল যে, "মুসলমানদের মধ্যে এক সময় যে গোঁড়ামি দেখা গিয়েছিল, এখন আর তা নেই। এখন বাংলার মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষার জন্য উদগ্রীব এবং সর্বক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর সমকক্ষ হতে তাঁরা চান। লর্ড মেয়ো ও স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের সময় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা বিশেষ ফলপ্রদ হয়নি।

কলিকাতা, হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মাদ্রাসাগুলোতে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং আমীর হোসেন মুসলমানদের পৃথক কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আবেদন করেছেন তা বিশেষভাবে বিবেচ্য বলে মনে হয়।"

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের দূরত্ব হচ্ছে ১১৩ বছরের মতো। ইংরেজ কর্তৃক এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভের ১১৩ বছর পর্যন্ত বিশেষ করে বঙ্গীয় অঞ্চলের মুসলিমরা বৈরী মনোভাব পোষণ করে। রেভারেন্ট জেমস লং-এর ভাষায় বলতে গেলে, "জীর্ণ প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এবং শোচনীয় সামাজিক দুরবস্থার দিকে চেয়ে দেখতেই বোঝা যায় যে, এদেশের মুসলমানরা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছেন।..." তখন অর্থাৎ বঙ্গীয় মুসলমানদের সেই ভয়াবহ দুঃসময়ে সৈয়দ আমীর আলী, আবদুল লতিফ খাঁ, সৈয়দ হাসান ইমাম, মীর মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ আমীর হোসেন, মওলানা কেরামত আলী প্রমুখের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায়?

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় প্রায় ১১৩ বছর পর বঙ্গীয় এলাকার বিধ্বস্ত প্রায় মুসলিম সম্প্রদায় যখন ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে একটা অলিখিত সমঝোতার ভিত্তিতে ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ (ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে) সংস্কারপন্থী মনোভাব গ্রহণ করল, তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। কেননা কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে বঙ্গীয় মুসলমানদের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতিকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দালালী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিনা।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ ১১৩ বছর পর্যন্ত ইংরেজ-বিরোধী অসংখ্য যুদ্ধ, কৃষক বিদ্রোহ, অসহযোগিতামূলক কার্যকলাপ, সংঘর্ষ এবং সংগঠিত প্রতিটি বিপ্লবাত্মক ঘটনার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনের পর ১৮৭০ সাল থেকে পরবর্তী ৭৭ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমানরা কোনো প্রেক্ষাপটে রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ তো দূরের কথা, রাজপথের সামান্য আন্দোলনে পর্যন্ত যোগদানে বিরত থাকলেও তা বিস্ময়কর মনে হলেও, এর গূঢ় কারণ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত ইংরেজ আমলে যখন স্কুল কলেজে বিদ্যার্জন করতাম, তখন বর্ণহিন্দু সহপাঠীদের কাছ থেকে বারংবার একটা কথাই শুনতাম যে, "আমরা বঙ্গীয় মুসলমানরা হচ্ছি সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজদের খয়ের খাঁ এবং দালাল।" সে আমলের পত্র-পত্রিকা এবং বই-পুস্তক সর্বত্রই এই একই কথার প্রতিধ্বনি দেখতে পেয়েছিল। আমাদের গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজনদের কাছ থেকেও সে আমলে এ ব্যাপারে কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাইনি। যেটুকু পেয়েছি তা হচ্ছে, কোনোরকম যুক্তিতর্ক ছাড়া সরাসরি কিছু হিন্দু-বিদ্বেষী কথাবার্তা আর হচ্ছে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দুদের মোকাবেলা করার উপদেশ।

কিন্তু আজ? বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে এসে ঢাকার বিদ্বৎ সমাজ নিশ্চুপ (জনাকয়েক ব্যতিক্রম) থাকলেও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত কিছুসংখ্যক বাস্তবধর্মী ও সাহসী লেখকের গবেষণামূলক পুস্তকে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি। শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের

পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কাল অর্থাৎ ১৪৮ বছর (ইংরেজদের পুরো রাজত্বকাল ১৯০ বছর) ধরে ইংরেজ রাজশক্তির সম্পূরক হিসেবে যেমন 'সাফল্যজনকভাবে' ভূমিকা পালন করেছে, ঠিক সেরকম দক্ষভাবে না হলেও ১৮৭০ সাল থেকে পরবর্তী ৭৭ বছর পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থ অত্যন্ত সন্তর্পণে ইংরেজদের বৈরী কোনো কর্মকাণ্ডে নিজেদের আর জড়িত করেনি। এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য।

এর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আলোচনার সুবিধার্থে সার্বিকভাবে সামগ্রিক বিষয়টি উপস্থাপনা করা অপরিহার্য বলে মনে করছি।

প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল থেকেই (১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.) বঙ্গীয় এলাকাকে রাজনৈতিকভাবে উত্তর ভারতীয় এলাকার একট বর্ধিত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সমগ্র বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে গঠিত এলাকাকেই প্রধানত : বঙ্গীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তাই মুসলিম সম্রাট ও নবাবদের আমলে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলিমদের নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

'আশরাফ ও আতরাফ' শ্রেণী গঠনের পূর্ব ইতিহাস

সৈয়দ গোলাম হোসেন রচিত ""সিয়ারুল মোতা আখেরিন" গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ থেকে এঁদের সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। এঁরা ছিলেন "আশরাফ" বা খান্দানীর দাবিদার। এঁদের অধিকাংশই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় এলাকা থেকে ভাগ্যের অন্বেষণে আগত অবাঙালি মুসলমান। মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত সনদ মোতাবেক লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী এবং ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক পদ দখলকারী এসব মুসলমান কালক্রমে নিজেদের বাঙালি মুসলমান হিসেবে পরিচয় দান করলেও এদের মাতৃভাষা ছিল ফার্সি এবং নিম্নশ্রেণী ও বিধর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় এঁরা সেনাছাউনি ভাষা' উর্দু ব্যবহার করতেন। একথা চিন্তা করলে আশ্চর্য মনে হয় যে, যেখানে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী থেকে কয়েকশত বছর ধরে বঙ্গীয় এলাকার পাঠান আমলে শত-সহস্র পীর, দরবেশ, আউলিয়া ও ফকির উদারমনা সুফী দর্শনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে "আশরাফ" ও "আতরাফ'-এর মধ্যে কোনো তফাৎ করতে দেওয়া হয়নি এবং বহিরাগত মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে কোনো শ্রেণী বিভাগ বিদ্যমান ছিল না, সেখানে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হিন্দু সমাজের শ্রেণী বিভাগের অনুকরণের সৃষ্টি হলো এই 'আশরাফ' আর 'আতরাফ'এর শ্রেণী বিভাগ।

গ্রাম বাংলার সোঁদা মাটির সঙ্গে এবং বাংলার ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, লোকাচার আর হাসি-কান্নার সঙ্গে এই অবাঙালি মুসলিম "আশরাফ"-দের বিশেষ কোনো সম্পর্ক না থাকায় রাজদণ্ড ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের ভিত্তিটা শিথিল হয়ে গেল এবং এদের মনে আস্থার বিরাট অভাব দেখা দিল। আগেই উল্লেখ করেছি যে, পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নবাব মীরজাফরের ৮০ হাজার সৈন্যের অধিকাংশ ও ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব মীর কাসেমের ৪০ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট সমগ্র সৈন্যবাহিনী বরখাস্ত, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন, ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের লাখেরাজ ও ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং ১৮৩৭ সাল নাগাদ রাষ্ট্রভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তিত হওয়ায় বঙ্গীয় এলাকায় মুসলিম

মধ্যবিত্ত শ্রেণী একরকমভাবে বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এঁদের অনেকেই বঙ্গীয় এলাকা থেকে পুত্র-পরিজনসহ উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে দেশান্তরিত হলো। বাকিরা নিঃস্ব অবস্থায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করে কৃষিজীবীর পেশা গ্রহণে বাধ্য হলো।

বঙ্গীয় এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান মনমানসিকতা সম্পর্কে ইংল্যান্ডের কমনস্ সভার সিলেক্ট কমিটি ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বক্তব্য পেশকালে স্যার জন ম্যাকম সত্য ভাষণ করেছেন বলা যায়। তিনি বলেছেন -

"আমার বিশ্বাস এই যে, মুসলিম জনসংখ্যার (বঙ্গীয় এলাকায়) একটা বিরাট অংশ তেমন সন্তুষ্ট নয়। কারণ এঁদের স্মৃতিতে ক্ষমতা হারাবার ভয়ংকর দহন বিদ্যমান রয়েছে। অথচ হিন্দুদের স্মৃতিতে এ ধরনের কোনো জ্বালা নেই। তাই হিন্দুরা যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে কেউই ব্রিটিশ শক্তির বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না। এজন্যই ভারতবর্ষে আমাদের (ব্রিটিশদের) নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন।"

প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লন্ডনের কমন্সসভার সিলেক্ট কমিটিতে সে আমলে প্রদত্ত এ ধরনের সাক্ষ্য, বিবৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতেই ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কিত তাদের নীতি প্রণয়ন ও নির্ধারণ করত। অবশ্য ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার কর্মচারী হিসেবে যারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকেই এ ধরনের সাক্ষ্য, বিবৃতি ইত্যাদি গ্রহণ করা হতো।

তাই বাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজপুরুষেরা কী ধরনের মনোভাব পোষণ করত ও কথাবার্তা বলত, তা' অনুধাবনের লক্ষ্যেই স্যার জন ম্যাকম-এর আলোচ্য মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিলাম। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের গবেষক ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের মন্তব্য হচ্ছে; "মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে পা বাড়ালো। সেখানে তাদের উন্নতির আশা ছিল সুদূরপরাহত। বর্তমানে সরকারের (ইংরেজ) অধীনে রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে পূর্ববাংলার শহরাঞ্চলগুলো যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তা' ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা। যেসব মুসলমান এসব শহরে বসবাস করছিল, তাঁরা উন্নতির কোনো সুযোগই পেলো না। অন্যদিকে কোলকাতার হিন্দুরা (রাজশক্তির নিকট থেকে) অভাবনীয় ধরনের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সক্ষম হলো।" (ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২)।

পশ্চিমবঙ্গের এককালীন মার্কসবাদী সাংবাদিক এবং পরবর্তীকালে বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষ বঙ্গীয় এলাকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিরাজমান সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লিখেছেন ...'কিন্তু নব্যবঙ্গের ইন্টেলিজেনশিয়ার এই বিকাশের ধারাটা সুখের নয়। তার মধ্যে ট্যাজেডির উপকরণও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু কিসের ট্যাজেডি? প্রথম ও প্রধান ট্যাজেডি হল, বাংলার এই নতুন বিদ্বৎসমাজ প্রায় সম্পূর্ণ 'মুসলমানবর্জিত' রূপ ধারণ করল এবং সেইজন্য একে সাধারণভাবে 'বাঙালি বিদ্বৎসমাজ' না বলে, বিশেষ অর্থে 'বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমরা যখন নব্যবঙ্গের বা নবযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি তখন কতকটা সচেতনভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজের এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই। কিন্তু কোনো সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তো নয়-ই। বাংলার বিদ্বৎ সমাজের বিকাশের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাই বাঙালি মুসলমান সমাজের কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

"উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলার পুরাতন সমাজবিন্যাসের ভাঙাগড়া চলেছে এবং ইংরেজ আমলের নতুন সম্ভ্রান্ত ধনিক সমাজ গড়ে উঠেছে, তখন মুসলমান সমাজের অবস্থা কী? বাঙালি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার সেই সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন। ইংরেজ নয়, তাঁদের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য ছিল মুসলমান আমলের। সেই ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য দুই-ই যখন তাঁদের লুপ্ত হয়ে গেল, তখন ইংরেজ আমলের নতুন সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজ গড়ে উঠল।

...অর্থাৎ শোভা বাজার, জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা, বাগবাজার, শ্যামবাজার, কলুটোলা প্রভৃতি অঞ্চলে, নতুন রাজধানী কোলকাতায় যখন ইংরেজ আমলের সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার-প্রতিষ্ঠাতারা ধনসমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন মুর্শিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি পুরাতন মুসলমান শাসন কেন্দ্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছিল। বাঙালি দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দিদের মধ্যে মুসলমানদের নাম একরকম পাওয়াই যায় না বলা চলে। তার প্রধান কারণ বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষ সেইসময় অনেক বেশি তীব্র ছিল।... মুসলমান সমাজ তাই সর্বক্ষেত্রে, রাজ্যচ্যুতি ও মর্যাদাহানির বিক্ষোভ থেকে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছেন। শিক্ষা, রাজসম্মান ইত্যাদির কোনো ক্ষেত্রেই তাঁরা কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে চাননি, বরং তাঁদের অসহযোগ নীতির পূর্ণ সুযোগ ইংরেজরা তাদের শাসনস্বার্থে গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজরা সেই সুযোগে শিক্ষা ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে হিন্দু সমাজকে সাহায্য করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বীজ বপন করে ভবিষ্যতের জন্য তাদের সিংহাসনটিকে অটল রাখবার চেষ্টা করেছেন।

"...হিন্দু সমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মধ্য শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে। তার মধ্যে মুসলমান সমাজে নতুন মধ্য শ্রেণীর বিকাশ তো একেবারেই হয়নি, পুরাতন অভিজাত সমাজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র ও নিঃস্ব শ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে। নতুন কোনো বিদ্বৎসমাজেরও বিকাশ হয়নি।" (বাংলার বিদ্বৎ সমাজ ২য় সং: প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ১৯৭৮)।

১৮৭০ সালে মুসলিম মধ্যবিত্ত সবেমাত্র হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের ১১৩ বছর পর ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চ শ্রেণী কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী হয় দেশান্তর হয়েছে না হয় নিশ্চিহ্নপ্রায়। আর কৃষক ও নিম্ন শ্রেণী অত্যাচারের জগদ্দল পাথরের নিচে নিষ্পেষিত। অনাহার, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যই তাঁদের নিত্য সঙ্গী।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "...বিদ্রোহের (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব) শেষের দিকে বিশেষ করিয়া বিপর্যয়ের সূচনায় বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব মুসলমানদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া সংগ্রাম হইতে সরিয়া পড়ার পর হইতে হিন্দুরা ক্রমশ মুসলমানদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করিতে থাকে। ইহার উত্তরে মুসলমানেরাও তাহাদিগকে আরও বেশি করিয়া পর ভাবিতে এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। এজন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে তাঁহারা সেদিন সুনজরে দেখিতে পারে নাই।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম: বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৮)

এমনকি যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের (স্থাপিত : ১৮৬৬ খ্রি.) উত্তরসূরী হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলো (ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রি.) সংস্কারপন্থী স্যার সৈয়দ আহম্মদ-এর মতো নেতাও সেই ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, সাংবাদিক ওয়ালিউল্লাহর ভাষায় বলতে গেলে "মুসলমানদিগকেও ইহার ছায়া পর্যন্ত না মাড়াইতে সতর্ক করিয়া দেন। এমনকি প্রগতিশীল মুসলমানদের নেতা জনাব বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং জনাব রহমতুল্লাহ সায়ানীর যোগদানেও মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের প্রতি অনাকৃষ্ট থাকিয়া যায়।"

এই প্রেক্ষাপটে একথা বলা যথার্থই হবে যে, ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে যখন কোলকাতায় মহামেডান লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে একটা সংস্কারপন্থী মনোভাবের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়কে পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে এর চালিকাশক্তি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের প্রচেষ্টা সবেমাত্র শুরু হলো, তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত। সত্যি কথা বলতে কি, এদের পুনর্জন্মের সময়টা তো ১১৩ বছর আগে পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালেই হয়েছে।

এজন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে অগ্রগতির মানদণ্ডে এই দুটো সম্প্রদায় বিরাট তফাতে দাঁড়িয়ে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত আর দুর্যোগের মাঝ দিয়ে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এসময় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে কেবলমাত্র হামাগুড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইংরেজদের দালাল হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে; আর তখন এরই পাশাপাশি শতাধিক বছর ধরে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পূরক শ্রেণী পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থায় নানা প্রগতিশীল দর্শনের বুলি কপচিয়ে বাহবা কুড়াচ্ছে। আসলে সবার অজান্তে এঁরা তখন সর্বভুক ও সর্বগ্রাসী এবং ভবিষ্যতের অলীক স্বপ্নের সৌধ রচনা করে বসে রয়েছে।

সঠিকভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরো সময়কালটাই হচ্ছে সবচেয়ে ঘটনাবহুল। এ সম্পর্কে গবেষকরা নানাভাবে ব্যাখ্যাদান করে বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সত্যিকারভাবে বলতে গেলে এসব প্রতিবেদনের অধিকাংশই অসম্পূর্ণ। কেননা উপ-মহাদেশে সংঘটিত প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে যেখানে তৎকালীন রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দু ইংল্যান্ডের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেখানে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওধারে ইংরেজদের আদি নিবাসভূমিতে বিরাজমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা নিতান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গবেষক পারসিভাল স্পেয়ার তাঁর রচিত 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া-২' (১১ সং ১৯৮২) গ্রন্থে নানা ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এসব তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কমন্স সভায় আইন পাসের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রহিত এবং সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি প্রদান করা হলে বিশেষ করে ইংল্যান্ডের উচ্চ মহলে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এ সময় সর্বত্রই যে আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে তা হচ্ছে এই যে, অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং ইংরেজ স্বার্থে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন বিবেচিত হবে।

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখার দরকার যে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন কমনস সভায় ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ পরবর্তী ২০ বছর অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবায়ন করা হয়, তখন ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী মহলের সমর্থনে উইলিয়াম উইলবারফোর্স কর্তৃক উত্থাপিত খ্রিস্টধর্মের প্রচারের অনুমতিদান সম্বলিত সংশোধিত প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। উপরন্তু সমাজ সংস্কারক ও ভারতের এককালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড রিচার্ড ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২ খ্রি.) কর্তৃক উত্থাপিত সতীদাহ (সদ্য বিধবা মহিলা পোড়ানো) বন্ধকরণ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব বারংবার স্থগিত রাখা হয়।

আলোচ্য সময়ে দুটো বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত ইংল্যান্ডে তখন রক্ষণশীল টোরী দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয়ত সমগ্র ইউরোপে তখন ফরাসি ব্যক্তিত্ব নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং জ্যাকোবিন্সদের প্রচণ্ড প্রভাব বিরাজমান। ইংরেজরা এই প্রভাবের দরুন সবচেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল।

ভারত সম্পর্কে ব্রিটেনের তিন ধরনের চিন্তাধারা

এ ধরনের এক পটভূমিতে মোটামুটিভাবে ইংল্যান্ডে তখন ভারত উপমহাদেশ সংক্রান্ত তিন ধরনের মনোভাব বিদ্যমান ছিল। প্রথমেই "ইভাজেলিক্যাল" মতবাদের কথা বলতে হয়। এঁরা যদিও ধর্মনিরপেক্ষ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তবু এঁদের সুস্পষ্ট দাবি হচ্ছে, ভারতের সতীদাহ, ক্রীতদাস প্রথা এবং ধর্মের নামে ঠগীদের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি কঠোর হস্তে বন্ধ করা ইংরেজ রাজশক্তির জন্য অবশ্য করণীয়। তাই এদের শ্লোগান, 'পাশ্চাত্যের খ্রিস্ট ধর্মকে পূর্বে নিয়ে যাওয়া হোক। কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই এমন এক সংস্কারমুক্ত ভারত সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, যেখানে স্বচ্ছন্দে দাবি করা যাবে যে, প্রস্ফুটিত ফুল সূর্যমুখী হয়েছে। এ ধরনের মতাবলম্বীদের নেতৃত্বে ছিলেন উইলিয়াম উইলবারফোর্স, উইলিয়াম পিট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর চার্লস গ্রান্ট প্রমুখ।

এ সময় রক্ষণশীল টোরী দলের মধ্যে অবস্থানকারী আর একটি প্রভাবশালী গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদের বক্তব্য ছিল বেশ একরোখা। এরা শুধু যে ভারতে ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং অবাধ অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন তাই-ই নয়, এঁদের পরিষ্কার কথা হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম ছাড়াও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সবকিছুই মহান ও উন্নত। অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেখানে স্থবির হয়ে রয়েছে সেখানে একমাত্র পাশ্চাত্যের সভ্যতা সচলভাবে সম্মুখপানে ধাবমান এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ অর্জনে সক্ষম। তাই ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে গলধঃকরণ করাতে হবে। এই মতাদর্শের নেতা ছিলেন বিখ্যাত গ্রন্থ "হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া" (১৮১৭ খ্রি.) লেখক জেমস মিল।

আলোচ্য সময়ে ইংল্যান্ডের উচ্চ সমাজে তৃতীয় একটি মতাদর্শ বিদ্যমান ছিল। এঁরা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরিরত যুবক কর্মচারীদের কথাবার্তা ও চিঠিপত্রে প্রকাশিত মতামত থেকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। মাত্র দেড় যুগের ব্যবধানে এসব চাকরিজীবীই ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে বসল। এঁদের মতাদর্শ বেশ কিছুটা উদারপন্থী। সোজা কথায় এঁদের বক্তব্য হচ্ছে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা খুব একটা সুখকর হবে না। ভারতের জীবনাদর্শের মধ্যে যেমনভাবে যুগের পর যুগ ধরে এক সময় ইসলামী আদর্শের সমন্বয় হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে পাশ্চাত্যের দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে এবং তার গতি হবে 'মন্থর অথচ স্থিতিশীল।' এই ধরনের মতাদর্শের প্রবক্তাদের মধ্যে মাউন্ট স্টুয়ার্ড এ্যালফিনস্টোন

(১৭৭৯-১৮৫৯ খ্রি.) স্যার চার্লস মেটকাফ (১৭৮৫-১৮৪৬ খ্রি.) এবং স্যার জন ম্যালকম (১৭৬৯-১৮৩৩ খ্রি.) অন্যতম ছিলেন। এ্যালফিনস্টোনের প্রচেষ্টায় বোম্বাই এলাকায় মারাঠি ও গুজরাটিদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছিল। চার্লস মেটকাফ যখন দিল্লী এলাকার শাসনের দায়িত্বে ছিলেন, তখন সেখানে অত্যন্ত সন্তর্পণে পাশ্চাত্যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। আর জন ম্যালকম বোম্বের গভর্নর থাকাকালীন ভারতীয়দের সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নতুন স্লোগান উচ্চারণ করলেন। স্লোগানটি হচ্ছে "অতএব আমরা ঠাণ্ডা মাথায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার নীতি বাস্তবায়িত করবো।"

এক কথায় বলতে গেলে উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থকরা ছিলেন ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল টোরী দলীয় আর তৃতীয় মতাবলম্বীরা ছিলেন উদারপন্থী। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের তৎকালীন ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলীয় সরকার এই তৃতীয় উদারপন্থী মতামতকে গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলো।

একথা চিন্তা করলে আজ বিস্মিত হতে হয় যে, সে আমলে পদানত ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে ইংল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৭ বছরকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর এই নীতি হচ্ছে 'পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রাচ্যের (ভারতের) দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে হবে–কিন্তু সে রকম কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এর পাশাপাশি ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের ইংরেজ এলাকায় সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হলেও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, খ্রিস্টধর্ম প্রচারে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো পৃষ্ঠপোষকতা থাকবে না।

এ ধরনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতে গভর্নর জেনারেল হিসেবে পরবর্তীতে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর (১৭৭৪-১৮৩৯ খ্রি.) গৃহীত পদক্ষেপগুলো ইংরেজ-এর স্বার্থে খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল।

এক্ষণে আমাদের বিচার করা দরকার যে, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতায় এর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ইতোপূর্বে কয়েকবার একথাটা উল্লেখ করেছি যে, উপমহাদেশে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সে আমলে এ দেশে ইংরেজদের প্রধান সম্পূরক শক্তির ভূমিকা পালন করেছিল। আলোচ্য সময়ে কোলকাতা তথা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে উদীয়মান বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর অভিন্ন লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও তিনটি চিন্তাধারার স্রোত বিদ্যমান ছিল। সুষ্ঠু আলোচনার লক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও এই তিনটি মতবাদের কথা পুনরায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে হলেও উল্লেখ করতে হচ্ছে।

প্রথমেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনরি লুইস ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.) কথা বলতে হয়। এঁরই প্রবর্তিত মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল 'ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ।' এঁদের বক্তব্য হচ্ছে, অবাধ অর্থনীতি থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবটুকুই গ্রহণ করতে হবে। ডিরোজিওর সমর্থকদের মধ্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রাম গোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রি.), রামতুন লাহিড়ী প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। বাংলার সাঁমাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য হলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এঁদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় চিন্তাধারাকে রাধাকান্ত-ভুদেব-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এঁদের কথা হচ্ছে যে, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামির বেড়াজাল ভেদ করে কিঞ্চিৎ সংশোধনের মাধ্যমে এবং সুষ্ঠু ব্যাখ্যাদানের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মের আদর্শকে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব। অতএব, পাশ্চাত্য দর্শন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গলধঃকরণের সমস্ত প্রচেষ্টা বর্জনীয়। এ সময় তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ হচ্ছে রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) প্রবর্তিত সমন্বয়ের চিন্তাধারার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সম্পূরক হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলা। তিনি প্রথমেই হিন্দু যুবকদের দলে দলে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। অথচ রামমোহন রায় ছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার গোঁড়া সমর্থক। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত দিন ধরে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে ইউরোপীয় আদব-কায়দায় ইংরেজদের সঙ্গে উঠা-বসা করলেও সন্ধ্যার পর ভারতীয় দর্শন এমনকি ইসলামী ভাবধারা সম্পর্কিত বিষয়ে পড়াশুনা করতেন।

ভারত সম্পর্কে ইংরেজদের 'ধীরে চলো নীতি'

এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন টোরী দল ইংরেজ শাসিত ভারত সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে "ধীরে চলো"-র ভিত্তিতে যে নীতি গ্রহণ করেছিল, রামমোহন রায় কর্তৃক প্রবর্তিত 'সমন্বয়ের চিন্তাধারার' সঙ্গে তার অপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত সমন্বয়ের চিন্তাধারা ছিল ইংরেজদের একমাত্র ভরসার স্থল। কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী নিজেদের গোষ্ঠী ও শ্রেণীস্বার্থে চরম আগ্রহে গ্রহণ করেছিল বলেই কমন্স সভায় গৃহীত আলোচ্য নীতি খুবই নির্বিঘ্নে এদেশে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, উপরে বর্ণিত তিনটি মতাদর্শের সকলেই ইংরেজদের সমর্থক ছিল। অথচ এসময় বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, একটা সংস্কারপন্থী চিন্তাধারার ভিত্তিতে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যখন সবেমাত্র হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে, তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত। সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাপারটা অনুধাবনের লক্ষ্যে অত্র পরিচ্ছেদে কমন্স সভায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের গৃহীত নীতি এবং অভিন্ন লক্ষ্যে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত সমাজের বিরাজমান তিনটি চিন্তাধারা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উল্লেখ করতে হয়েছে। এক্ষণে আমার বিশ্বাস এই যে, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর সময়কালের মধ্যে এই যৌবনপ্রাপ্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কত ধরনের সমিতি গঠন করেছিল, তার বিচিত্র ইতিহাস উপস্থাপন না করলে এতদসম্পর্কিত প্রতিবেদন অসমাপ্ত থেকে যাবে।

তা'হলে মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ইতিহাসের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে বঙ্গীয় এলাকার সমাজ জীবনে আমরা যে সুস্পষ্ট চিত্রটা দেখতে পাই তা' হচ্ছে, ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক একটি পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণী এবং এরই পাশাপাশি সংস্কারপন্থী মনোভাবের ভিত্তিতে সদ্য হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে এমন এক বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এরপর জীবনযুদ্ধে শুরু হলো এই দুই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অসম

প্রতিযোগিতা। তবে এখানে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার। যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোলকাতা কেন্দ্রিক এদেশীয় সুবর্ণ শ্রেণী এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের কর্নওয়ালিশ মার্কা জমিদার শ্রেণীর মাঝ থেকে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর জন্ম হয়েছে, সেখানে কিন্তু বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের পূর্ণ জন্মলগ্নে এ ধরনের দু'টি স্তর প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বলা যায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের গবেষক ড: আজিজুর রহমান মল্লিকের মন্তব্য আবারও উল্লেখ করতে হচ্ছে, "মুসলমানদের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্লথ অভ্যুত্থান। অথচ আধুনিককালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই একটি জাতির সকল প্রকার উন্নতির সোপান। ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেনি।" (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান : বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮২)।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের এই শ্রেণীর ভিত্তিটা যে সুদৃঢ় ছিল তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়। তৎকালীন ভারত উপমহাদেশে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষায় এঁরাই ছিলেন সবচেয়ে উন্নত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে এঁদের মাঝে অসংখ্য প্রতিভাবান ও মেধাবী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে। তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিটি পেশায় এঁরা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। এঁদের কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে, অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে ইংরেজ ও বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নাম ও পরিচিতি উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি : স্যার উইলিয়াম জোনস কর্তৃক ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি কলিকাতায় স্থাপিত। প্রথম সভায় ৩০ জনের মতো ইংরেজ উপস্থিত ছিল। জোনস সাহেব তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, "... আপনারা শিক্ষিত নেটিভদের এই সমিতির সদস্য হিসেবে গ্রহণ করবেন কি-না, তা নির্ধারণ করবেন।" প্রাপ্ত রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪৫ বছর পরে ১৮২৯ সালের ৭ই জানুয়ারির সভায় এদেশীয় লোকদের সর্বপ্রথম সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

আত্মীয় সভা : রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সাপ্তাহিক বৈঠকে বাল্যবিবাহ সমস্যা, জাতিভেদ সমস্যা, নিষিদ্ধ খাদ্য সমস্যা, সতীদাহ সমস্যা, বহু বিবাহ সমস্যা নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলাপ হতো। বৈঠকের সমাপ্তিতে ব্রাহ্মসঙ্গীত পরিবেশিত হতো। বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপী মোহন ঠাকুর, তদীয় পুত্র প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, তেলেনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রাজা কাশীনাথ প্রমুখ।

হিন্দু কলেজ : ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় স্থাপিত। পরবর্তীকালে এই কলেজেরই পরিবর্তিত নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ক্যালকাটা বুক সোসাইটি : রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় স্থাপিত। নতুন ইংরেজি শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার লক্ষ্যে এই সোসাইটি স্থাপিত হয়।

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি : রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য নতুন স্কুল স্থাপন এবং পুরাতন স্কুলগুলোকে ইংরেজি শিক্ষাদানের লক্ষ্যে উপযোগী করে গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরেজদের উদ্যোগে গঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান : মূলত কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মধ্যবর্তী সময়ে কোলকাতায় এ ধরনের বেশ কয়েকটি ইংরেজি নামের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গড়ে উঠে। এগুলো হচ্ছে :

১. লিটারেরি সোসাইটি, ২. ওয়রিয়েন্টাল লাইব্রেরি সোসাইটি, ৩. এগ্রিকালচার এ্যান্ড হর্টিকালচার সোসাইটি, ৪. কমার্শিয়াল এ্যান্ড প্যাট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন (স্থাপিত ১৮২৮ খ্রি.) কোষাধ্যক্ষ ছিলেন রামমোহন রায়, **৫. লেডিস সোসাইটি** (স্থাপিত ১৮২৮ খ্রি.)। এই লেডিস সোসাইটি স্থাপনে ইংরেজদের সঙ্গে যৌথভাবে ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং কাশীনাথ মল্লিক। **৬. ক্যালকাটা মেডিক্যাল এ্যান্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি।**

গৌড়ীয় সমাজ : সম্পূর্ণভাবে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কোলকাতায় এই সমাজ স্থাপিত হয়। কোলকাতা হিন্দু কলেজের মতো এই প্রতিষ্ঠানের বৈঠকগুলোতে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয় মতাদর্শের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেছেন। একদিকে যেমন রামমোহন রায়ের দলভুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কাশীনাথ মল্লিক, রাজা বৈদ্যনাথ, তাঁরাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ গৌড়ীয় সমাজের বৈঠকগুলোতে যোগ দিতেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু রক্ষণশীল দলীয় রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ, তর্ক পঞ্চানন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নিয়মিত আগমন হয়েছে। এঁরা সবাই বাঙালি সমাজ বিশেষ করে নিজেদের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন ছিলেন। গৌড়ীয় সমাজ ঠিক কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল তা বলা সম্ভব নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো "এদেশীয় লোকদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে।"

এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন : 'ইয়ং বেঙ্গল' গ্রুপের প্রবর্তক ও নেতা মুক্তবুদ্ধির হেনরি লুইস ডিরোজিও কোলকাতায় ১৮২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে এই সমিতি স্থাপন করেন। ডিরোজিও-র বসতবাটির বৈঠকখানায় স্থাপিত এই সমিতির বৈঠকগুলোতে মূলত বিভিন্ন বিষয়ে তুমুল বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর ঘোষিত নীতি প্রতিধ্বনিত করে এঁরা ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সামগ্রিকভাবে গ্রহণের জন্য সোচ্চার হয়। ইংরেজদের বশংবদ হিসেবে এই তরুণ গোষ্ঠীর কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত স্লোগান হচ্ছে, "হিন্দুইজম নিপাত যাক", "রক্ষণশীলতা বর্জন করো।" অন্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রমুখ এসব বিতর্কে যোগদান করতেন। এই একাডেমীর পক্ষ থেকে 'পার্থিনন' নামে যে মুখপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষের হুমকিতে তা' বন্ধ হয়ে যায়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এসব বিতর্ক ও আলোচনা সভায় প্রায়ই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এডোয়ার্ড রায়ান, ডেপুটি গভর্নর বার্ড এবং ডেভিড হেয়ার প্রমুখ প্রায়ই যোগদান করতেন। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার পদ থেকে চাকুরিচ্যুত হয়ে মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর আত্মহত্যা করেন।

ধর্মসভা : বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করলে কোলকাতায় সনাতনপন্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং মাত্র মাসাধিককালের মধ্যে বিধর্মী কর্তৃক এ ধরনের আনীত বিধান বানচালের লক্ষ্যে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে "ধর্মসভা" নামীয় এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়।

ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপের পত্র-পত্রিকা : ডিরোজিও-র জীবদ্দশায় 'পার্থিনন' নামক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সমর্থকরা উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে হিন্দু সনাতনপন্থীদের মোকাবেলা করে। এসব পত্রিকার মধ্যে 'হেসপারাস', 'ইস্ট ইন্ডিয়ান,' 'রিফর্মার', 'এনকোয়ারার', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি অন্যতম। এই গ্রুপের প্রধান হাতিয়ার ছিল পত্র-পত্রিকা আর এরই পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল অসংখ্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ সময় বাঙালি মুসলমানদের পরিচালিত কোনো পত্র-পত্রিকা কিংবা সমিতি গঠনের তথ্য পাওয়া যায় না। বাঙালি মুসলমানরা এ সময় প্রথমে শিখ বিরোধী ও পরে ইংরেজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছে।

১৮২৪ থেকে ১৮৪০ খ্রি. পর্যন্ত অন্যান্য সমিতি : বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই ১৬ বছরে কোলকাতায় অসংখ্য সমিতি গড়ে ওঠে। এরূপ সমিতি স্থাপন এ সময় বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এক ধরনের 'ম্যানিয়া'-তে পরিণত হয়েছিল। নিম্নে নমুনা হিসেবে কয়েকটি নাম দেওয়া হলো :

১. বঙ্গহিত সভা
২. এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন (১৮৩০ খ্রি.)
৩. জ্ঞানসন্দীপণ সভা (১৮৩০ খ্রি.)
৪. ডিবেটিং ক্লাব (১৮৩০ খ্রি.)
৫. বঙ্গরঞ্জিনী সভা
৬. বিজ্ঞানদায়িনী সভা
৭. সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২ খ্রি.)
৮. জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা (১৮৩২ খ্রি.)
৯. সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮ খ্রি.)
১০. তত্ত্ব বোধিনী সভা
১১. মেকানিক্স ইনস্টিটিউট
১২. টিচার্স সোসাইটি (সূত্রঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথাঃ ২য় খণ্ড : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : কলিকাতা)।

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা : সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সমিতিগুলোর মধ্যে এই একটিমাত্র সমিতির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাভাষার বিশেষ অনুশীলন করা। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক ছিলেন তাঁরই অকৃত্রিম বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা : উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমিতি হচ্ছে এই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। এর পাঁচজন উদ্যোক্তা ছিলেন যথাক্রমে তারিণীচরণ বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে। তবে এঁদের প্রচারিত ম্যানিফেস্টো থেকে এটুকু অনুধাবন করা যায় যে, এ সময় ডিরোজিও'র অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশনের জৌলুস অনেক হ্রাস পেয়েছে। অথচ

'জ্ঞানোপার্জিকা সভার' প্রভাব তখন ক্রমবর্ধমান এবং ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই সভার সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০০ জন ছিল। উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণীও সংকলিত হতো। এর সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক ছিলেন রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র।

বঙ্গভাষা প্রকাশিত সভা : সম্ভবত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার সরকারি নীতি ঘোষিত হবার পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সভা স্থাপিত হয়েছিল। এর সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত গৌরীশংকর তর্কবাগীশ (পরবর্তীকালে পণ্ডিত গৌরীশংকর 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন) এবং সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই সভার সদস্য ছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা : ১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রস্তাবক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' নামকরণ করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহর্ষির ভাষায় বলতে গেলে, "আমাদিগের উদ্দেশ্য সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এই সভার কর্তৃপক্ষ একাধারে যেমন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন, ঠিক তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে বাঙালি হিন্দু যুবকদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টিরও বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু কোথাও রাজশক্তির বিরোধিতার প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়নি। বছর কয়েকের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০-তে দাঁড়ায়। কোলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব মাত্রই এই সভার সদস্য হন। এ সময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য ক্ষেত্র অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখের অভ্যুদয় সর্বপ্রথম এই পত্রিকার মাধ্যমেই হয়েছিল। কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভার অবদান সর্বাধিক।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩ খ্রি.)

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গঠিত উল্লেখযোগ্য সমিতিগুলোর মধ্যে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' অন্যতম। বেথুন সোসাইটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোলকাতার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বসতবাটির দ্বিতলে এই সমিতি স্থাপিত হয়। "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার ১৪ই জুন তারিখের সংখ্যায় এতদসম্পর্কিত প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় যে, "নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য এক সভা করিয়াছেন।" প্রাপ্ত রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, যেখানে সে আমলের কোলকাতার সবচেয়ে প্রভাবশালী 'বেথুন সোসাইটির' ব্যয়ভার সদস্যদের চাঁদায় পরিচালিত হতো, সেখানে নব্য প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' সমস্ত খরচই এই সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেই বহন করতেন। এমনকি স্বীয় বাসগৃহে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' আলোচনা বৈঠকের পর উপস্থিত সদস্যদের নৈশভোজের ব্যবস্থাদিও করতেন। অবশ্য বিরুদ্ধবাদীরা এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে– 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র কার্যক্রম সে আমলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাহলে

একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক যে, যখন কোলকাতায় 'বেথুন সোসাইটি' বুদ্ধিজীবীর সব রকম চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেখানে একই ধাঁচের আর একটি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' নামক সংস্থা স্থাপনের যৌক্তিকতা কতদূর ছিল। এ সম্পর্কে সম্প্রতি জনৈক গবেষক-এর প্রকাশিত মতামত যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন ..."তখনকার তরুণ বিদ্যোৎসাহীরা কালীপ্রসন্ন সিংহের সভায় গিয়ে যতটা স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনায় যোগদান করতে পারতেন, বেথুন সোসাইটিতে তা পারতেন না। তার প্রধান কারণ বেথুন সোসাইটিতে ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। সভার কাজকর্ম পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। তার শৃঙ্খলা ও সংযত পরিবেশ বাঙালিদের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয় ছিল না। তাই বেথুন সোসাইটির খাঁটি বাঙালি সংস্করণ হয়েছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভা। একটু ঢিলেঢালা ঘরোয়া মজলিসি পরিবেশ না হলে বাঙালিদের বিদ্বৎসভা বা সাহিত্যসভা জমতে চায় না। সেই পরিবেশটি সিংহ মহাশয় তাঁর সভায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আর্থিক সামর্থ্যও ছিল এবং প্রধানত তাঁর পোষকতাতেই সভা চলত। পরিবেশটা পুরো সামন্ততান্ত্রিক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে সভায় আলোচনা হতো। ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই আলোচনা হতো, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনার দিকেই ঝোঁক বেশি।"

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার'উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে নিম্নরূপ :

ক. তরুণ লেখকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠের জন্য দু'তিনশো নগদ টাকা পুরস্কার।

খ. মাঝে মাঝে কৃতী সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। এসবের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রেভারেন্ড ফাদার জেমস লং-এর প্রতি প্রদত্ত সম্বর্ধনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ. বিদ্যোৎসাহিনী' নামক পত্রিকা প্রকাশ।

ঘ. ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা।

ঙ. বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে কাউন্সিল-এ দরখাস্ত পাঠানো ছাড়াও এই সংস্থা থেকে প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে এ মর্মে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হিন্দু বিধবা-বিবাহ করতে ইচ্ছুক যুবকদের প্রত্যেককে সংস্থার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় নগদ এক হাজার টাকা করে পুরস্কার প্রদান করবেন।

পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (৪র্থ সং) গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে 'হুতোম প্যাঁচা' সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) বাংলাদেশের এক অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুততর তাঁর সাহিত্য প্রতিভা। ধনী বংশে ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ধনী সমাজের কদাচারকে শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন, উচ্ছৃঙ্খল আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও সর্বদা একটি মার্জিত পরিশীলিত ভব্য মনের অধিকারী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু না হলে কালে তিনি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের মতোই এক দিক্‌পাল ব্যক্তি হতে পারতেন।...নিতান্ত অল্প বয়সে কালীপ্রসন্ন কোলকাতার নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তরুণ বয়সেই প্রবীণের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।...দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক রেভাঃ লং সাহেব অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হন, তাঁর

অর্থদণ্ডও হয়। কালীপ্রসন্ন নিজে টাকা নিয়ে আদালতে (বিলাতে) উপস্থিত ছিলেন।...অনেক বই লিখলেও 'হুতোম প্যাঁচার' নক্‌শার জন্যই তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।"

সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪ খ্রি.)

এই সমিতির কার্যক্রম থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এ সময় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দুদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচলনের পর হিন্দু ধর্মকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে হিন্দু ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সমাজ সংস্কারক এবং বিদ্বৎসমাজ বিশেষ আগ্রহী হয়। এই প্রেক্ষাপটে সুহৃদ সমিতিকে প্রকৃত অর্থে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত না করে অনায়াসে একটি হিন্দুসমাজ সংস্কারক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কাশীপুরের দমদম রোডস্থ কিশোরী চাঁদ মিত্রের বাসভবনে সুহৃদ সমিতি স্থাপিত হয়। এতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কিশোরী চাঁদ মিত্র বলেন যে, "কেবল প্রবন্ধ রচনা এবং বক্তৃতা দিয়ে কাজ হবে না। প্রাচীন ও নবীন বাঙালি সকলে মিলেমিশে একযোগে সমাজের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে হবে।" এই প্রথম বৈঠকেই কিশোরী চাঁদ মিত্র এ মর্মে প্রস্তাব করেন যে, (ক) স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তন, (খ) বিধবা-পুনর্বিবাহ, (গ) বাল্যবিবাহ বর্জন এবং (ঘ) বহুবিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

সম্প্রতি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'কর্মবীর কিশোরী চাঁদ' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সুহৃদ সমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, এ সময় সুহৃদ সমিতি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের প্রস্তাবক্রমে কোলকাতার উপকণ্ঠে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফলে একথা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায় যে, পরাশক্তি ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে কোলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীর পুরুষরা যেভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুকরণ ও অনুসরণ করে এগিয়ে এসেছিল, তুলনামূলকভাবে এঁদের নারী সমাজের অগ্রগতির গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। অথচ কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের লক্ষ্যে হিন্দু নারীমুক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ হিন্দুধর্ম ও সমাজের ব্যাপক সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এর প্রেক্ষিতেই দেখা যায় যে, সমসাময়িককালে বাংলা ভাষার দিক্‌পালদের প্রায় সবাই সামগ্রিকভাবে সমাজ সংস্কারক-এর ভূমিকায় এবং বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু নারী সমাজের মুক্তির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ সব হিন্দু মনীষীদের মধ্যে অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেক চাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ অন্যতম।

সুহৃদ সমিতি সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্যের বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি লিখেছেন,"...সুহৃদ সমিতি প্রধানত সামাজিক সভারূপেই স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্বৎসভা রূপে নয়। কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্বৎসভার মতো আলোচনা বা প্রবন্ধ পাঠ করা যে সুহৃদ সমিতিতে হতো না তা নয়, কিন্তু সামাজিক সুনীতি ও সত্যাচরণের আদর্শ প্রচার করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এক

কথায় বলা যায়, বিদ্যাসাগর যুগের বিদ্বৎসভার সঙ্গে সামাজিক সভার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। নতুন জ্ঞান বিদ্যার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের অনুভূতি তখন প্রায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ।"

ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭ খ্রি.)

সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলব্যাপী সিপাহী বিপ্লবের ভয়াবহ রণদামামা শুরু হয়ে গেছে ঠিক সেই সময়ে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ফ্যামলি লিটারারি ক্লাব' গঠিত হয়। সে আমলে কোলকাতার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বসতবাটিতে চক্রাকারে এই ক্লাবের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। এসব বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য ও সামাজিক বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করা হতো এবং প্রায়ঃশই সদস্যদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হতো। যে কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এই ক্লাবের সদস্যপদ লাভে বিশেষ অসুবিধা ছিল না। ব্যারিস্টার উড, স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেন্ড ডল, রেভারেন্ড মুলেন্স প্রমুখ ইংরেজরা প্রায়ই এই ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবের বৈঠকে যোগদান করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের রক্তাক্ত সিপাহী বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর জন্য এটা এমন একটা সময় যখন নিজেদের গোষ্ঠী ও শ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি একটা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের উদগ্র বাসনায় এঁদের নেতৃবৃন্দ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। হিন্দু মুসলমানদের মিলিত উদ্যোগে সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত রকম উত্তাপ পর্যন্ত এঁরা সযত্নে পরিহার করেছিল। এজন্যই অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে, সুহৃদ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী চাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙালি মনীষীদের বক্তব্য হচ্ছে, "সিপাহী বিদ্রোহ হচ্ছে সিপাহীদের ব্যাপার এবং এর সঙ্গে জনসাধারণের কোনো সংশ্রবই নেই।"

এখানেই শেষ নয়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরী শংকর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলো এ সময় তীব্র ভাষায় সিপাহী বিপ্লবের নিন্দা জ্ঞাপন (বিস্তারিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে) করেন। উপরন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রকাশ্য সভায় সিপাহীদের কর্মকাণ্ডের জন্য তীব্র নিন্দা করা ছাড়াও ইংরেজদের সমর্থনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বক্তৃতাদানের পর প্রস্তাব পাস করা হয়। রাজা রাধাকান্ত'দেব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' প্রতিষ্ঠাতা কালী প্রসন্ন সিংহ এবং কোলকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হরেন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ ইংরেজদের পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তৃত দান করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোলকাতায় রাজশক্তি ইংরেজদের সক্রিয় সহযোগিতায় বুদ্ধিজীবীদের আরও যেসব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সবের মধ্যে 'বড় বাজার গার্হস্থ্য সমাজ' এবং 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান' সভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ (১৮৫৭ খ্রি.)

বাংলা ১২৬৪ সালে অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতে সিপাই বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং যখন হাজার হাজার দেশপ্রেমিক এই বিপ্লবের বহ্নিশিখায়

আত্মাহুতি দিচ্ছিল, ঠিক তখনই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী প্রসাদ দাস মল্লিকের উদ্যোগে কোলকাতার জোড়াসাঁকোতে 'বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ' স্থাপিত হয়। এর প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেছিলেন বড়বাজারের রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট-এর উঠতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠবিহারী মল্লিক। প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যায় যে, 'গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাকালে সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং প্রসাদ দাস মল্লিক এবং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাক্কা ন'বছর ইংরেজ পাদ্রী রেভারেন্ড জেমস লং-এর সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে প্রতিমাসেই নিয়তিমভাবে ইংরেজি ও বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এমনকি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান ছাড়াও প্রবন্ধগুলো পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বিতরণ করার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়েছিল। সম্ভবত অর্থপ্রাপ্তির সুবিধার লক্ষ্যে সুবর্ণ বণিক গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয়কে প্রতিষ্ঠানের সহকারী সম্পাদক পদে রাখা হয়েছিল। এই 'সাহিত্য সমাজ'-এর পক্ষ থেকে কোলকাতায় মাঝে-মধ্যে বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা প্রদানের রেওয়াজ চালু করা হয়েছিল। এছাড়া ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানের এককালীন সভাপতি ইংরেজ মিশনারি পাদ্রি জেমস লং-এর বিলাত প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত বিদায় সম্বর্ধনায় ইংরেজিতে লেখা যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় এবং ফাদার লং লিখিতভাবে তার যে জবাব পাঠ করেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনন্দনপত্রে বলা হয় যে, "...আমাদের বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনি যেভাবে এই দেশের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে অবদান রেখেছেন, তার মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আপনার প্রায় সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়ে আপনি বাঙলার রায়ত শ্রেণী ও নারী জাতির দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহৃত বহু প্রবাদ বাক্য ও কৌতুক সংগ্রহপূর্বক আমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রার চিত্র পাশ্চাত্য সভ্য জগতের সম্মুখে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তা বহু ভারতীয় গবেষকের পক্ষে সম্ভব নয়।... ।"

প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের জবাবদানকালে জেমস লং বলেন,"...বাঙলায় একটা পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। সুখের বিষয় এই যে, বাঙলা ভাষা তার পুরানো সংস্কৃত স্টাইল পরিহার করতে শুরু করেছে এবং নতুন রূপ গ্রহণ করছে। আমার বিশ্বাস বাঙালি বন্ধুরা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে, শুধু 'কথার' মানুষ না হয়ে 'কর্মের' মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজ সবচেয়ে বেশি... ।"

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা ১৮৬৭ খ্রি.

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারি কোলকাতায় 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। ইংরেজ মিশনারি রেভারেন্ড জেমস লং সাহেব এ সময় বেশ কিছুদিন ধরেই কোলকাতায় সমাজবিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এতে বিশেষ সাড়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড থেকে সদ্য আগত কুমারী কার্পেন্টার নামীয় জনৈকা ইংরেজ মহিলা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর কোলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কোলকাতায় বসবাসকারী বিশিষ্ট ইংরেজ ও এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কুমারী কার্পেন্টার উল্লেখিত সভায় 'গ্রেট ব্রিটেনস্থ সমাজবিজ্ঞান উন্নয়নের জাতীয় সমিতির" শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ফলে উপস্থিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি বিবেচনা এবং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট

একটি কমিটি গঠন করা হয়। এঁরা হচ্ছেন রেভারেন্ড লং, জাস্টিস নর্মান, জাস্টিস ফিয়ার, সিডান কার, ই সি বেইলি, আর্থার গ্রোট, এ্যাটকিনসন, ফার্কুয়ার, ম্যাকেনজি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারাচাঁদ মিত্র, ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জী, রামচন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কমিটি ব্রিটেনের সমাজবিজ্ঞান সমিতির এ দেশীয় শাখা সংস্থাপনের প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপিত করে। ফলে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারি মেটকাফ হলে আহূত সাধারণ সভায় 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের ৪টি বিভাগ থাকবে। এগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য। প্রতিটি বিভাগ কী কী বিষয়ে অনুসন্ধান করবে, সে সম্পর্কে পৃথক পৃথক সার্কুলার তৈরি করে বিতরণ করা হয়েছিল।

এ সময় কোলকাতায় বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের সমিতি ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গুরু ও পথপ্রদর্শন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উল্লেখ করে লিখেছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামবঙ্গিনী, শ্যামতরঙ্গিনী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, ...সভাসকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।" (বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ খণ্ড ১২৯২ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৫ খ্রি.)

কোলকাতায় পাঠাগার স্থাপনের হিড়িক

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজ পরিপক্কতা লাভের লক্ষ্যে ইংরেজদের সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন একটার পর একটা সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিল তখন ঠিক তারই পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল বাংলা নাট্য আন্দোলন এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জোয়ার। বাংলা নাটকের মুক্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করায় এক্ষণে সে আমলে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থাপিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার বা পাঠাগারের নাম ও পরিচিতির উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি। এসবের মধ্যে রয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার (১৮৩৬ খ্রি.), মেদেনীপুরের রাজনারায়ণ পাঠাগার (১৮৫২ খ্রি.), কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৮ খ্রি.) উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯ খ্রি.) শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭১ খ্রি.), ইউনাইটেড রিডিং রুমস (১৮৭২ খ্রি.), চন্দননগর পুস্তকাগার (১৯৭৩ খ্রি.), শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৭৪ খ্রি.), তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮২ খ্রি.), বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি (১৮৮৩ খ্রি.), কুমারটুলি ইনস্টিটিউট (১৮৮৪ খ্রি.,) বালি সাধারণ পাঠাগার (১৮৮৫ খ্রি.), চৈতন্য লাইব্রেরি (১৮৮৯ খ্রি.), আশুতোষ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি (১৮৯১ খ্রি.,) ভারতী পরিষদ (১৮৯০ খ্রি.) এবং বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১ খ্রি.)।

কিন্তু সভা, সমিতি এবং পাঠাগার স্থাপনের যে ইতিহাসই রচনা করি না কেন, কোলকাতায় সবচেয়ে প্রথমে এ ধরনের যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪ খ্রি.)। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সমস্ত উদ্যোগটাই হচ্ছে, কোলকাতানিবাসী ইংরেজদের। এঁদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোনস। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের

১৫ই জানুয়ারি তারিখে স্যার উইলিয়াম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় ৩০ জন ইংরেজ যোগদান করেছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "এর (সোসাইটির) সদস্য হিসেবে নেটিভ শিক্ষিতদের গ্রহণ করা হবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত আপনারাই গ্রহণ করবেন।"

এশিয়াটিক সোসাইটিতে নেটিভদের সদস্য হিসাবে গ্রহণের জন্য প্রায় ৪৫ বছরের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৮২৯ সালের ৭ই জানুয়ারি বৈঠকে এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সদস্য পদ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সনাতন পন্থীরা ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত করলেন 'ধর্মসভা'

কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও বলতে হয় যে, ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন, উনবিংশ শতাব্দীর এই ত্রিশ দশকেই ডি রোজরিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন, লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ আইন পাস (১৮২৯ খ্রি.) এমনকি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের উদ্যোগে হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা এবং আরও পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবাবিবাহ সমর্থন এসবের কোনো কিছুই এই সনাতন ধর্মের 'গোঁড়ামির ভিত্তিকে শিথিল করতে পারেনি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে সনাতনপন্থীরা মূল হিন্দুধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠন করলেন 'ধর্মসভা'।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মার্কসীয় গবেষক বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশকালে লিখেছেন, "...হিন্দু শাস্ত্রকাররা (প্রাচীন ও মধ্যযুগের এলিটশ্রেণী) বলেন যে, জন্মের দ্বারাই 'বর্ণ' ঠিক হয়, অর্থাৎ কুল জন্মগত। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শূদ্রের পুত্র শূদ্র, এটাই হিন্দু সমাজের চিরস্থায়ী জাতিবর্ণগত ব্যবস্থা এবং স্বয়ং ভগবানই এই ব্যবস্থার প্রবর্তক। ভগবান নিজেই বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেন।

'হিন্দু ধর্ম চতুর্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দু সমাজ 'বর্ণাশ্রমী সমাজ'। হিন্দুসমাজের এই ভিত আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কারক অথবা কোনো শাসক ভাঙতে পারেননি, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রিস্টান ইংরেজরা, কেউ না। সংস্কারকদের মানবতার বাণী, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন শিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদির ফলে তার গায়ে খানিকটা আঁচড় লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ভিত্তিতে ফাটল ধরেনি। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকেও বোঝা যায়, একথা কতখানি সত্য।"

তাই একথা ভাবলে আজ আশ্চর্য হতে হয় যে, ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে প্রায় ৩০ বছর পর্যন্ত বিধর্মী তো দূরের কথা, ব্রাহ্মণ ছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়েরই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের সংস্কৃত শিক্ষার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, শোভাবাজারের রাজ পরিবারের গোপী মোহন দেব ও রাজকান্ত দেব, ধনশালী রাধামাধব, রামকমল সেন ও রসময় দত্ত প্রমুখ। শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রথমে ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে কায়স্থদের এবং পরে ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়।

তবুও একটা কথা থেকে যায়। আইন পাস করেও যেমন হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ আজও পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি তেমনি সকল বর্ণের হিন্দুদের সংস্কৃতি শিক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ সৃষ্টিতে বহু বছর সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ভারত উপমহাদেশে 'বাবু' হচ্ছে একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। কালের ব্যবধানে এই বাবু থেকেই 'বাঙালি বাবু'। আর এই বাঙালি বাবুই হচ্ছে সে আমলের ইতিহাস বিখ্যাত বাবু সমাজ। বিশ্বের নানা ভাষায় লিখিত উপন্যাস সাহিত্য আর ইতিহাসে এই 'বাবু সমাজের' উল্লেখ রয়েছে। আজও পর্যন্ত উপমহাদেশের অবাঙালি প্রধান এলাকাগুলোতে 'বাবু সমাজ' বলতে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদেরই বোঝানো হয়ে থাকে। সে আমলে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোলকাতা কেন্দ্রিক এঁদের সংস্কৃতিকেই 'বাবু কালচার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বালাই বাহুল্য যে, ইংরেজদের বদৌলতেই সে আমলে এই বাবু সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এঁরা চিরকালই ছিলেন ইংরেজদের বশংবদ। তাঁদের ইতিহাস শুধু রোমঞ্চকরই নয়—কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কোলকাতার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও গবেষক ডক্টর অতুল সুর (রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩১) অষ্টাদশ শতাব্দীর এই 'বাবু সমাজ' সম্পর্কে সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় যে অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তাঁরা পয়সা করেছিলেন দেওয়ানী, বেনিয়ানী ও ব্যবসা-বাণিজ্যে। গোড়ার দিকে অবশ্য অনেকে ঠিকাদার ও চাকুরি করেও পয়সা উপার্জন করেছিল। কলকাতায় ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন কুশারী জাহাজে মাল ওঠানো নামানোর ঠিকাদারী করতেন। তাঁর ছেলে জয়রাম কলকাতার কালেকটর বাউচারের অধীনে আমিনের চাকুরী করতেন। বনমালী সরকার ইংরেজদের ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন। নন্দরাম সেন কালেকটরের সহকারী ছিলেন। গোবিন্দ মিত্রও তাই। শেঠ-বসাকরা ব্যবসা করতেন। রতু সরকার ও শোভরাম বসাকও তাই। শোভারাম ইংরেজদের সঙ্গে সুতা ও বস্ত্রের কারবার করে কোটিপতি হয়েছিলেন। শতাব্দীর মধ্যাহ্নে গোকুল মিত্র নূনের একচেটিয়া ব্যবস্থা ও কারবার করে কোটিপতি হয়েছিলেন। শতাব্দীর মধ্যাহ্নে গোকুল মিত্র নুনের একচেটিয়া ব্যবস্থা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতি ও ঘোড়ার রসদ সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। পাথুরিয়া ঘাটার মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় শুকদেব মল্লিক ও নয়নচাঁদ মল্লিক পয়সা করেছিলেন তেজারতি কারবার করে। সিঁদুরিয়া পট্টিতে নয়নচাঁদের সাতমহল বাড়ি ছিল। নয়নচাঁদের ছেলে নিমাই চাঁদ নুনের ও জমিজমার ফাটকা করে তিন কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিকের পিতামহ ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। অগাধ ধনের মালিক হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্যাতি ছিল গৌরী সেনের। সামান্য অবস্থা থেকে আমদানি রপ্তানির কারবারে তিনি অসাধারণ ধনশালী হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মহারাজ রাজবল্লভ। হেস্টিংস-এর দৌলতে যাঁরা বড়লোক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্তবাবু ও পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ। কৃষ্ণকান্ত নন্দী মুদীর দোকানে কাজ করতেন বলে বাঙলার জনসমাজে কান্ত মুদী নামে পরিচিত ছিলেন। ফারসি ও যৎসামান্য ইংরেজি জানতেন এবং সেজন্য ইংরেজ কুঠিতে মুহুরীর কাজ পেয়েছিলেন। সিরাজের ভয়ে ভীত ওয়ারেন হেস্টিংসকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। হেস্টিংস যখন গভর্নর জেনারেল তখন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত ব্যবসায় মুৎসুদ্দী হয়ে হেস্টিংস-এর সকল রকম দুষ্কার্যের সহায়ক হন।...অত্যন্ত চতুর ও ফন্দিবাজ লোক ছিলেন ও কাশিমবাজার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থান্ধ বঙ্গসন্তান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলার ইতিহাস কলঙ্কিত করে গেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। এখানেই শেষ নয়। ৮২ বছর বয়স্ক গবেষক ডঃ অতুল সুর এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ রাজস্ব আদায়কারী রেজা খাঁর অধীনে কানুনগোর কাজ

করতেন।...পাঁচসালা বন্দোবস্তের সময় রাণী ভবানীর জমিদারির (নাটোর এলাকায়) কিয়দংশ হস্তগত করেন ও পাইকপাড়ার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার হিসাবে অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোম্পানির অধীনে চাকুরি করে আর যারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভুর্কৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর বড় লোক ছিলেন বালাখানার চূড়ামণি দত্ত। ধনগরিমায় তিনি ছিলেন নবকৃত দেবের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাবু সমাজ গঠনের পূর্ব ইতিহাস। পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক পূর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলতে হলে, "গোবিন্দ রামদের (ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের এককালীন সেনাপতি ও পরবর্তীতে কোলকাতার ইংরেজ জমিদার হলওয়েলের অত্যাচারী ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ডেপুটি) যুগ শেষ হলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল অন্য যুগ। কলকাতার বনেদী পাড়ায় জন্ম নিতে লাগল নতুন এক সম্প্রদায়, ইতিহাসে যাকে নাম দিয়েছে 'বাবু'। আঠারো শতকের শেষ ভাগের আগেও "বাবু" শব্দটা ছিল মর্যাদাসূচক। কিন্তু তখনও তার বহুল প্রচলন ঘটেনি। ঘটেছিল আঠারো শতকের শেষ পর্ব থেকে।...পলাশী যুদ্ধের পরের কলকাতায় বাঙলার বা বাঙালির পতন অভ্যুদয়ের ইতিহাসের নায়কের ভূমিকা নিয়েছে এই বাবু সমাজ। (পুরানো কলকাতার কথাচিত্র : ২য় সংস্করণ : দে'জ পাবলিশিং কলকাতা)।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে 'হুতোম প্যাঁচা' (১৮৪০-১৮৭০ খ্রি.) সর্ব প্রথম তাঁর সাহিত্যকর্মে এই বাবু সমাজের উল্লেখ করেন। তিনি এদের কর্মকাণ্ডকে শ্লেষাত্মক ভাষায় তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দন কুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকের দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল, সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান, সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও শ্রেণী স্বার্থের প্রতি সদাজাগ্রত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভিন্ন মতাবলম্বী। তিনি কালী প্রসন্ন সিং ওরফে হুতোম প্যাঁচাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য; হুতোমি ভাষায় কখনো গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম প্যাঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি ও বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না। প্রায় এক শতাব্দী পরে পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য সম্পর্কে একমত হতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে ডঃ বন্দোপাধ্যায় চমৎকার উক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন, বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের এ মন্তব্যের অনেকটাই যুক্তিসংগত নয়।...১৮৬২ সালে যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়নি, তখন কলকাতায় চলতি বুলি অবলম্বন করে এ রকম ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপে পূর্ণ অতিশয় শক্তিশালী গদ্যরচনার প্রয়াস বাস্তবিক বিস্ময়কর। (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তঃ সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ : মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা)।

যা হোক আলোচনার সুবিধার্থে এরকম এক প্রেক্ষাপটে এদেশে ইংরেজদের সমর্থক গোষ্ঠী কোলকাতার এই 'বাবু সমাজের' বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের উল্লেখটা অপরিহার্য মনে হয়। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। তখন এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সবেমাত্র

শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়েছে। লন্ডন থেকে কোম্পানির ডিরেক্টররা এ মর্মে কোলকাতায় কাউন্সিলকে চিঠি লিখল যে, কোলকাতায় অবস্থানকারী ইংরেজদের যাবতীয় কলহ ও বিবাদ মেটানোর জন্য মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ কোর্টের অনুকরণে কোলকাতাতেও একটি বিচারালয় স্থাপন করতে হবে। প্রায় এক বছর পরে কোলকাতা থেকে যে জবাব পাঠানো হলো, তা থেকে সে আমলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া সম্ভব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, কোলকাতায় এখন এক নাজুক পরিস্থিতি বিরাজমান। যতদিন পর্যন্ত দিল্লীর প্রতিনিধি হিসাবে বাংলায় শক্তিশালী নবাব আর দেওয়ান রয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের একটি পৃথক বিচারালয় স্থাপন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। উপরন্তু কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারী জব চার্ণক-এর মৃত্যু হওয়ায় কোম্পানির কার্য পরিচালনায় বেশ কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মার্চ লন্ডন থেকে জবাব এসে পৌছল। আপাতত কোলকাতায় বিচারালয় স্থাপন না করলেও যাঁরা কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা করবে তাদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য মাদ্রাজে পাঠাতে হবে। এ ধরনের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার জন্য কোম্পানির কোলকাতাস্থ কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেওয়া হলো।

এর প্রায় ৩০ বছর পরের কথা। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস এ মর্মে নির্দেশ পাঠাল যে, অবিলম্বে কোলকাতায় একটি কোর্ট স্থাপন করতে হবে। প্রস্তুতিকর্মে আরও তিন বছর গত হবার পর ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এর (সচিবালয়) পূর্ব দিকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা ব্যয়ে এ্যামবেসাডার্স হাউস নামে বাড়িটি ক্রয় করে স্থাপিত হলো 'মেয়র্স কোর্ট'। অবশ্য ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হবার পরই কেবলমাত্র এ ধরনের একটি বিচারালয় স্থাপনে ইংরেজরা সাহসী হয়ে ছিল।

কোর্টকে ঘিরে বাঙালি হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়াস

মেয়ার্স কোর্টের অস্তিত্ব বজায় ছিল মাত্র ৪৫ বছরের মতো। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে মেয়র্স কোর্ট যখন ওল্ড কোর্ট সাউস স্ট্রীটে, তখন এর অবলুপ্তি ঘোষণা করা হলো। এর জায়গায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দেই জন্ম হলো সুপ্রিম কোর্টের।

কোলকাতার 'বাবু সমাজে' কীভাবে ইংরেজি শিক্ষার সুত্রপাত হলো, তা সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে কোলকাতায় প্রথমে মেয়র্স কোর্ট এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের ঘটনার উল্লেখ করতে হলো। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও গবেষক বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন, "...লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, এই সময় থেকেই ইংরেজি ভাষা জ্ঞান কাম্য এবং প্রয়োজনীয় মনে হতে লাগল। আধাশিক্ষিত কয়েকজন ইউরেশীয় (এ্যাংলো ইন্ডিয়ান) এবং সুপ্রিম কোর্টের ব্রিটিশ এ্যাটর্নি ও উকিলদের ক'জন বাঙালি অবাঙালি উদ্যোগী দালাল—এরাই হলো আমাদের দেশের প্রথম 'প্রসিদ্ধ ও পরিপূর্ণ ইংরেজি বিদ্বান ও শিক্ষক। এই শিক্ষকদের বেতন ছিল ষোল টাকার একটি পয়সা কম নয়। এদের ইংরেজি বিদ্যার পুঁজি বলতে পকেট নোট বুকে টুকে রাখা কয়েক ডজন শব্দ। দেশের ভুঁইফোড় অভিজাতরা এদের কাছে ইংরেজি শিখতে আসত, তাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকত মুখস্থ করা কয়েকটা শব্দে। ইংরেজি ভাষায় যা তারা প্রকাশ করতে অক্ষম হতো তা তারা প্রকাশ করত নানা রকম সংকেত চিহ্নের সাহায্যে। প্রকাশের ব্যর্থতা পূরণের উপায় হিসাবে দেশীয়দের অনেকেই আশ্রয় নিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির। ইউরোপীয় প্রভুদের কাছে এই ভাবেই তাদের বক্তব্য বোধগম্য হতো। ইংরেজি ভাষায় এই সমান্য দখল নিয়েই কিন্তু মুৎসুদ্দিরা যথেষ্ট পরিমাণে ধনার্জন করতে

পেরেছিলেন যা' সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাঁদের নবীন নাগরিক অভিজাত শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করল। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মতো ঔপনিবেশিক দেশের আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের যা প্রায় অপরিহার্য উপাদান বলা চলে এইভাবেই তার শুরু। এর পেছনে প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল ব্রিটিশ বণিক এবং শাসকদের সেবা করার এবং আর্থিক লাভের। এই অনুপ্রেরণা ক্রমে বাড়তে থাকল—আরো প্রবল হয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনা থেকেই শুরু হলো ইংরেজি শিক্ষার প্রসার।" (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : ২য় সংস্করণ ১৯৭৮ প্রকাশ ভবন কলিকাতা)।

এখানে একটা কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় হবে যে, বড় লাট হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের সময়, এই নগরীকেই ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা প্রদান করেছিলেন এবং ১৯১২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফলে, ইংরেজ-ভারতের রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে (১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত) ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে বাঙালি বর্ণ হিন্দু মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস্য ধরনের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সূচিত হয়েছিল বলা যায়।

এই প্রেক্ষিতে বাস্তব ইতিহাস হচ্ছে এই যে, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ কোলকাতায় সংস্কৃত কলেজ (পরবর্তীকালে ক্যালকাটা প্রেসিডেন্সি কলেজ) স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশকিছু বর্ণহিন্দু ছাত্র ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলেও তখন সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি। অন্যদিকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ক্যালকাটা মাদ্রাসাতে পূর্ণ কোর্সের ইংরেজি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে যেসব বর্ণ হিন্দু ছাত্র বেশ কিছু বছর ধরে ইংরেজির মাধ্যমে কলেজ শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে, তারা সরকারি চাকরি লাভের জন্য আবেদন-নিবেদন দাখিল করতে আরম্ভ করল।

১৯৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ইংরেজি শিক্ষা সংক্রান্ত এক সরকারি বৈঠকে লর্ড মেকলে এ মর্মে বক্তব্য রাখলেন যে, "ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী কথা বলেন ইংরেজি ভাষাতে। উচ্চ শ্রেণীভুক্ত দেশীয়রাও সরকারি কাজকর্মে কথা বলেন এই ভাষাতেই। বাণিজ্যের ভাষা হিসেবে ইংরেজি সম্ভবত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে প্রাচ্যের সাতসমুদ্রেই।"

এ ধরনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের দরুন হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন এবং ধরেই নিলেন যে, এখন থেকে ইংরেজ শাসক শ্রেণীর মুখের ভাষা ইংরেজি ভারতীয় দেশীয় প্রজাদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপরেই ১৯৩৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি কোলকাতার গণ্যমান্য বর্ণ হিন্দুরা অবিলম্বে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করার দাবিতে কর্তৃপক্ষের কাছে এক গণদরখাস্ত দাখিল করে। এই দরখাস্তে রাধাকান্ত ব্যানার্জি, প্রশান্ত কুমার ঠাকুরসহ মোট ৬,৯৪৭ জনের দস্তখত ছিল।

লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৯৩৫ সালের ৭ই মার্চ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, "শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে অর্থ আলাদা করে রাখা হয়েছে, তার একমাত্র সার্থক নিয়োজন হবে ইংরেজি শিক্ষাতে।"

এক কথায় বলতে গেলে, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার হিন্দু কলেজ স্থাপনা থেকে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার যে প্রসার শুরু হয়েছিল, ১৮৫৭ সালে সিপাহী

বিপ্লব চলাকালীন সময়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭-এই চল্লিশ বছরে হিন্দু কলেজ, ডাফস্কুল ও কোলকাতার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি বিদ্যার্জন যাঁরা সমাপ্ত করেন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২ শতের মতো। এঁদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই ছিলেন বাঙালি বর্ণ হিন্দু। গবেষক বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "দেখা গেল এমনকি গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও তাঁদের সন্তানদের নবদ্বীপের টোলের বদলে কলকাতার ইংরেজি শিক্ষালয়ে পাঠাতেই অধিকতর আগ্রহী।...আসল কারণ হলো ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের তাগিদ।"

এরপরের ইতিহাস সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, অতঃপর দলে দলে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের চাকরি লাভ এবং বাঙালি নিম্ন বর্ণের হিন্দু, বাঙালি মুসলমান এবং অন্যান্য প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের ললাটে শুধু বঞ্চনা।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পাশাপাশি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম

উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক .ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরে একদিকে যেমন এদেশে ইংরেজ আগমনের শতবর্ষ পূর্তির প্রেক্ষাপটে রক্তাক্ত সিপাহী বিদ্রোহ (বিপ্লব) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের সন্তুষ্টি এবং এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ও দ্রুত ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছিল ভারত উপ-মহাদেশের প্রথম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এটা এমন একটা সময়, যখন (১৮৫৩ খ্রি.) এদেশে রেলপথ স্থাপিত হয়ে তার সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রধানত সৈন্যদের যাতায়াত ত্বরান্বিত করা এবং ভারতের সুলভ কাঁচামাল ও কৃষিজাত দ্রব্য ব্রিটেনে রফতানির জন্যই এসব রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল। অথচ এই সময়কালের প্রশংসায় কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা "বঙ্গীয় রেনেসাঁ"র ডঙ্কা-নিনাদে তখন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। সেদিন এঁরা সোচ্চার কণ্ঠে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, ভারতে রেলপথ এবং টেলিগ্রাম লাইন স্থাপন হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত গবেষক শ্রী সুপ্রকাশ রায়ের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন,

..."আর অপরদিকে কৃষক সংগ্রামের ভয়ে ভীত জমিদার ও মধ্য শ্রেণীর প্রধান মুখপাত্র অর্থাৎ বঙ্গীয় "রিনাসাসের" প্রধান নায়ক রামমোহন, দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। বঙ্গীয় "রিনাসাসের" জনক বলিয়া কথিত রামমোহন ফরাসি বিপ্লবের পতাকাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারত ভূমিতেও সেইরূপ এক বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজ শাসন এবং জমিদার-মধ্যশ্রেণীর ভূম্যধিকারের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করিয়াছেন সারা জীবন।...সুতরাং বঙ্গীয় তথা ভারতীয় 'রিনাসাসের" জাতীয়তাবাদ ছিল আপোসমুখী। ব্রিটিশ প্রভুত্বকে ভারত-ভূমিতে অক্ষত রাখিয়া শাসকগণের নিকট হইতে কিছু সুবিধা-সুযোগ আদায়ের জন্য যে আন্দোলন "রিনাসাসের" নায়কগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম নহে।...ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ইংরেজ-সৃষ্ট ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর হস্তে জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ন্যস্ত হইয়াছিল।" (ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (৩য় সংস্করণ) : ডি এন বি এ ব্রাদার্স কলিকাতা ১৯৮০)

আলোচনার সুবিধার্থে আবারও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, এদেশে ইংরেজদের ১৯০ বছর রাজত্বকালের শেষের দিকের ৩৫ বছর (দিল্লীতে রাজধানী) বাদ দিলে প্রথম ১৫৫ বছরকাল কোলকাতাতেই ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু, সুবর্ণ শ্রেণী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, মধ্যশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রশ্নাতীত আনুগত্য।

দরজায় 'বাঙালি বাবুজ' লেখা থাকলে গোরা সৈন্যদের ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল

এ ব্যাপারে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের (বিপ্লব) সময় কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুরা সম্প্রদায় হিসেবে যেভাবে পরাশক্তি ইংরেজদের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জুগিয়েছিল তা' ইতিহাসে বিরল বলা চলে। সে আমলে কোলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলো থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মতো সমিতিগুলো পর্যন্ত জনসভার আয়োজন করে ইংরেজদের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এজন্য ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, সিপাহী বিদ্রোহের (বিপ্লব) পর এর সমর্থকদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ইংল্যান্ড থেকে নতুন করে গোরা সৈন্য আমদানি করে পূর্ব ও উত্তর ভারতের ১৪টি শহরে মার্শাল ল' জারি করে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই তালিকা থেকে অত্যন্ত সযত্নে কোলকাতা নগরীর নাম বাদ দেয়া হয়েছিল। এমনকি উত্তর ভারতের শহরগুলোর প্রবাসী বাঙালি হিন্দু মহল্লাগুলোতে যাতে করে গোরা সৈন্যরা প্রবেশ না করে সেজন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এ জন্যই প্রখ্যাত নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি (ড: অরুণ কুমার মিত্র সম্পাদিত) গ্রন্থে লিখেছেন, "সিপাহীরা পরাস্ত হবার পর প্রতিহিংসাপরায়ণ গোরারা অন্ধ হয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে। তখনও এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে যে সব বাড়ির বাইরের দেওয়ালে কয়লা দিয়ে 'ক্যালকাটা বাবুজ' লেখা ছিল, সেসব বাড়ি তাদের চক্ষুতেও পবিত্রবোধে উৎপাত হতে রক্ষা পেয়েছিল।"

এরকম এক প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দেই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো উপ-মহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই সময় ব্রিটিশ ভারতে সরকারি চাকরিজীবীদের অবস্থাটা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। গবেষক বিনয় ঘোষের মতে, "বস্তুত ব্রিটিশের অধীনে প্রায় সমস্ত রকম চাকরিতে বাঙালিদের (বর্ণ হিন্দু) অধিকার ছিল প্রায় একচেটিয়া। ১৮৩০-৪০ এর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা আমূল সংস্কারপন্থী হিসেবে সবচেয়ে উচ্চ কণ্ঠ, যাঁরা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত, এমনকি যাঁরা নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী, তাঁরাও প্রত্যেকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগী—ব্যবসায়, বাণিজ্যে এবং প্রশাসনে ১৮৫৬-৫৭ পর্যন্ত সরকারি কাজ-কর্মে শিক্ষিত বাঙালিদের প্রায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা...।

এ সম্পর্কে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের চাঞ্চল্যকর মন্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন, "সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃ: ২২৪-২৫)

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, সরকারের অর্থ, স্বরাষ্ট্র, জনশিক্ষা, রাজস্ব, মহাগাণনিক, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত এবং সরকারি সচিবালয়ের মোট ৭১৪টি পদের মধ্যে ইউরোপীয়দের ২৮৬ টি পদ বাদ দিলে ৪২৮টির মধ্যে ৩৯৫টি (২/.৩টি বাদে)

বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের দখলে। অর্থাৎ অবশিষ্ট বিরাট ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী মিলিয়ে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে তখন মাত্র ৩৩ জন।

তা'হলে একথা বললে অন্যায় হবে না যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী অবস্থিত থাকায় এবং নানাভাবে দালালি করার বদৌলতেই কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুরা অন্য ভারতীয়দের তুলনায় ইংরেজি শিক্ষায় দারুণভাবে অগ্রসর হয়েছিল। এমনকি বাঙালি মুসলমানতো দূরের কথা, প্রতিবেশী আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে বঞ্চিত করেই কোলকাতা কেন্দ্রিক আলোচ্য সম্প্রদায় ইংরেজদের অনুগ্রহে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি অনুধাবনের লক্ষ্যে একটা সুষ্ঠু মূল্যায়ন করা অপরিহার্য মনে হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করে কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করাই যথেষ্ট হবে। বিহার এবং উড়িষ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের আগে কোনো কলেজ পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। এতদঞ্চলের প্রথম দুটি কলেজ হচ্ছে যথাক্রমে পাটনা কলেজ এবং কটকের রাভেন্‌শ কলেজ। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সব ক'টি কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৫ জন আর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কটকের রাভেন্‌শ কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ২ জন। অন্যদিকে আসাম এলাকায় সর্ব প্রথম কলেজ স্থাপিত হওয়ার বছরটা হচ্ছে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ এবং ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৩০ জন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তো আসামের সমস্ত স্কুলে বাংলা ছাড়া আর কোনো দেশীয় ভাষাই পড়তে দেওয়া হতো না।

পাশাপাশি কোলকাতার চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ২৪৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী নিয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেখানে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সংখ্যা (অধিকাংশই বর্ণহিন্দু) দাঁড়াল তিন হাজারে। অর্থাৎ প্রায় ২৫ গুণ বৃদ্ধি পেল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি, এ পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ১৩ জন, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তার সংখ্যা হলো ১৭১২ জন। এর মধ্যে মাত্র ২১৮ জন অবাঙালি। ১৮৬৩ সালে যেখানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র ৬ জন, ১৮৮১-তে সেই সংখ্যা দাঁড়াল ৪২৩ জনে। এর মধ্যে ৩৪৪ জনই বাঙালি।

এই প্রেক্ষাপটে কোলকাতার সদ্য স্থাপিত আইন, চিকিৎসা, শিক্ষকতা ও প্রকৌশল বিদ্যায়তনগুলো দলে দলে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের সন্তান-সন্ততি দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এজন্যই কোলকাতার বর্ণ-হিন্দু সমাজপতিরা অদূর বেকারত্বের অভিশাপের হাত থেকে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে প্রচেষ্ট হলেন।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত এদেশীয়, বিশেষ করে কোলকাতা-কেন্দ্রিক যুব সমাজ তথা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্বরূপ কী রকম হবে, সে সম্পর্কে লর্ড মেকলের উক্তি হচ্ছে, এদেশে এমন এক শ্রেণী বানাতে হবে, "যার বর্ণ এবং রক্ত ভারতীয়দের, কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিবোধ, এবং বুদ্ধিশীলতা ইংরেজের।" এ ব্যাপারে মেকলের নিকট-আত্মীয় ইংরেজ প্রশাসক ট্রেভেলিয়ন এর চাঞ্চল্যকর বক্তব্য রয়েছে।

ব্রিটিশ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তিনি স্পষ্টভাবে বললেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি চাইবেন এবং এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দুটো রাস্তা তাদের সামনে খোলা—হয় 'বিপ্লব' নয় 'সংস্কার'। 'সংস্কারপন্থা' অবশ্যই ব্রিটিশ শাসকদের কাছে অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষিত করে তোলাই এই পন্থাকে সফল করার প্রকৃষ্টতম উপায়। কেননা, 'শিক্ষিত শ্রেণী স্বভাবতই আমাদের আঁকড়ে থাকবেন।

এঁরা জানেন যে, আমাদের আশ্রয়চ্যুত হলে ঐ আদর্শের ভিত্তিতে দেশের উন্নয়ন অসম্ভব।'

গবেষক বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন তা হচ্ছে, "এই নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য শিক্ষা–বিশেষত উচ্চশিক্ষা হলো কঠোরভাবে নির্বাচিত। উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীগুলো এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণগুলোর সঙ্গেই তার গাঁটছড়া বাঁধা হল।"

তাহলে অবস্থাদৃষ্টে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে এদেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় চাঞ্চল্যকর ঘটনার অবতারণা হয়েছে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় যখন দ্বিতীয় দফায় ইংরেজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলনে ব্যস্ত, সেই সময়কালে অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দেই পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগারের মতো উদারমনা ও সর্বকালের পূজনীয় ব্যক্তিত্বও স্বীয় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে সরকারের কাছে উচ্চ শিক্ষা সীমিত করার দাবি উত্থাপন করেছেন। অথচ সঠিকভাবে বলতে গেলে তখনও পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার হাতেখড়ি পর্যন্ত হয়নি। ইতোপূর্বে এ মর্মে নানা তথ্য উপস্থাপন করে দেখিয়েছি যে, বাঙালি মুসলমান তো দূরের কথা, উনবিংশ শতাব্দীর তিন দশক থেকে শুরু করে মাত্র ৩০/৪০ বছর সময়ের মধ্যে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু ইংরেজি শিক্ষিত যুব সমাজ কী রকম সর্বভুকের মতো আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, ছোটনাগপুর প্রভৃতি এলাকার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলেছে। এবং আরও সুবিধা আদায়ের জন্য দাবি জানাতে শুরু করেছে।

এ সম্পর্কে ইংরেজ গবেষক পারসিভ্যাল স্পিয়ার তাঁর রচিত "এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (দ্বিতীয় খণ্ড)" গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "এটা এজন্যই হয়েছে যে, এই মধ্যে শ্রেণীর সম্প্রসারণটা এতো দ্রুত যা সাধারণ পর্যবেক্ষকদের ধারণার বাইরে বলা যায়...কিন্তু এখন এই সংখ্যালঘুদের একটা ভাষা রয়েছে এবং এদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাও অভিন্ন আকারের। এদের মনমানসিকতার বহিঃপ্রকাশ এবং বক্তব্য উপস্থাপন এতই সমমনা যা ভারতের অন্যত্র অনুপস্থিত। এমনকি এদের বক্তব্যকেই সমগ্র ভারতের চিন্তাধারা হিসেবে গণ্য করা যেত। লর্ড ডাফরিন সম্ভবত একটা কথা যোগ করতে ভুলে গেছেন যে, সংখ্যালঘুরা যদি চরিত্রের দিক দিয়ে ভয়ংকর গতিশীল হয় সেক্ষেত্রে তারা একা জাতির অবয়ব পর্যন্ত বদলে দিতে সক্ষম। একদিকে সম্মিলিত উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অন্যদিকে বিরক্তি এই দুই-এর মিলনে এই শ্রেণী সুসংগঠিত হয়ে দাঁড়ায়। আইসিএস পরীক্ষার প্রবর্তন, রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা এবং মেয়োর অধীনে স্বায়ত্তশাসনমূলক পৌরসভার প্রবর্তন প্রভৃতি সরকারি নীতির ফল আংশিকভাবে এই মধ্য শ্রেণীর উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ বলা যায়। বাকিটুকু এসেছে প্রাচ্যের বিদ্বৎসমাজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এই বিদ্বৎ সমাজই এদের সম্মুখে প্রাচীন ভারতের মহান সভ্যতাকে জ্ঞানগর্ভ দর্শন হিসেবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত সময়ে আমরা বাঙালি বর্ণহিন্দু শ্রেণী ক্রমবিবর্তনের চমকপ্রদ ঘটনাবলী অবলোকন করতে পারি। যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে ডি রোজারিও, কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমুখের নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলের দল এবং রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রবর্তিত সংস্কারপন্থী ও উদারমনা দর্শনের উত্তাল তরঙ্গে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু সমাজ মুক্তির সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষার তাগিদে ১৮৩০ সালে ধর্মসভা স্থাপন ও তৃতীয় স্রোত হিসেবে রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব হিন্দু ধর্মকে অন্যান্যের গ্রহণযোগ্য করে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন–সেখানে ৫০/৫৫ বছরের ব্যবধানে আমরা কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনমানসিকতা ও চিন্তাধারায় একটা বিরাট অর্থবহ পরিবর্তন দেখতে পাই।

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমরা এই সমাজের যেটুকু অর্থবহ পরিবর্তন দেখতে পাই তা হচ্ছে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রভাব কর্পুরের মতো উবে গেছে, আর রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত সংস্কারপন্থী ও উদারমনা দর্শনের পরিধি ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। বঙ্গীয় এলাকা বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় এই পাঁচ দশক সময়ে উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রগামী। কিন্তু স্বীয় শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে অনেকটা সংকীর্ণমনা এবং সমগ্র ভারতে হিন্দু রিভাইভালিজমের প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

এটা এমন এক সময় যখন বাংলার ভাগ্যাকাশে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছে। ১৮৮৪ সালে তাঁর রচিত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ'-এর 'বন্দেমাতরম' গান তখন ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়কে আপ্লুত করতে সক্ষম হয়েছে। কমরেড মুজাফফর আহমদ -এর মতে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূল মন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম গান। (আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পৃষ্ঠা-১০)। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মত কিন্তু ভিন্নধর্মী। তিনি লিখেছেন, "বাঙালির জীবনকে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্য আদর্শের মিলনভূমিতে স্থাপন করে মননশীল সাহিত্য, কথা সাহিত্য, দেশ ও দশের কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালিকে উনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ও প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাঙালির মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, সংস্কারকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে, স্বাদেশিক মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তিনি যে নতুন মানববোধের পন্থা নির্দেশ করেন, এক শতাব্দীর বাঙালি সেইপথ ধরেই চলেছিলেন। তাঁর 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র যেন আধুনিককালের ঋকমন্ত্র, যার দেবতা হচ্ছেন দেশমাতৃকা। তাই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির নবযুগ চেতনা বা রেনেসাঁসের মূলসুর যে একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত: সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ : মডার্ন বুক এজেন্সি কলিকাতা, ১৯৭৮)।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে পুনরায় উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কোলকাতায় এদের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণ থেকেই উদ্দেশ্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে :

১৮৫৩ : বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ডস এসোসিয়েশন।
১৮৬১ : জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা।
১৮৬৬ : ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন।
১৮৬৭ : হিন্দু মেলা।
১৮৭৬ : ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন।
১৮৮৫ : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

আলোচ্য সময়কালে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড, মনমানসিকতা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার মার্ক্সীয় গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন :

"হিন্দু সমাজের উদারতা ও সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের পুনরুভ্যুত্থান আন্দোলনে পরিণত হল। 'হিন্দু' প্রীতি ক্রমে 'হিন্দুত্ব' প্রীতির ভিতর দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতায়' পর্যবসিত হল। রামমোহন-ইয়ং-বেঙ্গল বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের যুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেল...।" (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : প্রকাশ ভবন মার্চ ১৯৭৮, কলিকাতা)।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক নাগাদ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীরা যখন একদিকে বঙ্কিম-ভূদেব-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের 'রিভাইভালিজমের' মাধ্যমে উপ-মহাদেশের নেতৃত্ব দানে এগিয়ে এসেছেন এবং অন্যদিকে প্রাক্তন আই সি এস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে নানা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে "আবদার" করতে শুরু করেছেন; সে সময় এদের মধ্যে বিরাজমান মন-মানসিকতা সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট মার্কসীয় গবেষক সুপ্রকাশ রায়ের পরিচ্ছন্ন মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "...ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া ভূমিস্বত্বের অধিকারবলে জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী (বর্ণহিন্দু) একদিকে কৃষক শোষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং অপরদিকে ইংরেজসৃষ্ট নূতন সমাজের নেতৃত্ব লাভের জন্যই তাহাদের তথাকথিত "রিনাসান্স"-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। এই "রিনাসান্স" আন্দোলন হইতেই শিক্ষিত "ভদ্রশ্রেণী" হিসাবে মধ্যশ্রেণী নতুনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কেরানী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে যে ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল, জমিদার শ্রেণীর সহিত মধ্যশ্রেণীও প্রাণপণে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীতে পরিণত হয়। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে এই ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯ খ্রি.) ...তাঁহার লক্ষ্য ছিল, এদেশে এরূপ একটি ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি করা যে শ্রেণীটি উহার উন্নত ইংরেজি শিক্ষার গুণে ভারতবর্ষকে নহে; ইংল্যান্ডকে 'স্বদেশ' ও ইংরেজদের পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিবে এবং কোনোকালেই ইংরেজ শাসনের বিরোধী হইবে না। মেকলের এই উদ্দেশ্য যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রত্যেকটি কৃষক-বিদ্রোহ, বিশেষত সাঁওতাল-বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) ও নীল-বিদ্রোহের সময় কৃষকদের সংগ্রামের প্রতি মধ্যশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল সমর্থন হইতে।...উনবিংশ শতাব্দীতেই যখন বিহার ও বঙ্গদেশের উপর দিয়া কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গণসংগ্রামের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের শাসনকে "ভগবানের আশির্বাদ" রূপে বরণ করিয়া ইংরেজি শিক্ষাদানের ভিত্তিতে নিজেদের নতুনভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সভ্য শ্রেণীরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রথম সাহিত্যের প্রয়োজন। সুতরাং নতুন সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইলো। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন এই সাহিত্য সৃষ্টিকার্যের প্রধান নায়ক এবং তাহার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মধ্যশ্রেণীর (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী) এই 'রিনাসান্স' পূর্ণ-বিকশিত রূপ গ্রহণ করিল। ..."রিনাসান্স আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভারতের "জাতীয় আন্দোলন"-এর আরম্ভ। ...ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা ও আপসের নীতি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের 'রিনাসান্স" আন্দোলনের অন্যতম অবদান। এই নীতিই রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর (হিন্দু) জাতীয়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক ইংরেজ শাসনের মহিমা কীর্তন করিতে বাধ্য-করিয়াছিল।" (ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ৩য় সংস্করণ ১৯৮০ ডিএলবিএ ব্রাদার্স কলিকাতা)।

তাহলে এ ধরনের প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক নাগাদ যখন অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী কোলকাতায় উপমহাদেশের ইংরেজি শিক্ষিত এবং সবচেয়ে অগ্রসরমান বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদ তথা রাজনীতির কথাবাতা বলা থেকে শুরু

করে "দাবি দাওয়া" উত্থাপন করতে আরম্ভ করেছে, তখন আলোচনার সুবিধার্থে এক নজরে পূর্ববর্তী ১২৮ বছরের সামাজিক স্তরগুলো উল্লেখ করা নিতান্তই অপরিহার্য বলে মনে হয়।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ ও শতাব্দীর কর্মকাণ্ড

বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে মুসলিম শাসকদের অনুগ্রহে ফার্সি ভাষায় দক্ষ বহু উজালী বর্ণহিন্দু কর্তৃক উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিতে অবস্থান। মুসলিম শাসকদের সমার্থক বিধায় বঙ্গীয় এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বর্ণহিন্দু জমিদারের অস্তিত্ব। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান প্রদত্ত ফরমান হাতে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আগমন হলে একশ্রেণীর নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ কর্তৃক কোম্পানির এজেন্ট, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দি হিসেবে সর্ব প্রথম সুযোগ গ্রহণ। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মাত্র ১৬ হাজার টাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব ক্রয় এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপনের মাধ্যমে কোলকাতা মহানগরীর গোড়াপত্তন হলে ইংরেজদের কেন্দ্র করেই বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণীর অভ্যুদয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যু হলে, মুর্শিদাবাদ ও কোলকাতায় উভয় জায়গাতেই বর্ণহিন্দু জমিদার, সরকারি কর্মচারী এবং সুবর্ণ শ্রেণীর ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের সময় এঁদের চাঞ্চল্যকর কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্গীয় এলাকায় চরম অস্থিরতা, অরাজকতা এবং মন্বন্তরের (এক কোটি ৩০ লাখ লোকের অনাহারে মৃত্যু) সময়কাল। মুর্শিদাবাদে নামকা ওয়াস্তে মীরজাফর (১৭৫৭-৬০) মীর কাশেম (১৭৬০-১৭৬৩), মীর জাফর দ্বিতীয়বার (১৭৬৩-১৭৬৫) নাজম-উদ-দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬), সাইফ-উদ-দৌলা (১৭৬৬-১৭৭০) এবং মোবারক-উদ-দৌলা (১৭৭০-১৭৯৩), নবাবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কোলকাতায় ইংরেজ শাসকবৃন্দ যথাক্রমে ক্লাইভ (১৭৫৭-১৭৬০), হলওয়েল (১৭৬০-১৭৬৫) ক্লাইভ দ্বিতীয়বার (১৭৬৭-১৭৭২) এবং ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়ে বিশেষ করে কোলকাতায় বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণীর বিপুল অর্থ অর্জন ও পরিপক্কতা লাভ। অতঃপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গভর্নর জেনারেল পদে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫), স্যার জন ম্যাকফারসন (১৭৮৫-১৭৮৬) এবং লর্ড কর্নওয়ালিশ-এর (১৭৮৬-১৭৯৩) সময়কালে ইংরেজদের নগ্ন পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বিত্তশালী বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণীর ঐতিহাসিক কারণেই গোত্রান্তর।

লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলেই ৫-সালা, ১০-সালা এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি প্রথা চালু করায় অবিভক্ত বৃহত্তর বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিদার নিলামের ফলে বনেদী হিন্দু ও মুসলমান জমিদারের জমিদারি হস্তচ্যুত এবং আদিতে নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ ও পরবর্তীতে ইংরেজের সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক সুবর্ণ শ্রেণী কর্তৃক নিলামে জমিদারি ক্রয়ের মাধ্যমে নব্য বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণীর অভ্যুদয়। কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু সুবর্ণ শ্রেণী ও নব্য জমিদার শ্রেণীর নির্ভেজাল দালালিতে আস্থাভাজন হওয়ার জের হিসেবে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দেই ইংল্যান্ডের কমন্সসভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক সনদ আইন পাসের মাধ্যমে পুনরায় নবায়নের সময় ভারতের ইংরেজ শাসিত এলাকায় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারিদের খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার বে-আইনী ঘোষণা। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কোলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলে, এই কোর্টকেই কেন্দ্র করে কাজ চালাবার মতো অর্থাৎ 'ইয়েস-নো-ভেরি গুড' মার্কা ডজন কয়েক ভাঙা ইংরেজি শব্দ রপ্ত করে কোলকাতাকেন্দ্রিক যে

বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী গঠনের সূত্রপাত হয়, মাত্র ৪৩ বছরের মধ্যে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে হিন্দু কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে সেই মধ্যশ্রেণী ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী হিসেবে রূপান্তরিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রীরামপুর মিশনের কর্মকাণ্ড ছাড়াও সংস্কারপন্থী রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) কর্তৃক ইংরেজ রাজত্বের মহিমাকীর্তন ও ইংরেজি ভাষা প্রচারে ও সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাবে নগ্ন সমর্থন প্রদান এবং ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হেনরি লুইস ডি রোজারিও (১৮০৯-১৮৩১খ্রি.) কর্তৃক পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতা হুবহু অনুকরণের লক্ষ্যে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ, রামদুলাল দে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখের উদ্যোগে হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে ধর্মসভা গঠন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিদ্রোহ ইংরেজবিরোধী ওহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে নীলকর সাহেবদের আগমন এবং ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষায় মর্যাদা দেওয়ার প্রাথমিক ঘোষণা দান।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে অফিস-আদালতে থেকে ফার্সি ভাষা অপসারিত এবং ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর-এর সরকারি নির্দেশে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যতীত অন্য কাউকে চাকরি প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরেজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মোতাওয়াল্লীরা ওয়াক্‌ফ ধরনের লাখেরাজ সম্পত্তির প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রদর্শনে অক্ষম হলে অধিকাংশ ওয়াকফ সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তের ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। ১৮৫৭ সালে একদিকে সিপাহী বিপ্লব ও কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজদের প্রতি উলঙ্গ সমর্থন এবং অন্যদিকে শাসক শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন কোলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে মাত্র ২০/২৫ বছর সময়কালের মধ্যে রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত কোলকাতা কেন্দ্রিক উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মোকাবেলায় উগ্র পাশ্চাত্যবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইয়ং বেঙ্গল-এ প্রভাব দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত। এরই পাশাপাশি পণ্ডিত ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গৌরমোহন বিদ্যালংকার, মদনমোহন তর্কালংকার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবাদী হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সঙ্গে উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অর্থবহ সংমিশ্রণ। অন্যদিকে সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের পুনঃজাগরণের লক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব-এর (১৮৩৪-৮৬ খ্রি.) আবির্ভাবে গোড়াপন্থীদের ব্যাপক শক্তি সঞ্চয়।

"মাতৃ জঠরে জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভ্রূণ"

এমনকি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে যখন ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহাবী আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আবদুল লতিফ খাঁ, সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রহিম এবং মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী প্রমুখ নেতা কর্তৃক ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহযোগিতা প্রদান ও মুসলমানদের অনতিবিলম্বে ইংরেজি শিক্ষার আহ্বান জানানো হয়, ঠিক তখনই কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানসপুত্র বঙ্কিম প্রতিভার অভ্যুদয়।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতায় উপমহাদেশের সবচেয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাঞ্চল্যকর কর্মকাণ্ডের জের হিসেবে "মাতৃজঠরে জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভ্রূণ"-এর সৃষ্টি হলো। এজন্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে যে বাঙালি তথা ভারতীয় "জাতীয়তাবাদ" মাতৃগর্ভে পূর্ণতার পথে

এগিয়ে গেল তার স্বরূপটা সঠিকভাবে অনুধাবন করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক শ্রী সুপ্রকাশ রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র সমান প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।...সামন্তবাদ বিরোধী ফরাসী বিপ্লবের অভিনন্দনকারী বঙ্কিমচন্দ্রই ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে সেই সামন্ততন্ত্রকে কৃষি বিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নতুন করিয়া আধ্যাত্মবাদ আর ধর্মের কুসংস্কার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালে পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও বিজ্ঞানের প্রভাবে বঙ্গদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুশাসন এবং হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের প্রবল জোয়ার দেখা দিয়াছিল। বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" সমকালের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবল জোয়ারকে প্রতিহত করিয়া 'নবহিন্দুবাদ'-এর প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় "রিনাসান্সের" প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী চরিত্রটিকে স্পষ্ট রূপদান করেন। এই কার্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক অস্ত্র হইলো তাহার 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ-চরিত্র', 'ধর্ম ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীমদ্ভবদগীতা' এই সকল রচনার মধ্য দিয়া তিনি নতুন যুক্তিতর্কের দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণাকে প্রকৃত ধর্ম বলিয়া প্রচার এবং নতুন প্রগতিশীল ভাবধারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছেন। এইভাবে 'রিনাসান্সে'র প্রথম যুগের নায়কগণ যে গলিত হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির (ইয়ং বেঙ্গল ও রামমোহন রায়ের যুগে) বিরুদ্ধে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির মধ্যেই নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা দ্বারা বঙ্কিম সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় "রিনাসান্স" 'হিন্দু রিনাসান্স' পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই 'হিন্দু রিনাসান্স' হিন্দু অভিজাত ও হিন্দু মধ্যশ্রেণীরই নবজাগরণ। বঙ্কিমের পর রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক আরব্ধ এই 'হিন্দু রিনাসান্সকে' আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রূপদান করেন।' (ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (৩য় সং) ডিএনবি ব্রাদার্স, কলিকাতা ১৯৮০)।

তা হলে একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আলোচ্য সময়ে যে 'জাতীয়তাবাদের আদর্শ' মাতৃগর্ভে ছিল তা ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের উদারপন্থী বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চৌহদ্দীতে তো দূরের কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের 'হিন্দু বাহুবল' ও 'হিন্দু শৌর্য-বীর্যের' আর হিন্দু ধর্মের পুনঃজাগরণের' আদর্শে লালিত-পালিত হচ্ছিল। সেখানে জাতীয়তাবাদ আদর্শের মূল ধর্ম নিরপেক্ষতার শর্ত সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। আর এ জন্যেই বঙ্গীয় এলাকায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাঙালি ছাড়াও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানদের কথা পর্যন্ত এই কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা হিসাবের মধ্যে রাখেনি। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হচ্ছে, "অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? যাহারা এইরূপ বলিবেন, তাহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নই। আমরা পরাধীন জাতি, অনেককাল পরাধীন থাকিব–সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।" (ভারতবর্ষের স্বাধীনতাঃ ও পরাধীনতা বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যখন "বাঙালি তথা ভারতীয় (হিন্দু) জাতীয়তাবাদ" মাতৃগর্ভে মারাত্মক প্রসব যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল, তখন অনাগত ভবিষ্যতের জাতীয়তাবাদরূপী

এই শিশুর স্বরূপ, প্রকৃতি ও অবয়ব কেমন হতে যাচ্ছে তা সঠিক ও পরিচ্ছন্নভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ বলে মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত গবেষক এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড: অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতামত এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, উপন্যাসের কথা ছেড়ে দিলেও বাঙালি মননের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব সুপরিচিত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র—এই তিনজনেই বাঙালি মনোজীবনে ও আদর্শলোকে নতুন আলোড়ন তুলেছিলেন, পথের দিশারী হয়ে সমগ্র জাতিকে অগ্রবর্তী করে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সকলের চেয়ে গভীর হয়েছিল। বাঙালির জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের মিলনভূমিতে স্থাপন করে মননশীল সাহিত্য, কথাসাহিত্য, দেশ ও দশের কথা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালিকে উনবিংশ শতাব্দীর জীবনরস ও প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাঙালির মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ়ত করে, সংস্কারকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে, স্বাদেশিক মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে তিনি যে নতুন মানববোধের পন্থা নির্দেশ করেন, এক শতাব্দীর বাঙালি সেই পথ ধরেই চলেছিলেন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্র শুধু মাসিক পত্রের আদর্শ নয়, এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র (হিন্দু) বাঙালিসমাজ আত্মদর্শনের বীজমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল। "...এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর 'আনন্দমঠ' ইংরেজি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হয়ে সারা ভারতেই স্বাদেশিক ও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র যেন আধুনিককালে ঋকমন্ত্র, যার দেবতা হচ্ছেন দেশমাতৃকা।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (পৃ: ৫৩৫-৩৬) সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ ১৯৭৮ কোলকাতা)।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার অপর এক বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ঘোষ নানা তত্ত্ব এবং তথ্য উপস্থাপন করে ড: অসিত বন্দোপাধ্যায়ের উপরোক্ত মন্তব্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে ভিন্নমত প্রদান করেছেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন বক্তব্য হচ্ছে, "...মর্যাদাবান ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীগুলোতে পৌত্তলিকের সংখ্যা ভয়ংকর রকমের বিশাল। যতো দিন গেল, মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল উনবিংশ শতাব্দীতে—যে যুগকে আমরা নাম দিয়েছি 'রিনেসাঁন্সের যুগ'। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদ প্রবণতা; মূর্তিপূজা, বহু ঈশ্বরবাদ, 'গোঁড়ামি—এইসব মধ্যযুগীয় ব্যাপারগুলোর একটি অথবা অপরটির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন 'আধুনিক' বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের ইংরেজি শিক্ষার ওজন বেশি ভারী...উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ কীভাবে তাঁর প্রেতাত্মা খুঁড়ে তুলে, তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশীল হিন্দুভাব প্রধান মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, তা ভাবলেও মাথা হেঁট হয়ে আসে। আর আদর্শের দিক থেকে যাঁরা হিন্দু অবতারবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও এই একই মনোভাব জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আগাগোড়া ব্যক্ত হয়েছে।...তাই বিধবা বিবাহ ব্যর্থ হয়েছে, নারীর পরাধীনতা, যৌথ পরিবার সবই বজায় থেকেছে এবং বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিবারণের জন্য শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই (একান্ত বশংবদ বর্ণ হিন্দুরা মনে আঘাত পাবে বিধায়) কোনো আইন পাস করতে চাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত শ্রেষ্ঠও আইন প্রয়োগ করে এ ধরনের সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। (বাংলার বিদ্বৎ সমাজ ১৯৭৮ এবং বাংলার নবজাগৃতি ১৮৭৯ কলিকাতা)।

এই প্রেক্ষিতে এক্ষণে সংক্ষেপে বঙ্কিম রচনাবলীর মূল্যায়ন করা বিশেষ সমীচীন বলে মনে হয়। প্রথমেই বঙ্কিম-রচিত উপন্যাসের উল্লেখের প্রয়োজন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী মোট ২২ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র ১৪টি উপন্যাস রচনা করেছেন। এরমধ্যে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এবং সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর মধ্যে ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী ৭টি উপন্যাস যথাক্রমে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপাল কুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), যুগালাঙ্গরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাজসিংহ (১৮৮২) ও সীতারাম (১৮৮৭); তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক ২টি উপন্যাস যথাক্রমে 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪) ও 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৫) এবং সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস ৫টি 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), রাধারাণী (১৮৮৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭) ও কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।

সাম্প্রতিককালে ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসগুলো সম্পর্কে যেসব অর্থবহ মন্তব্য করেছেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ–

ক. **ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস :** "কেউ কেউ মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র যতই প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক হোন না কেন, ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি বহুস্থলে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন, বরং রমেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে অনেক বেশি সতর্ক এবং একনিষ্ঠ। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল, বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্য সব সময়ে গ্রহণ না করলেও ঐতিহাসিক রস সৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ ঔপন্যাসিক বাংলাদেশে দ্বিতীয় কেউ নেই। বিশুদ্ধ ইতিহাস লেখা ঐতিহাসিক-ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, সে কাজ করবেন তথ্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক।"

খ. **তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস :** "শেষ জীবনে বঙ্কিকচন্দ্র নীতি, আদর্শ, ধর্ম ও সদাচার সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান হিন্দুর দিক থেকে যা ভাবছিলেন, তার কিছু গাঢ় প্রভাব এই যুগের উপন্যাসে পড়েছে। অবশ্য এই প্রভাব সর্বদা যে উপন্যাসের পক্ষে ভালোই হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না।"

গ. **সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস :** "অবশ্য একথাও ঠিক যে, হিন্দু নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সম্পর্কে বিচার করেছেন এবং সামাজিক নীতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক কামনার সংঘর্ষ হলে অর্থাৎ আর্টের সঙ্গে মরালিটির দ্বন্দ্ব হলে আদর্শবাদী এবং হিন্দুর সামাজিক নীতির সংরক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের কথা অস্বীকার করে আদর্শ ও নীতির জয় ঘোষণা করতে কখনও সঙ্কুচিত হতেন না।"

বাংলার ভাগ্যাকাশে সেদিন এ কোন্ প্রতিভার উদয় হয়েছিল?

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানোর উদগ্র বাসনায় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলোতে ইতিহাস বিকৃত করে যথেচ্ছভাবে কাল্পনিক ঘটনাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন; তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক উপন্যাসগুলোতে রক্ষণশীল ও সনাতন হিন্দুধর্মের নীতি, আদর্শের ও সদাচারের জয়গান করেছেন এবং সমাজ ও গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাসগুলোতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার নৈতিকতার পতাকাকালে সমুজ্জ্বল রাখার স্বার্থে আর্টের মোদ্দা বিষয়গুলোকে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

এজন্যই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড: অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতো সমালোচককেও (যিনি বঙ্কিম-প্রতিভাকে "বিস্ময়কর রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়সম্পন্ন" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন) এ মর্মে মন্তব্য করতে হয়েছে

যে, "কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে পৌরাণিক প্রেরণার প্রতি শিক্ষিত (বর্ণহিন্দু) বাঙালির বিশ্বাস আবার ফিরে আসতে লাগল এবং আপ্তবাক্য ও ব্যক্তিগত ধর্মোপালব্ধির স্থলে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যুক্তিবাদ আধুনিক মনকে অধিকতর আকৃষ্ট করল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে যুক্তির ওপর শাস্ত্রসংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে (বাঙালি হিন্দু) জনচিত্তে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম একটি সমন্বয়ী সত্তা লাভ করল" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (পৃ: ৪১৯) সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ ১৯৭৮ কলিকাতা)।

আলোচনার সুবিধার্থে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গীয় এলাকায় বিরাজমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক বিধায় বঙ্কিম-প্রতিভার প্রতিটি সৃষ্টিকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কেননা বাংলার ভাগ্যাকাশে সেদিন এ কোন্ প্রতিভার উদয় হয়েছিল, যার রথচক্রে ইয়ং বেঙ্গলের পাশ্চাত্যমুখী উদারতা থেকে শুরু করে রামমোহনের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন আর বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের 'সীমিত প্রগতির' পদক্ষেপ সবকিছু হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল—না হয় ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দুরা সেসব উচ্ছিষ্টের মতো বর্জন করে, "হিন্দু বাহুবল এবং হিন্দু শৌর্য-বীর্যের" জয়গানে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো? এ কোন্ প্রতিভা যিনি দীনবন্ধু মিত্র রচিত "নীল দর্পণ" এবং মীর মোশাররফ হোসেনকৃত 'জমিদার দর্পণ' নাটক দু'টিকে শ্রেণীস্বার্থে অবিলম্বে বেআইনী ঘোষণার লক্ষ্যে স্বীয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন? ইনিই হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক' এবং 'সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

"সমাজ-বিপ্লব সকল সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র "—বঙ্কিম

তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে রেখে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করা মহাপাতকের কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও অবস্থাদৃষ্টে এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ও যৌক্তিকতা রয়েছে যে, বঙ্কিমের মুখ্য পরিচয় হচ্ছে, এক বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিন্দু ভারতের অনন্যসাধারণ রাজনীতিবিদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক বিত্তশালী ও ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পথপ্রদর্শক ও দীক্ষাগুরু হিসেবে বঙ্কিমের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর লেখনীর প্রতিটি বর্ণ রাজনীতির মাদকতায় ভরপুর। তিনিই সার্থকভাবে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অহিফেন সেবনে সক্ষম হলেন।

শাসকগোষ্ঠীকে বিরাগভাজন না করে বঙ্গীয় এলাকায় প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ-সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় সংস্কারপন্থী আন্দোলন সম্মুখপানে ধাবিত হচ্ছিল, এরকমভাবে বলতে গেলে বঙ্কিমের একাকী কর্মকাণ্ডে তা রুদ্ধ হয়ে গেল। মোদ্দা কথায় তাঁর বক্তব্য হচ্ছে দু'টি মাত্র। পরাশক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধাচারণ কোনো অবস্থাতেই বরদাশত করা হবে না এবং রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে হিন্দু রিভাইভালিজম করতে হবে। এজন্যই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমের দাম্ভিক বক্তব্য হচ্ছে, "সমাজ-বিপ্লব সকল সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"

বঙ্কিমচন্দ্র শঙ্কাহীনচিত্তে ঘোষণা করলেন যে, "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আর্যদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে, যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে, ...যে সকল অমূল্য রত্ন ইংরেজদের চিত্তভাণ্ডার লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।" (বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড : ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?)

ইংরেজদের বশংবদ এদেশীয় জমিদার শ্রেণীর গার্জিয়ান হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীলতার মূর্ত প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আত্মপ্রসাদে ভরপুর। তিনি লিখেছেন, "চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেইদিন সে পরামর্শ দিব।" (বঙ্গ দেশের কৃষক, পৃ: ৮৪-৮৫)।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি বর্ণ হিন্দু তথা ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রাক্কালে নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের সম্রাট ও ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই হিন্দুধর্ম সংস্কারের বিরোধিতার কথা বলতে হয়। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েই এ মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, ইতিমধ্যেই রামমোহন প্রবর্তিত সংস্কারপন্থীদের ব্যাপক প্রভাব ছাড়াও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পর্যন্ত পাস হয়ে গেছে এবং বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় বহু বিবাহ বন্ধের কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। এ জন্যই তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' পুস্তকে এ মর্মে সুপারিশ করলেন যে, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করলে "বিবাহ প্রথার বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট হয়ে যাবে।" অর্থাৎ বিরাজমান সামন্ততান্ত্রিকসমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি বিনষ্ট হবে। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন :

"গুরু! নারী আত্মপালন ও রক্ষণে অক্ষম...অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগকে সে শক্তি পুনরাভ্যাস পুরুষ-পরম্পরায় উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বলে, তবে বিবাহ-প্রথার বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই।...

"সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি?" (ধর্মতত্ত্ব ১৮৮৮)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাসে স্বীয় প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে উদার ও সংস্কারপন্থীদের অগ্রগতির ধারাকে হয় রুদ্ধ করেছেন, না হয় বিপথগামী করে একটি চরম রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। বঙ্কিম রচনাবলী থেকে একথা বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের কথা হচ্ছে—নারী সম্প্রদায় পুরুষের সহিত সমানাধিকার লাভে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত' (১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'সাম্য' পুস্তকের প্রচার ও বিক্রি বন্ধ করে এটাই হচ্ছে বঙ্কিমের সংশোধিত মতবাদ)। এ জন্যই 'কমলাকান্তের

দপ্তর'-এ ব্যঙ্গরস ও হাস্য-কৌতুকের ভেতর দিয়ে তাঁর লেখনীতে নারী-বিদ্বেষ ও নারী সম্প্রদায়ের প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিমের আবির্ভাব হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজের রক্ষক হিসেবে। এজন্যই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক প্রতাপকে দূরসম্পর্কের আত্মীয়া নায়িকা শৈবালিনীর মিলন দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে মিলন প্রতিষ্ঠিত করেননি। কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে আত্মীয়া নারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে নায়ক প্রতাপ প্রাচীন সমাজের নীতিবোধ ও ধ্যান-ধারণাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল।

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিম সরাসরিভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মের জয়গান করা ছাড়াও বহু বিবাহ সমর্থন করেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য হচ্ছে যে, বহু বিবাহের মাঝ দিয়েও সংসারের সুখ ও শান্তিলাভ সম্ভব। এজন্যই এ উপন্যাসের সমাপ্তি লগ্নে আমরা দেখতে পাই যে, নায়ক ব্রজেশ্বর এত কিছু করার পরেও দেবী চৌধুরাণীসহ তার তিনজন স্ত্রীকে নিয়েই আবার সুখের সংসার পাতল। এই উপন্যাসের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, 'হে ইংরেজি শিক্ষিত যুব সমাজ, বহু বিবাহ প্রথা বন্ধের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের দাবিতে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না।'

বঙ্কিম রচিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সনাতন হিন্দু ধর্মে যেখানে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য ভয়ংকরভাবে বিদ্যমান, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিধবাদের জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত রয়েছে। অথচ আলোচ্য উপন্যাসের বিধবা নায়িকা রোহিনীর সর্বত্রই হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর। এ জন্যই ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নায়ক গোবিন্দলালকে ক্ষমা করলেও নায়িকা রোহিনীকে ক্ষমা করতে পারেননি।

অবস্থাদৃষ্টে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি প্রকারান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের প্রচার পদ্ধতির সাহিত্যরূপ। রক্ষণশীল হিন্দু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিধবা বিবাহের মতো এই সীমিত সংস্কারপন্থী পদক্ষেপও বঙ্কিম বরদাশত করতে পারেননি। এ জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে এবং বহু বিবাহের সমর্থনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিধবা বিবাহ জনপ্রিয় করার উদগ্র বাসনায় বিদ্যাসাগর যেখানে স্বীয় পুত্রের সঙ্গে বিধবা বিবাহ দেওয়ার পর নিজে অর্থ ব্যয় করে জনাকয়েক পড়শীর বিধবা কন্যাদের বিয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন, সেখানে তিনি কিছুদিন পরে দেখতে পেলেন যে, সে সব উপকৃত ব্যক্তিরাই "একঘরে" হওয়ার অছিলায় ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এরই জের হিসেবে পণ্ডিত ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বকেও শেষ জীবনের সাঁওতাল পরগনায় কার্মাটার নামক গ্রামে একাকীত্বের মাঝে কাটাতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কৃষক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী

রক্ষণশীল হিন্দু সনাতন ধর্মের মহিমা কীর্তন ছাড়াও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও এ দেশীয় জমিদার শ্রেণীর অন্ধ সমর্থক এবং কৃষক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী হিসেবে বঙ্কিম প্রতিভার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে বহু তথ্য উপস্থাপন করা সত্ত্বেও ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে কিছুটা আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বঙ্কিমভক্ত ডঃ অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মত হচ্ছে, 'আনন্দমঠের' মধ্যে প্রধান ও প্রবল সুর দেশাত্মবোধ। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রত্রিকার

মারফতে দেশ, সমাজ, ধর্ম ও জাতীয়তা সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা করছিলেন। এই উপন্যাস দু'টিতে সেই তত্ত্বদর্শনের কিছু ছাপ পড়েছে। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কাল্পনিক গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করেন 'বন্দে মাতরম্।' সঙ্গীতটিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।...সর্বোপরি উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী হাঙ্গামার মতো একটা লুটতরাজের বিশৃঙ্খল ঘটনাকে জ্যোতির্ময় দেশপ্রেম ও বলিষ্ঠ আত্মত্যাগের আধারে পরিবেশন করাতে কাহিনীটির বস্তুগত যথার্থ কিছু ক্ষুণ্ন হয়েছে। কারণ, ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে একদল উপদ্রবকারী সন্ন্যাসী (উত্তর প্রদেশের অধিবাসী) বাংলাদেশে কিছুকাল ধরে যে নির্যাতন, লুটতরাজ ও আরও নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল, তার সঙ্গে দেশপ্রেম কেন, কোনও প্রকার মহৎ বৃত্তির কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : পৃ: ৫৪১-৪২: সংশোধিত ৪র্থ সং; কলিকাতা ১৯৭৮)

অবশ্য আরও গভীরভাবে বঙ্কিম রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাস আলোচনার লক্ষ্যে পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক সুপ্রকাশ রায়-এর মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠ'-এ বিরাট গণঅভ্যুত্থানকে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তী কৃষক বিদ্রোহ) পাশ কাটাইয়া গিয়া এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। ইংরেজদের হস্তের ক্রীড়নক মীরজাফরের শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত কৃষক জনসাধারণের সংগ্রামকে তিনি এরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যেন তাহা মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু সংগ্রাম এবং মুসলমান শাসনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই প্রয়োজন ইংরেজ প্রভুত্বকে বরণ করা। সংগ্রামের শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াও সংগ্রামের নায়কগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন না করিয়া ইংরেজের হস্তে রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া তীর্থ দর্শন করিতে গেলেন। দেশ ইংরেজের হস্তে পতিত হইবে শুনিয়া বিদ্রোহীদের নায়ক সত্যানন্দ আক্ষেপ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসকের মুখ দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন :

"সত্যানন্দ, কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণ জয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব, তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে ভালোই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ৩য় সং কলিকাতা)।

বেদান্ত দর্শনের গোঁড়া সমর্থক বিবেকানন্দের আবির্ভাব

বাংলা সাহিত্যের সম্রাট ও ঋষি হিসেবে বর্ণিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমগ্র জীবনব্যাপী রক্ষণশীল ধারায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর ৮৬ বছর পর প্রখ্যাত গবেষক সুপ্রকাশ রায় সে সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর মূল্যায়ন করেছেন। মার্কিস্ট রায় লিখেছেন :

"সামন্ত প্রথার **সমস্ত** রক্ষণশীল কুসংস্কারের এমন ঘোরতর সমর্থক বলিয়াই বঙ্কিম-সাহিত্য এত আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল এদেশের সমাজের গোঁড়া হিন্দু ও উচ্চশ্রেণীর নিকটে। বঙ্কিমের উপন্যাসে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের কোনো সমর্থন নাই, সামন্ত অভিজাত সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোনো আহ্বান নাই। বঙ্কিমের আবেদন কেবল প্রগতির পথরোধকারীদের কাছে। বঙ্কিম-সাহিত্য হইল প্রগতি বিরোধী (হিন্দু) অভিজাত-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর সমাজের মুখপত্র। তাই ইহাকে আপোস করিয়া চলিতে হইয়াছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত প্রথার সঙ্গে।...বঙ্কিম চন্দ্রের মতে, দেশ ইংরেজ শাসনের পদানত হইবার ফল ভালোই হইবে। কারণ, ইংরেজ না আসিলে সনাতন

ধর্মের জয়ের সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ শাসন তাহা পুনরুদ্ধার করিবে এবং তাহা জয়যুক্ত হইবে। যে সময় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ত সেই সময় এইভাবে তিনি হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাইয়া ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করিয়াছেন।...ভারতের জাতীয়তাবাদের তথাকথিত গুরু বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, ইংরেজের সহযোগিতা করাই এখন জ্ঞান ও ধর্মের লক্ষণ। অতএব ইংরেজের সহিত সহযোগিতা এবং তাঁহাদের গুণগান করাই এখন সকলের কর্তব্য। কারণ, "ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।" (আনন্দমঠ)। ইহাই দেশবাসীদের প্রতি জাতীয়তাবাদের 'জনক' বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, 'আনন্দমঠ' জমিদার শ্রেণীর ইংরেজ-ভক্তিরই সাহিত্যিক রূপ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল 'আনন্দমঠ' এ-ই ইংরেজের জয়গান করেন নাই, তাঁহার বহু বিখ্যাত প্রবন্ধও ইংরেজের জয়গানে মুখর। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা তাঁহার নিকট ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ এবং সেই পথকেই তিনি অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস লইয়া দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।...এইভাবে বঙ্গীয় "রিনাসান্স আন্দোলনের" শ্রেষ্ঠ নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের যে পথ প্রস্তত করিয়া গিয়াছেন, সেই পথেই পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন : ৩য় স: ১৯৮০ কলিকাতা)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংরেজ ভারতের রাজধানী ও এদেশীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কোলকাতায় বসে যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কর্মতৎপরতার মাধ্যমে উপমহাদেশের সবচেয়ে অগ্রয়মান ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী সম্প্রদায়কে বিপথগামী করে পুনরায় রক্ষণশীল এবং সংকীর্ণমনা ও ধর্মান্ধ করতে সক্ষম হলেন; ঠিক তখনই হিন্দু ধর্ম ও বাহুবলের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে একদিকে যেমন ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটি ব্রাহ্মণ স্বামী দয়ানন্দ "আর্য সমাজ" গঠন করলেন, অন্যদিকে তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (১৮৩৪-৮৬) কোলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক নতুন আঙ্গিকে হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব-এর ভাবশিষ্য এবং বেদান্ত দর্শনের গোঁড়া সমর্থক স্বামী বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের কিঞ্চিৎ ইতিহাস এক্ষণে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে হয়। কেননা এসময় মাদ্রাজে প্রদত্ত এক বিখ্যাত বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ পরিষ্কার ভাষায় বললেন যে, "ভারতের সকল প্রকার উন্নতির পক্ষে যাহা সর্বপ্রথম আবশ্যক তাহা হইল ধর্মীয় জাগরণ। সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারায় ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিবার পূর্বে এখানে আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্লাবন আনয়ন করিতে হইবে।" (স্বামী বিবেকানন্দ : ওয়ার্কস : খণ্ড তিন, পৃ: ২২১)।

স্বামী বিবেকানন্দ-এর প্রচারিত দর্শনের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে তৎকালীন বঙ্গদেশের বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং ইউরোপের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা অপরিহার্য। কারণ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব-এর ভাবশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশে তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত নানা সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদান করে বেড়াচ্ছিলেন, তখনও সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ ও ঐতিহাসিক নীল বিদ্রোহের পরিসমাপ্তিজনিত পরিবেশ সমাজজীবনে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু দুই-দুইবার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকট রূপ ও তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম স্বামী

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার উপর এ সময় বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল বলা যায়। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, একদিকে যখন ইংরেজ ভারতে জমিদার-বিরোধী কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় গেছে এবং অন্যদিকে চা বাগান ও কয়লা অভ্র খনিগুলোতে নির্যাতিত শ্রমিকরা ছাড়াও বোম্বে-কোলকাতা-মাদ্রাজ এলাকায় যন্ত্রশিল্পের বাল্যকাল শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে শোষিত শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছে, তখন তাঁর প্রচারিত দর্শনে সমাজতন্ত্রের কিছুটা প্রলেপ না থাকলে তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিবেকানন্দের বর্ণিত সাম্যবাদের সঙ্গে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক নেই

এ জন্যেই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু উপনিষদের "সর্বভূতে বিরাজমান আত্মার" ধারণা থেকে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-মুচি-মেথর সকলকে সমান আখ্যায়িত করে 'ধুম্রজাল" সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছিলেন। এটুকু করেই স্বামীজী সেদিন সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করো, আই এ্যাম এ স্যোশালিস্ট অর্থাৎ আমিই হচ্ছি একজন স্যোশালিস্ট।" তিনি শ্রেণীসত্তাবর্জিত 'মুচি', 'মেথর', 'চণ্ডাল' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে 'সমাজতন্ত্রের' দাবিদার হয়ে জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করতে প্রচেষ্ট হলেন বলা যায়। কারণ কার্যক্ষেত্রে স্বামীজী বিবেকানন্দ বর্ণিত 'সাম্যবাদের' সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত 'সোশ্যালিজম'-এর কোনোই সম্পর্ক নেই। পারতপক্ষে একটু বলা যায় যে, সে আমলে কোলকাতা কেন্দ্রিক হতাশাগ্রস্ত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীর জন্য বিবেকানন্দের এ ধরনের কথাবার্তা কিছুটা মানসিক সান্ত্বনার সৃষ্টি করেছিল বৈ কি! সাহিত্য সম্রাট ও প্রকারান্তরে রাজনীতিবিদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেখানে স্বীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষিত সংস্কারপন্থীদের অগ্রগতি নিস্প্রভ করা ছাড়াও উলঙ্গভাবে কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থকদের ভূমিকা পালন করেছিলেন, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ 'সুচতুরভাবে আরও একধাপ এগিয়ে' হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত স্বীয় দর্শন প্রচারে লিপ্ত হলেন। এই 'সুচতুরভাবে আরও একধাপ এগিয়ে' যাওয়ার সময় স্বামীজী 'মুচি', 'মেথর,' 'চণ্ডাল' প্রভৃতি সমাজতন্ত্র মার্কা শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর মোদ্দা উদ্দেশ্যই ছিল শ্রেণী স্বার্থে সচেতন কৃষক জাগরণ এবং কৃষক বিদ্রোহকে এড়িয়ে যাওয়া। এজন্যেই তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ইত্যাদির কোথাও তিনি বঙ্গদেশে জমিদারদের বল্গাহীন শোষণ কিংবা শতাব্দীব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি।

সমসাময়িককালে বঙ্গীয় এলাকায় বিরাজমান পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে এখানে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনের (১৮৭৬-৮০ খ্রি.) কৃষি সচিব এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম-এর (ইংরেজ আইসিএস অফিসার এবং সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা) লিখিত বক্তব্যের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এ সময় ভীত-সন্ত্রস্ত এ্যালান হিউম লিখলেন, "দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব খবর এসে পৌঁছুচ্ছিল তাতে ...আমার মনে এ রকম ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, আমরা এক ভয়ংকর অভ্যুত্থানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।...এসব সংবাদ-এর বেশির ভাগ ছিল দেশের জনগোষ্ঠীর নিম্নতর অংশের (কৃষকদের) সম্পর্কে। এ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, দেশের জনসাধারণ প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে; তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একটা কিছু করার জন্য অধীর হয়ে

উঠেছিল।...আর এই একটা কিছু সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। (এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম : লাইফ অব স্যার উইলিয়াম ওয়াডারবার্ণ পৃ: ৮০-৮১)

এ ধরনের এক ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত দর্শনের স্বরূপটা পরীক্ষা করা সমীচীন মনে হয়। পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত গবেষক গোপাল হালদারের মতে "স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস হচ্ছে, জগৎকে যদি আমাদের কিছু জীবন-প্রদ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ। (বাসিক পরিচয় ৩২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা: শ্রী গোপাল হালদার রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী' প্রবন্ধ)।

আপাতদৃষ্টিতে বিবেকান্দের যে দর্শন বেশ কিছুটা পরস্পর বিরোধী ভাবধারার দর্শন বলে মনে হয় সে সম্পর্কে আরও কিছু তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনার প্রাক্কালে "অদ্বৈতবাদ" সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দান করা দরকার। সংক্ষেপে "অদ্বৈতবাদ" দর্শন বলতে যেটুকু বোঝা যায় তা হচ্ছে, "ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই—বাকি সবই মায়া।" এরই পাশাপাশি তিনি ছিলেন স্বদেশেপ্রেমের দাবিদার। তিনি বলেছেন, "ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ।...এই একমাত্র দেবতা যে জীবন্ত —আমার স্বজাতি। কিন্তু এই স্বর্গ অর্থাৎ মাতৃভূমির উদ্ধার কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদের দ্বারাই সম্ভব। এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত না হইলে আমাদের এই মাতৃভূমির আর উদ্ধারের আশা নাই।" একই সঙ্গে বিবেকানন্দ ছিলেন মূর্তিপূজারী শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব-এর ভক্ত শিষ্য। অথচ রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, "যদি সেই মূর্তিপূজা ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম?" আবার পরবর্তীতে বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের সমীক্ষা করলে আমরা দেখতেই পাই যে, যেখানে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতাকে বর্জন করার লক্ষ্যে ঘৃণার আহ্বান জানিয়েছেন, সেখানে তিনিই আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে 'বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব', 'রজোগুণের অনুশীলন' এবং 'শক্তির সাধনা' কামনা করেছেন। তিনি বলেলেন, "সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে কর্ম ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্ম বিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।"

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূরক

এই প্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক সুপ্রকাশ রায় সম্প্রতি বিবেকানন্দের প্রচারিত দর্শন ও জাতীয়তাবাদের যে মূল্যায়ন করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "এই প্রকার পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা লইয়া বঙ্গীয় "রিনাসান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদের পথ নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বহু নিবন্ধ ও বক্তৃতার মারফত ভারতবাসীকে সেই পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। কতিপয় দৃষ্টান্ত :

১. **ভারতের মুক্তির পথ** : "শক্তিনাশক অতিন্দ্রীয়তাবাদ পরিহার করিয়া শক্তিমান হও। উপনিষদের মহাসত্যগুলো তোমার সম্মুখে রহিয়াছে। সেই সকল সত্য গ্রহণ কর, তাহা অনুসরণ কর —তাহা হইলেই ভারতের মুক্তি নিকটবর্তী হইবে।"

২. **ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপায়** : "...সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মের ঐক্যসাধন। ইহা বলিতেছি না যে, রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমার মতে ধর্মই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।"

৩. **বিশ্ব জয়ের পরিকল্পনা :** "এখন এরূপভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারা পাশ্চাত্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের মারফত সমগ্র বিশ্বজয় করিতে হইবে।...উপনিষদের শিক্ষা গ্রহণ—য়ুরোপকে কেবল উপনিষদের ধর্মই রক্ষা করিতে পারে।"

পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদীগণ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দ "জাতীয় বীর' বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তিনি কোনো সুগঠিত রাজনৈতিক মতপ্রকাশ অথবা স্বাধীনতা লাভের জন্য কোনো রাজনৈতিক পথ-নির্দেশ করেন নাই।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : ৩য় সং ১৯৮০ কলিকাতা)।

এখানেই শেষ নয়। সুপ্রকাশ রায় মহাশয় দুইটি মাত্র বাক্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দের মূল দর্শন এবং বাঙালি হিন্দু মধ্যশ্রেণী মন-মানসিকতা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সত্য ভাষণ করেছেন। শ্রীরায়ের বক্তব্য হচ্ছে, "তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-ভারতের ঐক্যসাধন ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচারক। তথাপি পরবর্তীকালে মধ্যশ্রেণীর কর্মীবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদীগণ তাহার ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের বাণী হইতে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।"

তাই আমরা ইতিহাস-ভিত্তিক তথ্য থেকে দেখতে পাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ এ সময়ে ঢাকায় আয়োজিত কয়েকটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করলে, হেমচন্দ্র ঘোষের (পরবর্তীকালের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী) নেতৃত্বে একদল শহুরে হিন্দু যুবক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপদেশ প্রার্থনা করেন। স্বামীজী এসব যুবককে এ মর্মে উপদেশ দেন যে, "প্রথম কাজ প্রথমে করিতে হইবে। শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়া তরুণ বাংলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা এমন কি 'ভগবতগীতা' পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।" এ ধরনের বক্তব্যের পর স্বামীজী এই যুবকদের চার দফা বক্তব্যের নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশগুলো নিম্নরূপ :

ক. মাতৃভূমির সেবাই তোমাদের প্রথম কর্তব্য।
খ. ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।
গ. জনগণের মধ্যে যাও—অস্পৃশ্যতা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর। এবং
ঘ. বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাঁহার দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুসরণ কর।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে একথা আজ পক্ষপাতিত্ব করে বললেও বলতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রচারিত উগ্ররক্ষণশীল হিন্দু ধর্মীয় দর্শনের মতামত থেকে বিবেকানন্দের দর্শনকে খুব একটা পৃথক করে দেখার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বরং সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূরক শক্তি। হিন্দু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গঠনের লক্ষ্যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় বঙ্কিমের যেখানে সমাপ্তি স্বামী বিবেকানন্দের শুরুটা কিন্তু সেই ভিত্তি থেকেই। বৈষ্ণবী বিনয় প্রকাশ না করে সহজ ও সরলভাবে বলতে হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত 'নবহিন্দুবাদ' ও 'হিন্দুজাতীয়তাবাদের'ই সমর্থক। এ জন্যই স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় সে আমলের হিন্দু যুব সম্প্রদায়কে সামন্ততন্ত্র ও ইংরেজ শাসনের প্রশান্তি গানে মুখর বঙ্কিম-সাহিত্য বারংবার পাঠ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতন ধর্ম অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ কিন্তু বঙ্কিম-এর মতো স্পষ্টভাবে কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা এবং ইংরেজ শাসনের অবিচলভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু আবার একথাও বলতে হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী কৃষকদের বৈপ্লবিক উত্থান প্রত্যক্ষ করেও বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে অর্থবহ কারণে বরাবর নিশ্চুপ ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কোলকাতা কেন্দ্রিক তথা সমগ্র বঙ্গীয় বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীর নিকট হিন্দু ভারতের ধর্মীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বাণী প্রচার করে যে জাতীয়তাবাদ-এর স্বপ্নকে উপস্থাপিত করেছিলেন, সে সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার অপর এক গবেষক অমলেন্দু সেনগুপ্তের মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শ্রী সেনগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, "তাহাদের এই জাতীয়তাবাদ ছিল স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ, 'হিন্দু-সম্প্রদায়ের পুনরুত্থান, মানুষের নতুন মহিমাবোধ, ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন প্রভৃতি ধারণার সমষ্টিবদ্ধরূপ।" (বিবেকানন্দের সমাজ চিন্তা' প্রবন্ধ—অনুশীলন, শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৯)।

মার্কসসিস্ট গবেষক বিনয় ঘোষ এ সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য হচ্ছে, "শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব যেভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, তার আরও বিস্ময়কর মনে হয়। বিদ্যাসাগরের মতো হৃদয়বান নির্ভীক সমাজসংস্কারকও মেকলের 'ফিলট্রেশন পলিসির' (পরিশ্রুতি নীতি) অসহায় 'ভিকটিম' (ভুক্তভোগ) হয়ে নিজের মধ্যবিত্তসুলভ মানসিক সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং জনশিক্ষা ও শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার নীতি প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। কেশবচন্দ্র সেনের মতো তেজস্বী সংস্কারক কতরকমের পরস্পর-বিরোধী আদর্শের আবর্তে পড়ে শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তাও আমরা জানি। বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহের সমস্যার প্রবল আন্দোলন বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে উনিশ শতকের মধ্যভাগে হওয়া সত্ত্বেও, উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলার উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ কীভাবে তাঁর প্রেতাত্মা খুঁড়ে তোলে, তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে নিজেদের রক্ষণশীল হিন্দুভাব প্রধান মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, তা ভাবলেও মাথা হেঁট হয়ে আসে। আর আদর্শের দিক থেকে যাঁরা হিন্দু অবতারবাদ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও অল্প নয়। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসও এই একই মনোভাব জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আগাগোড়া ব্যক্ত হয়েছে। (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : ২য় সং : ১৯৭৮ : প্রকাশ ভবন কলিকাতা)।

সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত দর্শনের মূল্যায়ন করলে গবেষক সুপ্রকাশ রায়ের ভাষায় বলতে হয় যে, "তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-ভারতের ঐক্যসাধন ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচারক।"

তাহলে সবার মনে এ মর্মে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে, "কিন্তু কেন এমনটি হলো?" যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে রামমোহনের সংস্কারপন্থী আর ইয়ং বেঙ্গল-এর পাশ্চাত্যমুখী আন্দোলনের মাধ্যমে যাত্রার শুরুটা হয়েছিল, সেখানে এই শতাব্দীর শেষভাগে এসে যখন পূর্ণ অবয়বে একটি "জাতীয়তাবাদ'রূপী শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার আগমন বার্তা এসে গেছে, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে ইতিহাসের কোন্ প্রেক্ষিতে ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু মধ্য শ্রেণী একযোগে মন্ত্রযুদ্ধের মতো 'হিন্দু বাহুবল' আর 'হিন্দু শৌর্যবীর্যের' জয়গানে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল?'

আর এই জের হিসেবে উপমহাদেশের সমস্ত নেতৃস্থানীয়রা উদগ্রীব নয়নে দেখতে পেল "এক বিকলাঙ্গ জাতীয়তাবাদ-রূপী শিশুর' এই ধরাধমে আগমন হয়েছে। তার ললাটে চন্দন তিলক এবং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষরের মালা আর শিশুটি লালিত-পালিত হতে শুরু করেছে শ্বেতাঙ্গ ধাত্রীর ক্রোড়ে।

বঙ্গীয় এলাকার হিন্দু জমিদারি শ্রেণী এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাট এলাকার উঠতি শিল্পপতিদের মিলনে এবং জনাপাঁচেক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ আইসিএস অফিসারের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর জন্ম হলো। প্রথম সভাপতি হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ আইসিএস এবং বড়লার্ট লর্ড লিটনের এককালীন কৃষি সচিব এ্যালন অকটাভিয়ান হিউম। আর এই প্রতিষ্ঠানের অঘোষিত পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফ্‌রিন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বঙ্গীয় এলাকায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান চিন্তাধারা সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "উনিশ শতকের শুরু থেকেই হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এই কর্মপ্রচেষ্টা ও ভাবধারা পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সঙ্গে যখন যুক্ত হলো বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা ও অভাব-সঙ্কটের তাড়না, তখনই সূচনা হলো রাজনৈতিক আন্দোলনের।" (মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্যঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অক্টোবর ১৮৬৪ ঢাকা)

তা'হলে ইংরেজি-শিক্ষিত কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের তাগিদের ধাপগুলো কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সংক্ষেপে তার উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভাবিত বিশিষ্ট লেখক এবং 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩ খ্রি.) গ্রন্থের রচয়িতা রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রি.) কোলকাতায় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে যে "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা" নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, তারই প্রস্তাবনাপত্রের বর্ণিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মাত্র ৬ বছরের মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো "হিন্দু মেলার"। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে গঠিত 'হিন্দু মেলা' স্থাপিত হওয়ার ৫ বছরের মধ্যেই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার যাত্রারম্ভ।

এর পরের ধাপেই আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী ভারতবাসীদের অধিকার আদায়ের আড়ালে নিজেদের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। এরই প্রেক্ষাপটে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হলো "ভারত সভা"। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সমগ্র ইংরেজ ভারতের পক্ষ থেকে কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুসম্প্রদায় এসব দাবি-দাওয়া উত্থাপনের ক্ষমতা পেল কোত্থেকে? এর জবাবে শুধু এটুকু উল্লেখ করতে হয় যে, এঁরা যে শুধুমাত্র দেড় শতাধিক বছর ধরে ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে এবং এ সময় উপ-মহাদেশের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে অগ্রসর ছিলেন তা-ই নয়; ভৌগোলিক দিক দিয়ে এঁদের আবাসভূমির অবস্থানটাও সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল বলতে হয়।

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গলাকীর্ণ সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই ৩টি মাত্র গ্রামের জমিদারির ইজারা লাভের মাধ্যমে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়েছিল, মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে সেই ইংরেজ শাসনাধীন "বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি" নামের এলাকাটা বিশালকায় হয়ে দাঁড়ালো। উপরন্ত নিত্য-নতুন ঘটনা প্রবাহের মাঝ দিয়ে ইংরেজ

এলাকা বেড়েই চলল। এ সময় মধ্য ভারতের অঞ্চল বিশেষ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পূর্বে চট্টগ্রামের অদূরে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড এই শ্বেতাঙ্গ বণিকদের পদানত হলো। এ জন্যই ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স -এ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সনদ পরবর্তী ২০ বছর পর্যন্ত নবায়নকালে দেখা যায় যে, রাজধানী কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এই সর্বপ্রথম ৪-জন কাউন্সিলরসহ একটি গভর্নর-জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন ইংরেজদের প্রথম গভর্নর-জেনারেল এবং তার তিনজন কাউন্সিলর হচ্ছেন যথাক্রমে ক্লেভারিং, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফরানসিস। আরও ২০ বছর পর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শেষবাবের মতো এবং প্রশাসন সংক্রান্ত চার্টার-এর রুটিন নবায়নের সময় একটি ডেপুটি গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করতে হলো।

বাংলাদেশের এলাকা দাঁড়াল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গ মাইল

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আধুনিক উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবটাই ইংরেজদের পদানত হলো। সে আমলে এই প্রদেশের নামকরণ হলো "উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।" এরপর ১৮১৬ তে নেপাল ও ছোট নাগপুর এবং ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ভারতীয় মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। বেঙ্গলের অধীনে এই নবগঠিত এলাকা সাগর ও নর্মদা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হলো। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দ আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মনিপুর ছাড়াও বিশাল বর্মী এলাকায় উত্তোলিত হলো ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা।

কিন্তু প্রশাসনের দিক দিয়ে এ বিশাল ভূ-খণ্ডের সবটাই বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আওতায়। এর পরবর্তীতে ১৮৩৯-৪০ সাল নাগাদ রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর ইংরেজদের পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ দখলের কর্মকাণ্ড তো আর এক বিশাল ইতিহাস। এদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশ দশকে বিরাটকায় বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসন পরিচালনায় মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশকে বঙ্গীয় এলাকা থেকে পৃথক করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনও একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্বে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও শুধু দুর্বল প্রশাসনের জের হিসেবে ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার ১২ হাজার বর্গমাইল এলাকায় ৪০ লাখ লোক এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। (সূত্র : সিই বাক্‌ল্যান্ড রচিত বেঙ্গল আন্ডার লেফটেন্যান্ট গভর্নরস) রেখক ও গবেষক সখারাম গণেশ দেউস্কর রচিত এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্তকৃত "দেশের কথা" গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য মোতাবেক ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে শুধু উড়িষ্যা ও পাশ্ববর্তী এলাকায় অনাহারে প্রায় ৬ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল।

এটা এমন এক সময় যখন ইংরেজদের অধীনে বাংলা নামে দেশটার এলাকা দাঁড়িয়েছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গমাইল। পূর্ব থেকে পশ্চিমের চিহ্নিত সীমানার দূরত্ব প্রায় ৮০০ মাইলের মতো। উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে এ সময় দেখা দিলো দুর্যোগের ঘনঘটা। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির নাগা উপজাতি ১৮৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েক দফায় হামলা চালাল। ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের শীতের মওসুমে নাগা বিদ্রোহীরা সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের বহু এলাকা লণ্ডভণ্ড করে বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠন করল। এরপরেই শুরু হলো আসামের চা-বাগানগুলোতে উপজাতীয়দের উপর্যুপরি আক্রমণ। ফলে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটসহ আসামকে আলাদা প্রদেশ হিসেবে বাংলা থেকে পৃথক করে একজন চিফ

কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হলো। এরপরেও বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির অধীনে অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও বিহার, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা প্রদেশ রয়ে গেল। এর এলাকা ১ লাখ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখের মতো।

বাঙালি মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম মান-অভিমান

এ সময়ের বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে একটা সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ এবং আলোচনার সুবিধার জন্য উপমহাদেশের মানচিত্রে বিভিন্ন জাতির অবস্থান, বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের সম্প্রসারণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপনা করতে হলো। এটা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। এ সময় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু সমাজের আর এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এই প্রতিভাবান মনীষীর নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডে যখন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী অন্ধ পতঙ্গের মতো 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর অগ্নিশিখার দিকে ধাবিত হচ্ছিল, ঠিক এ সময় সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রি.) ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজ সরকারের চাকরিতে যোগদান করার মাত্র তিন বছরের মধ্যে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে চাকরিচ্যুত হন। পরবর্তীতে তিনি সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতা পেশায় লিপ্ত হন। ১৮৯৫ এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষ জীবনে ব্যানার্জী মহাশয় ১৯২১-২৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ১০ বছর পূর্বে এই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি শিক্ষিত বর্ণ হিন্দুদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে "ভারত সভা" বা 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর অনেকগুলো উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার সর্বনিম্ন বয়সের সীমা বাড়াতে হবে, ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাপড়ের উপর ধার্যকৃত কর বাতিল করতে হবে এবং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারিকৃত 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' (১৮৭৬ খ্রি.) ও নাটক নিয়ন্ত্রণ এ্যাক্ট (১৮৭৬ খ্রি.) বাতিল করতে হবে।

আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে এসব দাবি-দাওয়া সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের স্বার্থে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তথাপিও কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য দাবি-দাওয়াগুলো আদায় হলে কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মুষ্টিমেয় উঠতি বস্ত্র শিল্পপতিরা ছাড়া বাকি সবগুলো ক্ষেত্রেই ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রসর কোলকাতা কেন্দ্রিক মধ্য শ্রেণীর উপকৃত হওয়ার কথা। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রগতিশীল গবেষক অধ্যাপক ড: আনিসুজ্জামান-এর বক্তব্য হচ্ছে, 'কিন্তু যেহেতু এই উদীয়মান উচ্চরিত শ্রেণী ছিল ইংরেজ বণিক ও শিল্পপতিদের পার্শ্বচর, তাই ইংরেজ শাসকদের শুভেচ্ছায় 'এদের আস্থা ছিল যথেষ্ট। তেমনি বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্কট মধ্যবিত্তকে জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা দিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা আনয়নকারী ইংরেজ শাসকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা তাঁদের কম ছিল না। বাংলার উদীয়মান উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল নানা ঐতিহাসিক কারণে। (মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য : পৃষ্ঠা ৬৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।

ভবানীপুরে ইংরেজ যুবরাজ এডওয়ার্ডকে কুলবধূরা চন্দন তিলক দিয়ে বরণ করল

এখানে একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করলে আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মনে হয়। যে ইংরেজের সঙ্গে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দুদের একটা হরিহর আত্মার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে সেই সম্পর্কের খানিকটা ভাঙনের সৃষ্টি হলো কেমন করে? সিপাহী বিপ্লবের পরবর্তী ২০ বছর পর্যন্ত উপমহাদেশে অরাজকতার প্রেক্ষিতে বিরাজমান পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শনের লক্ষ্যে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতের রাজধানী কোলকাতা সফরে আগমন করেন। এই যুবরাজকে সম্বর্ধনা প্রদানের প্রশ্নে সেদিন কোলকাতার বর্ণহিন্দু সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। ভবানীপুরের প্রখ্যাত উকিল ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুধু যে দলবল নিয়ে ইংরেজ যুবরাজকে সম্বর্ধনা জানালেন তাই নয়, শেষ পর্যন্ত যুবরাজকে স্বীয় বাসভবনে আমন্ত্রণ করে আনলেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সেদিন ভবানীপুরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। জগদানন্দের বসতবাটির সম্মুখের রাস্তার দু'পাশে হিন্দু যুবতীরা দাঁড়িয়ে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে এবং উলুধ্বনি দিয়ে যুবরাজ এডওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা জানাল। এরপর বসতবাটির প্রবেশ দ্বারে কুলবধূরা দাঁড়িয়ে যুবরাজের ললাটে চন্দন-তিলক পরিয়ে বরণ করলো।

যুবরাজ এডওয়ার্ড যথাসময়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও ঘটনার পরিসমাপ্তি হলো না। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হলো যে, জাতীয় চেতনাকে বলৎকার করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলার গবেষক ড: প্রভাতকুমার গোস্বামী এ সম্পর্কে লিখেছেন ১৮৭৬-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার জগদানন্দকে বিদ্রূপ করে গজদানন্দ ও যুবরাজ নামে এক প্রহসন মঞ্চস্থ করে। সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করে দ্বিতীয় অভিনয় রাতেই এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেয়। উদ্যোক্তারা দমে গেলেন না। তারা হনুমান চরিত্র না দিয়ে ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রহসনটি আবার অভিনয় করালেন। রাজভক্ত প্রজাদের মান রক্ষার জন্য পুলিশ এবারেও অভিনয় বন্ধ করে দিল। এরপরে পুলিশ কমিশনার স্যার স্টুয়ার্ট হগ এবং সুপারিনটেনডেন্ট ল্যাম্বকে ব্যাঙ্গ করে 'পুলিশ অব পিগ এন্ড শীপ' নামক প্রহসন রচিত হলো। এটার অভিনয়ও পুলিশ বন্ধ করে দেয়" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক : সাহিত্য প্রকাশ কলিকাতা ১৩৮৫ বাংলা)।

কোলকাতায় যখন পরিস্থিতিটা কিছুটা উত্তপ্ত, ঠিক সে সময়েই অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন পাস করে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী করা হলো। ভারতের বড়লাট লর্ড লিটনকে এ সময় এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, দিল্লীতে দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে দরবার বসিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।

এটা এমন এক সময় যখন দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এলাকায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ লোকের অনাহারে মৃত্যু (মৃতের সংখ্যা ৫০ লাখ) হচ্ছে এবং অন্যদিকে রাজধানী কোলকাতায় এক শ্রেণীর যুবক নাটকের মাধ্যমে বিরক্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হয়েছে। ফলে অতি সম্প্রতি জারিকৃত নাটক নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স ছাড়াও এই ১৮৭৬ সালেই

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা নিয়ন্ত্রণ অ্যাক্ট বলবৎ করা হয়।

ঠিক এমনি এক সময় ইতিপূর্বে বর্ণিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো ব্যক্তিত্ব বাঙালি মধ্য শ্রেণীর স্বার্থে ইলবার্ট বিল ইত্যাকার দিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। লর্ড লিটনের পর বড়লাট হিসেবে লর্ড রিপনের (১৮৮০-৮৪ খ্রি.) আগমনে বাঙালি বর্ণহিন্দু ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের আবার উন্নতি হলো। লর্ড রিপন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে কারাগার থেকে মুক্তি করা ছাড়াও এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতিদের সমান ক্ষমতা প্রদান, স্থানীয় সরকারে এদেশীয়দের অধিকতর অধিকার প্রদান প্রভৃতি অনেক ক'টি বিষয়ে কনসেশন প্রদান করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড রিপন ছিলেন ১৮৬৮ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালীন মুক্ত বুদ্ধির ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাড স্টোন-এর ভাবশিষ্য। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে গ্লাড স্টোন জয়লাভ করেই রিপনকে ভারতে বড় লাটের দায়িত্বে পাঠান। লর্ড রিপনের শ্লোগান ছিল "ইংল্যান্ড আর ভারত হচ্ছে পরস্পর পার্টনার শাসক আর প্রজার সম্পর্ক নয়।" কিন্তু রিপনের কার্যকলাপ বিশেষ করে কোলকাতায় স্থানীয় শ্বেতাঙ্গরা খুবই উষ্মা প্রকাশ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিক পারসিভাল স্পিয়ার-এর মতে এ সময় কোলকাতার ইংরেজরা বড়লাট রিপনকে অপহরণের কথাও চিন্তা-ভাবনা করেছিল। কিন্তু কোনো কিছুই রিপনকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, লর্ড রিপনের তখন একটাই মাত্র ভাবনা। এদেশে ইংরেজদের সবচেয়ে বনেদী ও শক্তিশালী সমর্থক সম্প্রদায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু যেন কোনো অবস্থাতেই বৈরী হতে না পারে।

এ জন্যই তো লর্ড রিপনের অনুসৃত পথ অবলম্বন করে পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত বাঙালি বর্ণহিন্দুদের বিপথগামী হওয়ার পর রুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

তাহলে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের বঙ্গীয় এলাকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন দ্বিতীয় দফায় ইংরেজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে বহু প্রতিবন্ধকতার মাঝ দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যশ্রেণী একটা অবয়ব নিতে শুরু করেছে, অন্যদিকে তেমনি এর পাশাপাশি বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত আর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কের স্তরগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই স্তরগুলো হচ্ছে :

১. মান-অভিমান ও মান কষাকষির স্তর, ২. আবেদন-নিবেদন ও দাবি-দাওয়ার স্তর, ৩. আন্দোলন এবং ১৯০৫ সাল নাগাদ, ৪. সন্ত্রাসবাদ-এর স্তর।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যখন নানা ঘটনা প্রবাহের মাঝ দিয়ে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীর মধ্যে মান-অভিমান এবং মন কষাকষির পর্ব শুরু হয়ে গেছে, ঠিক সে সময় অর্থাৎ ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫-০৬ সাল পর্যন্ত ৩৫ বছরকাল সময়ে সদ্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সূচনাটা কীভাবে হলো তার পটভূমির প্রতি আবারও কিছুটা আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করছি। এ কথা আজ স্বীকার করতেই হয় যে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর প্রায় ১১৫ বছর যাবৎ নানা পন্থায় ইংরেজ বিরোধিতার পর ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে দিল্লী আলিগড়ে সৈয়দ আহমদ এবং কোলকাতায় সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রহিম, সৈয়দ

হাসান ইমাম, আবদুল লতিফ খাঁ এবং জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলীর নিরলস প্রচেষ্টায় যখন মুসলমানরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে, এদেশে ইংরেজ শাসনকে এক্ষণে মেনে নেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে–ঠিক সে সময় থেকেই প্রকৃত অর্থে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের সূচনা হলো।

বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বিলুপ্তির কারণ

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, ১১৫ বছর আগে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালেও মুর্শিদাবাদ-ঢাকা তথা বঙ্গীয় এলাকায় মুসলিম শাসনামলে যে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় ছিল, সেই সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি কীভাবে হয়েছিল? এর পিছনে প্রধানত তিনটি কারণ দেখা যায়। প্রথমেই বর্ণহিন্দুদের কর্মকাণ্ডের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, নবাবী আমলে বঙ্গীয় এলাকায় বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী হিন্দু ও মুসলমানরা মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যেই মুসলিম নবাবদের আমলে দেখা যায় যে, রাজস্ব, বিচার ও সৈন্য বিভাগ ছাড়া সর্বত্রই বর্ণহিন্দুদের প্রাধান্য সানন্দে গৃহীত হয়েছিল। তবে এসব নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বর্ণহিন্দুরা সবাই রাজভাষা ফারসিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, ইতিহাসের নানা ঘটনা প্রবাহে এঁরা প্রথম সুযোগেই (কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে) মুসলিম নবাবদের বদলে ইংরেজ কোম্পানির শাসনকে বরণ করে নিলেন এবং অতিরিক্ত রাজভাষা যেখানে ফারসি শিখতে হতো, সেখানে এর বদলে নতুন শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ইংরেজী ভাষাকে সহজেই রপ্ত করে ফেলে। তাই বাঙালি বর্ণহিন্দুদের পক্ষে সে আমলে আনুগত্য পরিবর্তনের বিষয়টা খুব একটা অসুবিধার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। নবাবী আমল এবং ইংরেজ কোম্পানির শাসন–এই দু'টো সময়কালেই বর্ণহিন্দুদের ভূমিকা হচ্ছে সম্পূরক শক্তি হিসেবে।

দ্বিতীয়ত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপের কথা বলতে হয়। পলাশীর যুদ্ধ বিজয় থেকে শুরু করে সিপাহী বিপ্লব–ঠিক একশ' বছর সময়কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, স্বাভাবিকভাবে তার সবগুলোই সিংহাসনহারা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কে লর্ড এলেনবরার বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে প্রেরিত এক পত্রে এ মর্মে লিখেছেন যে, এ কথা বিশ্বাস করে আমি নিজের চোখ বন্ধ রাখতে পারি না যে, এই সম্প্রদায় (মুসলিম) মূলতঃই আমাদের শত্রু। হিন্দুদের সন্তুষ্ট রাখাই আমাদের সত্যিকার নীতি হওয়া উচিত। (ডব্লুউসি স্মিথ : মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া ১৯৪৫, লন্ডন)।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছাড়াও পরবর্তীতে ওয়াকফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং সরকারি কাজকর্মে ও আদালতে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি ভাষা চালু করা প্রভৃতি প্রতিটি পদক্ষেপ বিশেষ করে বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম সমাজের অভিজাত (আশরাফ) শ্রেণীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎও নিশ্চিহ্নের পথে ঠেলে দিল।

তৃতীয় বিষয়টা কিন্তু নবাবী আমলে বঙ্গীয় এলাকায় সৃষ্ট মুসলিম আশরাফ শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত। প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন বহিরাগত অবাঙালি মুসলমান। তাঁরা ছিলেন দিল্লীর মোগল সম্রাটদের আশির্বাদপুষ্ট এবং এঁদের মাতৃভাষা ছিল ফারসি। বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক একরকম ছিল না বললেই চলে। এঁদের যথার্থভাবেই সে আমলের সমাজের পরগাছা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অবস্থার প্রেক্ষিতে ফারসি ভাষা এসব আশরাফ শ্রেণীর পরিবারগুলো বাঙালি

মুসলমানদের এতিম করে উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে সেদিন পাড়ি জমিয়েছিল। অবশিষ্ট হাতেগোনা বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্তের লোকগুলো সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের ভাষায় বলতে হলে "...সকল প্রকার সুখ-সুবিধা হারিয়ে (এঁরা) গ্রামাঞ্চলের দিকে পা বাড়াল। সেখানে তাঁদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। বর্তমান সরকারের (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) অধীনে রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে পূর্ব বাংলার শহরগুলো যেভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তা ইতিহাসের এক মর্মান্তিক ঘটনা। কিছুসংখ্যক মুসলমান যারা এসব শহরে বসবাস করছিল তারা উন্নতির কোনো সুযোগই পেল না। অপরপক্ষে কোলকাতার হিন্দুরা অসম্ভব রকম সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করলো।" (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান বাংলা একাডেমী ১৯৮২)।

জৌনপুরীর ফতওয়া : বাঙালি মুসলমানদের ম্যাগনাকার্টা

এজন্য এ কথা আজ বলা যায় যে, প্রায় শতবর্ষ পর্যন্ত বঙ্গীয় এলাকায় মুসলিম উচ্চবিত্ত এবং মধ্য শ্রেণী মোটামুটিভাবে অনুপস্থিত ছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর মল্লিকের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তিনি উল্লেখিত গ্রন্থে আরও বলেছেন যে, মুসলমানদের সব চাইতে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্লথ অভ্যুত্থান। অথচ আধুনিককালে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই একটি জাতির সকল প্রকার উন্নতির সোপান। ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন জানাবার আর কেউ রইল না।

এভাবেই যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। অবশেষে ইংরজ বিরোধী ওহাবী আন্দোলনের একেবারে শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, আবদুল্লাহ নামক জনৈক পাঞ্জাবী ওহাবী যুবক কোলকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস নর্মানকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ফাঁসিতে আত্মাহুতি দিল। আন্দামান দ্বীপে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডভোগকারী শের আলী খান নামক অপর এক পাঠান ওহাবী মাত্র ৫ মাস সময়ের ব্যবধানে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি আন্দামান জেল সফররত ইংরেজ বড়লাট লর্ড মেয়োকে হত্যা করে ফাঁসির রজ্জু বরণ করে নিল। এই সঙ্গে ইংরেজবিরোধী ওহাবী আন্দোলনের যবনিকাপাত হলো।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, এর মধ্যেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেই মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সেই ঐতিহাসিক ফতওয়া জারি করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, "ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ কেবল অসিদ্ধ তা নয় তেমন সংগ্রাম দেখা দিলে মুসলমানদের কর্তব্য হবে তথাকথিত জেহাদীদের বিরুদ্ধে শাসককে সাহায্য করা।

আপাতদৃষ্টিতে কেউ কেউ এই ফতওয়াকে ইংরেজদের দালালি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও বিরাজমান পরিস্থিতিতে এই ফতওয়াকে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের ম্যাগনাকার্টা' বলে চিহ্নিত করা যায়। কেননা এ সময় থেকেই এ দেশে প্রকৃত অর্থে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিকাশের গতি দ্রুততর হলো। বাংলাদেশের প্রগতিশীল চিন্তাধারার গবেষক ডক্টর আনিসুজ্জামানের মতে, "তবে অনতিবিলম্বে বাঙালি মুসলমানও নবোৎসাহে আধুনিক জগতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু সমাজের চেয়ে একটু পরবর্তী সময়ে হলেও একই পথ ধরে সামাজিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টায় তাঁরাও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।"

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের ধারা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে এ ব্যাপারে আরও কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষের বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি মুসলমানদের বঞ্চিত এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে আমলে ইংরেজ ভারতের রাজধানী কোলকাতায় বাঙালি বর্ণহিন্দুদের যে শক্তিশালী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল বিনয় ঘোষের মতে সেটাই হচ্ছে এক বিরাট ট্রাজেডি'। তিনি লিখেছেন, 'কিসের ট্র্যাজেডী?' প্রথম ও প্রধান ট্র্যাজেডি হলো, বাংলার এই নতুন বিদ্বৎসমাজ প্রায় সম্পূর্ণ 'মুসলমান বর্জিত' রূপ ধারণ করল এবং সেইজন্য একে সাধারণভাবে 'বাঙালি বিদ্বৎসমাজ' না বলে, বিশেষ অর্থে 'বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমরা যখন নব্যবঙ্গের বা নবযুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি তখন কতকটা সচেতনভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজের এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাই। কিন্তু কোনো সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তো নয়ই। বাংলার বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তাই বাঙালি মুসলমান সমাজের কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলার পুরাতন সমাজবিন্যাসের ভাঙাগড়া চলছে এবং ইংরেজ আমলের নতুন সম্ভ্রান্ত ধনিকসমাজ গড়ে উঠেছে, তখন মুসলমান সমাজের অবস্থা কী? বাঙালি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার সেই সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছেন।...হিন্দু সমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ একটি বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মুসলমান সমাজে নতুন মধ্যশ্রেণীর বিকাশতো একেবারেই হয়নি, পুরাতন অভিজাত সমাজ ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে এবং দরিদ্র নিঃস্বশ্রেণীর সংখ্যা বেড়েছে। ...উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার মুসলমান সমাজের এই ভয়াবহ চিত্রের কথা মর্মে করলেই নব্যবঙ্গের বিদ্বৎসমাজের বিকাশের মধ্যে ট্রাজেডি' কোথায় ও কেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়।" (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : ২য় সং প্রকাশ ভবন ১৯৭৮ কলিকাতা)।

তাহলে আলোচ্য সময়ে 'সমাজের এলিট শ্রেণী' বলতে আমরা একটি অসম্পূর্ণ চিত্র দেখতে পাই। এই চিত্রের প্রায় সবটাই জুড়ে রয়েছে 'হিন্দু বাহু বল' ও 'হিন্দু শৌর্যবীর্যে'র জয়গানে মুখরিত ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের সমর্থক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত উচ্চবর্ণের সঙ্গতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত 'এলিট শ্রেণী'। তারা এখন পরিণত ও প্রাপ্তবয়স্ক।

তাই সরকারের কাছে এঁদের 'আব্দার 'দাবি-দাওয়ার' তালিকাটা বেড়েই চলেছে। স্বীয় শ্রেণী স্বার্থের তাগিদে রাজনীতির নিষিদ্ধ আঙিনায় এঁদের এখন পদচারণা শুরু হয়ে গেছে। অথচ এ সময় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের সবেমাত্র শৈশব।

ইংরেজের আনন্দের দিনগুলো হচ্ছে ১৮৫৮ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গঠনের ধারা সম্পর্কে আরও আলোকপাত করার প্রাক্কালে প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে সংক্ষেপে হলেও সে আমলে উপমহাদেশের অর্থনৈতিক অবয়ব-এর দ্রুত পরিবর্তনের কথা বলতে হয়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি টেনিসন জীবনে প্রথমে রেলপথে ভ্রমণ করেছিলেন ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে লিভারপুল থেকে ম্যাঞ্চেস্টার পর্যন্ত। এরমাত্র ২৩ বছরের মধ্যে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ভারতে রেলপথ চালু করার কাজ শুরু করা হয়। এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রেলপথ সম্প্রসারণের বিষয়টা পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত

ছিল। পরাধীন ভারতবাসীদের আরাম-আয়েশের চেয়েও সেদিন এই বিশাল ইংরেজ রাজত্বে দ্রুত সৈন্য যাতায়াত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চা, কার্পাস, পাট, নীল প্রভৃতি কাঁচামাল ছাড়াও আফিম ও খনিজ সম্পদ রফতানির লক্ষ্যে বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছাবার জন্যই এই রেলপথের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

ইংরেজ গবেষক পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে, "বিদ্রোহের সমাপ্তিতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যানিং-এর ঘোষণার সময়কাল থেকে শুরু করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়কেই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের 'আনন্দের দিনগুলো' বলে বর্ণনা করা যায়।" এ সময়কালের মধ্যে ইংরেজদের প্রতি বাঙালি বর্ণ-হিন্দুদের সর্বাত্মক সমর্থন অব্যাহত থাকা ছাড়াও মুসলিমদের ইংরেজ বিরোধী মনোভাব দ্রুত স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সময়ে একটার পর একটা মঞ্জুরীপ্রাপ্ত বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং ইংরেজ ও ভারতীয়দের উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের সূচনা হয়। ভারতের রেলওয়ের ব্যাপক প্রসার এবং মিসরে সুয়েজ খাল খননের দরুন জলপথে ইউরোপের দূরত্ব প্রায় তিন সহস্রাধিক মাইল হ্রাস পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যে নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায় যে, এ সময়ে বহুসংখ্যক চা-বাগান স্থাপিত হওয়া ছাড়াও কোলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাটকল এবং বোম্বাই এলাকায় কাপড়ের কল স্থাপিত হতে শুরু করে। পাট কলগুলো ইংরেজদের উদ্যোগে স্থাপিত হলেও কাপড়ের কলগুলো ভারতীয়দের বিশেষ করে পার্সীদের প্রচেষ্টায় চালু হয়। অবশ্য উপমহাদেশে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরে প্রথম স্থাপিত 'ইমপ্রেসমিল' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জে এন টাটা। এরই পাশাপাশি পশ্চিম বাংলা ও বিহার অঞ্চলে ইংরেজ ব্যবস্থাপনায় কয়লা খনিগুলো সম্প্রসারিত হলেও ভারতের সর্ব বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ছিল পার্সী টাটা পরিবারের মালিকানাধীন।

এই সময়কালেই ব্রিটেনের ইংরেজ উদারপন্থী মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন-এর প্রেরিত গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপন শহর ও গ্রামাঞ্চলে সর্বপ্রথম নিয়ন্ত্রিতভাবে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রবর্তন করা ছাড়াও ইলবার্ট বিলের মাধ্যমে ভারতীয় সেশন জজদের শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের বিচারের অধিকার প্রদান করায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং শাসকগোষ্ঠী বর্ণবৈষম্যের অভিযোগের হাত থেকে রক্ষা পায় বলা যায়। এ জন্যই দেখা যায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিদায়ের প্রাক্কালে লর্ড রিপন কোলকাতায় যে রকম প্রাণঢালা বিদায় সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, আর কোনো গভর্নর জেনারেলের পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব হয়নি।

তবুও কথা থেকে যায়। এটা এমন এক সময় যখন একদিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়া বেশ জোরেশোরেই শুরু হয়ে গেছে তখন অন্যদিকে তেমনি কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীর চাহিদা ও উচ্চাশা বলতে গেলে সীমাহীন এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে তা পূরণ করার সুযোগ সেই অনুপাতে অনেক কম। অন্যতম কারণ হিসেবে এটুকু বলা যায় যে, বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণী তখন প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার নতুন ভাগিদার হিসেবে কিছুটা সোচ্চার হতে শুরু করেছে। আর এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালি বর্ণহিন্দু বিদ্বৎসমাজের নতুন করে 'মান-অভিমান' এবং 'বিরোধের' সূত্রপাত হলো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, 'ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার ভাগ্যাকাশে বঙ্কিম বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী সেদিন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। মার্কসিস্ট গবেষক বিনয় ঘোষের ভাষায় বলতে গেলে, যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল

কুসংস্কার, উদারতার বদলে সঙ্কীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা। হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বিদ্বৎসমাজ যে প্রৌঢ় হয়েছেন তা বোঝা গেল। বার্ধক্যের উপসর্গ বিদ্বৎসমাজের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। মুসলমান বর্জিত তথাকথিত রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রায়শ্চিত্ত করা হলো চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত করে, বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি সব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে। সেই তরুবাদ, ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেল ইয়ং বেঙ্গল ও বিদ্যাসাগর যুগের যুক্তিবাদ, স্বাতন্ত্রবাদ, যা কিছু ভালো সব। 'এজ অব রিজন' (যুক্তির যুগ), 'হিউম্যানিজম' (মানবতাবোধ) ও 'ফিলসফি অব এন্‌লাইটেনমেন্ট' (আলোকপ্রাপ্তির দর্শন)-এর উত্তরাধিকারীরা গুরু অবতারের পাকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন। আজও সেই পাক থেকে তাঁরা গাত্রোত্থান করতে পারেননি।" (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : প্রকাশ ভবন কলিকাতা ১৯৭৮)।

তাহলে একথাটা বলা যায় যে, ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় একচেটিয়াভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অগ্রগতির চূড়োয় পৌঁছে যখন বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধোগতি শুরু হয়ে গেছে, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই বাঙালি মুসলমান বিদ্বৎসমাজ ও মধ্যশ্রেণীর উত্থান আরম্ভ হলো। এজন্য দেখা যায় যে, পরবর্তী ৬০-৭০ বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের পথ পরিহার করে 'কৌটা' বা 'হিস্যা' আদায়ের রাজনীতি করেছে।

ইতিপূর্বে গবেষক ডক্টর আনিসুজ্জামানের এ সম্পর্কিত বক্তব্যের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তারই জের ধরে একটা কথা বলা যায় যে, ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বঙ্গীয় এলাকার মুসলমান সম্প্রদায় মোটামুটিভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ এর প্রবর্তিত "আলীগড় আন্দোলনের" পথ অনুসরণ করেছে। এখানে 'সংক্ষেপে আলিগড় আন্দোলনের" কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাদান প্রয়োজন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছরের মধ্যেই সৈয়দ আহমদ "মোহামেডান এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স স্থাপন করেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার করতে হবে। এ সময় স্যার সৈয়দ আহমদ এ মর্মে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান যে, ইংরেজি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে হিন্দুদের সমকক্ষ না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে না। স্যার সৈয়দের এই প্রচেষ্টাই ইতিহাসে 'আলীগড় আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত হয়ে রয়েছে। (আলীগড় কলেজ : স্থাপিত ১৮৭৫ খ্রি.) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মার্চ সৈয়দ আহমদ-এর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন শুধু অব্যাহত থাকে তাই-ই নয়—নতুন অবয়বে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় উত্তর ভারতের আটোয়ার মহসিন উল মুলক্ নবাব সৈয়দ মেহেদী আলী 'আলীগড় আন্দোলনের' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁরই প্রচেষ্টায় ১৯০৩ সাল নাগাদ মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন নেতা ও জাতীয় কংগ্রেসের এককালীন সভাপতি বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং তাঁর সমর্থক রহিমতুল্লাহ্ সায়ানী 'আলীগড় আন্দোলনে' যোগদান করেন। ১৯০৩ সালেই বদরুদ্দীন তায়েবজী "মোহামেডান এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স'-এ সভাপতিত্ব করেন।

কোলকাতায় যখন শিবাজী উৎসব

এদিকে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার প্রেক্ষিতে যখন উপমহাদেশে সবচেয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী এবং পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদার শ্রেণী 'একচেটিয়া আধিপত্য' বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ভয়াবহ আন্দোলন-এর

পথ বেছে নিলো, তখন সবার অজান্তেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মুসলমানরা আরও অধিক পরিমাণে সচতেন হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে কয়েকটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সব ক'টি ঘটনাই কিন্তু ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনে উদারপন্থী লিবারেল পার্টির বিজয়ের দরুন লর্ড কার্জনের স্থলে সুদূর কানাডায় অবস্থানকারী লর্ড মির্খোকে ভারতের নয়া গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং ইংরেজ জাতির অন্যতম কৃতী রাজনীতিবিদ গ্ল্যাডস্টোন-এর জীবনীর রচয়িতা জন মরলি ভারত সচিবের দায়িত্বভার লাভ করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ সময় ইংরেজ শাসকবৃন্দ পুনরায় 'সমঝোতা'র নীতি গ্রহণ করলে ১৯০৬ সালেই কংগ্রেসের নরমপন্থী মারাঠা নেতা গোখলে এবং মরলি ও মিন্টোর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেই কয়েকটি বিষয়ে ভারতীয়দের কনসেশন প্রদান করা ছাড়াও সীমিত আকারে নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পরিষদ গঠনের প্রশ্নটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। অচিরেই এ মর্মে তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, প্রস্তাবিত ৬০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদে নমিনেশন ছাড়া যে ২৭টি আসনে সরাসরি ভোটে সদস্য নির্বাচিত হবেন, সেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার নেই। এর বদলে ভোট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'সম্পত্তি ভোটাধিকার' চালু হবে এতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বেশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠে। এর কারণটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উপমহাদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া ছাড়াও বিশেষ করে বাংলা বিহার আসাম উড়িষ্যা এলাকায় ভোটাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি না থাকার জের হিসেবে বিপুলসংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠী ভোটাধিকার লাভে বঞ্চিত হবে।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবি-দাওয়া ইংরেজ বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে পেশ করার লক্ষ্যে আটোয়ার নওয়াব মহসিন উল মুলুক ব্যাপকভাবে এক উদ্যোগ গ্রহণ করে সর্বমোট ৩৬ জন সর্ব ভারতীয় নেতা আগা খানের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলে অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে নওয়াব মহসিন-উল্ মুলক, নওয়াব ইমদাদুল মুলক, নওয়াব ভিকার উল্ মুল্ক, হেকিম আজমল খান, স্যার আলি ইমাম, স্যার মোজাম্মেল উল্লাহ খান, স্যার রফিক উদ্দিন আহমদ, স্যার মোহাম্মদ শফি, স্যার আবদুর রহিম, স্যার সলিম উল্লাহ এবং বিচারপতি শাহেদীন প্রমুখ অন্যতম। এটাই ইতিহাসে সিমলা ডেপুটেশন হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে রয়েছে। এই বৈঠকেই বড়লাট লর্ড মিন্টো। নীতিগতভাবে পৃথক নির্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং ১৯০৯ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এ সর্বপ্রথম পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপরন্তু আলোচ্য ১৯০৬ সালেই নবাব সলিম উল্লাহর আমন্ত্রণক্রমে ঢাকার শাহবাগে বার্ষিক মোহামেডান এ্যাডুকেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন চলাকালে নওয়ার ভিকার-উল্ মুল্ক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া বৈঠকে আটোয়ার নওয়াব মহসিন-উল্ মুল্ক এর প্রস্তাবক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের মোকাবেলায় সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

নিয়তির পরিহাসই বলতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্য শ্রেণীর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল একটা উদার ভাব-ধারার আলোকবর্তিকা নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে সেই কোলকাতায় ১৯০২ সালে মহা ধুমধামের মধ্যে শুরু হলো 'শিবাজী উৎসব' আর 'গণপতি পূজা'। মনোমোহন গোস্বামীর রচিত "শিবাজী" নাটকের ভূমিকায় লেখা হলো, "মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তক খানির উদ্দেশ্যে।" (সূত্র ড. প্রভাত গোস্বামী রচিত 'ঐতিহাসিক বাংলা নাটক) আর এদিকে ঢাকায় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর স্থাপিত হলো মুসলিম লীগ।

তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকের সময়কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় এলাকার ৩৫/৪০ বছরের ইতিহাসের বাস্তব অবস্থাটা পর্যালোচনা করলে দু'টো বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। প্রথমত ইংরেজবিরোধী ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ফতোয়া এবং সৈয়দ আমীর আলী ও আবদুল লতিফ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলমানরা সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে এনে আন্তরিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনে সচেষ্ট হয়েছিল, মাত্র তিন দশক ব্যবধানে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তখন কৈশোর উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এরই জের হিসেবে এ সময় মূলত এই নব্যসৃষ্ট গোষ্ঠীকে রক্ষা করা ছাড়াও এর দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক মুসলিম নবাব নাইটদের সমন্বয়ে গঠিত এঁদের চালিকা শক্তি যে কতিপয় অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ সবের অন্যতম হচ্ছে সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে সর্বত্র মুসলমানদের জন্য পৃথক 'কোটা' এবং 'হিস্যা' আদায়ের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করা। এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে হয় যে, এ ধরনের মনমানসিকতার সৃষ্টি এবং 'স্ট্র্যাটেজি' গ্রহণের পিছনে যথেষ্ট পরিমাণে পরোক্ষ প্রভাবের অবদান বিদ্যমান ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত সময়কালে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু বিত্তশালী ছাড়াও মধ্যশ্রেণী গঠনের চাঞ্চল্যকর ক্রমবিকাশের ধারা থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ শিক্ষাই গ্রহণ করেছিল যে, "শাসক গোষ্ঠীর সম্পূরক ভূমিকায় অবস্থান করে দাবি আদায় করার পদ্ধতিটাই সবচেয়ে নিরাপদজনক।"

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক বিনয় ঘোষের মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "...প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিক্ষিত মুসলমান এলিট গোষ্ঠীর বিকাশ হয়নি বলা চলে। ব্রিটিশের ক্রমবর্ধমান প্রশাসনযন্ত্রের নানাশ্রেণীর চালক ও কর্মচারি সরবরাহের জন্য যে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রবর্তন করা হয়েছিল, তা হিন্দুরাই বেশি আয়ত্ত করেছিলেন বলে এই স্তরের চাকরিজীবীদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। ধনিক ও মধ্যবিত্তের স্তরে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের বিচ্ছেদ তো হয়েছিলই, শিক্ষিত এলিটের স্তরেও হয়েছিল। এই কারণে বাংলাদেশে যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ট্র্যাজেডি ঘটেছে, তাও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে অস্বীকার করা যায় না। যদি ঐতিহাসিক সত্য, বিকৃত না করে বাংলাদেশ থেকে আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয় তাহলে তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিকাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এইভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে, পরবর্তীকালে নতুন উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত এলিটশ্রেণী স্বভাবতঃই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে জাতীয় আন্দোলনের ধারার সঙ্গে একাত্মীয়তা স্থাপন করতে পারেননি। তার আগেই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সামাজিক দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো খণ্ডিত বাংলাদেশ এবং খণ্ডিত ভারত।" (বাংলার নবজাগৃতি পৃ: ১৫৮-৫৯ ওরিয়েন্ট লংম্যান ১৯৭৯ কলিকাতা)।

আর দ্বিতীয়ত আলোচ্য সময়কালে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত সময়ে বঙ্গীয় এলাকায় বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর মনমানসিকতার প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা এক্ষণে

অপরিহার্য বলে মনে হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিষয়গুলো অনুধাবনের লক্ষ্যে ইংরেজদের অধীনে 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি (ইংরেজিতে প্রেসিডেন্সি অব ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল) নামকরণে কীভাবে বাংলাদেশের আয়তন বৃদ্ধি পেল এক নজরে তার ধারাবাহিক ইতিহাসটুকুও দেখা দরকার।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক কলিকাতার জমিদারি ক্রয়	: ১৬৯৮ খ্রি.
পলাশীর যুদ্ধজয়ে চব্বিশ পরগণার জমিদারি লাভ	: ১৭৫৭ খ্রি.
মীরকাশেমকে গদিতে বসিয়ে চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমানের জমিদারি লাভ	: ১৭৬০ খ্রি.
বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার অর্জন	: ১৭৬৫ খ্রি.
বেনারস ও গাজীপুরের সংযুক্তিকরণ	: ১৭৭৫ খ্রি.
উত্তর প্রদেশের অংশ বিশেষ এবং কটক দখল	: ১৮০১-৩ খ্রি.
নেপালের গারোয়াল ও কুমাউন এবং নাগপুরের কর্তৃত্ব লাভ	১৮১৬ খ্রি.
মধ্য ভারতের সাগর ও নর্মদা এলাকার সংযুক্তি	১৮১৬ খ্রি.
আরাকান, তেনাসেরিম, আসাম, কাছাড় জয়ন্তিয়া ও মনিপুর দখল	: ১৮২৪ খ্রি.
ডাচ উপনিবেশ ফলতা, চুঁচুড়া ও কলকাপুর ছাড়াও পূর্ববঙ্গে ঢাকার শাসনভার গ্রহণ	১৮২৪ খ্রি.
বাংলা থেকে আলাদা করে পৃথক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান ইউপি) গঠন	১৮৩৫ খ্রি.
বর্মার উত্তরাঞ্চল ছাড়া অবশিষ্ট বর্মীয় এলাকা দখল এবং কোলকাতা থেকে পেনাং মালাক্কা ও সিংঙ্গাপুরের প্রশাসন সম্পর্কিত দায়িত্ব পরিচালনা	: ১৮৫২ খ্রি.

(সূত্র : 'দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম' : এম কে ইউ মোল্লা)

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে আলোচনার সুবিধার্থে আবারও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন ইংরেজ ভারতের রাজধানী কোলকাতা নগরীতে একটি মনোনীত ব্যবস্থাপক পরিষদ সৃষ্টি করা ছাড়াও হাইকোর্ট স্থাপিত হলো, তখন বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আয়তন দাঁড়াল ২,৪৬,৭৮৬ বর্গমাইল (বর্তমান বাংলাদেশের আয়তন ৫৪,১৫০ বর্গমাইল)।

বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের সর্বগ্রাসী রূপের প্রামাণ্য তথ্যাবলী

এক্ষণে অত্যন্ত সহজেই একথাটা অনুধাবন করা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরু থেকেই এই বিশাল ইংরেজ রাজত্বে (মাদ্রাজ ও বোম্বে এলাকা ব্যতীত) এ দেশীয় ভাড়া করা সৈন্য ছাড়াও প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা, রাজস্ব আদায়সহ সরকার পরিচালনার জন্য ইংরেজি শিক্ষিত অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত একটা সমার্থক গোষ্ঠীর জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর এই ভূমিকা সার্থকভাবে পালনের জন্য সে আমলে একচেটিয়াভাবে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, কালক্রমে তাঁরা হচ্ছে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সমাজ। এঁদের চরিত্র বোঝার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে এতদসম্পর্কিত কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন বাঞ্ছনীয় হবে।

(ক) ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছরে ভারতের ইংরেজ শাসিত এলাকায় ইংরেজি শিক্ষার পাঠক্রম সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে এরকম যুবকের সংখ্যা যেখানে ১২০০ জনের মতো, সেখানে শুধুমাত্র বাঙালি বর্ণহিন্দুর সংখ্যা ছিল ১১৪০ জন।

(খ) ১৮৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের সরাসরি ব্যবস্থাপনা এবং মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ইংলিশ স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত মোট ১৩,৪৮৮ জন ছাত্রের মধ্যে ১২,৪১৮ জনই ছিল বাঙালি হিন্দু।

(গ) ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এফ এ পরীক্ষা চালু হবার পরবর্তী ২০ বছরে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ৪৭২৪ জনের মধ্যে ৩৮০০ জনের মতো বাঙালি বর্ণহিন্দু। বাকি ৯২৪ জনের মধ্যে রয়েছে বিহার, উড়িষ্যা, বর্মা, ছোট নাগপুর ও আসামের ছাত্র এবং গুটিকয়েক বাঙালি মুসলমান।

(ঘ) ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৩ বছরে মোট গ্রাজুয়েট-এর সংখ্যা ১,৭১২ জনের মধ্যে ১,৪৯৪ জনই ছিল বাঙালি হিন্দু। বাংলা প্রেসিডেন্সির আওতাধীন অন্যান্য এলাকার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা মাত্র ২১৮ জন।

(ঙ) ইংরেজ শাসিত এলাকার ২,৪৬,৭৮৬ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির একমাত্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে এম এ পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম ২০ বছরে যে ৪২৩ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়, তার মধ্যে বর্মা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের সংখ্যা মাত্র ৭৯ জন। বাকি ৩৪৪ জনই হচ্ছেন (গুটিকয়েক বাঙালি মুসলমানসহ) বাঙালি হিন্দু।

(চ) ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে যেখানে বিহারের সবগুলো কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ২০৫ জন, সেখানে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দেই শুধুমাত্র কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬১ জন এবং এর শতকরা প্রায় ৯৫ জনই ছিল বাঙালি হিন্দু।

(ছ) ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র আসামে একটি মাত্র আর্টস কলেজ স্থাপিত হয়েছিল এবং এ কলেজে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র আসামে বাংলা ছাড়া আর কোনো ভাষাই শেখানো হতো না।

(জ) উড়িষ্যার কটকে ঊনিশ শতকের ষাটের দশকে রাভেনশ কলেজ স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৯৭ জন এবং এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা ৩২ জন। সর্বোপরি ১৯০৫ সালে কটকের রাভেনশ কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২ জন।

এখানে প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য সময়কালে সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ-এর সমার্থক শ্রেণী হিসেবে সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজি

শিক্ষিত বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর সর্বগ্রাসী চরিত্রের ফলে বঙ্গীয় এলাকার নিম্নশ্রেণী হিন্দুরা ছাড়াও বাংলা প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক সীমারেখায় অবস্থিত বর্মা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের সকল সম্প্রদায়ই চরম বঞ্চনার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। ১৮৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ভারতের রাজধানী কোলকাতায় এদেশীয় উচ্চপদস্থ ৪৩৭ জন কর্মচারীর মধ্যে ৩৯০ জনই ছিলেন বাঙালি বর্ণহিন্দু। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লিডার ড: পুলিন দাস যথার্থই লিখেছেন, "১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের দিনগুলোতে এঁদের (বাঙালি বর্ণহিন্দু) অনেকে তাঁদের বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছেন।" (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক—কলিকাতা ১৩৯০)।

এই-ই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আসলে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে এতোই নিমগ্ন ছিলেন যে, এঁরা বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের কোনো হিসাবের মধ্যে নেওয়া তো দূরের কথা, এঁদের অগ্রগতির পথে প্রায়শঃই বাধার সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ড: এ আর মল্লিকের প্রদত্ত তথ্যের উল্লেখ করতে হয়। তিনি লিখেছেন, ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্চরচন্দ্র শর্মার অধীনে কোলকাতা ও হুগলীতে স্থাপিত দু'টি সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত স্কুলে একজনও বাঙালি মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে সক্ষম হয়নি। কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের যে ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হতো তা হচ্ছে (১) সীতাবৌদ্ধ শকুন্তলা, (২) বেতালপঞ্চ বিংশতি এবং (৩) সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা। ফলে সরকারি মঞ্জুরিপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য স্কুল দু'টিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অথচ ক্ষণিকের তরে এসব বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দ চিন্তাও করে দেখলেন না যে, এই শোষিত বাঙালি মুসলমানরাই হচ্ছে সুজলা-সুফলা বঙ্গীয় এলাকায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। শুধু তাই-নয় আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে একটা সুষ্ঠু ও পরিচ্ছদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হলে এতদঅঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেবলমাত্র তা সম্ভব। কিন্তু সেদিন সমগ্র ইংরেজ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় সবচেয়ে আগুয়ান কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্মুখপানে ধাবিত ইতিহাসের রথচক্রকে বিপথগামী করতে প্রচেষ্ট হলেন। তাঁরা বাঙালি বর্ণহিন্দুকেই 'বাঙালি' হিসেবে চিহ্নিত করে 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর জন্য সোচ্চার হয়ে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণের স্বপ্নে 'পথভ্রষ্ট' হলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, এরই জের হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯০২ সাল নাগাদ কোলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' আর 'গণপতি পূজা' শুরু হয়ে গেছে। কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী মহল রামমোহন ডি রোজারি বিদ্যাসাগর মধুসূদনের সংস্কারপন্থী ও উদারমনা পরিমণ্ডলের বাইরে এসে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রবর্তিত 'হিন্দু বাহুবল'-এর আবর্তে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত বর্ণহিন্দুদের আগোচরে এসব চাঞ্চল্যকর 'ক্রিয়ার' প্রতিক্রিয়া দেখা দিল বাঙালি মুসলমান সমাজে। অত্র পরিচ্ছদের শুরুতেই এই প্রতিক্রিয়াকেই 'পরোক্ষ প্রভাব' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবারও উল্লেখ করতে হয় যে, এই পরোক্ষ প্রভাবের শিক্ষাই হচ্ছে, "শাসকগোষ্ঠীর সম্পূরক ভূমিকায় অবস্থান করে দাবি আদায় করার পদ্ধতিটাই সবচেয়ে নিরাপদজনক।" ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলোতে বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম নেতৃবৃন্দ তথা মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দর্শনের পর্যালোচনা করলে এই বক্তব্য

প্রমাণিত হয়। শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক 'কোটা' ও 'হিস্যার' রাজনীতির চরম পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, ইতিহাসের তাগিদে এই উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট "পাকিস্তান" নামে একটা পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। আবার মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে ঐতিহাসিক কারণেই একটা রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাঝ দিয়ে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকা নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও বলতে হয় যে, ইংরেজদের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত-পালিত এবং বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সেই কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কিন্তু আজ ভারতবর্ষের বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে হারিয়ে যেতে চলেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সবার অলক্ষ্যে এর প্রক্রিয়া শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে।

এ কথাটা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, উপমহাদেশের গত এক শতাব্দীর ইতিহাসে তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এগুলো হচ্ছে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের ফল হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এক্ষণে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মতো 'নাজুক' বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রাক্কালে তৎকালীন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা অপরিহার্য বলে মনে হয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রশাসনের সুবিধার জন্য রাজধানী কোলকাতায় একটি মনোনীত ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠন করা হয়, তখনই বিশাল বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ২ লাখ ৪৬ হজার ৭৮৬ বর্গমাইলের মতো। অবশ্য এরও প্রায় বছর দশেক আগে ইংরেজ ভারতের রাজধানী কোলকাতায় অবস্থানকারী গভর্নর জেনারেল-এর কাজের অস্বাভাবিক চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয় এবং মিঃ জে এফ হ্যালি ডে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল বাংলার প্রথম লে. গভর্নর পদে যোগদান করেন। তখন গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন লর্ড ডালহৌসী।

কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার ৬টি জেলা বিহারের অংশবিশেষ এবং উত্তরবঙ্গ এলাকায় প্রায় ২ লাখ ৬৫ হাজার লোকের মৃত্যু হলে বঙ্গীয় এলাকায় প্রশাসনিক দুর্বলতার বিষয়টি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তৎকালীন লে. গভর্নর স্যার সি বেডন বিলাতে এ মর্মে কৈফিয়ত পাঠান যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বল্পতাহেতু তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সময়মতো ও যথাযথভাবে ওয়াকেফহাল করা হয়নি এবং তাঁর মনে এ ধরনের ধারণা হয়েছিল যে, অবস্থা ততটা উদ্বেগজনক নয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলীয় সদস্য এবং ভারত সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড নট কোট-এর হস্তক্ষেপের ফলে বাংলার লে: গভর্নর স্যার সি বেডন এ যাত্রায় রক্ষা পান। কিন্তু এ সময় থেকেই মাদ্রাজ ও বোম্বের মতো বঙ্গীয় এলাকার জন্যও একজন ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই প্রস্তাবের সমর্থকরা ইংল্যান্ডে এ মর্মে বক্তব্য উত্থাপন করেন যে, ইংরেজ ভারতের গভর্নর জেনারেল-এর অফিস কোলকাতায় অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও দেশরক্ষায় সামরিক অভিযান এবং কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাকার বিষয় সংক্রান্ত অস্বাভাবিক ধরনের কাজের চাপ থাকায় গভর্নর জেনারেলের পক্ষে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক বিষয়ে ত্বরিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব নয় বলেই অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর নিয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এ সময় ভাইসরয়-এর কাউন্সিলের তিনজন সদস্য যথাক্রমে এইচ মেইন (১৮৬২-৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আইন বিষয়ক সদস্য), ডব্লিউ আর ম্যানসফিল্ড (কমান্ডার-ইন-চিফ) এবং জি এন টেলর বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য একটি কাউন্সিলসহ একজন পৃথক গভর্নর নিয়োগের যৌক্তিকতা প্রদান করেন। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন গভর্নর জেনারেল জন লরেস এ প্রসঙ্গে দ্বিমত প্রদর্শন করেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, যদি বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য পৃথক গভর্নর নিয়োগ করতেই হয়, তবে তা কোনো কাউন্সিল ব্যতিরেকে করা বাঞ্ছনীয় হবে। অন্যথায় আসাম এলাকাকে বাংলা থেকে পৃথক করে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। (সূত্র : গভর্নর জেনারেলস মিনিট, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খ্রি.)। ভারত-সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল-এর এই বক্তব্য গ্রহণ করেন।

কিন্তু ১৮৬৭-৬৮ থেকে শুরু করে ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে আসাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত কতকগুলো ঘটনাপ্রবাহ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে বেশ বিব্রত করে তোলে। পুনরুল্লেখ পূর্বক বলতে হয় যে, ১৮৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে নাগা উপজাতিরা কয়েক দফায় শিবসাগর জেলায় হামলা চালায়। ১৮৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে নাগা বিদ্রোহীরা ত্রিপুরা রাজার এলাকা ছাড়াও সিলেট জেলায় আক্রমণ পরিচালনা করে। একই বছরে এই বিদ্রোহীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অংশবিশেষ এবং কাছাড় জেলা লুট করে। এ সময় নাগাদের আক্রমণে আসামের একটি চা বাগান, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং এর ইংরেজ আবাসিক প্লান্টার মি. উইনচেস্টার নিহত হন। নাগারা নিহত ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও আরও কয়েকটি চা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেও উপজাতীয় বিদ্রোহীরা আসামের দারাং ও উত্তর লক্ষ্মীপুর এলাকায় হামলা চালায়। (দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম : এম কে ইউ মোল্লাঃ ১৮৮১)।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে প্রশাসন কার্যের সুবিধার জন্য এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে মোট ১০টি জেলাকে আলাদা করে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে পৃথক আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়। জেলাগুলো হচ্ছে (১) কামরূপ (২) দারাং (৩) নওগাঁ (৪) শিবসাগর (৫) লক্ষ্মীপুর (৬) গারোহিলস (৭) খাসিয়া এ্যান্ড জয়ন্তিয়া হিলস (৮) নাগা হিলস (৯) কাছাড় এবং (১০) গোয়াল পাড়া। একই বছরের ১২ই সেপ্টেম্বর এক সরকারি নির্দেশে সিলেট জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এ সময় আসাম প্রদেশের এলাকা দাঁড়ায় ৪১ হাজার ৭৯৮ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪১ লাখের মতো। অবশ্য ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লুসাই হিলসকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবুও বলতে হয় যে, বাংলা প্রেসিডেন্সীর আয়তন বিরাটকায় থেকে যায়। পৃথক আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ইউরোপের স্পেন দেশের প্রায় সমান ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ সময় এই প্রদেশের আয়তন ১ লাখ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সর্বপ্রথম কীভাবে উত্থাপিত হয়েছিল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক এম কে ইউ মোল্লা সম্প্রতি তাঁর রচিত 'দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম' গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। অধ্যাপক মোল্লার মতে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর আসামের চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত পত্রে সর্বপ্রথম আসামের

সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম এলাকাকে সংযুক্তির প্রস্তাব করেন। স্যার উইলিয়াম এ মর্মে যুক্ত প্রদর্শন করেন যে, এর ফলে আসামের জন্য একটি পৃথক সিভিল সার্ভিস গঠন করা ছাড়াও প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত প্রদেশ অচিরে খুবই সমৃদ্ধশালী প্রদেশে পরিণত হবে বলা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার আগেই ইংরেজ ভারতের রাজধানী কোলকাতার উচ্চ মহলে এই প্রশ্নে বাদানুবাদ শুরু হয়। ফলে কোলকাতার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৮৯২ ষালের ৯ই এপ্রিল সংখ্যায় এবং 'ঢাকা গেজেট' পত্রিকার ১৮ই এপ্রিল (১৮৯২) সংখ্যায় এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করা হয় যে, বাংলা প্রেসিডেন্সির আর কোনো এলাকাকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা এর ফলে চট্টগ্রাম এলাকার (ঢাকা ও ময়মনিসংহের প্রশ্ন অজানা ছিল) 'জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হবে।" এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, পদচ্যুত প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভারত সরকারের নিকট এক লিখিত প্রতিবাদ দাখিল করেন। তথাপিও আসামের তৎকালীন চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড আলোচ্য প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করায় বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বিত্তশালী মহল ও মধ্য শ্রেণীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর পিছনের মূল কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে, কোলকাতার ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে বসবাসকারী বর্ণ হিন্দুদের পূর্ব বঙ্গীয় এলাকায় অবস্থিত জমিদারির স্বার্থ। এদিকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখে স্যার উইলিয়ামের উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা এলাকা সংযুক্ত করা হলে সম্প্রসারিত আসামের আয়তন ৮০ হাজার ৯৫০ বর্গমাইলে দাঁড়াবে এবং লোক সংখ্যা হবে ১ কোটি ৫৫ লাখ ৮০ হাজারের মতো।

এ রকম এক সময় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে আসামে নয়া চিফ কমিশনার হিসেবে স্যার হেনরি জন স্টেড্‌ম্যান কটনের আগমন হলে পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। গবেষকদের মতে স্যার হেনরি কটন প্রকারান্তরে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু বিত্তশালী ও মধ্য শ্রেণীর মতামত সমর্থন করেন। তিনি আপাতত বিষয়টি স্থগিত রাখার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলে বাংলা প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেন্‌জি এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড ভিক্টর আলেকজান্ডার ব্রুস এলগিন একমত হন। ফলে ভাইসরয় লর্ড এলগিন এ ব্যাপারে ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল ভারত-সচিব লর্ড হ্যামিলটনের নিকট লিখিত পত্রে যে প্রস্তাব দেন তা যথাযথভাবে গৃহীত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও মধ্যশ্রেণীর প্রিয়ভাজন ইংরেজ ব্যক্তিত্ব স্যার কটন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগ থেকে শুরু করে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ৬ বছরকাল আসামের চিফ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এরপরেই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্যার কটন অবসরপ্রাপ্ত হয়ে কোলকাতাতেই বসবাস করেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। আজকের দিনে একথা আশ্চর্যজনক মনে হলেও এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু মহলের সমর্থনে স্যার হেনরি জন স্টেডম্যান কটন ১৯০৪ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

উপমহাদেশের ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণ ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন লর্ড কার্জন। এর পুরো নাম জর্জ ন্যাথনিয়াল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫)।

অবিভক্ত ভারতের ইংরেজ রাজত্বে নানা কারণে এই নামটি সবচেয়ে বিতর্কিত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে ইংরেজ গবেষক পারসিভাল স্পিয়ার-এর মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'এর হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া-২' তিনি লিখেছেন, "এরপর এলেন কার্জন। ভিক্টোরিয়ান সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়ের চিন্তাধারার স্পর্শে উজ্জীবিত রোমান্টিক ধর্মী আভিজাত্যমণ্ডিত হয়ে তিনি একজন জুনিয়র সরকারি কর্মচারী থেকে উন্নতির সোপান অতিক্রম করে মাত্র ৪০ বছর বয়সে এই দায়িত্ব লাভ করলেন। নেপোলিয়নের মতোই তিনি প্রাচ্য দর্শনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ভারতে অবস্থানকালে মধ্যবর্তীকালীন কর্মকাণ্ডকে সফল করার লক্ষ্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসলি এবং ডালহৌসির মতো ভারত তাঁকে প্রতারিত করলো এবং এখানে তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পরিসমাপ্তি হতে চলেছিল।"

আর এদিকে এ সময় কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালিদের মধ্যে বিরাজমান মন-মানসিকতা সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর মন্তব্যের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে হয়। 'দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটলো। এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, তিলক প্রভৃতির প্রভাবে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক নতুন রূপ গ্রহণ করলো।"

ভারতের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপনার প্রাক্কালে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একযুগ সময়কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমেই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট-এর কথা বলতে হয়। এই আইন ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত সীমিত আকারে যে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তা ভারতীয় কংগ্রেসের কোনো মহলেরই মনঃপুত হয়নি। ফলে একদিকে ইংরেজ সরকার এবং অন্যদিকে বাঙালি ও মহারাষ্ট্রীয় কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দের বাদানুবাদ শুরু হয়। এসব নেতৃবৃন্দের কোলকাতার প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী এবং বোম্বের গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ও বাল গঙ্গাধর তিলক অন্যতম ছিলেন। প্রায় ৬ বছর স্থায়ী এই বাদানুবাদের পর ইংরেজরা কেন্দ্র ও প্রদেশে মনোনীত ব্যবস্থাপক পরিষদের ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি করতে সম্মত হয়। এসবের মধ্যে কেন্দ্রের মনোনীত পরিষদের সদস্যদের বাজেট আলোচনার ক্ষমতা অন্যতম।

এদিকে সমগ্র উপ-মহাদেশে সে আমলে ইংরেজি শিক্ষার সবচেয়ে অগ্রসর কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ ভারতের সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস চাকরিগুলোতে যোগদানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের উপর মারাত্মক চাপের সৃষ্টি করে। এঁদের পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে যে, এদেশে ইংরেজদের জন্য যখন নানাভাবে পরীক্ষিত কোলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মতো সমর্থক ও সম্পূরক শক্তি রয়েছে, তখন আইসিএস পরীক্ষায় বয়ঃসীমা সংক্রান্ত ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের সিদ্ধান্ত সংশোধনে আপত্তি থাকার কথা নয়। অর্থাৎ আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ১৯ বৎসর থেকে বৃদ্ধি করতে হবে এবং লন্ডনের সঙ্গে কোলকাতাতেও আইসিএস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। যিনি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হৈ চৈ-এর সৃষ্টি করলেন, তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী মহোদয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নানা বাহানা করলেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আইসিএস পরীক্ষার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ক্রমান্বয়ে শিথিল করে।

ফলে সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ২১ বৎসর, ১৯০৫ সালে ২৩ বৎসর এবং ১৯০৬ সালে ২৪ বৎসর করা হয়। প্রসঙ্গত একটা বিষয় চাঞ্চল্যকর মনে হলেও উল্লেখ করতে হয় যে, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত ৬৯ বছরে ফরিদপুরের একমাত্র মুজিবুর রহমান ছাড়া বাঙালি মুসলমান পরিবারের কোনো সন্তান আইসিএস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। গাইবান্ধার মরহুম নূরুন্নবী চৌধুরী ছিলেন ওয়ার আইসিএস।

এক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫-০৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে বঙ্গীয় এলাকার ঘটনা প্রবাহের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতির উল্লেখ বিশেষ অপরিহার্য মনে হয় কেননা উপমহাদেশে বঙ্গীয় এলাকায় বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে বিপুল জমিদারি লাভ করার পরবর্তীতে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে অধিকাংশ সরকারি চাকরি করায়ত্ত করার পর আরও সুযোগ-সুবিধার জন্য অভিমান আবদার আন্দোলন করছে, তখন মহারাষ্ট্র এদেশীয় মালিকানায় বস্ত্র শিল্পের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে এবং ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ার ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি এলাকার কাপড় আমদানির বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেঁধেছে। এ জন্য দেখা যায় যে, জাতীয় কংগ্রেসের শুরুতে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু আর মারাঠা ব্রাহ্মণদের কর্মকাণ্ডে ভরপুর। পুনরাবৃত্তি হলেও উল্লেখ করতে হয় যে, এ সময় ভারতের রাজনৈতিক গগনে মারাঠা ব্রাহ্মণদের দু'জন বিশিষ্ট নেতার আবির্ভাব ঘটে। এদের একজন হচ্ছেন রামমোহনের অনুসারী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং অন্যজন বঙ্কিম বিবেকানন্দের চেয়ে কট্টর রক্ষণশীল চিন্তাধারার বাল গঙ্গাধর তিলক। একজনের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সংস্কারপন্থী কথাবার্তা এবং অন্যজনের বক্তব্য হচ্ছে, আর আপোষ নয়—বরং কপালে রক্ত তিলক লাগিয়ে হিন্দু ধর্মের মহিমা প্রচার ও হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা।

বাংলায় মারাঠা বর্গীর হামলার ভয়াবহ ইতিহাস

কিন্তু এ কথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এসব কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বিত্তশালী আর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মাত্র দেড়শ' বছর আগের ঘটনাবলী মারাঠা দস্যুদের পশ্চিম বাংলা আক্রমণের কথা হয় বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন কিংবা শ্রেণী ও গোষ্ঠী স্বার্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সেই করুণ ও ভয়াবহ ইতিহাসের দিকে চক্ষু মুদ্রিত রেখেছিলেন। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার গবেষক পূর্ণেন্দুপত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন এখানে তার উদ্ধৃতি বিশেষ সমীচীন হবে। তিনি লিখেছেন :

"মহারাষ্ট্র জুড়ে জেগেছে মারাঠা জাতি। নেতা শিবাজী। অসি, ধনুক, মল্লবিদ্যা আর অশ্বারোহণে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা। একরাজ্য ধর্মপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে তোলার মহান সংকল্পে তিনি পার্বত্য প্রদেশের অন্তরালে দীর্ঘদিন সুকঠিন রণ-সাধনা করেছেন। অসংখ্য তার বর্গী সৈন্য। অসীম তাদের সাহস।...একের পর এক রাজ্য জয় করে চলেছেন শিবাজী। আজ কঙ্কন, কাল বিজাপুর, পরশু সুরাট। তারপর গোলকুণ্ডা। দেখতে দেখতে সারা দাক্ষিণাত্যে উড়ল মারাঠা জাতির বিজয় নিশান। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিকভাবে থেমে গেল সব অগ্রগতি। বড় বড় সর্দার সেনাপতিরা মেতে উঠলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার, স্বার্থসিদ্ধির পারস্পরিক কলহে। মারাঠা নায়ক তখন রঘুজী ভোঁসলে। মন্ত্রী পণ্ডিত ভাস্কর বাম কোলহৎকর। কুটবুদ্ধিতে অতুলনীয়। তাঁরা দুজনে ঠিক করলেন বাংলাদেশকে এইবার জয় করে জুড়ে দিতে হবে নাগপুরের সঙ্গে। কী করে সম্ভব হবে সেটা। কেন লুঠপাট, জোর-জুলুম, হত্যা আর অত্যাচার। নাগপুরের এক পাহাড়ি অঞ্চলের অন্ধকার

অরণ্য শিউরে উঠল এই দুই মারাঠা বীরের গোপন ষড়যন্ত্রে।...কবেকার সেই বর্গী আক্রমণের নৃশংসতা আজও আমাদের দেশে ছেলে ভুলোনো বা ঘুম পাড়ানো ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের মা মাসীমা শিশুদের কানে প্রথম যে গানের কলিটি গেয়ে শোনান, সে ঐ ধ্বংসের গান।

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এল দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

বালেশ্বর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বর্গী আক্রমণে অস্থির। আজ মেদিনীপুর ডুকরে কাঁদছে। কাল বর্ধমান। ওদিকে হুগলীর আর্তনাদ ভাগীরথীর ঢেউ-এ আছড়ে ছুটে আসছে কলকাতার কিনারে। তখন বর্গীরা শিবপুর থানা দুর্গ দখল করেছে।" (পুরনো কলকাতার কথাচিত্র পৃ: ২২৩-২২৭ দে'জ পাবলিশিং কলকাতা)।

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে এই যে, বাংলার বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁ ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ ১০ বছরকাল বর্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর পর ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করতে সক্ষম হন। এ সময় মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। নবাব আলীবর্দী মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে খণ্ডিত উড়িষ্যাকে 'চৌথ'-এর (রাজস্বের এক চতুর্থাংশ) প্রাপ্য হিসেবে মারাঠাদের শাসনে ছেড়ে দিলেন। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত কিন্তু আর দেশে ফিরতে পারেননি। ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দেই ভাস্কর পণ্ডিত আততায়ীর হাতে নিহত হন আলিবর্দী খাঁর শিবিরে।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবার শেষপাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ যে মারাঠা জাতির ঐতিহ্য ও বীরগাঁথা নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে 'ভবানী পূজা' আর 'শিবাজী উৎসবে' মেতে উঠলেন, সেই মারাঠাদের পূর্বসুরী বর্গীরা হুগলী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গীয় এলাকা কীভাবে লণ্ডভণ্ড করেছিল, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের রচিত 'সিরাজুদ্দৌলা' গ্রন্থ থেকে তার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া এক্ষণে বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তিনি লিখেছেন,

"...কিন্তু সেকালে বর্গীর হাঙ্গামাই বাঙালির সর্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ জানিত যে, বাঙালির অন্নগত প্রাণ; বাঙলার সমতল ক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করিতে পারিলে, অন্নজীবী বাঙালি সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিবে না। দেশে দুর্গ নাই। রাজধানী হইতে গণ্ডগ্রাম পর্যন্ত সমুদয় দেশ অরক্ষিত; সুতরাং বাংলাদেশে পদার্পণ করিয়া তাহারা একেবারে কাটোয়া পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ভাগিরথীর পশ্চিম তীরস্থ সম্পন্ন জনপদগুলো জনশূন্য হইয়া গেল। লুণ্ঠন-পরায়ণ মহারাষ্ট্র সেনা গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিল; অশ্বপদ তাড়নায় শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইয়া গেল; লোকে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া হাহাকার করিতে করিতে ভাগীরথী পার হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।"

কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ এ বর্গী হামলার বীভৎস কাহিনী

মারাঠা বর্গীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কীভাবে বঙ্গীয় এলাকার পশ্চিমাঞ্চল দশ বছর ধরে লুণ্ঠন করে শ্মশানে পরিণত করেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ বাংলা পুঁথি সাহিত্যে পাওয়া গেছে। পুঁথিকারের নাম কবি গঙ্গারাম। পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা থেকে। পুঁথির নাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণ।" রচনাকাল ১১৫৮ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে। কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে এই সম্পূর্ণ পুঁথি প্রকাশিত হয়েছে। এই

পুঁথিতে সমসাময়িককালের মারাঠাদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও উৎপীড়নের বর্ণিত কাহিনীর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"তবে সব বরগি গ্রাম
লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুঁথির
ভার লাইয়া
সোনার বাইনা পলাএ কত
নিক্তি হড়পি লইয়া।
oooo
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামের ছিল।
বরগির নাম শুইনা সব
পলাইল।
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত
হাঁটে নাই পথে।
বরগির পলানে পেটারি
লইয়া মাথে।
ক্ষেতি রাজপুত জত
তলোয়ারের ধ্বনি
তলোয়ার ফেলাইঞা তারা
পলাও অমনি।
গোসাঞি মোহান্ত জত
চোপালি-এ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত
বাহুকে করিয়া।
চাষা কৈবর্ত জত জা-এ
পলাইঞা।
বিচন বলদের পিঠে
লাঙ্গল লইয়া।
oooo
এই মত সব লোক
পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা
আইসা সাথে।
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয়
তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নএ আর
সব ছাড়া।

কারু হাত কাটে কারু
নাক কান।
একি চোটে কারু বধ-এ পরাণ।
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা
লইয়া জা-এ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়িবাঁধি দেয়
তার গলাএ।
একজনে ছাড়ে তারে আর
জন ধরে।
রমণের ডরে ত্রাহি শব্দ করে।
এই মতে বরগি যত পাপ
কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক যত দেয়
সব ছাইড়া।
০০০০
এই জাতে জত সব গ্রাম পোড়া
ইয়া।
চতুর্দ্দিকে বরগি বেড়াএ লুটিয়া।
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ
পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পা-এ
জুতা চড়া।
রূপি দেহ রূপি দেহ বলে বার
বার।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে
জাল ভার।"

(কবি গঙ্গারাম রচিত পুঁথি 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ১১৫৮ বঙ্গাব্দ)

এ ধরনের এক নৃশংস ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমগ্র উপমহাদেশে সবচেয়ে শিক্ষিত ও অগ্রসরপ্রাপ্ত কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কট্টর রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা থেকে একজন সর্ব ভারতীয় নেতার 'ইমেজ'কে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। রাজপুত প্রতাপ সিংহকে দিয়ে তা' ব্যর্থ হবার পর এজন্যই সেদিন এদের কাছে মারাঠা হওয়া সত্ত্বেও ছত্রপতি শিবাজীর বন্দনার প্রয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এরই জের হিসাবে ১৯০২ সালে কোলকাতায় 'শিবাজী উৎসব'-এর সূচনা হয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করেন শ্রী সখারাম গণেশ দেউসকর। এরই রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'দেশের কথা' এবং 'শিবাজীর দীক্ষা'। ১৯০৪ সালে রচিত ও প্রকাশিত এই 'শিবাজীর দীক্ষা' বই-এর ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূমিকাটি কবিতায় লেখা। এটাই হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-এর 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। অবশ্য এর আগেও শিবাজী

সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একাধিক পুস্তক রচিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী জীবন চরিত্র' (১৮৯৫) এবং শ্রী সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-চরিত্র' (১৮৯৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সময় কোলকাতায় চরমপন্থী হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীরা শিবাজীকে উপলক্ষ করে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। ছত্রপতি শিবাজী ভবানী দেবীর ভক্ত ছিলেন বলে বঙ্গীয় এলাকায় 'শিবাজী উৎসব'-এ বিরাট তোড়জোড় করে শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে ভবানী পূজার প্রবর্তন হয়। গবেষক ড: প্রভাত কুমার গোস্বামীর মতে, 'তাই শিবাজী উৎসবে ভবানীর মূর্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালুতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা। সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ পর্যবসিত হয়েছিল। তাই শিবাজীকে জাতীয় বীররূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল।' (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটক : সাহিত্য প্রকাশ কলিকাতা : ১৩৮৫)।

এ জন্যই লক্ষ করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিবাজীকে ভগবানের অবতার হিসেবে চিত্রিত করে নাটক রচনার হিড়িক পড়ে যায়। শ্রী ফকির চাঁদ বসু শিবাজীকে নিয়ে প্রথম বাংলা নাটক 'শিবাজীর অভিনয়' রচনা করেন। নাট্যকার স্বয়ং লিখিতভাবে স্বীকার করে গেছেন যে, নাটকটি যথাযথভাবে ইতিহাসভিত্তিক নহে। ফকির চাঁদ-এর নিবেদন হচ্ছে, 'শিবাজীর বৃত্তান্ত বলেই যে ইহার বর্ণিত বিষয়গুলোর সমুদয় ঐতিহাসিক সত্য, এরূপ বিবেচনা করবেন না। ইতিহাস লিখিত শিবাজীর তাবৎ স্বরূপ লক্ষণ বর্ণনা করা আমার অভিপ্রায়ও নয়।'

নাট্যকার শ্রী মনোমোহন গোস্বামী শিবাজীকে নিয়ে ১৯০১ সালে "রোশিনারা" নামে যে নাটকটি রচনা করেন, দ্বিতীয় সংস্করণ-এর সময় এর নতুন নামকরণ হয় "শিবাজী"। নাট্যকার মনোমোহনের সৎসাহস রয়েছে। ভূমিকায় তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির উদ্দেশ্য।"

এই 'শিবাজী' নাটকের সংলাপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

জিজাবাঈ : অত্যাচার অত্যাচার যে দিকে নেহারী ধর্মের এ অপমান সহিতে না পারি।
হিন্দুর মন্দিরে হেরি গো-অস্থির রাশি,ধৈরেষ ধরিতে নারি; হিন্দু কুলবালা
যবে যবন পরশে অমূল্য সতীত্ব-রত্নে দেয় জলাঞ্জলি।

শিবাজী : জন্মভূমি পর পদানত বর্ণাশ্রম ধর্ম হের লুপ্ত প্রায় আজ গো ব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ন,
শুনি ঐ দেবতার করুণ ক্রন্দন করিব কি জীবন ধারণ।

অবশ্য বছর কয়েক পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-এর সময় এই একই নাট্যকার মনোমোহন গোস্বামীর 'পৃথ্বিরাজ' নাটকের সংলাপ আরও ভয়াবহ।

"বীরের প্রধান ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ
হিন্দুর প্রধান কার্য যবন নিধন।"

(দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটক : ডক্টর প্রভাত কুমার গোস্বামী : কলিকাতা ১৩৮৫)।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯০২ সাল থেকে কোলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তিত হয়। ফলে এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে নাট্য প্রযোজক ও পরিচালক শ্রী অমরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ই প্রকৃতপক্ষে 'রোশিনারা'-র নাম পরিবর্তন করেন। তিনি এর নামকরণ করেন 'শিবাজী'। এই নতুন নামে মনোমোহন গোস্বামী রচিত উগ্র সাম্প্রদায়িক আমেজে

রচিত 'শিবাজী' নাটকটি ১৯০২ সালের ২২শে মার্চ কোলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। এ থেকেই সে আমলের 'বাঙালিত্বের' আবরণে 'বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে মারাঠা বর্গীদের নৃশংস এবং পৈশাচিক হামলায় এক সময় মধ্যভারত থেকে শুরু করে পশ্চিম বাংলার শহর ও জনপদগুলো শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এবং অবলা নারীর ওপর পাশবিক অত্যাচার আর শিশুর রক্তে রঞ্জিত মারাঠা বর্গীর খঞ্জর ইতিহাসে কালিমাময় অন্যায়ের সংযোজন করেছিল, বাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সেই মারাঠা শক্তির জয়গানের ঢক্কানিনাদে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো।

এতসব ঘটনা সত্ত্বেও ১৯০২ সালের কোলকাতায় প্রথম 'গণপতি পূজা'

বাংলা ও মহারাষ্ট্রে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বিরাজমান অবস্থা অনুধাবনের লক্ষ্যে পশ্চিম বঙ্গের গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি বাঞ্ছনীয় হবে। তিনি লিখেছেন, "মোগলের বিরুদ্ধে রাজপুত্রদের সংগ্রামের কাহিনী যেমন আমাদের দেশাত্মবোধের প্রেরণা যুগিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছে মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী। বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠাদের সবচেয়ে প্রিয় দেবতা গণপতি (গণেশ)-কে নিয়ে গণপতি উৎসব-এর প্রচলন করেন ১৮৯৩ -এ। ..মহারাষ্ট্রের অনুসরণে ১৯০২-এ কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের সূচনা এবং এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করে সখারাম গণশ দেউসকর।...শিবাজীকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ তখন তুঙ্গে উঠেছে। চার বছর ধরে শিবাজী উৎসব চলছিল এই কলকাতা শহরে। চরমপন্থী স্বাদেশিকরা বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হলো তার অঙ্গস্বরূপ ছিল 'ভবানী পূজা'। শিবাজী ছিলেন ভবানী দেবীর ভক্ত। তাই শিবাজী উৎসবে ভবানীর মূর্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালুতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা। সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই শিবাজীকে জাতীয় বীর (?) রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক : পুস্তক বিপণি, কলিকাতা ১৯৭৮)।

এই একই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ডঃ পুলিন দাশ লিখেছেন, "(শিবাজী) উৎসবে যোগদানের জন্য মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জে আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় আসেন। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ভবানী পূজা অনুষ্ঠিত হয় (জুন, ১৯০৬)। এক অখণ্ড ভারতের নির্মাতারূপে জাতীয় বীরের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে শিবাজীর উদ্দেশে যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদিত হচ্ছে গিরিশচন্দ্র (নাট্যকার) তখন সময় এ মঞ্চের চাহিদার সঙ্গতি রেখে সিরাজদ্দৌলা মীরকাশেমের জগৎ ছেড়ে "ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য" শিবাজীর ভূমিকাকে উপজীব্য করে, বাংলা মঞ্চকে উপহার দেন তাঁর 'ছত্রপতি শিবাজী" (১৯০৭) নাটক। (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক : পৃঃ ২৬৮ : ১৯৮৩ : এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স কলিকাতা)

অবশ্য এর আগেই ছত্রপতি শিবাজীর চরিত্রকে মহিমান্বিত হিসেবে চিত্রিত করে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীয় 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবন চরিত্র' (১৮৯৫), সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-চরিত্র' (১৮৯৫), মনোমোহন গোস্বামীর রোশিনারা (সংশোধিত নাম 'শিবাজী' (১৯০২) প্রভৃতি।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬) এবং মীর কাশিম (১৯০৬) রচনার পর পুনরায় তৎকালীন বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মনমানসিকতাকে প্রতিধ্বনিত করতে সচেষ্ট

হলেন। এবার তিনি রচনা করলেন চরম সাম্প্রদায়িক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী'। ১৯০৭ সালের ১৭ই আগস্ট নাটকটি কোলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হলো। মিনার্ভা থিয়েটারে তৎকালীন স্বত্বাধিকারী এম এম পান্ডে এবং ম্যানেজার শ্রী এ এন দত্ত স্বাক্ষরিত ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত প্রচারপত্রে 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হলো যে, "...আমাদের বিশ্বাস, এক্ষণে তাঁহার (শিবাজীর) জীবন এবং চরিত্র দেশবাসী সত্যিকারভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং অতঃপর হিন্দুস্থানের এই বাঙালিরা হস্তমিলন করবেন।"

নাটকটি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র তাঁর স্বজনবন্ধু শ্রী কুমুদবন্ধু সেনকে লিখেছিলেন, "শিবাজীতে এই আদর্শ দেখবার চেষ্টা করেছি যে, ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য, অত্যাচারিত, দুর্বল, পীড়িতকে রক্ষার জন্য ত্যাগের ওপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।"

(গিরিশ চন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য : পৃঃ ১২)

গিরিশচন্দ্র কৃত 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের সংলাপের নমুনা হচ্ছে :

(ক) **জিজবাঈ** : তুমি ভবানীর কার্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে, পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য তোমার জন্ম, সনাতন ধর্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র কর্ম।

(খ) **রামদাসস্বামী** : বৎস (শিবাজী), দেবকার্যে তুমি আবির্ভূত, দেবকার্য সুসম্পন্ন করেছ, উনবিংশ বর্ষব্যাপী ঘোর যুদ্ধে মুসলমান বল চূর্ণ করে বিরাট হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেছ। তোমার নাম বিধর্মীর ভয়োৎপাদনকারী, স্বধর্মীর আনন্দবর্ধক, প্রতি হিন্দু জিহবায় ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত।

(গ) **শিবাজী** : একবার নয়ন উন্মীলন করে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি আর্যভূমি বিধর্মী পীড়িত। যে গো-দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গো-হত্যা; উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য করবেন? কতদিন নিত্য আর স্বজাতির দুর্গতি দেখবেন? কতদিন দেবনিন্দা শুনবেন—কতদিন ধর্মের গ্লানি প্রতিমা ভঙ্গ উপেক্ষা করবেন?

অচিরেই ইংরেজ শাসকরা উগ্র সাম্প্রদায়িক বিশ্বে জর্জরিত 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকটি বেআইনী ঘোষণা করে।

দুঃখজনক হলেও একথা উল্লেখ করতে হয় যে, ২/১টি (সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাশিম) ব্যতিক্রম ছাড়া এ সময় নাট্য রচনার প্রায় সর্বত্র বর্ণহিন্দু লেখকরা একই মনমানসিকতার পরিচয় প্রদান করেছেন। এক্ষণে এ সময়ে নাট্য আন্দোলনের অগ্রণী গিরিশচন্দ্র ঘোষের কিঞ্চিৎ মূল্যায়নই যথেষ্ট মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট প্রগতিশীল গবেষক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী লিখেছেন, 'শিবাজীকে অবলম্বন করে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন নিয়ে গিরিশচন্দ্র শিবাজীর যে ছবি এঁকেছেন সেটাও তাঁর 'ছত্রপতি শিবাজী'র পূর্বে লেখা মনোমোহনের রোশিনার-র (শিবাজীর) অনুসরণ।...শিবাজী উৎসবকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ যখন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময় রচিত হয় গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক। এইরূপ আবহাওয়ায় শিবাজীকে নিয়ে লেখা নাটক যে প্রকৃতই একখানি মঞ্চ সফল নাটক হবে এটা গিরিশচন্দ্র জানতেন। তাছাড়া শিবাজী চরিত্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র তাঁর ধর্মভাবাশ্রিত জাতীয় তার আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। শিবাজীর সঙ্গে দেবী ভবানীর সম্পর্ক থাকায় গিরিশচন্দ্রের পক্ষে আরও সুবিধা হয়েছিল। 'দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটক' পৃঃ ১৭৬-১৭৭, পুস্তক বিপণি কলিকাতা-৯)

এ সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর পুলিন দাশ লিখেছেন, 'অচিরকাল মধ্যেই বিশেষভাবে চরমপন্থীদের প্রয়াসে জাতীয় আন্দোলন যখন হিন্দু জাতীয়তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায় সেই সময় এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বীরের আদর্শরূপে মঞ্চে অভ্যর্থিত হয়েছে ছত্রপতি শিবাজী। ...ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে সংগ্রামরত শিবাজীর সংলাপে হিন্দুর ধর্মীয় চেতনা প্রভাবিত দেশাত্মবোধের (?) প্রকাশ ঘটানো সহজসাধ্য হয়েছে। 'ছত্রপতি শিবাজীর' মাধ্যমে ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার আদর্শকে রূপায়িত করার সুযোগ পেয়ে গিরিশচন্দ্রও তাঁর নাটকের পথ বদল করেছেন। 'ছত্রপতি শিবাজী'তে পরিবর্তনের সূচনা তা আরো সম্প্রসারিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী নাটক 'শঙ্করাচার্য', 'অশোকে'। (পশ্চিম বঙ্গের সিপিএম সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক', ১৯৮৩ কলিকাতা)

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে হয় যে, গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী 'সিরাজদ্দৌলা (১৯০৫) এবং 'মীর কাশিম' (১৯০৬) নাটক দু'টি কিন্তু 'ছত্রপতি' 'শিবাজী', শঙ্করাচার্য' এবং 'অশোক' এর আগেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু কেন এমনটি হয়েছিল, সে সম্পর্কে ডঃ পুলিন দাশ সত্য ভাষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "উৎসবের (কোলকাতায় শিবাজী উৎসব) এবং অঙ্গ হিসেবে ভবানী পূজা অনুষ্ঠিত হয় (জুন, ১৯০৬)। এক অখণ্ড ভারতের নির্মাতারূপে জাতীয় বীরের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে শিবাজীর উদ্দেশে যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদিত হচ্ছে গিরিশচন্দ্র তখন সময় ও মঞ্চের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিরাজদ্দৌলা মীর কাসিমের জগৎ ছেড়ে 'ধর্মের ওপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য' শিবাজীর ভূমিকাকে উপজীব্য করে বাংলা মঞ্চকে উপহার দেন তাঁর 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক।"

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন বঙ্গীয় এলাকায় ইংরেজি শিক্ষিত কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে আপ্লুত হয়ে উঠেছে, তখন মহারাষ্ট্র এলাকায় এদেশীয় উঠতি শিল্পপতিদের সমার্থক গোষ্ঠী হিন্দু ব্রাহ্মণদের চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে হয়। এর শুরুটা কিন্তু ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বৈঠক থেকে। এটাকেই বাঙালি বর্ণ হিন্দু এবং মারাঠা ব্রাহ্মণদের 'মহামিলন' বলে আখ্যায়িত করা যায়। জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ কর্মচারীরা ভেবেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বগ্রাসী কৃষক বিদ্রোহ এড়ানো ছাড়াও এদেশীয় সমার্থক গোষ্ঠীকে সুশৃঙ্খলভাবে সরকারের কাছে নানা 'আব্দার' ও 'প্রার্থনা' উপস্থাপনার পদ্ধতি শেখানো সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (ডিএনবিএ ব্রাদার্স কলিকাতা ১৯৮০) গ্রন্থে লিখেছেন, "এইভাবে দেখা যায়, যে সময় সরকারি উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব হইতেই ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীও নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী হইয়াছিল। তাহাদের সাফল্য যখন আসন্ন হইয়া উঠে তখনই সরকারি প্রতিনিধি এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হিউম সেই ষড়যন্ত্রের মারফত ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগকে

সাময়িকভাবে সরকারি প্রভাবে আনয়ন করিয়া নিজের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিতে সক্ষম হন। রজনী পামদত্তের কথায় :

"প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সঙ্গোপনে রচিত পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। ক্রমবর্ধমান বিশুদ্ধ গণশক্তি এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইয়াছিল।

বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন বিপ্লব (কৃষক বিদ্রোহ) পরাজিত করা অথবা আরম্ভের পূর্বেই উহা ব্যর্থ করা।"

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (সভাপতি) : উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী) পরবর্তীকালে নিজেই লিখেছেন :

"সেই সময়ে, এমনকি এখনও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বা নাই যে, আমরা সেই সময়ে একটা ভয়ঙ্কর গণ-বিপ্লবের ঘোরতর বিপদের মধ্যে ছিলাম।

বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি বিরাট খণ্ড আমাকে দেখানো হইয়াছিল।...রিপোর্ট ও সংবাদগুলো বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। রিপোর্ট ও সংবাদগুলোর সংখ্যা অতি বিপুল। এইগুলো ৩০ সহস্রাধিক সংবাদদাতার নিকট পাওয়া গিয়াছিল।" (স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন : হিউম, ফাদার অব ইন্ডিয়ান কংগ্রেস)।

গবেষক সুপ্রকাশ রায় মহাশয় আরও লিখেছেন, "১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে হিউম সিমলায় গিয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল সিমলায় বসিয়াই বড়লাট লর্ড ডাফরিন ও হিউম কর্তৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রচিত হয়।" কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ, সি. ব্যানার্জী মহাশয়ও এই সত্য উদঘাটিত করিয়া লিখিয়াছেন :

"সম্ভবত ইহা বহু লোকের নিকটই একটি নতুন সংবাদ যে, যেভাবে প্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে যেভাবে তাহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের বড়লাট হিসেবে ডাফরিন ও আভার মার্কুইসয়েরই বড়লাট লর্ড ডাফরিন কীর্তি।"

এদিকে স্বল্পকালেই মধ্যেই কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের বক্তব্য হচ্ছে, যখন জাতীয় কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে, তখন 'আব্দার' ও 'প্রার্থনার' যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন ভারতীয়দের নামে 'দাবি' আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রসর বলেই আদায়কৃত দাবির সিংহভাগ স্বাভাবিকভাবেই কব্জা করা সম্ভব হবে। এরই পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১০০ টি বস্ত্রকল) স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে সোচ্চার হলে মারাঠা বিত্তশালী ব্রাহ্মণদের শর্তহীন সমর্থন লাভ নিশ্চিত বলে গণ্য করা যায়। উপরন্তু 'মারাঠা বীর' 'ছত্রপতি শিবাজী'র ইমেজকে পুনঃজাগরণের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সনাতন হিন্দু ধর্মের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজতর হবে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বিশ বছরকাল সময়কে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ এবং মহারাষ্ট্রে স্থাপিত ও দেশীয় বস্ত্র শিল্পের সমর্থক মারাঠা ব্রাহ্মণদের জন্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে "চরম বোঝাপড়ার" প্রস্তুতিকাল বলা যায়।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় এলাকার ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণ হিন্দুদের পরিপক্ক নেতৃত্ব আরও কিছুদিনের জন্য ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেও মহারাষ্ট্রে কিন্তু তেমনটি হলো না। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, উপমহাদেশে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত কিন্তু আদতে বাংলায় হয়নি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এর শুরুটা হয়েছিল সুদূর মহারাষ্ট্রে; এর পেছনে এক ক্ষুদ্র ইতিহাস রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষপাদে দাক্ষিণাত্যে হঠাৎ করে মহামারী আকারে প্লেগ রোগ দেখা দিলে ইংরেজ সরকার মিঃ র‍্যান্ড নামে জনৈক ইংরেজ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন মিঃ আয়ার্স্ট নামে অপর এক ইংরেজ কর্মচারী। এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে, এঁরা দু'জনেই বিশেষ করে হিন্দু গৃহবধূদের সম্পর্কে "অশোভন" ও 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ" মন্তব্য করেছেন। এতে করে দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রীয় এলাকায় তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে দামোদর চাপেকার এবং বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই ব্রাহ্মণভ্রাতা হত্যার মাধ্যমে এর প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জুবিলী উৎসবে যোগদানের পর যখন মিঃ র‍্যান্ড এবং আয়ার্স্ট বোম্বের লাটভবন থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন সে সময় এঁরা চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে প্রাণ হারান। উপমহাদেশে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীর হাতে এটাই হচ্ছে প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এরপর দু'জন ভারতীয় নাগরিক পুলিশের কাছে অন্যতম হত্যাকারী দামোদর চাপেকারকে ধরিয়ে দিলে বিচারে দামোদরের ফাঁসি হয়। কিন্তু স্বল্পদিনের ব্যবধানে সন্ত্রাসবাদীরা উক্ত দুই ব্যক্তিকেও হত্যা করে। এরই জের হিসেবে আরও ৪ জনের ফাঁসি হয়।

সন্ত্রাসবাদীরা পদ্ধতির ব্যাপারে ওয়াহাবীদের অনুসরণ করেছে

তবে সন্ত্রাসবাদীরা পদ্ধতিগত ব্যাপারে কীভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক সুপ্রকাশ রায় সত্যভাষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহের' নায়কগণের মামলার বিচারকালে বিদ্রোহীপক্ষের ব্যারিস্টার এনেস্টি সাহেব তাঁর বক্তৃতায় চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ' কৃষকের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরে এনেস্টি সাহেবের এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলে তাহা মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।" শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন : "এনেস্টির এই বক্তৃতাসমেত মোকদ্দমার বিবরণ ওয়াহাবীর পুস্তিকাকারে ছেপে চারিদিকে বিলি করলে তাহা পাঠ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে তাঁরা যেন একেবারে মেতে উঠেছিলেন।" (মুক্তি সন্ধানে ভারত : পৃ: ৯৯)।

মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত 'ওহাবী আন্দোলন' এবং হিন্দুদের 'সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড' সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর বক্তব্য নিশ্চিতভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু বলা যায়। তিনি লিখেছেন, "মুজাহিদগণের [ওহাবী] আদর্শ ছিল মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম। পক্ষান্তরে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শ হইল মুক্ত ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। ধর্ম ভিত্তি করিয়া জেহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল

বলিয়া প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে হিন্দুরা এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে মুসলমানরা অংশগ্রহণ করে নাই।" (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : পৃ: ১৭৬ বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৮)

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম স্রষ্টা এবং মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিত্ব কমরেড মুজাফফর আহমদ-এর সত্যনিষ্ঠ বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গীয় এলাকায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কমরেড আহমদ লিখেছেন, "বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অভ্যুদয় একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটা ছিল একটি গোপন আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের আগেই তাঁদের দল গড়ে উঠেছিল। অবশ্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁদের বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশেই সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপ বিশেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। বাংলার শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের ভিতরেই ছিল তার উর্বর ক্ষেত্র। বাংলার বাহিরেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু বাংলার মতো দীর্ঘস্থায়ী তা কোথাও হয়নি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমার মনের যে অবস্থা ছিল, আর যে রোমাঞ্চ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছিল তাতে আমার পক্ষে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার পথে বিস্তর বাধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ" হতে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান। তাতে আছে–

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরধারিণী ইত্যাদি।

একেশ্বরবাদী কোনো মুসলিম ছেলে কী করে এই মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনোদিন বুঝতে পারেননি। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। উদ্দেশ্যে ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বারীন্দ্রকুমার ঘোষও আন্দামান হতে ফেরার পরে এই কথা লিখেছিলেন। তাঁর সেই পুস্তকখানি এখন দুষ্প্রাপ্য।" (আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (পৃষ্ঠা ১০-১১) : কমরেড মুজাফফর আহমদ : ১৯৭৭ : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা-১।

কমরেড মুজাফফর-এর বক্তব্যের জের হিসেবে এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় একটা মন্তব্য সহজেই করা যায় যে, ইংরেজ রাজত্বে বাংলা গদ্যের প্রবর্তন থেকে শুরু করে রেলপথ সম্প্রসারণ ও ব্যাপক আকারে উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এদেশীয় নেতৃবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইংরেজদের উদ্যোগে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এ জন্যই গবেষক বিনয় ঘোষ যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, "কিন্তু ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তা অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের নিজের উদ্যম ও অর্থব্যয়ে অথবা তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রচেষ্টায়। তাও দেখা গেছে বিধবা বিবাহ যাঁরা করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে সাময়িক অর্থলোভে শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন, কোনো আদর্শ প্রীতির জন্য বিবাহ করেননি। বিদ্যাসাগর নিজেও তা বুঝতে পেরে শেষজীবনে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজ গ্রহণ তো করেননি, শিক্ষিত উচ্চ সমাজে যারা আদর্শের দিক থেকে একদা তা সমর্থন

করেছিলেন, তাঁরাও কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেননি।...তাই বিধবা বিবাহ ব্যর্থ হয়েছে, নারীর পরাধীনতা, যৌথ পরিবার সবই বজায় থেকেছে এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নির্ধারণের জন্য শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই কোনো আইন পাস করতে চাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিতশ্রেষ্ঠও আইন প্রয়োগ করে এই ধরনের সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন।" (বাংলার নবজাগৃতি' পৃ: ১৫৭-৫৮ : ওরিয়েন্ট লংম্যান ১৯৭৯ কলিকাতা)।

এর পিছনে কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাধাকান্ত-ভূদেব-রামকৃষ্ণ-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রমুখের প্রবর্তিত হিন্দুধর্মের রিভাইভ্যালিজম-এর চিন্তাধারার ব্যাপক প্রভাব। এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা শুধু একটা কথাই বলেছেন যে, "পাশ্চাত্য প্রভাবে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ভারতের যেভাবে অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল, বাস্তবে তা হয়নি।" কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিল। তারা বিলম্বে হলেও অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-প্যারীচাঁদ-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের উদার ও সংস্কারপন্থী ভাবধারার সমাধি রচিত হয়েছে এবং সেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বঙ্কিমের প্রদর্শিত পথে 'হিন্দু বাহুবল' ও 'হিন্দু শৌর্যবীর্যের' গৈরিক পতাকা শোভা বর্ধন করছে। এজন্যই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এর পর সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের মধ্যে (১৯২৯ সালের সারদা আইন) হিন্দুদের জন্য আর কোনো ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেনি এবং বিধবা বিবাহের সমর্থনে কিংবা সতীদাহের বিরোধী কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হয়নি।

এখানে লক্ষণীয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গীয় এলাকার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মন-মানসিকতা যখন "দিনে স্যুট-প্যান্ট আর সন্ধ্যায় ধুতি", ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের সেতুবন্ধ রচিত হলো। এই সম্প্রদায়ের চোখে তখন ভবিষ্যতের বিরাট স্বপ্ন। আর এদিকে ভারতের ভাইসরয় হিসেবে সেই ঐতিহাসিক সময়ে আগমন হলো লর্ড কার্জনের।

ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে প্রাচ্য দর্শনে যিনি একদিন অবাক বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই মার্কুইস জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) মাত্র ৪০ বছর বয়সে গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর এক উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে এদেশে আগমন করলেও নানা ঘটনাপ্রবাহে শেষ পর্যন্ত তিনি ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত গভর্নর জেনারেল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। তাই লর্ড কার্জনের কর্মকাণ্ডকে বিচার করার প্রাক্কালে ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িককালের ইতিহাসের কীভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তার উপস্থাপনা অপরিহার্য মনে হয়।

১৮৫৮ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজ রাজত্বের বিপদমুক্ত সময়

ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হান্টার তাঁর রচিত 'ইন্ডিয়া অব দি কুইন (১৮৮৭ খ্রি.) গ্রন্থে এ মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং-এর ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মধ্যবর্তীকালীন সময়কালকে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সবচেয়ে বিপদমুক্ত সময় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ সময় ব্রিটিশরা যে

কেবলমাত্র নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই-ই নয়, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বকে প্রাচীন এবং পাশ্চাত্যপন্থী ভারতীয়রা স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। প্রথমোক্ত দল শক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে আর শেষোক্তরা নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বকে বরণ করে নেয়। অন্যদিকে এসব গবেষক ও ঐতিহাসিকরা ব্রিটিশ জনগোষ্ঠীর কাছে লর্ড ক্যানিং থেকে শুরু করে লর্ড কার্জন পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলদের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের ইমেজকে 'সুমহান' হিসেবে উপস্থিত করে। ইংরেজ কবি কিপলিং এক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন।

গবেষক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এ ব্যাপারে তার 'আওয়ার ইন্ডিয়ান আম্পায়া'র গ্রন্থে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর কৃতিত্ব দাবি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমাদের আগে এই বিশাল ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে যেসব জাতির আবির্ভাব হয়েছে তাদের মতো আমরা আসিনি। আমরা হিন্দুদের মতো মন্দির অথবা মুসলমানদের মতো প্রাসাদ মসজিদ আর কবরখানা নির্মাণের দিকে নজর দিইনি, মারাঠাদের মতো দুর্গ কিংবা পর্তুগীজদের মতো গির্জাও গড়িনি। আমরা এসেছি আধুনিক নগর নির্মাণের জন্য। এ কাজে আমাদের যোগ্যতা ও প্রতিভা যে অতুলনীয় তা আধুনিক শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্রে আমাদের মহানগর নির্মাণের সাফল্যে প্রমাণিত হয়। আমাদের মহানগর নির্মাণের অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলেই ভারতবর্ষে নতুন শ্রমশিল্প যুগের সূচনা হয়েছে।" রেভারেন্ড জেমস লং তাঁর রচিত 'পিপলস ইন টু সোশ্যাল লাইফ অব ক্যালকাটা' গ্রন্থে লিখেছেন, "কলিকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, জলাভূমি, জঙ্গল ও গ্রাম থেকে কীভাবে কলিকাতা ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরে পরিণত হয়েছে, সে কাহিনী লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে সযত্নে রক্ষিত প্রায় এক লক্ষ সরকারি নথিপত্রের মধ্যে সবিস্তারে লেখা রয়েছে।"

ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের সুফল দাবি করে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এ মর্মে আরও লিখেছেন যে, ভাইসরয় জন ব্যারন লরেন্স (১৮১১-৭৯) এদেশীয় উচ্চ শ্রেণীর প্রবল বিরোধিতার মুখে বিশেষ করে পাঞ্জাব এলাকার রায়তদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। এরই ফলে ব্রিটিশদের আপোষ ফর্মুলার জন্ম হয়। পূর্বাঞ্চলে বঙ্গীয় এলাকায় জমিদারদের এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব এলাকায় রায়তদের পৃষ্ঠপোষকতাই হচ্ছে এই ফর্মুলার মূল নীতি। আদিতে আইরিশ লর্ড আর্ল মেয়ো (১৮২২-৭২) ভারতীয় প্রিন্সদের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হওয়া এবং আফগানদের 'হতবুদ্ধি' করার পর দেশে ফেরার প্রাক্কালে আন্দামানে কারাগার পরিদর্শনকালে জনৈক মেয়াদী আসামীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

এর পর গভর্নর জেনারেল পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এক কালের ব্যাংকার নর্থব্রুক। তিনি ভারতের প্রশাসনযন্ত্রে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও আইনের শাসন প্রবর্তনে সচেষ্ট হন।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছরের জন্য ইংরেজ ভারতের ভাইসরয় হিসেবে আগমন করেন মেধাবী চরিত্রের এডোয়ার্ড রবার্ট বুলার লিটন (১৮৩১-৯১)। তিনি সর্বপ্রথম সিমলায় এক ভোজসভায় কোর্স পরিবেশনের বিরতিকালীন সময়ে চুরুট পান করে উচ্চ মহলে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। লিটনের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ভারত উপমহাদেশে পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ রোধের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন।

লিটনের পর ভাইসরয় পদে নিযুক্তি লাভ করলেন মুক্তবুদ্ধির জর্জ ফোডারিক রবিনসন রিপন (১৮২৭-১৯০০)। ইনি ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ ইতিহাসবিদরা এখানে বিশেষভাবে ইংল্যান্ডে উদারপন্থীদের জয়জয়কারের কথা উল্লেখ

করেছেন। ১৮৬৮ থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বছর ধরে উদারপন্থীদের নেতৃত্বদানকারী গ্লাডস্টোন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েই ভারতে জনকল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে লর্ড রিপনকে প্রেরণ করেছিলেন। এ সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, "আমাদের দুর্বলতা ও ভাগ্যের ফেরে একথা বলতে হয় যে, আমরা মুক্ত চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ-সুবিধা ভারতীয়দের মধ্যে বিলিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছি।" ভাইসরয় লর্ড রিপন ভারত উপমহাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু ভারতীয় সেশন জজদের ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা প্রদানকালে ভারতে অবস্থানকারী শ্বেতাঙ্গদের নিকট থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এটাই হচ্ছে বিখ্যাত ইলবার্ট বিল। শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতার ফলে ইলবার্ট বিলে কিছু সংশোধন করা হলেও দেশে প্রত্যবার্তনের প্রাক্কালে ভাইসরয় রিপন ভারতীয়দের বিশেষ করে কোলকাতার বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নিকট থেকে আশাতীতভাবে বিদায় সম্বর্ধনা লাভ করেন। এরপর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ একে একে এলেন আভা ফ্রেডারিক টেম্পেল ডাফরিন (১৮২৬-১৯০২) লর্ড ল্যান্সডাউন এবং স্কটিশ এলগিন।

ইংরেজ সৈন্যদের দ্রুত যাতায়াতই ভারতে রেলওয়ে স্থাপনের মূল্য উদ্দেশ্য

এ ধরনের এক পূর্বাপর ইতিহাস বর্ণনাপূর্বক ইংরেজ গবেষক পারসিভ্যাল স্পিয়ারের মত হচ্ছে, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ রাজত্বের তুঙ্গ অবস্থা। তিনি লিখেছেন, ভারতে রেলওয়ে স্থাপনের জন্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৯০১ সালের মধ্যে তা' এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রেলওয়ে পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একই বছরে অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দেই ভারতে টেলিগ্রাফ পদ্ধতিও চালু করা হয়। কিন্তু তিনি একথা উল্লেখ করেননি যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবের পর সম্ভাব্য সমস্ত রকমের বিদ্রোহকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে দ্রুত সৈন্য প্রেরণের সুবিধার জন্যই ভারতে রেলপথ স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। উপরন্তু ভারতের চা, পাট, কাপার্স, নীল, অভ্র, আফিম ইত্যাদি সম্পদ বিদেশে রফতানির জন্যও রেলওয়ের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। পারসিভ্যাল এ মর্মে দাবি করেছেন যে, ভারতের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে পাঞ্জাব এলাকার সেচ ব্যবস্থা ইংরেজদের এক অবিস্মরণীয় অবদান। কিন্তু তিনি এ কথাটি স্বীকার করেননি যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করতে যেয়ে ইংরেজরা যেসব নেটিভ সৈন্যদের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছিল কেবলমাত্র গুর্খারা ছাড়া বাকি প্রায় সবাই ছিল পঞ্চনদের হিন্দু-মুসলমান-শিখ বাসিন্দা। এজন্য এদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এই সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইংরেজদের উদ্ধারের জন্য শিখ সৈন্যরাই সর্বপ্রথম দিল্লীতে প্রবেশপূর্বক সিপাহীদের রক্ষাব্যূহ ভেদ করে রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত করেছিল। আর কোলকাতায় এই বার্তা পৌছানোর পর বাঙালি বর্ণ-হিন্দুদের মুখপাত্র পণ্ডিত গৌরিকিশোর ভট্টাচার্য ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যি সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার মন্তব্য হচ্ছে "...আমাদিগের (ইংরেজদের) সৈন্যরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে।...ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজা সকল নির্ভয় হও... ।"

ইংরেজ গবেষকরা একথাটা সঠিকভাবে লিখতে সম্ভবত লজ্জাবোধ করেন যে, 'ব্রিটিশ প্রভুত্বকে ভারত ভূমিতে অক্ষত রাখিয়া শাসকগণের নিকট হইতে কিছু সুবিধা-সুযোগ আদায়ের জন্য যে আন্দোলন "রিনাসান্সের" নায়কগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল

রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম নহে'। (সূত্রঃ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়)।

এমনকি এসব শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিকরা উনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা কেন্দ্রিক সামাজিক চরিত্রের মূল্যায়ন করতে যেয়ে এ মর্মে মন্তব্য করতেও সাহসী হননি যে, "...উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও শিক্ষিত মধ্য বিত্তশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।...হিন্দু-প্রধান বাঙালি বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত এবং তা প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত।" (সূত্র : বাংলার নবজাগৃতি—বিনয়ঘোষ)

৪৭ বছরে ইংরেজ ভারতে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সময়কালকে ইংরেজ রাজত্বের পূর্ণ বিকাশের সময় হিসেবে বর্ণনা করে এ মর্মে উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়ে রাজধানী কোলকাতায় ইংরেজি শিক্ষিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী পূর্ণ অবয়ব লাভ করেও ভারতীয়দের আংশিকভাবে স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত প্রদান করা হয় এবং বস্ত্র ও লৌহ শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য যান্ত্রিক যুগের সূচনা হয়। সর্বোপরি এ সময়েই ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। কিন্তু এসব ইতিহাসবিদরা একথাটি বলেন নি যে, আলোচ্য পঞ্চাশ বছরে শুধু বঙ্গীয় এলাকার সাঁওতাল বিদ্রোহ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ওয়াহাবী আন্দোলন, নীল চাষিদের বিদ্রোহ, সুন্দরবনের বিদ্রোহ, গারোদের বিদ্রোহ, কুকিদের অভ্যুত্থান, ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ, সন্দ্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ এবং সিরাজগঞ্জের ভয়াবহ কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ আর গবেষকদের দল একথাটা সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত মোট ৪৭ বছরে ইংরেজ ভারতে শুধু দুর্ভিক্ষজনিত পরিস্থিতির দরুন প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার মানব সন্তান এই ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। (সূত্রঃ 'দি স্টারভিং মিলিয়ন'—এস কে চ্যাটার্জি)।

ইংরেজ ঐতিহাসিক ও গবেষকদের পক্ষে এ ধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকার মূল কারণ একটাই এবং তা' হচ্ছে আলোচ্য সময়ে ভারতে ইংরেজ শাসনের যথার্থতা প্রমাণ করা। সেক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ববৃহৎ (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন : ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার বর্গ মাইল) সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং সবচেয়ে পরিপক্ক শাসকগোষ্ঠী এই ইংরেজদের পক্ষে উপমহাদেশের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও অনুগত কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়কে নানা তত্ত্বকথা আর আদর্শের বুলি কপচিয়ে একটি সম্পূরক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপগুলো নিতান্তই স্বাভাবিক বলে গণ্য করলে আপত্তি থাকার কথা নয়। এজন্যই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং (১৭৭৪-১৮৩৯) ভারতে গভর্নর জেনারেল থাকাকালীন সময়ে তাঁর আইন উপদেষ্টা টমাস বেবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) 'নেটিভদের' মাঝ থেকে একটি সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে এ মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এদেশে এমন এক শ্রেণী বানানো প্রয়োজন "যার বর্ণ এবং রক্ত ভারতীয়দের, কিন্তু রুচি, অভিমত, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ইংরেজের।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে যৌবনপ্রাপ্ত হলো ইংরেজ শাসকের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সমর্থক গোষ্ঠী "কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।" তবে ইংরেজরা যেমনটি চেয়েছিল ঠিক হুবহু তেমনটি হয় নি। রাধাকান্ত-বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ-দয়ানন্দের বদৌলতে এদের ললাটে শোভিত হলো চন্দন-প্রলেপ। একদিকে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস দমন-নীতির ফলে একের পর এক সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এঁরা ইংরেজদের সম্পূরক শক্তি হিসেবে যথাযথভাবে ভূমিকা পালন অন্তে সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের লক্ষ্যে সোচ্চার হলো।

মেকলের সেই বিখ্যাত উক্তির প্রেক্ষিতে উপ-মহাদেশের গতিধারার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এরপরেই রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে শুরু হলো সেই প্রক্রিয়া। মাত্র বছর কয়েকের মধ্যেই ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে ঘোষণা করা হলো অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে। শুরু হলো কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দুদের 'উন্মেষের যুগ'। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পাশ্চাত্য -ঘেঁষা উদারপন্থী 'তত্ত্বোধিনী সভার' প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রথম প্রকাশের মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল-এর দাপট তখন তুঙ্গে। এর মধ্যে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংরেজ সমর্থক 'জমিদার সভা' এবং 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'—এই দু'টি সমিতিকে একত্রিক করে তৈরি হলো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন।' সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৫৭. খ্রিস্টাব্দে যখন সমগ্র বাংলা এবং উত্তর ভারতীয় এলাকা মহাবিদ্রোহের বহ্নিশিখায় প্রজ্বলিত, সে সময় কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে স্থাপিত হচ্ছে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। রক্তাক্ত সিপাহী বিপ্লবের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলার পাহাড়ে অবস্থান করলেও অন্যান্য বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ একবাক্যে কীভাবে সোচ্চার কণ্ঠে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন যুগিয়ে আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তা অন্যত্র বিস্তারিত বিবৃতি করেছি। এ ধরনের এক সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি তো ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দেখতে পাই।

প. বাংলার সিপিএম সরকারের অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থের মতামত

এজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর আট দশকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সমর্থক সম্প্রদায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মনমানসিকতা সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ডক্টর পুলিন দাশ সম্প্রতি (১৩৯০ বঙ্গাব্দ) পশ্চিম বঙ্গের মার্কসীয় সরকারের অর্থানুকল্যে তাঁর রচিত "বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা নাটক" শীর্ষক গ্রন্থে যেসব চাঞ্চল্যকর এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দান করেছেন তার কিয়দংশ এখানে উপস্থাপন করা অপরিহার্য মনে করছি। তিনি লিখেছেন :

"১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' ও অপর অংশ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় "আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে চিহ্নিত হয়।...দেবেন্দ্রনাথের পৌরহিত্যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদক বিখ্যাত বক্তৃতা দেন (১৮৭২)। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রাজনারায়ণের বক্তৃতার উচ্ছ্বাসিত প্রশস্তি প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রকেও দেখা যায় হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়ন ও আলোচনায় নিবিষ্ট হতে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'প্রচার' পত্রিকা হিন্দু ধর্মের প্রচার মাধ্যম হয়ে ওঠে। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ' (১৮৭৫) আন্দোলন হিন্দু পুনরাভ্যুত্থানে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বেদকে অভ্রান্ত গণ্য করে দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দু ধর্মের

প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। লালা হংসরাজ, লালা লজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি নেতৃবর্গ অতঃপর দয়ানন্দ প্রবর্তিত মতবাদের অনুপ্রেরণা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চারিত করেন।...

"বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার'-এর সঙ্গে বাংলাদেশের আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে 'বঙ্গবাসী', 'নবজীবন' হিন্দু ধর্মের পুনরুভ্যুত্থান প্রয়াসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শশধর তর্কচূড়ামণিকৃত হিন্দু ধর্মের 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যার প্রকাশক ছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। শশধরের হিন্দু ধর্মের ব্যাখার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিম শিষ্য কোঁৎপন্থী চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু পুনরুভ্যুত্থান পন্থায় আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'নবজীবন' পত্রিকায় যুক্তিবাদের পথ পরিহার করে দেন। অক্ষয়চন্দ্র বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর অভিমত দেন আর 'বঙ্গবাসী' স্ত্রী শিক্ষার কুফল প্রদর্শনে ব্রতী হয়।..."

"বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আকৃষ্ট হন। বঙ্গদেশের শিক্ষিত সাধারণের কাছে দয়ানন্দ পরিচিত হয়েছিলেন কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে। 'ইন্ডিয়ান মিরর' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রে প্রধানত কেশবচন্দ্রের রচনাধারার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহিমা প্রকাশ পেতে থাকে। হিন্দুর যে পৌত্তলিকতা নব্য শিক্ষিতদের দ্বারা সম্পূর্ণ বিবর্জিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ ছিলেন সেই পুতুল পূজারী। গ্রাম্য ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রনাথ সরকার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির ন্যায় ভিন্নমার্গী বহু গুণীজনের শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃষ্টান্তে পৌত্তলিক হিন্দুর আত্মপ্রসাদ লাভের যথেষ্ট সুযোগ মিলল। নিরাশ্রিত আশাহত চেতনার অবলম্বন হয়ে উঠলো হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি।..."

বঙ্গীয় এলাকায় সৃষ্টি হলো শতাব্দীকালের বিষবৃক্ষ

অবশ্য এর সুচনা হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী'র প্রথম বৈঠকে। এ কথা চিন্তা করলে আজ বিস্মিত হতে হয় যে, আলোচ্য বৈঠকে রাজনারায়ণ মহাশয় তাঁর অনুষ্ঠানপত্রে 'হিন্দু ব্যায়াম', 'হিন্দু সঙ্গীত', 'হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যা' এবং 'হিন্দু শাস্ত্র' অবলম্বনে সমাজ সংস্কার সম্পাদনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আবেদন ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও আবারও উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, রাজনারায়ণের প্রণীত এই অনুষ্ঠানপত্রের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল বেলগাছিয়ার ডানকান সাহেবের বাগান বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রমুখের উদ্যোগে "হিন্দু মেলা" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৪ বার মেলার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান বক্তা মনোমোহন বসুর ভাষণ বিষেশভাবে লক্ষণীয়। তিনি এ মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, "হিন্দু মেলায় 'ঐক্যনামা' যে মহাবীজ রোপিত তার ফলে অতি শুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত হইবে।... তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা নাম দিয়া তাহার অমৃতস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে।" (হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত : সুনীল দাস সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৮১)

পাঁচ বছরের ব্যবধানে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সভার অধিবেশনেও মনোমোহনের ভাষণ হচ্ছে, "আমাদের (বর্ণ হিন্দুদের) বিলক্ষণ আশা হইতেছে "স্বাধীনতা" নাম্নী সুর

মনোমোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।" এখানে উল্লেখ্য যে, এটা এমন একটা সময় যখন ইয়ং বেঙ্গল নির্বাপিত এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনও স্তিমিত। কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মনে তখন অনেক আশা। শীর্ঘ "স্বাধীনতা" নামক ডুমুরের ফুল তাঁদের 'কোচরে' এসে আশ্রয় নেবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করলেন যে, 'প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে।" অবশ্য বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের অনেকেই হিন্দুধর্মের এই 'কর্মাত্মক' দিকটির ওপরেই জোর দিয়ে তাকে আবার আচার-আচরণগত ক্রিয়াকলাপের কুক্ষিগত করে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে নিমগ্ন হলেন। ফলে সমস্ত রকমের যুক্তিবাদ হলো পরিত্যাজ্য আর সনাতন হিন্দু ধর্মের ভক্তিবাদের জোয়ার প্রবাহিত হলো।

এ জন্যই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উনিশ শতকের আটের দশকের সূচনার সময় ছিল এই হিন্দু পুনরুত্থানের মাহেন্দ্রক্ষণ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত চাতুর্যে এতদিন ধরে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় আপ্লুত রক্ষণশীল সনাতন হিন্দু ধর্মরূপী যে চারাবৃক্ষে জল-সিঞ্চন করছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে কোলকাতায় সখারাম গণেশ দেউস্কর আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'শিবাজী উৎসব-এর মাধ্যমে তার বিরাট মহীরুহ আকারের চেহারাটা সকলের দৃষ্টিগোচর হলো। আসলে এটাই হচ্ছে বঙ্গীয় এলাকার শতাব্দীকালের বিষবৃক্ষ।

এতগুলো বছর পরেও এ কথা আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হয় যে, বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে যখন রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গল-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন প্রমুখের সাধনা ও অবদানে উদার ও পাশ্চত্য-ঘেঁষা সংস্কারপন্থী মনমানসিকতায় বাঙালি বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা অবয়ব সৃষ্টি হতে চলেছিল এবং যাকে বাংলার 'রেনেসাঁ' বলে চিহ্নিত করে অনেকে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলার আকাশে একে একে উদিত হলেন বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের মতো উজ্জ্বল অথচ রক্ষণশীল প্রতিভার। বর্ণ হিন্দু লেখকরা ছাড়াও ইংরেজ ঐতিহাসিকরা 'জ্ঞানপাপীর' মতো রামমোহন-ইয়ং বেঙ্গল-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের কর্মোদ্যমের ধারাবাহিকতায় বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডকে লিপিবদ্ধ করলেন। অথচ কার্যত দু'টো ধারা তো সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী। এর সমর্থনে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, উনবিংশ শতাব্দীর আট দশকে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 'উদার ও সংস্কারপন্থী মনমানসিকতা' উচ্ছিষ্টের মতো নর্দমায় নিক্ষিপ্ত করেছে। মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে মেকলের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে যুক্ত হলো 'সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' আর 'হিন্দু বাহুবলের' আবরণ। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় বলতে গেলে নীরবেই বরণ করে নিলো এই পশ্চাদমুখী দিক দর্শনকে।

সবার অজান্তেই বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তরা তখন কৈশোরে উপনীত

এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃস্থানীয়দের "আবদার-অভিমান-আবেদনের" যুগ। ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ নাগাদ স্থাপিত হলো জাতীয় কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রের নব্য শিল্পপতিদের পুরোধা মারাঠা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের 'মহামিলন' আর বঙ্গীয় এলাকায় ভবানী পূজা এবং শিবাজী উৎসবের আয়োজন করতে করতে উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিও হয়ে গেল। কিন্তু বলতে গেলে সবার অজান্তেই এর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের দল সবেমাত্র কৈশোরে উপনীত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এসব কিছু

অত্যন্ত সন্তর্পণে অবলোকন করছে। সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিহাসের গতিধারায় এঁদের শুরুটাও হলো সাম্প্রদায়িকতার পথ বেয়ে।

প্রখ্যাত মার্কসীয় গবেষক গোপাল হালদারের ভাষায় বলতে হলে, "সাংস্কৃতিক আয়োজনেও বাঙালি (বর্ণ হিন্দু) শিক্ষিত শ্রেণী দেশের জনসমাজ থেকে কতকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বিশেষ করে দেখি, বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজকে নবযুগের এই জাগরণ চাঞ্চল্য প্রায় স্পর্শও করতে পারেনি। অপরদিকে, খ্রিস্টিয় প্রভাব প্রতিহত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীরা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সাধনাকে সংযুক্ত করলেন, তাতে তখন থেকেই হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ ক্রমেই আমাদের জাতীয় প্রধান রূপ হয়ে উঠতে লাগল।"

(বাংলা সাহিত্যের রূপ রেখা ২য় খণ্ড গোপাল হালদার)।

এ ধরনের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইংরেজ ভারতের নয়া ভাইসরয় হিসেবে আগমন হলো লর্ড মার্কুইস জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জনের। ইনি দুই দফায় মোট প্রায় পাঁচ বছরকাল ভাইসরয় হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম দফায় ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এবং পরবর্তী সময়ে ১৯০৪ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। ইতিহাসে লর্ড কার্জন সবচেয়ে বিতর্কিত ভাইসরয় হিসেবে বর্ণিত হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশে বেশ কিছু জনহিতকর কাজের বাস্তবায়ন হয়েছিল। এ সবের মধ্যে কোলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি) এবং পুরাকীর্তি সংরক্ষণের জন্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ স্থাপন অন্যতম। পৃথকভাবে কৃষি বিভাগের সৃষ্টি এবং পুসা নামক স্থানে আধুনিক কৃষি গবেষণাগার স্থাপন তাঁর অমর কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের পর পুসার কৃষি গবেষণাগারটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। দেশীয় নৃপতিদের আন্তরিক সমর্থন আদায় এবং সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কার্জন ইম্পিরিয়াল সার্ভিস কোর-এর সৃষ্টি করেন। উপরন্ত তিনি প্রশাসন ব্যবস্থাকে নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে সচল করে তোলেন।

লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ইংরেজ স্বার্থে আফগান সমস্যার সমাধান হয় বলা যায়। তিনি ডুরন্তে লাইন-এর স্বীকৃতি আদায় করা ছাড়াও একটি স্থায়ী সমঝোতার লক্ষ্যে পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে হাজরা জেলাকে আলাদা করে পৃথক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন করেন এবং জির্গাশাসিত উপজাতীয় এলাকাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেন। এ সময় কার্জন সীমান্ত প্রদেশকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে রাখার নির্দেশ দান করেন। ইংল্যান্ডে নতুন সম্রাট হিসেবে ১৯০৩ সালে যখন সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, তখন এই উপলক্ষে দিল্লীতে আয়োজিত দরবারের সভাপতিত্ব করেন উদারপন্থী গ্ল্যাডস্টোনের ভাবশিষ্য এই লর্ড কার্জন।

এরপর থেকে কার্জন-এর কর্মকাণ্ড বিতর্কিত হতে শুরু করে। ভারতে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর চূড়ান্ত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর তিব্বত অভিযান ঈপ্সিত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। এ সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান অবস্থা তদন্তের লক্ষ্যে কার্জনের নির্দেশে গঠিত কমিটি কতিপয় সুপারিশ করলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট জারি করা হয়। এই অ্যাক্টের ফলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

ফ্যাকাল্টি সৃষ্টি ছাড়াও আবাসিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। উপরন্তু, আলোচ্য অ্যাক্টের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-নির্ধারণী সংস্থায় সরকারি মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয়। ফলে অনতিবিলম্বে প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। ঠিক এমনি এক উত্তপ্ত পরিবেশে প্রশাসনিক কাজের সুবিধা এবং অনুন্নত এলাকায় সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঘোষিত হলো 'বঙ্গভঙ্গ'। সেতো আর এক সুদূরপ্রসারী চাঞ্চল্যকর ও অর্থবহ ইতিহাস। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট সম্পূরক সম্প্রদায় কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের 'আব্দার-অভিমান-আবেদনের” যুগের পরিসমাপ্তি হলো।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ লর্ড রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে ইংরেজরা ১৯০ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এই সময়কালে বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনার মধ্যে যে দু'টি বিষয়ের ইতিহাসকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী হিসেবে চিহ্নিত করা নিতান্ত অপরিহার্য বলে মনে হয়, খুবই দুঃখজনকভাবে সে দু'টি বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা হয় অত্যন্ত সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন, না হয় বিকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে ইংরেজ বিরোধী অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয়টি বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১)। ইংরেজ-বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও প্রাসঙ্গিকতার কারণে সংক্ষেপে এসবের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে হয় :

১. সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ : ১৭৬৩-১৮০০ খ্রি.
২. মেদিনীপুরের কৃষক বিদ্রোহ : ১৭৬৬-১৭৮৩ খ্রি.
৩. ত্রিপুরায় শমসের গাজীর বিদ্রোহ : ১৭৬৭-১৭৬৮ খ্রি.
৪. সন্দীপের কৃষক বিদ্রোহ : ১৭৬৯ খ্রি.
৫. কৃষক তন্তুবায়দের আন্দোলন : ১৭৭০-১৭৮০ খ্রি.
৬. পার্বত্য চট্টগ্রামে রামু খাঁর বিদ্রোহ : ১৭৭৬-১৭৮৭ খ্রি.
৭. নীলচাষিদের প্রথম বিদ্রোহ : ১৭৭৮-১৮০০ খ্রি.
৮. রেশমচাষিদের সংগ্রাম : ১৭৮০-১৮০০ খ্রি.
৯. রংপুরে নূরুলউদ্দিনের বিদ্রোহ : ১৭৮৩ খ্রি.
১০. যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ : ১৭৮৪-১৭৯৬ খ্রি.
১১. বীরভূম-বাঁকুড়ার বিদ্রোহ : ১৭৮৯-১৭৯১ খ্রি.
১২. বাখরগঞ্জে বোলাকি শা'র বিদ্রোহ : ১৭৯২ খ্রি.
১৩. বীরভূম-বাঁকুড়ার ২য় বিদ্রোহ : ১৭৯৮-১৭৯৯ খ্রি.
১৪. করম শা'-র নেতৃত্বে 'পাগলপন্থী' আন্দোলন : ১৭৭৫-১৮০২ খ্রি.
১৫. মেদিনীপুরে নায়েক বিদ্রোহ : ১৮০৬-১৮১৬ খ্রি.
১৬. ময়মনসিংহে হাতিখেদা বিদ্রোহ : ১৮১২ খ্রি.
১৭. সন্দীপের কৃষক বিদ্রোহ : ১৮১৯ খ্রি.
১৮. ময়মনসিংহে হাতিখেদা বিদ্রোহ : ১৮০০-১৮৩০ খ্রি.
১৯. ময়মনসিংহে 'পাগলপন্থী'দের বিদ্রোহ : ১৮২৫-১৮২৭ খ্রি.
২০. নীল চাষিদের সংগ্রাম : ১৮৩০-১৮৪৮ খ্রি.

২১. তীতুমীর-এর বিদ্রোহ : ১৮৩১ খ্রি.
২২. 'পাগলপন্থীদের' ৩য় বিদ্রোহ : ১৮৩২-১৮৩৩ খ্রি.
২৩. গারোদের বিদ্রোহ : ১৮৩৭-১৮৮২ খ্রি.
২৪. ফরিদপুরে ফারাজিদের অভ্যুত্থান : ১৮৩৮-১৮৪৮ খ্রি.
২৫. ত্রিপুরায় কৃষক বিদ্রোহ : ১৮৪৪-১৮৯০ খ্রি.
২৬. মহাজনদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ : ১৮৫৫-১৮৫৭ খ্রি.
২৭. সিপাহী বিপ্লব : ১৮৫৭ খ্রি.
২৮. নীল বিদ্রোহ : ১৮৫৯ - ৬১ খ্রি.
২৯. সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ : ১৮৭২-১৮৭৩ খ্রি.
৩০. যশোরে নীল বিদ্রোহ : ১৮৮৯ খ্রি.

বঙ্গীয় এলাকায় অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজশক্তি এবং জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে একের পর এক যে রক্তক্ষয়ী কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে সে-সবের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়নি বললেই চলে। কৃষক বিদ্রোহের যেটুকু ইতিহাস আমরা দেখতে পাই তার প্রায় সবটাই বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এদের সমর্থক গোষ্ঠী সে আমলের ইংরেজি শিক্ষিত কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লেখকগণও বিকৃতভাবে কৃষক বিদ্রোহগুলো চিত্রিত করেছেন। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে এবং ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর "একান্ত বাধ্য" হিসেবে নিজেদের ভূমিকা প্রমাণ করার উদগ্র বাসনায় প্রকাশ্যেই আলোচ্য প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে। এতগুলো বছর পরে ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গবেষক সুপ্রকাশ রায় এ সম্পর্কে সত্যভাষণ করেছেন, তিনি লিখেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীতেই যখন বিহার ও বঙ্গদেশের উপর দিয়া কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গণসংগ্রামের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের শাসনকে "ভগবানের আশীর্বাদ' রূপে বরণ করিয়া ইংরেজি শিক্ষা দানের ভিত্তিতে নিজেদের নতুনভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সভ্যশ্রেণীরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বপ্রথম সাহিত্যের প্রয়োজন। সুতরাং নতুন সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন এই সাহিত্যসৃষ্টি কার্যের প্রধান নায়ক এবং তাঁহার সৃষ্টি সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মধ্যশ্রেণীর এই "রিনাসাস" পূর্ণ বিকশিত রূপ গ্রহণ করিল।

"উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে মাত্র দুইখানি নাটক ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে তৎকালের বঙ্গদেশ ও বিহারব্যাপী কৃষক বিদ্রোহের কোনো ছায়ামাত্র নাই, আছে কেবল বিকৃতি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' নামে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিয়া কৃষক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যেন ভারতে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল। কৃষক বিদ্রোহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এইভাবে বিকৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজ শ্রেণীর চরিত্র ও চিন্তাধারাই উদঘাটিত করিয়াছেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশার এবং এদেশে ইংরেজ প্রভুদের শোষণ-উৎপীড়নের চিত্র উদঘাটন করিয়া রচিত কোনো সাহিত্যও সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষকদের কোনো সংগ্রামের চিত্র অঙ্কিত করেন নাই, কেবল ইংরেজ প্রভুদের শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষকের চরম দুর্দশার চিত্রই অঙ্কিত

করিয়াছেন। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্ট'-এর নাম করিয়া ইহার উপরও আক্রমণ করিতে ইতস্তত করেন নাই। মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক কৃষকবিদ্রোহ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই।"

(ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ : সুপ্রকাশ রায়, কলিকাতা)

উপরন্তু প্রকৃত ইতিহাস সন্ধান করলে আরও দেখতে পাওয়া যায় যে, ১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের দাবানলে যখন সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতীয় জনগোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরী কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের বাগান বাড়িতে নাটক কিংবা নৃত্যগীত উপভোগ করেছিল, না হয় প্রকাশ্যেই ইংরেজ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনায় মেতে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে বর্ণহিন্দু মনীষী হিসেবে স্বীকৃত কিশোরী চাঁদ মিত্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের বক্তব্য হচ্ছে, "সিপাহী বিদ্রোহ সিপাহীদের ব্যাপার এবং জনসাধারণের সঙ্গে ইহার কোনো সংশ্রব নেই।" বিখ্যাত কবি ঈশরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরীশংকর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' বিশিষ্ট পত্রিকাগুলোতে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত ভয়াবহ মন্তব্য ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখানেই শেষ নয়, ১৮৫৭ সালের ২৬শে মে তারিখে রাজা রাধাকান্ত দেব-এর সভাপতিত্বে 'হিন্দু মেট্রোপলিটান' কলেজে অনুষ্ঠিত "সম্ভ্রান্ত মহাশয়দের" সভায় প্রকাশ্যেই ইংরেজদের সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছিল।

স্কুল-কলেজে বিকৃত ইতিহাস পাঠ্য করা হয়েছে

এসবই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজরা ছাড়াও এদেশীয় ইতিহাস রচয়িতারা এসব ঘটনাবলী যত্নে এড়িয়ে গেছেন এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবকে কোনো জাতীয় অভ্যুত্থান কিংবা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন নাই। এরচেয়ে মর্মান্তিক ও দুঃখজনক আর কী হতে পারে। অবশ্য সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের ব্যতিক্রমধর্মী ও মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী গবেষক সুপ্রকাশ রায় ভারতের "কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' পুস্তকে এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা যথার্থই বলতে হয়। তিনি লিখেছেন :

"এই বিকৃত ইতিহাস আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে অবশ্য পাঠ্য। স্বদেশের ও স্বদেশীদের মিথ্যা পরিচয় লইয়া আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠে। আমাদের দেশের এই বিকৃতি রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া তিনিও এই বিকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি জনসাধারণকে শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন শ্রেণী সমন্বয়ের দৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁহার ধারণার জনসাধারণকেও বা তাহাদের কোনো পরিচয়ও ভারতবর্ষের কোনো লিখিত ইতিহাসে তিনি খুঁজিয়া পান নাই।"

এ প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার স্থপতি ভি, আই, লেনিন-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, "যেখানেই জনসাধারণ, সেখানেই রাজনীতির আরম্ভ, আর যেখানে কেবল কয়েক হাজার নয়—লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের বাস, সেখান হইতেই আরম্ভ হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি।"

এই কথাগুলো স্মরণ রেখে এক্ষণে ইংরেজ আমলের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১১) সম্পর্কে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা অপরিহার্য মনে হয়। এখানে আরও

উল্লেখ করতে হয় যে, ভি. আই লেনিন সগর্বে যে আপামর জনসাধারণের কথা বলেছেন, ইংরেজ আমলে বঙ্গীয় এলাকায় সেই জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে বঞ্চিত ও অবহেলিত বাঙালি মুসলমান এবং অবশিষ্টরা নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়।

পাঠকবৃন্দ এখন আমরা উপমহাদেশ তথা বঙ্গীয় এলাকার ইতিহাসের এক ভয়াবহ পরিচ্ছদ-এর আলোচনায় নিমগ্ন হতে চলেছি। সঠিকভাবে এই পরিচ্ছদ-এর সারবত্তা অনুধাবন করতে হলে পরিচ্ছন্ন মন, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আর উদার হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। ইতিহাসের এই পরিচ্ছদই হচ্ছে সবচেয়ে বিতর্কিত বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১)। এই সময়কালের কেন্দ্রস্থলে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত গলিত লাভা এবং চারদিক প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। এই বহ্নিশিখায় লর্ড কার্জনের মতো জাঁদরেল ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের ভবিষ্যৎ ভস্মীভূত হয়েছে আর ঢাকার সন্তান নবাব সলিমুল্লাহ মনঃকষ্টে মৃত্যু বরণ করেছেন। অন্যদিকে ইংরেজ ভারতে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য বিনষ্টের লক্ষ্যে ১৫৪ বছর পর রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বাঙালি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কৈশোর অতিক্রম 'মুসলিম লীগ' নামীয় একটি রাজনৈতিক প্লাটফরমের সুবিধায় গোষ্ঠীস্বার্থে সোচ্চার হতে শুরু করেছে। সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে কোন গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত লাভবান হলো সেটাই বিচার্য বিষয়।

তাহলে এক্ষেত্রে বিতর্কিত 'বঙ্গভঙ্গ' সম্পর্কে আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার প্রাক্কালে এর ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে হয়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন কোলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির এলাকা ছিল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গমাইল (সূত্র এম কে ইউ মোল্লা: নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম : পৃঃ ১৫) অর্থাৎ আসাম, পূর্ব বাংলা, পশ্চিম বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার এবং ছোট নাগপুর এলাকা এই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর আসামকে পৃথক করে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য এই চিফ কমিশনারও কার্যত বেঙ্গল-এর লেঃ গভর্নরের অধীনে ছিলেন এবং আসামের জন্য কোনো আলাদা সার্ভিস করা হয়নি। এ সময় আসামের ৪১,৭৯৮ বর্গমাইল এলাকা পৃথক করা সত্ত্বেও বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ। বঙ্গভঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসের শুরুটা এখান থেকেই।

প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের জারিকৃত নোটিশের যেটুকু এলাকা পৃথক করে আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল, তার মধ্যে সিলেট জেলার কোনো উল্লেখ ছিল না। পূর্বেই বলেছি যে, উক্ত বছরের শেষার্ধে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর অপর এক নোটিশে সিলেট জেলাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরন্তু ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ লুসাই হিলস এলাকাকে বেঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হয়। এ সময় লুসাই হিলস অঞ্চলে পার্বত্য উপজাতিগুলোর কর্মকাণ্ডে শান্তি ও শৃংখলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি হলে দ্রুত সামরিক এ্যাকশন গ্রহণের লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকদের এই ব্যবস্থা নিতে হয়। তথাপিও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বিরাট বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আয়তন দাঁড়িয়েছিল ১,৮৯,০০০ (এক লক্ষ উননব্বই হাজার) বর্গ মাইলের মতো (ম্যাপ দ্রষ্টব্য)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে যখন বর্মা এবং আসামের চিফ কমিশানারদ্বয় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সামরিক অভিযানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লুসাই হিলসকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিল, তখনই এ মর্মে মত প্রকাশ করা হয়েছিল যে, অবিলম্বে চট্টগ্রাম জেলাকে আসাম প্রদেশের আওতায় দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু এ সময় চট্টগ্রামে "ভূমি সেটেলমেন্ট' এর কাজ চলছিল বলে বিষয়টি আপাতত ধামাচাপা পড়ে যায়।

প্রথম ১৯ বছরে কংগ্রেসের ৫ জন ইংরেজ সভাপতি

এ কথা আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের তৎকালীন চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড আসামের জন্য পৃথক সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন, ঠিক তখনই কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দুদের সমর্থক স্যার হেনরি কটন নয়া চিফ কমিশনার নিযুক্ত হয়ে তা বানচাল করে দেন। অবশ্য এর পুরস্কার হিসেবে স্যার হেনরি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইনিই হচ্ছেন কংগ্রেসের জন্মের পর প্রথম ১৯ বছরের পঞ্চম ইংরেজ সভাপতি। অন্যরা ছিলেন জর্জ ইউল (১৮৮৮ খ্রি.), স্যার ডব্লিউ ওয়েডারবর্নে (১৮৮৯ খ্রি.), পি চারলু (১৮৯১ খ্রি.) এবং আর এ সিয়নী (১৮৯৬ খ্রি.)। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, এককালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিন-এর পরামর্শক্রমে যে ইংরেজ প্রাক্তন আই সি এস এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্নে এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই ইংরেজ ভদ্রলোকই কিন্তু একনাগাড়ে ২৫ বছরকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৮৮৫-১৯১০ খ্রি.) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সে যাই-ই হোক না কেন বঙ্গ-বিভাগের চিন্তার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল এক্ষণে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা অপরিহার্য বলে মনে করি। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আসলে কিন্তু লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের চিন্তার উদগাতা ছিলেন না। যে ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারীর মাথায় সর্বপ্রথম এই বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল তাঁর নাম স্যার এ্যানড্রু হেন্ডারস ফ্রেসার (১৮৪৮-১৯১৯)। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেসার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একনাগাড়ে ২৭ বছর মধ্য প্রদেশে চাকরির পর ইনি কিছুদিন কলিকাতাস্থ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ছিলেন এবং একই বছর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মধ্য প্রদেশে চিফ কমিশনারের দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে হেন্ডারসন ফ্রেসার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের অধীনে বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির লেফটেনেন্ট গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন।

ভারতের বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিক 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র অন্যতম সহকারী সম্পাদক (১৯০৭-১৯২২) এবং পরবর্তী সময়ে প্রধান সম্পাদক ল্যোভাট ফ্রেসার তাঁর রচিত 'ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এ্যান্ড আফটার' গ্রন্থে এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্য প্রদেশের চিফ কমিশনার হিসেবে স্যার এ্যানড্রু ফ্রেসার সম্বলপুর জেলার কোর্টের ভাষা ওড়িয়ার পরিবর্তে হিন্দী করার অনুমতি চেয়ে গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে প্রসঙ্গত সুপারিশ করেছিলেন যে, প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। কিন্তু ভারত সরকারের তৎকালীন কৃষি সচিব বি ফুলার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব জে পি হেওয়েট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাবের

সরাসরি বিরোধিতা করে ফাইলে যথাক্রমে ১৯০২ সালের ২৩শে এবং ২৯শে জানুয়ারি স্বহস্তে নোট লিপিবদ্ধ করেন। (কার্জন কালেকশন : খণ্ড ২৪৭)। লোভাট ফ্রেসার আলোচ্য গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ফাইলটি নোট সহকারে গভর্নর জেনারেলের টেবিলে উপস্থাপিত হতে প্রায় ১৪ মাসের প্রয়োজন হওয়ায় লর্ড কার্জন কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ ভারতের বেরার অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হলে সব ক'টি ইংরেজ শাসিত প্রদেশের সীমানা পুনঃ নির্ধারণের লক্ষ্যে জরুরি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লেখক ও সাংবাদিক লোভাট ফ্রেসারের মতে, এই সম্মেলনে স্যার এ্যানড্রু ফ্রেসার প্রদেশগুলোর সীমানা পুনঃ নির্ধারণকালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করার পক্ষে সর্বপ্রথম যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।

অবস্থাদৃষ্টে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, লেঃ গভর্নর ফ্রেসার-এর লিখিত নোট এবং আলোচ্য সম্মেলনে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বক্তব্য গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের চিন্তাধারাকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করে। তিনি ১৯০২ সালের ২৪শে মে তারিখে লন্ডনে ভারত সচিব লর্ড জর্জ ফ্রান্সিস হ্যামিলটনের (১৮৪৫-১৯২৭) নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনে একটা পরিচ্ছন্ন অবয়বে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করেন।

১৯০৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে পৌরসভার সংখ্যা ছিল ১৫৮

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কোলকাতাস্থ সচিবালয় ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় অবস্থানকারী সরকারি কর্মচারীদের উপর এ সময় কী পরিমাণ কাজের চাপ ছিল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সমীচীন মনে হয়। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম' গ্রন্থে গবেষক ডঃ এম কে ইউ মোল্লা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র উল্লেখপূর্বক এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, এ সময় বাংলার লেঃ গভর্নর-এর কাজের দায়িত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, শুধু ১৯০২ সালেই কোলকাতাস্থ রাইটার্স বিল্ডিং-এর সচিবালয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক চিঠিপত্র রিসিভ এবং ইস্যু করার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১,৫৩,০১২টি (এক লক্ষ তিপান্ন হাজার বারো)। ১৯০৫ সালে যখন ইংরেজশাসিত মাদ্রাজ প্রদেশে ৬১ টি পৌরসভা ছিল, তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে পৌরসভার সংখ্যা হচ্ছে ১৫৮টি। উপরন্তু এ সময় নানা সমস্যায় জর্জরিত ও ক্রমবর্ধমান কোলকাতা নগরীর (সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী) লোকসংখ্যা ১১ লাখ পেরিয়ে গেছে। যথেষ্ট পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা না থাকায় কোলকাতাসহ ১৫৮টি পৌরসভার সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্বও বেঙ্গলের লেঃ গভর্নর-এর উপরেই অর্পিত ছিল। এছাড়া এই লেঃ গভর্নর বছরে যে ক'দিন কোলকাতায় অবস্থান করতেন, সেই দিন ক'টি অফিসের শতশত ফাইল দেখে সিদ্ধান্ত প্রদান ছাড়াও বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎদান এবং বহু সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতো। এলাকার বিরাটত্ব ছাড়াও এসময় (১৯০৩ খ্রি.) ইংরেজশাসিত ৩টি বড় প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যাও ছিল অত্যধিক। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের লক্ষ্যে প্রদেশ ৩টির লোকসংখ্যা প্রদত্ত হলো :

মাদ্রাজ : সাড়ে ৪২ মিলিয়ন ইউপি : সাড়ে ৪৮ মিলিয়ন বেঙ্গল : সাড়ে ৭৮ মিলিয়ন এ ধরনের চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মধ্য প্রদেশের চিফ

কমিশনার হিসেবে স্যার এ্যান্ড্রু ফ্রেসার ১৯০১ সালে কোলকাতায় প্রেরিত এক চিঠিতে প্রসঙ্গত বঙ্গবিভাগের যে সুপারিশ সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছিলেন এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন ১৯০২ সালের ২৪শে মে তারিখে লন্ডনে ভারত সচিব লর্ড হ্যামিলটনের কাছে প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্বক যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন তারই জের ধরে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিসলে ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল, মাদ্রাজ এবং বোম্বের প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে সেই বিখ্যাত পত্র নং-৩৬৭৮ পাঠালেন। এই পত্রেই ইংরেজ শাসিত প্রদেশগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা বলা হলো। আলোচ্য পত্রে সামগ্রিক বিষয়ের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা ছাড়াও প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের চিত্রও উপস্থাপিত করা হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিসলের স্বাক্ষরিত এই পত্রে সে আমলের চমৎকার তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, এক্ষণে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যখন বেঙ্গলের লেঃ গভর্নর প্রায় সমস্ত বছর ধরে সফর করলেও নিজের এলাকার একাংশের বেশি পরিদর্শনে সক্ষম হবেন না। বেঙ্গলের লেঃ গভর্নর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও পাঁচ বছর মেয়াদী সময়কালের মধ্যে তাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম, ঢাকা, কটক, রাঁচী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একবারের বেশি সফর অসম্ভব বলা যায়। পত্রে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয় সেগুলো হচ্ছে :

(ক) মাদ্রাজের ওড়িষ্যা-ভাষী এলাকা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

(খ) ছোট-নাগপুরের বিরাট অংশ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

(গ) চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা সাড়ে ৭৮ মিলিয়ন থেকে সাড়ে ৬০ মিলিয়নে হ্রাস পাবে এবং বেঙ্গলের ২৪,৮৮৪ বর্গমাইল এলাকা আসাম প্রদেশের আওতাভুক্ত হবে। উপরন্তু প্রায় ৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যা সম্বলিত সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশ চট্টগ্রামের মতো একটি বন্দরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং আসামের প্রশাসনের জন্য একটি পৃথক সার্ভিস চালু করা সম্ভব হবে।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কিন্তু বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকরী করার আগেই কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু জমিদার, বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আঁচ করতে পেরেছিল। পশ্চিম বঙ্গের গবেষক সুমিত সরকার ১৯৭৩ সালে 'দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-১৯০৮)' নামক তাঁর রচিত গ্রন্থে এ সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে আমলে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে কোলকাতার বর্ণহিন্দুদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"বিক্রমপুরের 'বাবুগণ' এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে অধঃস্তন সরকারি চাকুরিতে তাঁদের এতদিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হলো, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু'পারেই যেসব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে তাঁদের দু'সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগ করতে হবে, ভাগ্যকুলের রায়েরা—কোলকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাঁদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা—ভীত হয়েছে এজন্য যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্যপথ খোলা হবে; কোলকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয় শেষ পর্যন্ত কোলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ার অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে;

চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন; আর কংগ্রেস রাজনীতিতে কোলকাতা এবং বাংলার (বর্ণহিন্দুদের) ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকিল্পত আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে অদ্যাবধি দেশ-বিদেশের গবেষক ও ইতিহাসবিদরা যত মূল্যবান প্রতিবেদন ও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, তাঁরা কিন্তু একটা কথা এক বাক্যে সবাই স্বীকার করেছেন যে, সে আমলে ১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি আতংকগ্রস্ত হয়েছিল, কোলকাতায় বসবাসকারী পূর্ব বঙ্গীয় বর্ণহিন্দু জমিদার গোষ্ঠী। যদিও এঁরা আদতে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর পদলেহী ছিলেন, তবুও নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে একমাত্র বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটি এঁরা মেনে নিতে পারেনি। গবেষক ড: সুমিত সরকারের মতে এ সময় কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী বাংলার লে: গভর্নর স্যার এ্যান্ড্রু হেন্ডারসন লিথ্ ফ্রেসার-এর (১৮৪৮-১৯১৯) সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। তখন বঙ্গভঙ্গের ফলে তাঁর জমিদারির একাংশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এবং অপর অংশ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। নন্দী মহাশয়ের কণ্ঠে তীব্র অভিমানের সুর। তিনি বলেছেন, "আমার জমিদারির একাংশের জন্য যদি লে: গভর্নর এবং রাজস্ব দপ্তর ঢাকায় স্থিত থাকে, তাহলে সেখানে আমাকে একদল মুহুরি রাখতে হবে, আবার কলকাতায়ও রাখতে হবে।" (দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল পৃ: ৪২, ১৯৭৩)।

এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার মার্কসীয় গবেষক এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ড: অরবিন্দ পোদ্দার-এর (জন্ম ৩রা নভেম্বর ১৯২০) মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গতি ও শক্তি সঞ্চার করে। ...জমিদার শ্রেণী—যাদের পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারি ছিল—এই ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তাঁরা এ পর্যন্ত যেভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাংলা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা! কারণ, আসামের সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ব বাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত।...অন্যান্য চিন্তার সঙ্গে এইসব ভাবনা যুক্ত হয়ে কোনো কোনো জমিদারকে, বিশেষ করে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীকে, স্বদেশী আন্দোলনে অন্তত কিছু সময়ের জন্য অগ্রচারীর ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করে। জনশ্রুতি যে, তাঁরা বিপ্লবীদেরও অর্থ সাহায্য করতেন।"

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জমিদারদের চাঁদার তালিকা

১৯০৬ সালের বেঙ্গল পুলিশ রিপোর্ট-এ দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য নিম্নোক্ত জমিদাররা বিপুল অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। এঁরা হচ্ছেন :

১.	মহারাজা সূর্যকান্ত	১০ হাজার টাকা
২.	মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী	৫ হাজার টাকা

৩.	মহারাজা টি পালিত	৫ হাজার টাকা
৪.	মহারাজা জানকী রায়	৫ হাজার টাকা
৫.	গজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫ হাজার টাকা
৬.	সন্তোষ ব্রাদার্স	৩ হাজার টাকা
৭.	দিঘাপাতিয়ার মহারাজা	২$\frac{১}{২}$ হাজার টাকা
৮.	সোবহান চৌধুরী	এক হাজার টাকা
৯.	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	এক হাজার টাকা
১০.	নাটোরের মহারাজা	এক হাজার টাকা

গবেষক ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার আরও লিখেছেন, "তার উপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাকুরির সম্ভাবনা ও পরিধি সঙ্কুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশংকায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশংকা আদৌ অমূলক ছিল না। কারণ আইন ব্যবসায় সরকারি চাকুরি, শিক্ষাক্ষেত্রে ইত্যাদি ইতিমধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে দ্রব্যমূল্য ছিল অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির পথে। সুতরাং বেকারির ভয় বাস্তব।" (রবীন্দ্রনাথ —রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃঃ ১২১-১২৩। প্রকাশক উচ্চারণ, কোলকাতা ১৯৮২)।

এখানে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নবর্ণিত তারিখ ক'টি স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। তারিখ ক'টি হচ্ছে :

ক. বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রচার : ৫ই জুলাই, ১৯০৫।
খ. বঙ্গভঙ্গের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০৫।
গ. আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ : ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫।

বাস্তবে কিন্তু ১৯০২ সাল থেকেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে প্রকাশ্যেই কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল এবং এতদসম্পর্কিত প্রস্তুতি গ্রহণের তথ্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল।

ফলে আলোচ্য সময়ে একদিকে যেমন গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ সফর করে উন্নত ধরনের প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বক্তৃতা করেছিলেন; অন্যদিকে তেমনি কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ আর পূর্ববঙ্গীয় জমিদারগোষ্ঠী ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে লিপ্ত হয়। ১৯০৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন ঢাকায় আয়োজিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে বললেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হলে জনসাধারণ ব্যাপক সুবিধা অর্জন করবে। কেননা প্রশাসনের নিকটবর্তী হয়ে জনসাধারণ নিশ্চিতভাবে লাভবান হবে। নয়া প্রদেশের জন্য একজন পৃথক লেঃ গভর্নর ছাড়াও আলাদা ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজস্ব কর্তৃত্ব গঠিত হবে। ঢাকায় অবস্থানকালে লর্ড কার্জনের সঙ্গে নবাব-সলিমুল্লাহর এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পর নবাব সলিমুল্লাহ প্রকাশ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

এর দুইদিন পরে ১৯০৫ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন ময়মনসিংহের জনসভায় বললেন, "আমি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এ মর্মে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনাদের এলাকায় একটি উন্নত ধরনের সরকারি প্রশাসন চালু করাই হচ্ছে এর (বঙ্গভঙ্গের) একমাত্র

উদ্দেশ্য। বাংলা তথা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য এই ব্যবস্থা হবে সবচেয়ে মঙ্গলজনক।" ('স্পিচেস্ বাই কার্জন' ভল্যুম-৩ পৃ: ২৮৪)।

এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করতে হয় যে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গের লক্ষ্যে লর্ড কার্জন আনুষ্ঠানিকভাবে যে প্রস্তাব লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন, তাতে কিন্তু পূর্ব বঙ্গ ও আসামকে নিয়ে প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম ছিল "উত্তর-পূর্ব-প্রদেশ।" লন্ডনে ব্রিটিশ সরকার কার্জনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেও নয়া প্রদেশের নামকরণ অনুমোদন করেনি। তৎকালীন ভারত সচিব ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভের পর এতদসম্পর্কিত যে অফিসিয়াল তারবার্তা গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে পাঠিয়েছিল, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে উক্ত তারবার্তায় বলা হয়, "একটি বিষয়ে আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, নয়া প্রদেশের নামকরণে, "আসাম" শব্দ না থাকলে আসামের চা শিল্পে লিপ্ত প্রতিনিধিরা যথার্থভাবেই আপত্তি উত্থাপন করবে। কেননা বাজারে ভারতীয় যেসব চা বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে 'আসাম চা' হচ্ছে এক নম্বরে। সুতরাং নয়া প্রদেশ গঠনকালে "আসাম" নামটির বিলুপ্তি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। এই প্রেক্ষিতে আমার ধারণায় নয়া প্রদেশের নাম "পূর্ববঙ্গ ও আসাম' হওয়া যথাযথ হবে। (কার্জন কালেকশন, ভল্যুম ১৭৫)

এ ধরনের এক চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ আর পূর্ববঙ্গের জমিদারদের তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ উপেক্ষা করে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'এর সৃষ্টি হলো। নয়া গভর্নর হলেন আসামের কমিশনার স্যার জোসেফ ব্যাম্পফিলডার ফুলার (১৮৫৪-১৯৩৫) এবং রাজধানী স্থাপিত হলো ঢাকা শহরে। এক্ষণে অবিভক্ত বাংলার যে ১৪টি জেলা ও ২টি দেশীয় রাজ্য নয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হলো তা হচ্ছে : ' ১. চট্টগ্রাম, ২. নোয়াখালী, ৩. বাকেরগঞ্জ, ৪. ফরিদপুর, ৫. ত্রিপুরা, ৬. ঢাকা, ৭. ময়মনসিংহ, ৮. পাবনা, ৯. বগুড়া, ১০. রাজশাহী, ১১.মালদহ, ১২. দিনাজপুর, ১৩. রংপুর, ১৪. জলপাইগুড়ি, ১৫. কুচবিহার, ১৬. পার্বত্য ত্রিপুরা।

এখানে লক্ষণীয় যে, ১৯০৫ সালে নয়া প্রদেশের সঙ্গে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সীমান্তবর্তী জেলাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে বরিশাল, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি। অর্থাৎ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে বাকেরগঞ্জ জেলার পশ্চিম সীমা বরাবর মধুমতি নদী দিয়ে উত্তরে গঙ্গা নদীর সংযোগ দিয়ে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত এবং এরপর মালদহ, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির পশ্চিম সীমানা দিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে ভুটান পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, মালদহ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের সীমানা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে কোনো হিন্দী ভাষাভাষী এলাকা নয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত না হয় (ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। ফলে চা ও পাট ছাড়াও বন ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী এই নয়া প্রদেশের আয়তন হলো ১,০৬,৫৪০ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা দাঁড়ালো তিন কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে এক কোটি ১৮ লাখ মুসলমান, এক কোটি ১২ লাখ হিন্দু আর অবশিষ্টরা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মীয়।

১,৪১,০০০ বর্গমাইল এলাকা পেয়েও ওরা সন্তুষ্ট হলো না

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়া সম্পর্কিত ইতিহাসটুকু যত সহজে বর্ণনা করলাম, আসলে কিন্তু মোটেই ততটা সহজ নয়। দেড় শতাধিক বছর ধরে যে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীরা ইংরেজ শাসকদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করে উপমহাদেশে সর্বাগ্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে একটা পরিপক্ক সম্পূরক

শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছিল, তারা কিন্তু স্বীয় স্বার্থে সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে প্রাক্তন আই সি এস এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন, "গোপনে এই (বঙ্গভঙ্গের) চিন্তার সূত্রপাত, গোপনে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে আর গোপনেই এর চূড়ান্তকরণ হয়েছে।" কংগ্রেসের এককালীন সভাপতি ময়নমসিংহের সন্তান আনন্দ মোহন বসু প্রকাশ্যেই বঙ্গভঙ্গ বানচালের শপথ ঘোষণা করলেন।

এ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন নিতান্ত অপরিহার্য মনে হয়। নচেৎ সামগ্রিক বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর শুরুতে ১৯৮৩ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাংলাভাষায় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত এবং প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর রচিত আধুনিক ভারত (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সমীচীন মনে হয়। প্রণব বাবু লিখেছেন, "...বাঙালি জাতির (বর্ণহিন্দু) মনে তীব্র ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশ পেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র আন্দোলন প্রসার লাভ করল। ৬ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভুপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে "এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়" বলে মন্তব্য করা হয়। 'হিতবাদী' পত্রিকা লিখল যে, "গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতি (বর্ণহিন্দু) এই রকম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়নি।

অথচ পূর্ববঙ্গ আসামের সঙ্গে যুক্ত হবার পরও তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন হচ্ছে এক লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল আর লোক সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। উপরন্তু ইংরেজ ভারতের রাজধানী তখনও কোলকাতাতেই। কিন্তু কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বিত্তশালী জমিদার এবং বুদ্ধিজীবীরা এরপরেও সন্তুষ্ট ছিল না।

১৯০৫ সালের প্রথমার্ধে ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী যখন মূলত প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিল তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালী সম্প্রদায় ছাড়াও কোলকাতায় বসবাসকারী পূর্ব বঙ্গের বর্ণহিন্দু জমিদার গোষ্ঠী কীভাবে এর বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল, আলোচনার সুবিধার্থে তার আরও কিছু তথ্য এখানে উপস্থাপন সমীচীন মনে হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, "১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ প্রকাশ্য সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং প্রতিটি সভায় অন্ততঃপক্ষে ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকতেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ছাত্র সমাজের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য" (প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত 'আধুনিক ভারত-পৃ: ৮৯: কোলকাতা)। তবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে দু'ধরনের চিন্তার অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল। এর প্রথমটি হচ্ছে রাজনৈতিক চিন্তধারা। সে আমলে এই চিন্তার বহিঃপ্রকাশকে বলা হতো "স্বদেশী"। আর দ্বিতীয়টি এদেশীয় উঠতি পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিলাতী পণ্য বর্জন। আন্দোলনের এই অংশের নামকরণ হয়েছিল "বয়কট"।

এ সময় 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলনকে আরও উগ্র করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যিনি 'স্বদেশী' কর্মসূচির সঙ্গে বিলাতী পণ্য বর্জন অর্থাৎ 'বয়কট' কর্মসূচির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক। তাঁর পুরা নাম কৃষ্ণকুমার মিত্র। ১৯০৫ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'

পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জোরালো ভাষায় এই প্রথমবারের মতো "বয়কট" পরিকল্পনার কথা প্রচার করা হয়। অবিভক্ত বাংলায় বিশেষ করে কোলকাতায় বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে "বয়কট" আদর্শের তাৎক্ষণিক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ফলে প্রাক্তন আইসিএস সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি থেকে শুরু করে মতিলাল ঘোষ, (অমৃতবাজার পত্রিকা), আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালী প্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ প্রমুখ বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব এই আদর্শ প্রচারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এরই প্রেক্ষিতে মাত্র ৪ দিনের ব্যবধানে ১৯০৫ সালের ১৭ই জুলাই বাগেরহাটে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সর্বপ্রথম বিলাতী পণ্য বর্জন সম্পর্কিত "বয়কট" প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, "যতদিন পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হবে, ততদিন ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রী বর্জন করা হোক।" দ্বিতীয় প্রস্তাবে এ মর্মে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানানো হয় যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে পরবর্তী ছ' মাসের জন্য সমস্ত রকমের আনন্দানুষ্ঠান এবং উৎসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ বন্ধ করা হোক।

কোলকাতার রিপন কলেজে এ সময় দু'দিনব্যাপী (১৭ই ও ১৮ই জুলাই) ছাত্র-সমাবেশে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। উত্তেজিত অবস্থায় বক্তারা এই প্রথম ব্রিটিশ পণ্য পোড়াবার কথাও উচ্চারণ করলেন। এই ছাত্র সমাবেশই একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দিনাজপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজা নাথ(?)। এই সভায় গৃহীত অতিরিক্ত ২টি প্রস্তাবে বলা হয় যে, আগামী এক বছরকাল জাতীয় শোক পালিত হবে এবং জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সমস্ত সদস্য পদত্যাগ করবেন।

এ সময় মফঃস্বল এলাকায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল, সে সম্পর্কে গবেষক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "তবে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, কলকাতা যখন তপ্ত বাক্য উচ্চারণে ছিল নিবিষ্ট, মফঃস্বল বাংলায় তখন সৃষ্টি হচ্ছিল ইতিহাস। সেখানে, যেমন বরিশালে, কার্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়, আয়োজন হয়; শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অযুতকণ্ঠে যুদ্ধ মন্ত্রের মতো 'বন্দেমাতরম', বিভক্ত বাংলা পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পও গ্রহণ করা হয়।" (রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব পৃঃ ১২৫ : উচ্চারণ, কোলকাতা)

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসপন্থী গবেষক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনী কুমার (১৮৫৬-১৯২৩) এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর জনপ্রিয়তার ফলে এই আন্দোলন বরিশাল জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত) যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছিল সমস্ত বাংলায় আর কোথাও সেই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তার প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশ বান্ধব সমিতি" ১৫৯ শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সংঘটিত করে। অশ্বিনীকুমারের প্রচেষ্টায় বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন গণভিত্তিক সংগ্রামে পরিণত হয় এবং বরিশাল জেলা স্বদেশী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়।"

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বরিশাল এলাকায় অশ্বিনীকুমার দত্তের ভূমিকার বর্ণনাদানকালে সংক্ষেপে হলেও চারণ কবি মুকুন্দ দাস-এর কর্মকাণ্ডের উপস্থাপনা অপরিহার্য

মনে হয়। তবে প্রথমেই ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নং এ্যাক্ট অর্থাৎ পঞ্চ নাটক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইনের ১২ নং অনুচ্ছেদের কথা বলতে হয়। এই অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :

(১২) যে কোনো যাত্রাভিনয় অথবা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে যাত্রাভিনয়ের অনুরূপ অনুষ্ঠানের উপর অত্র এ্যাক্ট প্রযোজ্য হবে না।

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের কর্মকাণ্ড

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে এ কথা বলতে হয় যে, আলোচ্য এ্যাক্টের এই অনুচ্ছেদে যাত্রাভিনয়ের জন্য যে রেয়াতের সুবিধা ছিল, তারই ফলে মুকুন্দ দাসের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। এর পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে এবং ডাকনাম 'যজ্ঞা'। 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলনের সময় মুকুন্দ দাস প্রায়ই অশ্বিনীকুমার দত্তের সফরসঙ্গী ছিলেন এবং 'স্বদেশী যাত্রার' প্রবর্তক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সনাতন হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি কোলকাতার বসুমতি সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলীতে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বরিশালের উপকণ্ঠে কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁর সকল স্বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 'আনন্দময়ী আশ্রম।'...'মাতৃপূজা' তাহার প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয়?' তাঁর অন্যান্য যে সব পালা এ সময় বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল 'সেগুলো হচ্ছে, ব্রহ্মচারিণী', 'কমলোত্র,' 'পথ', 'সমাজ', 'সাথী' প্রভৃতি। প্রতিটি পালার মধ্যে মুকুন্দ দাসের ব্যবহৃত গানগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে গানটির জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'মাতৃপূজা' যাত্রাভিনয় বেআইনী ঘোষণা করে মুকুন্দ দাসকে অভিযুক্ত করেছিল তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

"মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল,
সাহেবী চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দে মাতরম বাজাও ডঙ্কা,
জাগুক ভাই সকলে
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ
প্রেমময়ী প্রেম সলিলে।"

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে আরও যেসব যাত্রাওয়ালা পালা রচনা করেছিলেন তাঁরা সবাই 'বন্দে মাতরম'-এর জয়গান করা ছাড়াও কট্টর দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রশস্তির লক্ষ্যে হিন্দু বীর পূজায় লিপ্ত হয়েছিলেন। এসব পালাগুলোর নামকরণ থেকেই লেখকদের মনমানসিকতা অনুধাবন করা সম্ভব। এর মধ্যে মথুর সাহার "পদ্মিনী" ও "ভরতপুরের দুর্গাজয়", ভূষণ দাসের "মাতৃপূজা", শশী অধিকারীর "প্রতাপাদিত্য", ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "রামলীলাবসান", "মণিপুরের গৌরব" ও "মনোজয়ের মহামুক্তি" এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের "রণজিত রাজার জীবন যজ্ঞ" প্রভৃতি অন্যতম।

সমসাময়িককালে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের রচিত নাটকের বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বেই করেছি। তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য এদের চিন্তারাজ্যের হদিস পাওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে অভিনীত নাটকগুলোর গুটিকয়েকের উল্লেখ এখানে সমীচীন মনে হয়।

১৯০২ সাল : নলদময়ন্তী, বিল্বমঙ্গল, অবতার, অর্জুন বিদায়, বিজয় বসন্ত, শিবাজী, রিজিয়া, রাধারাণী, প্রফুল্ল, হারানিধি, ভ্রমর, নন্দ বিদায় এবং লাট গৌরাঙ্গ।

১৯০৩ সাল : সীতার বনবাস, ফণার মণি, অভিমন্যু বধ, রত্নবালা তরুবালা, কপালকুণ্ডলা, সীতাহরণ ও তাজ্জব ব্যাপার, জনা, কৃষ্ণকুমারী, নুরনীহার, প্রতাপাদিত্য, মেবার পতন, রঘুবীর, আলিবাবা, আনন্দমঠ, তারাবাঈ এবং বিল্বমঙ্গল।

১৯০৪ সাল : বৃন্দাবন বিলাস, জাহানারা, সংসার, সৎ নাম, শ্রী রাধা, বিক্রমাদিত্য নন্দ বিদায়, লক্ষণ বর্জন, রতনগিরি, চোখের বালি এবং প্রেমের পাথর।

১৯০৫ সাল : হরগৌরী, বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, অদৃষ্ট, শিবরাত্রি, হরিরাজ, শ্রীকৃষ্ণ, পৃথ্বীরাজ, রানা প্রতাপ, বাপ্পারাও, প্রতিফল, ভ্রান্তি, এস যুবরাজ এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি।

বাঙালি মুসলিম মনমানসিকতা

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং 'সবেমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত' মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন-মানসিকতা ও কর্মকাণ্ডের উল্লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। অন্যথায় পুরো আলোচনাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এটা এমন একটা সময় যখন 'মেঘে মেঘে বেশ কিছু বেলা' হয়ে গেছে। বিষয়টা একটু গুছিয়ে বললে বলতে হয় যে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে সেই যে মওলানা কেরামত আলী জোনপুরী ইংরেজি শেখার জন্য 'ফতোয়া' জারি করেছিলেন; তখন থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৪ বছরকাল সময়ের দূরত্বে শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৈশোরে উপনীত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বাস্তবতা এই যে, এসময় কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালী সম্প্রদায় বিগত প্রায় এক শতাব্দীকালের মধ্যে বিশাল বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা সম্পর্কে কোনোরকম চিন্তা করারও অবকাশ পাননি। এঁদের ধ্যান-ধারণায় তখনও পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান বলতে কোলকাতার দিলখুশা, কলুটোলা, নারিকেলডাঙ্গা, মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর এলাকায় বসবাসকারী কিছু সংখ্যক আদম সন্তান আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে প্রাপ্ত পূর্ববঙ্গের জমিদারি এলাকার শোষিত বিপুল সংখ্যক কৃষক, মাঝি আর গাড়োয়ানের দল।

মানবজাতির সামাজিক ইতিহাসে আজও পর্যন্ত এমন ঘটনা বিরল; যেখানে পাশাপাশি দু'টো সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে যাচ্ছে, অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণীরা নিগৃহীত সামাজিক অনুষ্ঠানাদি থেকে শুরু করে এঁদের মনমানসিকতা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অন্যান্য দিকের কথা ছেড়ে দিলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীকালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু লেখকদের রচিত নাটক, উপন্যাস আর ছোট গল্পগুলো এর জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। অবশ্য অবিস্মরণীয় প্রতিভার অধিকারী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বিপ্লবী অরবিন্দ বর্ণিত ("স্বাদেশিকতার ধর্মগুরু") তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এদের চোখে এক সময় যে প্রতিক্রিয়াশীল ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিলেন, একমাত্র রবীন্দ্র প্রতিভা ছাড়া আরও গুটিকয়েক ব্যতিক্রম রয়েছে। সাতচল্লিশ পর্যন্ত এদের আর কারো পক্ষে সেই ঠুলি ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাই পশ্চিম বঙ্গের মার্কসীয় গবেষক সুপ্রকাশ রায় যথার্থই লিখেছেন, "সামন্ত প্রথার সমস্ত রক্ষণশীল কুসংস্কারের এমন ঘোরতর সমর্থক বলিয়াই বঙ্কিম-সাহিত্য এত আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল এদেশের সমাজের গোঁড়া হিন্দু ও উচ্চশ্রেণীর নিকটে।"...বঙ্কিম সাহিত্য হইল প্রগতিবিরোধী অভিজাতগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী সমাজের মুখপত্র।"...সেই হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির মধ্যেই নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা দ্বারা বঙ্কিম সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় "রিনাসান্স" হিন্দু "রিনাসান্সে" পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই

হিন্দু “রিনাসান্স” হিন্দু অভিজাত ও হিন্দু মধ্যশ্রেণীরই নবজাগরণ। বঙ্কিমের পর রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাহার শিষ্য বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক আরব্ধ এই হিন্দু “রিনাসান্স”কে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রূপদান করেন।” (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : পৃঃ ১৯৬-১৯৭ কলিকাতা ১৯৮০)

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার সবচেয়ে অগ্রসরমান এই উন্নাসিক কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পক্ষে বাঙালি মুসলিম মানস সম্পর্কে চিন্তার অবকাশ পর্যন্ত ছিল না। এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের আর এক বিশিষ্ট মার্কসীয় গবেষক ও সাংবাদিক কমরেড বিনয় ঘোষের মন্তব্য পুনরুল্লেখ করতে হয়। তিনি যথার্থই লিখেছেন, “...হিন্দু-প্রীতি ক্রমে ‘হিন্দুত্ব’ প্রীতির ভিতর দিয়ে ‘সাম্প্রদায়িকতায়’ পর্যবসিত হল। ...যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল কুসংস্কার, উদারতার বদলে সঙ্কীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা। ...মুসলমান বর্জিত তথাকথিত রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রায়শ্চিত্ত করা হলো চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত করে, বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি সব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে।”

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এ ধরনের এক বিকৃত উত্তরণ লক্ষ করে কমরেড বিনয় ঘোষের লেখনীতে মারাত্মক আক্ষেপের সুর পরিলক্ষিত হয়। তিনি পুরো ঘটনা প্রবাহকে ‘ট্র্যাজেডি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিনয় বাবু সুস্পষ্ট ভাষায় আরও লিখেছেন যে, “প্রথম ও প্রধান ট্র্যাজেডি হল, বাংলার এই নতুন বিদ্বৎসমাজ প্রায় সম্পূর্ণ ‘মুসলমান বর্জিত’ রূপ ধারণ করল এবং এই জন্য একে সাধারণভাবে ‘বাঙালি বিদ্বৎসমাজ’ না বলে বিশেষ অর্থে ‘বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজ’ বলাই যুক্তিসঙ্গত। আমরা যখন নব্যবঙ্গের বা নব যুগের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করি তখন কতকটা সচেতনভাবেই বাঙালি মুসলমান সমাজের এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাই।” (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : প্রকাশ ভবন কলিকাতা ১৯৭৮)।

ইতিহাসের এ ধরনের এক চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে বাঙালি মুসলমানদের মনমানসিকতা ও কর্মকাণ্ডের উল্লেখ নিতান্ত অপরিহার্য মনে হয়। প্রাপ্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে প্রথমেই বলে রাখতে হয় যে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ায় সামগ্রিকভাবে বাঙালি মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয়েছিল। কেননা এর ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুর্গতির কিছুটা লাঘব হওয়া ছাড়াও বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারা দ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এ জন্যই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঢাকায় “মহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন” নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় (সূত্র : দি মুসলিম ক্রনিক্যাল, ২১ শে অক্টোবর ১৯০৫)। নয়া প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশই ছিল এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার মুসলমানরাও নয়া প্রদেশ গঠনের প্রতি সমর্থন দান করে।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের সর্বাত্মক বিরোধিতার মোকাবেলায় বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত সমাজ ১৯০৬ সালের ২৫শে নভেম্বর কোলকাতার ৫১, ওয়েলেসলী স্ট্রিট-এ “মহামেডান ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন” (মুসলিম সতর্ক প্রহরা সমিতি) গঠন করে। নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম যথাক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সমিতির মুখ্য

উদ্দেশ্য হচ্ছে, "সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের "দুঃখজনক প্রভাবকে" সম্ভাব্য সমস্ত রকমের আইনসঙ্গত উপায়ে প্রতিরোধ করা।"

মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভাড়া করা বক্তা

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় যে, এ সময় কতিপয় বাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ এম কে ইউ মোল্লার মতে, এদের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহর সৎভ্রাতা খাজা আতিকুল্লাহ, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী, সিরাজগঞ্জের ইসমাইল সিরাজী, ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ রসুল এবং নোয়াখালীর লিয়াকত হোসেন অন্যতম। ডাঃ মোল্লা তাঁর রচিত 'দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম" গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরও তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইতিহাসবিদ ডঃ মফিজুল্লাহ কবীরের বরাত দিয়ে এ মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, খাজা আতিকুল্লাহ আসলে খাজা সলিমুল্লাহর সঙ্গে বৈষয়িক বিষয়ের বিবাদের জের হিসেবে আলোচ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে দুই ভাইয়ের বিরোধের নিষ্পত্তি হলে খাজা আতিকুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। আলিমুজ্জামান চৌধুরী ভারত সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদের লক্ষ্যে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন তা বেশ বিতর্কিত বলা যায়। ডঃ মোল্লা এ মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, এই প্রতিবেদন কোনো জনসভায় গৃহীত হয়নি। উপরন্তু আলোচ্য প্রতিবেদনটি কারা উপস্থাপন করেছিলেন এবং কারাই বা তা' দস্তখতের জন্য বিতরণ করেছিলেন তারও সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অভাব রয়েছে। তবে এটুকু দেখা যায় যে, প্রতিবেদনটি কোলকাতাতেই প্রণীত হয়েছিল এবং এর প্রথম চারজন দস্তখতকারী দু'জনই এ সময় হিন্দু আইনজীবীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত 'ফরিদপুর লোন অফিসে' দারুণভাবে ঋণগ্রস্ত। তৃতীয় দস্তখতকারী ছিলেন জনৈক অমিতচারী মুসলিম যুবক।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত নোয়াখালীর মুসলিম নেতা লিয়াকত হোসেন সম্পর্কে ডঃ মোল্লা চাঞ্চল্যকর তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি ১৯০৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চিফ সেক্রেটারি পিসি লিওন কর্তৃক ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট প্রেরিত নোট-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার জন্য আন্দোলনকারীরা লিয়াকত হোসেনকে মাসিক ৪০ টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করত।

এ ধরনের গুটিকয়েক ব্যতিক্রমী বাঙালি মুসলিম ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের চেয়ে যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে সামগ্রিকভাবে বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারার মুল্যায়ন। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ' কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত 'আধুনিক ভারত : প্রথম খণ্ড' (প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত) গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এছাড়া কলকাতার' মোহামেডান সাহিত্য সভা' বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানালেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম ও আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনগণের মনেও এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন 'ইসলাম প্রচার," "মিহির ও সুধাকর" ও 'হাফেজ'-এ মুসলমান লেখকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন তা উগ্রভাবে ইসলাম বিরোধী।...কিন্তু সাধারণ মুসলমান কৃষিজীবী সম্প্রদায় কেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিমুখ হলেন তা বিশ্লেষণ করতে

গিয়ে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ও ভূ-স্বামীগণ ছিলেন হিন্দু এবং তাঁরাই স্বদেশী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান প্রজা অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে তাদের ভূ-সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় হিন্দু জমিদারগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন।...অনিবার্য ফলের কারণে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়। ১৯০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে জামালপুরে মুসলমান প্রজাগণ হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। ডঃ সুমিত সরকারের [দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল : পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬] মতে, ময়মনসিংহের দাঙ্গায় ভূমি সংক্রান্ত চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছিল।'

এ সময় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিক্ষুব্ধ চিত্তে লিখলেন, 'মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে নিয়মিত অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, ম্লেচ্ছর অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই" (রচনাবলী ১২ পৃঃ ৯০৫-৯১৫)।

তাহলে একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, পূর্ববঙ্গে বর্ণহিন্দু জমিদারদের বল্গাহীন শোষণের মোকাবেলায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম কৃষক সমাজ বঙ্গভঙ্গের মাঝেই কিছুটা মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছিল। এর পাশাপাশি সদ্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল তা পর্যালোচনা করা সমীচীন মনে হয়।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিল্প, বাণিজ্য এবং যাতায়াতের ভয়াবহ দুরবস্থার বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধুমাত্র সংক্ষেপে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট মনে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো :

কলেজের সংখ্যা

পূর্ববঙ্গ ও আসাম	:	১১টি
অবশিষ্ট বঙ্গ	:	২৬টি

এম এ পর্যন্ত পড়ার কলেজ

পূর্ববঙ্গ ও আসাম	:	শূন্য
অবশিষ্ট বঙ্গ	:	৩টি

মেয়েদের হাই স্কুল

পূর্ববঙ্গে	:	৩টি
আসামে	:	শূন্য

চাকরির ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া না গেলেও ১৯০৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের নিকট থেকে কোলকাতায় পুলিশের আইজি'র নিকট প্রেরিত এক পত্রে দেখা যায় যে, এই প্রদেশের সমগ্র পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর পদে হিন্দুদের সংখ্যা যেখানে শতকরা ৯২.৬% ভাগ, সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৭.৪% ভাগ। অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, নয়া প্রদেশের সর্ববৃহৎ ময়মনসিংহ জেলায়

যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৭১.৩৬% ভাগ মুসলমান, সেখানে মাত্র শতকরা ৯.৪% ভাগ পদে মুসলিম কর্মচারী রয়েছে। বাকি সবাই অমুসলিম। (ইস্ট বেঙ্গল এ্যান্ড আসাম জুডিশিয়াল প্রসিডিংস, ১৯০৬)।

এ ধরনের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সদ্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থনের হস্ত সম্প্রসারিত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। আর ঠিক এমনি সময়ে মাত্র ৯০ দিনের ব্যবধানে পর পর দু'টো ঘটনা সংঘটিত হলো। প্রথমটি হচ্ছে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ জন সদস্যবিশিষ্ট এক মুসলিম প্রতিনিধি দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে একই বছরের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনের সময় এক ঘরোয়া বৈঠকে আলিগড় কলেজের মহসিন-উল-মূলকের প্রস্তাবক্রমে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জন্ম হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন নবাব ভিকার-উল-মূলক। উল্লেখ্য যে, আগা খানের প্রতিনিধি দলে এবং ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নে বদরুদ্দিন তায়েবজী, মহাকবি ইকবাল এবং ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কোনো স্থান ছিল না। সেদিন এঁদের কাউকে আমন্ত্রণ পর্যন্ত করা হয়নি।

এক্ষণে গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি প্রশ্নের অবতারণা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ভাষাভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠী-স্বার্থে পর্দার অন্তরালে যেসব অর্থবহ ঘটনা এই উপমহাদেশে সংঘটিত হয়েছে সে সবের প্রতি অন্তত কিছুটা আলোকপাত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে যখন ৩৫ সদস্যের উত্তর ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর (১৯০৫-১৯১০) সমীপে মুসলমানদের 'দাবি-দাওয়া' পেশ করতে যায়, তখন "বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী করার" বিষয়টি আলোচ্য দাবি দাওয়ার' অন্তর্ভুক্ত হলো না কেন? এবং কেনইবা বড় লাটের সঙ্গে আলোচনাকালে বাঙালি মুসলমানদের মূল দাবি বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলো না?

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এ সময় কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের উদ্যোগে 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করলে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং ময়মনসিংহের নবাব আলী চৌধুরী আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আগাখানের "দাবি-পত্রে" বঙ্গভঙ্গ স্থায়ী করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিশিষ্ট গবেষক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দ বিশেষত ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী এই দাবি-পত্রে বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগাখার বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।" (আধুনিক ভারত : প্রথম খণ্ড, পৃ: ১৩৮ কলিকাতা ১৯৮৩)।

গোষ্ঠীস্বার্থে বাঙালি মুসলমানদের সেদিন ব্যবহার করা হলো

আগাখান এবং যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এর ঘোর বিরোধিতা করার কারণ একটাই। তা হচ্ছে ইংরেজ ভারতের যে সব প্রদেশে জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা সংখ্যালঘু রয়েছে, সেই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই যুক্ত প্রদেশের নবাব ইমদাদুল মূলক এবং নবাব মোস্তাক হোসেন ভিকার-উল-মূলক-এর খসড়া অনুসারে আলোচ্য 'দাবি-পত্র' প্রণীত হয়েছিল। এই 'দাবি-পত্র'কে একটা সর্বভারতীয় চরিত্র দাঁড়

করাবার জন্যই সেদিন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ১৮ মিলিয়ন মুসলমানদের সমর্থনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হিন্দী ভাষার মোকাবেলায় যুক্ত প্রদেশ ও বিহার অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দুকে রক্ষার লক্ষ্যে আলোচ্য নেতৃবৃন্দ সেদিন এ মর্মে ধূলিঝড়ের সৃষ্টি করেছিল যে, বঙ্গীয় এলাকার মুসলমানদের ভাষাও হচ্ছে উর্দু। (এরই জের হিসেবে পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলায় রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়)। সে ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে দর কষাকষির সময় বলতে সুবিধা হলো যে, ইংরেজ শাসিত ভারতের ৬২ মিলিয়ন মুসলমানের উর্দু ভাষার জন্য রক্ষাকবচ চাই। মোদ্দা কথায় বলতে গেলে সেদিন এসব উর্দুভাষী নেতৃবৃন্দের কাছে উচ্চতর ভারতীয় অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন ছিল মুখ্য। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের (৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যার ১৮ মিলিয়ন মুসলমান) স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ স্থায়ীকরণের বিষয়টি এঁরা সেদিন অর্থবহ কারণে আমলই দিলেন না। বাঙালি মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, সেদিন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আর ময়মনসিংহের সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী ছাড়া গোষ্ঠীস্বার্থে দাবি উত্থাপনের লক্ষ্যে আর কোনো বিশিষ্ট নেতা ছিলেন না। সিরাজগঞ্জের আসাদুল্লাহ সিরাজী, কোলকাতার আবদুল্লা রসূল আর চট্টগ্রামের মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরাও তখন ছিলেন দুঃখজনকভাবে ভিন্নদর্শী। বাঙালি মুসলমানদের পক্ষ থেকে একথা সেদিন কেউই সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে পারলেন না যে, আগাখানের 'দাবি-পত্রের' প্রতি সমর্থন থাকলেও কেন্দ্রের কোটাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশকে স্থায়ীকরণই হচ্ছে ইংরেজ ভারতের মুসলিম জনেগোষ্ঠীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাঙালি মুসলমানদের মূল দাবি এবং এ ব্যাপারে আর কোনো আপোষ নেই। নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ স্থায়ী হলে প্রাদেশিক পর্যায়ে তো আর বাঙালি মুসলমানদের 'কোটার' প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে উপ-মহাদেশের রাজনীতি সেদিন একটা সুষ্ঠু অথচ বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো বলা যায়।

অথচ ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে 'সিমলা ডেপুটেশনের' মাত্র ৯০ দিনের মাথায় ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্য হলেও এই প্রতিষ্ঠানের দাবি-দাওয়ার মধ্যে নবগঠিত বাঙালি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ স্থায়ীকরণের প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। শুধু তাই-ই নয়, সদ্য স্থাপিত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানটি যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, এজন্য আগাখানকেই এর স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তী সময় ১৯০৯ সালে মর্লেমিন্টো সংস্কার আইনের প্রবর্তনে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' সোপান রচিত হওয়ায় যেসব প্রদেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু মূলত তাঁদের অধিকার সংরক্ষণ এবং কেন্দ্রে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হলেও কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণ-হিন্দুদের ক্রমাগত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মোকাবেলায় বাঙালি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের অখণ্ডতা রক্ষার গ্যারান্টির কোনো ব্যবস্থাই হলো না। এরই জের হিসেবে লর্ড মিন্টোর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬) যখন ১৯১০ সালের নভেম্বর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ভারত সচিব লর্ড ক্রিউকে সুপারিশ করলেন, তখন উপ-মহাদেশের অবাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধার হওয়ায় আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করলেন না বলা যায়। আগাখানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগও মোটামুটি নীরব রইল। একথা আজ চিন্তা করলে বিস্ময়কর মনে হয় যে, বঙ্গভঙ্গ রদ-এর আলোচ্য সুপারিশকালে নবাব সলিমুল্লাহর সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা পর্যন্ত করা হয়নি। কারণ,

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে প্রশাসন থেকে শুরু করে সর্বত্র ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের কোটার ব্যবস্থা করায় বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর তেমন কোনো আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। "১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নতুন সরকারি সিদ্ধান্ত (পুনরায় যুক্ত বাংলা) ঘোষিত হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সিদ্ধান্তে বাংলার মুসলমান সমাজের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়ায় তাঁদের মনে হতাশা দেখা দিল।" (আধুনিক ভারত প্রথম খণ্ড : পৃ: ১৪৩, কলিকাতা ১৯৮৩)।

এরই পাশাপাশি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর থেকে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্রমবিকাশ কীভাবে ঘটল তা' পর্যালোচনা করা দরকার। আগেই উল্লেখ করেছি যে, বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিনটিতে অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর এদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখিবন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কোলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল, অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগজর্জর আনন্দমোহন বসু 'মিলন মন্দিরের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের জন্য ইংরেজিতে যে ভাষণ লিখে এনেছিলেন তা' পড়ে শোনালেন আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

কংগ্রেসে নরম ও চরমপন্থীদের সংঘাত চরমে উঠল

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে কেন এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন তা' বলার প্রাক্কালে এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, শুধু বিক্ষোভ প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারের টনক নড়ানো যাবে না—এই সত্য উপলব্ধি করে বাঙালি হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথ অনুসরণের গুরুত্ব অনুভব করলেন। ফলে প্রতিবাদ রূপান্তরিত হলো সক্রিয় বিক্ষোভে। 'বয়কট' নীতির ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশে প্রথমে বিলেতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব গৃহীত এবং দোকানে দোকানে পিকেটিং শুরু হলো। শীঘ্র আন্দোলন আরও একধাপ এগিয়ে বিলেতী পণ্যের বহ্ন্যুৎসব চলতে লাগল। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দু ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থী নেতা এ সময় 'বয়কট'-এর ব্যাখ্যাদান করে ঘোষণা করলেন যে, 'বয়কট' এর অর্থ বিলেতী পণ্য বর্জন ছাড়াও বিলেতী চিন্তাধারা এবং আদব-কায়দা সব কিছুকেই পরিত্যাগ করা। ফলে অচিরেই এই আন্দোলন বাংলার সর্বত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করল। এ মর্মে স্লোগান উচ্চারিত হলো যে, বিদেশী প্রশাসন এবং বিদেশী শিক্ষাকেও বর্জন করতে হবে। এরই মোকাবেলায় ইংরেজ সরকারের তৎকালীন মুখ্যসচিব আর ডাব্লিউ কার্লাইল এ মর্মে এক সার্কুলার জারি করলেন যে, আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু ছাত্র কোলকাতার কলেজগুলো থেকে বহিষ্কৃত হয়। প্রায় একই সময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের মুখ্যসচিব মি: লায়ন তাঁর জারিকৃত নির্দেশে উল্লেখ করলেন যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হবে। এরই জের হিসেবে

সরকারি আওতার বইরে 'ন্যাশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। রংপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) কালী প্রসন্ন দাস গুপ্ত এবং ব্রজসুন্দর রায়ের উদ্যোগে প্রথম ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়। ঢাকার নবাবপুর রোডে মুকুল সিনেমা হলের পাশে 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল' নামক প্রতিষ্ঠানটি আজও পর্যন্ত সেই সাক্ষ্য বহন করছে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক এক লাখ টাকা এবং ময়মনসিংহের বর্ণহিন্দু জমিদাররা প্রচুর অর্থ চাঁদা দিয়ে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত "জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে" সাহায্য করলেও এসব প্রতিষ্ঠান সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি চাকরি লাভের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ।

অন্যদিকে বিশিষ্ট গবেষক ড: সুমিত সরকার তাঁর রচিত 'দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে সরকারি নথিপত্রের ভিত্তিতে এ মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলার বয়কট আন্দোলন চীনের বয়কট আন্দোলনের মতো সাফল্য লাভ করেনি। কারণ স্বদেশী জিনিস পত্রের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় স্বদেশী দ্রব্যের জনপ্রিয়তা আশাব্যঞ্জক ছিল না। ড: সরকার আরও উল্লেখ করেছেন যে এ সময় 'স্বদেশী আন্দোলনের' অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। একদিকে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ 'স্বদেশী কর্মসূচিকে' রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারে সচেষ্ট হন এবং অন্যদিকে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার প্রমুখ স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারকে রাজনৈতিক আওতার বাইরে রাখার উদ্যোগী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়েই প্রফুল্ল রায়ের 'ক্যালকাটা' কেমিক্যাল, ডাঃ নীলরতনের সাবানের কারখানা, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক, ন্যাশনাল ইনসুরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এসবের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।

এদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার মাত্র ১০ মাসের মাথায় ইংরেজভক্ত বর্ণহিন্দু জমিদারের দল এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালো। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন-এর মাধ্যমে এঁরা সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এক স্মারকলিপি দাখিল করলেন। এতে মোট ১০৭ জন বর্ণহিন্দু জমিদারের স্বাক্ষর ছিল। এর মধ্যে প্রথম নামটিই হচ্ছে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত এবং দ্বিতীয়টি বর্ধমানের মহারাজার।

তবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত চরমপন্থী বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের কব্জায় চলে যায়। এ সময় গোপনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার লাভ ছাড়াও পত্র-পত্রিকাগুলোও উগ্র নীতি গ্রহণ করে। বিশিষ্ট লেখক যোগেশচন্দ্র বাগল-এর মতে, প্রেস আইনের দাপটে ৩৫০ টি ছাপাখানা এবং ৩০০ টি সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। (মুক্তির সন্ধানে ভারত : কলিকাতা ১৯৪০ পৃ: ৩১১)। এছাড়া অর্ডিন্যান্স জারি করে বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ঢাকায় অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃৎ সমিতি ও সাধনা সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি এবং কোলকাতার অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। উপরন্তু অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধ চন্দ্র, বসুমল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ এবং শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এই ৯ জন চরমপন্থী বর্ণহিন্দু নেতাকে গ্রেফতার করে বাংলার বাইরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকায় একটা সমীক্ষা বিশেষ সমীচীন মনে হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য সমসাময়িককালে কংগ্রেসের সভাপতির পদে যাঁরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের নামে উল্লেখ বাঞ্ছনীয় হবে। এঁরা হচ্ছেন :

১. স্যার হেনরি কটন (বোম্বাই ১৯০৪)
২. গোপালকৃষ্ণ গোখলে (বারানসী ১৯০৫)
৩. দাদাভাই নওরোজি (কলিকাতা ১৯০৬)
৪. রাসবিহারী ঘোষ (সুরাট ১৯০৭)
৫. রাসবিহারী ঘোষ (মাদ্রাজ ১৯০৮)
৬. মদনমোহন মালব্য (লাহোর ১৯০৯)
৭. স্যার ডব্লিউ (ওয়েডারবার্ন এলাহাবাদ ১৯১০)।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং নথিপত্রে দেখা যায় যে, ১৯০৬ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রশ্নটি নিয়ে নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নরমপন্থীরা কিছুতেই 'একটা আঞ্চলিক প্রশ্নে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে রাজি নয় এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। অন্যদিকে চরমপন্থীরা 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' আন্দোলনকে আরও সর্বাত্মক করে গড়ে তুলতে আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত দাদাভাই নওরোজী কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনে উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ মর্মে ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হলো 'স্বরাজ' অর্জন করা। কিন্তু ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে উভয়পক্ষের শক্তি পরীক্ষা হলো। চরমপন্থীরা "হিন্দু ধর্মরাজ্যে বিশ্বাসী" মারাঠা ব্রাহ্মণ বাল গঙ্গাধর তিলককে সভাপতির প্রার্থী মনোনয়ন করলে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো হাতাহাতি এবং পরে মারপিট সংঘটিত হয়। এরই জের হিসেবে চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করলে রাসবিহারী ঘোষ ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কৌতূহলী পাঠকদের কাছে এখানে একটা তথ্য উল্লেখ করতে চাই যে, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে যে ব্যক্তি এক নাগাড়ে ২৭ বছর অর্থাৎ ১৯১২ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ আইসিএস রাজপুরুষ--নাম এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (১৮১৯-১৯১২)।

এজন্যই সেদিন সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে অবাঙালি বর্ণহিন্দু ও পার্শী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সহযোগিতায় নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য হলেন এবং বাঙালি বর্ণহিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রকারান্তরে অপারগতা প্রকাশ করলেন। ইতিহাসে মোটামুটিভাবে এদেরই নরমপন্থী কংগ্রেসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীদের মোকাবিলায় এঁরা বিজয়ী হয়েও বাইরে কংগ্রেসের ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার কৌশল হিসেবে নরমপন্থী বাঙালি বর্ণহিন্দু নেতা রাসবিহারী ঘোষকে উপর্যুপরি দু'বছর পার্টির সভাপতি নির্বাচিত করেছিল।

তৃতীয়ত নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ-এর কাজকর্ম শুরু হওয়ার স্বল্প দিনের ব্যবধানে ভারতের বড়লাট বংগভংগের প্রবক্তা লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন এবং এই নতুন প্রদেশের প্রথম লে: গভর্নর স্যার জোসেফ বি ফুলারের বিদায় গ্রহণ প্রসঙ্গ। লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় দফায় গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই

প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতবিরোধের প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে পদত্যাগ-পূর্বক দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া এবং বানোয়ারীলাল নামক বিদ্যালয় দু'টির শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় নবগঠিত প্রদেশের লে: গভর্নর ফুলার অবিলম্বে আলোচ্য বিদ্যালয় দু'টির সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কোলকাতায় (তখনও পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোলকাতা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতো) চিঠি লিখেন। নতুন বড়লাট লর্ড মিন্টো এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করলে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রতিষ্ঠাতা লে: গভর্নর স্যার জোসেফ বি, ফুলার (১৮৫৪-১৯৩৫) ১৯০৬ সালের ৩রা আগস্ট পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ফুলারের অবদানকে স্মরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'ফুলার রোড'।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯০৬ সালে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে উদারনৈতিক দলের ঐতিহাসিক বিজয়ের ফলে ভারত সাম্রাজ্যের প্রতি ইংরেজ সরকারের নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদারনৈতিক নেতা গ্ল্যাডস্টোনের জীবনীকার জন মর্লেকে ভারত সচিব এবং কানাডায় কর্মরত প্রতিভাবান ইংরেজ ব্যক্তিত্ব লর্ড মিন্টোকে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। এই জুটি ১৯০৫ সালের শেষার্ধ থেকে শুরু করে ১৯১০ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। তবে বঙ্গভঙ্গ রদের দায়িত্ব পালনে এঁদের প্রায় পাঁচ বছরের সময়ের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে সিমলা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯০৯ সাল নাগাদ মিন্টো-মর্লে সংস্কার আইনের মাধ্যমে উত্তর ভারতীয় অবাঙালি মুসলিম অভিজাত নেতৃবৃন্দকে নিরপেক্ষ করা এবং নওরোজী-গোখলে চিন্তাধারার অবাঙালি নরমপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টি করতে হয়।

চতুর্থ : বঙ্গীয় এলাকার বর্ণহিন্দু জমিদার, ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত বেকার হিন্দু যুব সম্প্রদায় মূলত ৫টি কারণে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে। এগুলো হচ্ছে :

১. কোলকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এ মর্মে প্রকাশ করলো যে, পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা হবে বলে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যই শীঘ্র চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হবে। (সূত্র : বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর সেক্রেটারি শ্রীনাথ রায় কর্তৃক বাংলা সরকারের নিকট ১৯০৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারির চিঠি)।

২. কোলকাতার আইনজীবীরা এজন্য ভীত হলেন যে, ঢাকায় একটি নতুন হাইকোর্ট স্থাপিত হতে যাচ্ছে এবং এতে করে বহু মক্কেল হাতছাড়া হয়ে যাবে। (সূত্র : ভারতের বড়লাট ১৯০৫-১৯১০) লর্ড মিন্টো কর্তৃক লন্ডনস্থ উদারনৈতিক ভারত সচিব (১৯-৫-১৯১০) লর্ড জন মর্লের নিকট ১৯০৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লিখিত পত্র)।

৩. কোলকাতাস্থ সংবাদপত্রের মালিকগণ এজন্য চিন্তিত হলেন যে, অচিরেই ঢাকা থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করবে এবং সেক্ষেত্রে কোলকাতার খবরের কাগজের প্রচার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাবে (দি-বেঙ্গলি, কলিকাতা, ১৯০৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা)।

৪. কোলকাতায় আরাম-আয়েশের মধ্যে বসবাসকারী যেসব বর্ণহিন্দু জমিদারের জমিদারি এলাকা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে রয়েছে, তাঁরা এ মর্মে আতঙ্কগ্রস্ত হলেন যে, তাঁদের নিয়মিত

খাজনা আদায়ের জন্য ঢাকায় পৃথক অফিস বসাতে হবে এবং তা ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। উপরন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলিম কৃষকদের পক্ষে কালক্রমে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করারও সম্ভাবনা বিদ্যমান (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি প্রদ্যুত কুমার ঠাকুর কর্তৃক ১৯০৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলা সরকারের নিকট লিখিত চিঠি)।

৫. কোলকাতা-কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদদের মনে এ মর্মে ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, নয়া প্রদেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাগ্য স্থানান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব সংকুচিত হতে চলেছে (১৯০৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড মিন্টো কর্তৃক লন্ডনে ভারত সচিব লর্ড মর্লের নিকট প্রেরিত চিঠি)।

প্রায় ৮০ বছর পর আগা খানের এই ডেপুটেশন সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন মূল্যায়ন করা অপরিহার্য মনে হয় এবং সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ৪টি সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার উল্লেখ বিশেষ বাঞ্ছনীয় :

ক. **যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু :** সিমলা সম্মেলনে প্রস্তাবিত পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্র ছাড়াও প্রদেশগুলোতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের রক্ষাকবজের ব্যবস্থা করায় এঁরা সেদিন সন্তোষ প্রকাশ করেন।

খ. **নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় :** প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি লাভজনক হলেও প্রাদেশিক পরিষদে এই প্রদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি রক্ষাকবজের প্রশ্নই ওঠে না। এজন্য পাকিস্তান আমলে বাঙালি মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সোচ্চার ছিল। ১৯০৫-০৬ সালে বাঙালি মুসলমানদের দ্রুত সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যেটা ছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন তা হচ্ছে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের স্থায়িত্বকরণ। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে ১৮ মিলিয়ন বাঙালি মুসলমানের বিরাট সংখ্যাকে ব্যবহার করেও সেদিন আগা খান ডেপুটেশনে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের স্থায়িত্বকরণের প্রশ্নটি ছিল অনুপস্থিত।

গ. **বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এদেশীয় উঠতি পুঁজিপতিদের স্বার্থে অবাঙালি হিন্দু ও পার্শী সম্প্রদায় :** জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এ সময় গোষ্ঠী স্বার্থে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে এতো বেশি আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, সেদিন এঁরা সিমলা বৈঠক'কে ততটা গুরুত্ব প্রদান করেননি বলা যায়।

ঘ. **বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দু ও জমিদার শ্রেণী :** নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের জমিদারি হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রশ্নে এসব নেতা সেদিন এত বেশি উগ্র হয়ে উঠেছিলেন যে, ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে পরাজিত হবার পরও এঁরা বঙ্গীয় এলাকায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে শুধু তীব্রতর করে তুলেছিলেন তাই-নয়, বাংলার বুকে সৃষ্টি হলো হিন্দু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এঁরা সেদিন আগা খানের ডেপুটেশন এমনকি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা পর্যন্ত বিবেচনা করেননি।

এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যের উল্লেখ সমীচীন মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সমকালীন জাতীয়তাবাদী নেতাদের কেউই সিমলায় মুসলমান প্রতিনিধি দলের প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। একদিকে চরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এতটা নিমগ্ন ছিলেন যে, এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের ঘটনা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অন্যদিকে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্কার সাধনের ব্যাপারে বেশি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে সিমলা সম্মেলনের (মিন্টো-আগা খাঁ বৈঠক) তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর-এ আহূত জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সিমলা সম্মেলনের কোনও উল্লেখ ছিল না। ...তবে অমৃতবাজার পত্রিকায় (৪ অক্টোবর ১৯০৬) সিমলা সম্মেলন সম্পর্কে কটূক্তি দেখা যায়" (আধুনিক ভারত প্রথম খণ্ড : পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০ কলিকাতা)।

এক্ষণে উপমহাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা অপরিহার্য মনে হয়। ইতিহাসে বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উপমহাদেশে দ্বিতীয় দফায় কট্টরপন্থী ওয়াহাবী আন্দোলনের একেবারে অন্তিম সময়ে দু'টো উল্লেখযোগ্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এর প্রথমটি হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন ইংরেজ ভারতের রাজধানী খোদ কোলকাতা মহানগরীতে। ৪৫ বৎসর বয়স্ক ওয়াহাবী বিপ্লবী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব থেকে বিহারের পাটনায় আগমন করেন। এ সময় পাটনার দায়রা জজ জাস্টিস প্রিন্সেস এক মামলায় ওয়াহাবী বিপ্লবী কাজী দীন মুহাম্মদ, মোবারক আলী, আমীর উদ্দিন ও তবারক আলী প্রমুখকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করলে আবদুল্লাহ খুবই মর্মাহত হন। দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কোলকাতা হাইকোর্টে আপীল করলে আবদুল্লাহ এই আপীল শ্রবণের জন্য কোলকাতায় আগমন করেন। হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি জাস্টিস মিঃ নর্মান আপীল মামলার রায় প্রদানকালে পূর্বের দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। ফলে ওয়াহাবী স্বেচ্ছাসেবক আবদুল্লাহ প্রধান বিচারপতি মিঃ নর্মানকে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুর ১১টার কোলকাতা টাউন হলের সোপানে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সূতীক্ষ্ণ ছোরার আঘাতে বিচারপতি নর্মানকে হত্যা করেন। পরে আবদুল্লাহর ফাঁসি হয়।

মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি কালাপানির দেশ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের হেপ টাউন-এ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগকারী এক পাঠান ওয়াহাবী বিপ্লবী শের আলী খান ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়োকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। কট্টরপন্থী ওয়াহাবীদের দ্বিতীয় দফা আন্দোলনের এটাই হচ্ছে সর্বশেষ হত্যাকাণ্ড। আন্দামানের ভাইপার দ্বীপের কারাগারে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল ওয়াহাবী বিপ্লবী শের আলীর ফাঁসি হয়। অবশ্য এর মধ্যেই ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ঐতিহাসিক "ফতোয়া" জারি হওয়ায় উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতি নতুন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

মহারাষ্ট্রে প্রথম সন্ত্রাস আন্দোলন

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারত উপমহাদেশে হিন্দুদের মধ্যে সীমিত আকারে প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো গবেষকের মতে বাসুদেব

বলবন্ত ফাদকে (১৮৪৫-১৮৮৩) নামক মারাঠা ব্যক্তিত্বই হচ্ছেন হিন্দু সন্ত্রাসবাদী এবং বিপ্লবীদের জনক। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলায় জন্মগ্রহণকারী বলবন্ত ফাদকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রামো জি কোল প্রভৃতি উপজাতিকে সংগঠিত করে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকলাপের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও 'বিশ্বাসঘাতকতার' দরুন তা সফল হয়নি। সশস্ত্র বিপ্লব সংক্রান্ত তাঁর স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

এরপরেই মারাঠা ব্রাহ্মণ চরমপন্থী বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) কথা বলতে হয়। এঁরই প্রচেষ্টায় পুনরায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গাধর তিলক ছিলেন 'হিন্দু বাহুবল' ও হিন্দু শৌর্যবীর্যের' প্রবক্তা। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে মূলত এঁরই প্রচেষ্টায় মারাঠা ও বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে 'গণপতি পূজা' এবং 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তিত হয়। ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করে 'হিন্দু রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করাই ছিল চরমপন্থী তিলকের আদর্শ। শিক্ষিত মারাঠা যুবকদের মধ্যে এসব আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে শ্রী তিলক "মারাঠা" ও "কেশরী" নামের দু'টো পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে ইনি কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের চরমপন্থী উপদলীয় অংশের খুবই শ্রদ্ধাভাজন নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে গঙ্গাধর তিলক ছিলেন সভাপতি পদে চরমপন্থীদের প্রার্থী। এরপর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অপর মারাঠা ব্রাহ্মণ এবং নরমপন্থীদের কংগ্রেসী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের (১৮৬৬-১৯১৫) পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করলে, এর প্রতিদ্বন্দ্বী গঙ্গাধর তিলককে কথিত সন্ত্রাসবাদী কাজের অভিযোগে সুদীর্ঘ ৬ বছরকাল বার্মার মান্দালয় কারাগারে আটক রাখা হয়। কারারুদ্ধ অবস্থায় গঙ্গাধর তিলকের অবিস্মরণীয় গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে হিন্দু ধর্মীয় পুস্তক গীতার টিকা-টিপ্পনী সংক্রান্ত বিরাটাকার গ্রন্থ রচনা।

এরই পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রে 'বাল সমাজ' নামে একটি গোপন সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত প্রয়াত মারাঠা নেতা বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের আদর্শে স্থাপিত হয় হিন্দু বিপ্লবী সংস্থা "আর্যবান্ধব সমাজ।" ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পাঞ্জাবের চরমপন্থী কংগ্রেসী নেতা লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) এবং ভাই পরমানন্দ এই আর্যবান্ধব সমাজের সঙ্গে যুক্ত হলে এর কর্মকাণ্ড উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯০১ সালে বঙ্গীয় এলাকার হিন্দু বিপ্লবীদের সঙ্গে আর্যবান্ধব সমাজের সর্বপ্রথম যোগাযোগ হয়।

এদিকে বিনায়ক দামোদর সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬) নামক অপর এক মারাঠা ব্রাহ্মণ নেতা ১৯০৪ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে "অভিনব ভারত সংঘ" নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গঠন করে বিশেষ করে বর্ণ হিন্দু যুবকদের গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও ব্রিটেন থেকে অস্ত্র সংগ্রহে লিপ্ত হন। এদিকে বছর কয়েকের মধ্যে বিনায়ক সাভারকার ইংল্যান্ডে গমন করলে তদীয় ভ্রাতা গণেশ সাভারকারও বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগদান করেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক পুস্তক রচনার অভিযোগে নাসিকের ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসন এক সংক্ষিপ্ত বিচারে গণেশ সাভারকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। ফলে 'অভিনব ভারত সংঘের' সদস্যরা ১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর জ্যাকশনকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের দায়ে তিন জনের ফাঁসি হয়। অবশ্য পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার সময় একটি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এটাই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে "নাসিক ষড়যন্ত্র

মামলা" নামে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই মামলায় মোট ২৭ ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

এ সময় খোদ লন্ডন নগরীতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়। বিনায়ক সাভারকারের কর্মকাণ্ডে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত ২২ বছরের প্রবাসী ভারতীয় যুবক মদনলাল ধিংড়া (১৮৮৭-১৯০৯) নাসিকের ঘটনাবলীতে উত্তেজিত অবস্থায় তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লের এডিকং স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলিকে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউটে এক সভায় গুলি করে হত্যা করেন। মদনলাল গ্রেফতার হলে লন্ডনেই বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। এরই জের হিসেবে ইংরেজদের হাতে নির্যাতনের আশংকায় ইংল্যান্ডের প্রবাসী ভারতীয়রা মদনলালের কর্মকাণ্ডের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণের লক্ষ্যে লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে এক সভার আয়োজন করেন। কিন্তু আলোচ্য সভায় বিনায়ক সাভারকার এ ধরনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ সরকার এই অপরাধে সাভারকারকে গ্রেফতার করে জাহাজযোগে ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু উল্লেখিত জাহাজটি বোম্বাই- এর পথে ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের নিকটবর্তী হলে বিনায়ক সাভারকার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতার কেটে উপকূলে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ইংরেজ পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। এরপর বন্দি অবস্থায় সাভারকারকে ভারতে আনা হয় এবং বোম্বাই-এর আদালত রাজদ্রোহের অভিযোগে বিনায়ক সাভারকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে। সাভারকার আন্দামানে বন্দি অবস্থায় ১৪ বছর অতিবাহিত করেন।

বিনায়ক সাভারকার সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "...তিনিই (সাভারকার) প্রথম ভারতীয় যিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে বিলাতী কাপড় দগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার যাঁহাকে মামলা পরিচালনার জন্য আদালতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তিনিই ভারতের প্রথম বিপ্লবী যাহার জীবনী সম্বলিত বই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। তিনিই ভারতের একমাত্র কবি যিনি কাগজ-কলমের অভাবে কারাগারের দেওয়ালে অঙ্গার দ্বারা কয়েক হাজার লাইন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারতীয় লেখক যাঁহার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল। দ্বীপান্তর অবস্থানকালে তাঁহার ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব মুসলিম বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়।" (আমাদের মুক্ত-সংগ্রাম বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮)

বিনায়ক সাভারকার সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আন্দামান থেকে মুক্তিলাভের পর ইনি 'হিন্দু রাজ রাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করার আদর্শ সম্বলিত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করতে হয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয় পুঁজিতে স্থাপিত বোম্বাই এলাকার বিপুলসংখ্যক বস্ত্র কলগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটলে মহারাষ্ট্রে এলাকায় ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাসবাদীমূলক কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এই এলাকার রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়।

বাংলায় সন্ত্রাস আন্দোলনের গোড়াপত্তন

মহারাষ্ট্রের পর বঙ্গীয় এলাকায় হিন্দু-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এর জন্মকাল সম্পর্কে বেশ কিছুটা বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক এ সম্পর্কে লিখেছেন, "অবশেষে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রকৃত সূচনা। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনটি ও মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত

হয়। এই সকল সমিতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল অনুশীলন সমিতি। অনুশীলন সমিতির ইতিহাসের সঙ্গে প্রমথ মিত্রের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি ছিলেন একজন ব্যারিস্টার এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি চারবার বিপ্লবী সংস্থা গঠন করার চেষ্টা করেন। অবশ্য অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন সতীশচন্দ্র বসু (২৪ শে মার্চ ১৯০২) এবং এই সমিতি শরীর শিক্ষা সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দ মঠ" গ্রন্থ থেকে এই নাম নেওয়া হয়। সতীশচন্দ্র বসু ও অন্যদের অনুরোধে ব্যারিস্টারি প্রমথ মিত্র অনুশীলন সমিতির সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক হন।...

"কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এরপর বাংলার বৈপ্লিক আন্দোলনের নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ডঃ সুমিত সরকার (দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-১৯০৮) এই মত পোষণ করেন যে, ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা না হলে বাংলার বিভিন্ন সমিতি উনবিংশ শতাব্দীর সঞ্জীবনী সভার মতো স্তিমিত হয়ে পড়তো। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক সমিতি গড়ে ওঠে এবং মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলায় স্বদেশী আন্দোলন এই সকল বৈপ্লবিক সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই সময় ঢাকার পুলিনবিহারী দাশের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির যে শাখা গড়ে ওঠে, তা নিয়মানুবর্তিতা ও সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে খুব শক্তিশালী ছিল।...

"কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পর ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বিকল করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। হিংসাত্মক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু ও উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র দত্ত ও সর্বোপরি অরবিন্দু ঘোষ।... জনগণের মধ্যে (হিন্দু) বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভবানী মন্দির' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় (১৯০৫ খ্রি.) ধর্মের ভিত্তির উপর বিপ্লবী আন্দোলন সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়।" (আধুনিক ভারত পৃঃ ১১০-১২ কলিকাতা ১৯৮৩)।

মোদ্দা কথায় বলতে গেলে, সে আমলে শেষ পর্যন্ত ঢাকার সন্ত্রাসবাদীরা 'অনুশীলন' এবং কোলকাতার সন্ত্রাসবাদীরা 'যুগান্তর' এই দু'টি নামের সমিতির মাধ্যমে তাঁদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। এক্ষণে বঙ্গভঙ্গের পর কী ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা অপরিহার্য মনে হয়।

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নবগঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্নর বাম ফিল্ড ফুলার এবং পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর স্যার ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যার দু'টি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। এরপরেই কোলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। ইংরেজ সরকার অনতিবিলম্বে কিংসফোর্ডকে নিরাপত্তার জন্য বিহারের মোজাফফরপুরে বদলী করলে বিপ্লবীরা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বগুড়া জেলার বিহার গ্রামের রাজনারায়ণ চাকীর পুত্র প্রফুল্ল চন্দ্র চাকী (জন্ম ১৮৮৮) এবং মেদিনীপুর জেলার হরিপুরের ত্রৈলোক্যনাথ বসুর পুত্র ক্ষুদিরাম বসুকে (জন্ম ১৮৮৯) এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালের ৩১শে এপ্রিল রাত ৮ টার সময় এই দুই বিপ্লবী যুবক মোজাফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বাংলোর সম্মুখে একটি চলন্ত ঘোড়ার গাড়ির উপর বোমা নিক্ষেপ করলে দু'জন আরোহিনী ইংরেজ ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী এবং

কন্যা নিহত হন। গ্রেফতার এড়াবার জন্য প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করেন এবং ১৯০৮ সালে ১২ই আগস্ট মোজাফফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। অবশ্য প্রফুল্ল চাকীকে যে গুপ্ত পুলিশ গ্রেফতারের চেষ্টা করেছিল, বিপ্লবীরা সেই সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীকে ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর কোলকাতায় হত্যা করে। বিপ্লবীদের হাতে অন্য দু'জন নিহত পুলিশ কর্মচারী হচ্ছে বসন্ত চ্যাটার্জী (১৯০৬) এবং শামসুল আলম (১৯১০)।

এদিকে মোজাফফরপুরের হত্যাকাণ্ডের তদন্তকালে পুলিশ কোলকাতার মুরারীপুকুর এলাকায় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও বোমা তৈরির কারখানা এবং চিঠিপত্র উদ্ধার করে। এসবের সঙ্গে জড়িত হিসেবে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ ৩৪ জনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এটাই হচ্ছে বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলা। এই মামলা চলাকালীন সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যা করলে এঁদের দু'জনেরই ফাঁসি হয়। অবশ্য ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ খালাস পেলেও অন্যরা বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত হন। এই মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী মি. নর্টনকে সাহায্য করেছিলেন কোলকাতার ভবানীপুর নিবাসী সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনৈক বিপ্লবীর গুলিতে আশুতোষ বিশ্বাস নিহত হন। ভারত স্বাধীন হবার পর এঁরই পুত্র বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস নেহেরু মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন।

বাংলার ইতিহাসের এই চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে ১৯০৯ সালে যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টি বেআইনী ঘোষণা ও প্রচণ্ড দমননীতির মুখে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন হতে থাকে। এগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. ১৯০৭ সালের সুরাটি কংগ্রেসে বিপর্যয়ের পর সর্বভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতিতে বাঙালি বর্ণ হিন্দুদের আধিপত্য হ্রাস।

২. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ভয়াবহ ব্যাপকতা প্রদর্শন করে বর্ণ হিন্দু জমিদারদের আন্দোলনের সংস্পর্শ ত্যাগ।

৩. আলিপুর বোমার মামলায় খালাসপ্রাপ্ত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক আধ্যাত্ম সাধনা গ্রহণ ও পণ্ডিচেরিতে আশ্রম স্থাপন।

৪. বিপিন চন্দ্র পাল কর্তৃক ইংল্যান্ডে পাড়ি জমাবার ছাড়পত্র গ্রহণ।

৫. অসংখ্য পত্র-পত্রিকা নিষিদ্ধ এবং শতশত বাঙালি হিন্দু বিপ্লবী কারারুদ্ধ এবং অন্যান্যের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশা।

৬. ১৯০৯ সালে মিন্টোমর্লে সংস্থার আইনে সাম্প্রদায়িক কোটার রাজনীতির প্রবর্তন এবং উত্তর ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর রক্ষাকবজের ব্যবস্থা।

গবেষক ড: সুমিত সরকার সমসাময়িককালে বঙ্গীয় এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশের উল্লেখ করে এ মর্মে লিখেছেন যে, ১৯১০ সালে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে অধিবেশনে অম্বিকাচরণ মজুমদার তাঁর পঠিত প্রতিবেদনে কাউন্সিলদের জানান যে, বিগত বছরে অর্থাৎ ১৯০৯ সনে পুরাতন বা নতুন কোনো প্রদেশে একটাও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ

নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা-প্রবাহের ফলে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত মোট ৯৮ বছর সময়কালকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একথা চিন্তা করলে আজ বিস্ময়কর মনে হয় যে, ইংরেজরা এদেশে আগমনের পর কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সমর্থকগোষ্ঠী হিসেবে যে বাঙালি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল, তাঁরা মনে আঘাতপ্রাপ্ত হবে বিবেচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটা অর্থবহ আইন পাস করা হয়েছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিরা তাঁদের খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করতে পারবে না এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছাড়া আর কোনো ইংরেজ কোম্পানির ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার থাকবে না। এর পরবর্তী কালে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে একদিকে দুই দফায় কট্টর শরিয়তপন্থীদের ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লব এবং অন্যদিকে উদার ও সংস্কারপন্থী রামমোহন ইয়ং বেঙ্গল-মাইকেল-বিদ্যাসাগর প্রমুখের কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

১৮৭১-এর পরবর্তী সময়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ

কিন্তু ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঘটনাপ্রবাহ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ বছর কোলকাতায় মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর ঐতিহাসিক ফতোয়ার জের হিসেবে উত্তর ভারতীয় এবং বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম মধ্যবিত্তরা যখন এদেশে ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে, ঠিক তখনই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু বাহুবল এবং হিন্দু শৌর্যবীর্যের জয়গান করে এক একে আবির্ভাব হলো বঙ্কিম রামকৃষ্ণ-দয়ানন্দ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দর মতো মণীষীদের। উদার ও সংস্কারপন্থীদের কর্মকাণ্ডগুলোর হয় বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেল, না হয় এসবের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা দান করা হলো। পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত গবেষক ড. অরবিন্দু পোদ্দারের মতে,

"... বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে একটা ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক আলোকে মণ্ডিত করেন। ভারতবর্ষ নামক যে একটি ভৌগোলিক সত্তা, তাকে তিনি মাতৃরূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, এই মাতৃভাবনা স্বর্গীয় দেবী-ভাবনার সমতুল্য। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে (স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত নয়) তিনি দেশজননীকে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে একাত্ম বলে বর্ণনা করেছেন।... অন্য কথায়, হিন্দু রাজত্ব স্থাপন এবং তারই অনুপ্রেরণায় ভবিষ্যৎ ভারতকে নির্মাণ করার আদর্শ তিনি (শ্রীঅরবিন্দু) প্রচার করেছিলেন।... হিন্দু ঐতিহ্য আশ্রিত সমস্ত লেখকের দৃষ্টিতেই ... সৃজনধর্মী ও বুদ্ধিমার্গীয় উভয়ত ... শ্রীকৃষ্ণই হলেন একমাত্র পুরুষ যিনি বর্তমানের পরাধীন ও শত লাঞ্ছনায় ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষকে এক শক্তিশালী প্রগতিশীল দুর্জয় সত্তায় রূপান্তরিত করতে পারেন। ... তাঁদের (নেতৃবৃন্দের) সুদৃঢ় বিশ্বাস কেবলমাত্র হিন্দু দার্শনিক চিন্তা, জীবনদর্শন এবং এর সংশেষবাদী ধর্ম দ্বারাই অতীতে এই বিরাট ভূখণ্ড ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জিত ও সুরক্ষিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও পুনরায় সেই আদর্শের শক্তিতেই নবভারতের আবির্ভাব ঘটবে।" (রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ১৯৮২ 'উচ্চারণ' কলিকাতা)।

এ ধরনের এক প্রেক্ষাপটে স্বল্পদিনের ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যের গৌরব রবীন্দ্র প্রতিভার আবির্ভাব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এই প্রতিভা কীভাবে আপন মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কোলকাতার অন্যতম বনেদী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। গবেষক বিনয়ঘোষ বাংলার নবজাগৃতি পুস্তকে

(প্রকাশক: ওরিয়েন্ট লংম্যান: ২য় সং: আষাঢ়. ১৩৯১ : কলিকাতা: পৃ: ৫৯-৬০) এ সম্পর্কে বলেছেন, "বহু বিস্তৃত সমৃদ্ধশালী ঠাকুর পরিবারের প্রধান শাখার আদি পুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।" পরবর্তীকালে এই পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অবিভক্ত বাংলার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বাঙালি বিত্তশালীদের অগ্রণী। বিদেশে নীল ও রেশম রফতানি ব্যবসায় দ্বারকানাথের কর্মদক্ষতা এবং পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন ব্যাংক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়া ছাড়াও তাঁর শিল্পোদ্যোগ লক্ষ করে ইংরেজরা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। (ফিসার্স কলোনিয়াল ম্যাগাজিন : ১৮৪২ : পৃ: ৩৯৪-৩৯৫)।

এই দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔরসে উপমহাদেশের গৌরব এবং এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তৎকালীন কোলকাতা নগরীর একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র পাওয়া যায়। 'ছেলেবেলা' পুস্তকে তিনি লিখেছেন "... তখন কাজের এত বেশি হাঁস-ফাসানী ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা অফিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা আটা, চামড়ার আধঘোষটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচম্যান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, চামরবাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকার, গাড়ি চড়তে ছিল ভারি লজ্জা।"

এহেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ্যভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শাসক ইংরেজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভের প্রত্যাশায় ১৮৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গান

"মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান"

এবং গগণন্দ্রেনাথ ঠাকুরের রচিত "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কী করে... " গান পরিবেশিত হয়। হিন্দুমেলায় প্রথম অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'উদ্বোধন' শিরোনামে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। প্রথম দুটি লাইন হচ্ছে :

"জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান।
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?"

এখানে বিশেষ করে বলতে হয় যে, আলোচ্য সময়ে জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুর পরিবারে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরিবারের বয়োজ্যষ্ঠ প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে হিন্দুমেলার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব কাল থেকে এ ধরনের ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এমনকি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা'রও অন্যতম সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং এ-সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন। "কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়াবাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠানই রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল।... দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর

আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই ভ্রাতার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন এক খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম, যে অহরহ উৎসাহে যেন উড়িয়া চলিতাম।... এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনায় আগুন পোহানো" (জীবনস্মৃতি: রচনাবলী ১০ম পৃ: ৬৭)।

গবেষক ড: প্রভাত কুমার গোস্বামীর ভাষায় বলতে গেলে, "এই উত্তেজনার আগুন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারদের নাটককে স্পর্শ করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটককে স্পর্শ করেনি।... রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পুর্নবয়ব নাটক রাজা ও রানীতে (১৮৮৯) রাজা আছেন, রানী আছেন, মন্ত্রী আছেন... কিন্তু তারা ইতিহাসের কেউ নন। ... এর মধ্যে গ্রথিত তথ্য ও তত্ত্ব কোনোটাই ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু তথাপি নাটকটিতে বিদেশি শাসনের প্রতি বারবার কটাক্ষ থাকায় ইংরেজ সমালোচক এডওয়ার্ড থমসন এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার আভাস পেয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস "বৌঠাকুরানীর হাট' ১৮৮১ সালে রচনা করলেও ('ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৮-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত) ১৮৮৩ সালে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে এর নাট্যরূপ দেন ১৯০৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটিকা 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকদের মতে এটা হচ্ছে "গাঁথা-কাব্য" তাই সত্যিকারভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক রচনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক থেকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ ধরনের একটা পারিবারিক পরিবেশ এবং তৎকালীন কোলকাতার বর্ণ হিন্দু বাঙালিত্বের ধূলিঝড়ের মাঝে থেকেও তিনি কেমন করে 'রাজা ও রানী' নাটকে মুক্তবুদ্ধি মনমানসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হলেন? তিনি কেমন করে এই রূপক নাটকে মূল শত্রু বিদেশী পরাশক্তিকে চিহ্নিত করে কটাক্ষ করলেন? এর জবাবে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এটাই ছিল হিমাচল সদৃশ রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষের যুগ। মাত্র ১২ বছর বয়সে থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অবিশ্রান্তভাবে কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে গেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা 'অভিনাষ'।

এখানে লক্ষণীয় যে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলায় নবম অধিবেশনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কিন্তু কবিতাটির কোথাও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি কটাক্ষ কিংবা হিন্দু বাহুবল ও বীর্যবত্তার অহেতুক গুণকীর্তন নাই। কবিতাটিতে তিনি কেবলমাত্র দেশ-বন্দনা করেছেন। কবিতার অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

> "ভারত কঙ্কাল আর কি কখন,
> গাইবে হায়রে নতুন জীবন,
> ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
> আর কি কখন দিবে সে জ্যোতি।"

অথচ এরই পাশাপাশি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ ঔপনাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর 'রাজসিংহ' উপন্যাস-এর প্রতি আলোকপাত করা সমীচীন হবে। অবশ্য এর আগেই বঙ্কিম-এর 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি রচনা করেন। কিছুদিনের মধ্যে এই উপন্যাস-এর তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণ নিঃশেষিত হলে ১৮৯৩ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে

রাজসিংহ উপন্যাস-এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই ৪র্থ সংস্করণের ভূমিকায় লিখলেন, "ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তারা পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুলবই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি 'রাজসিংহ' লইয়াছি।"

এই 'রাজসিংহ' গ্রন্থেই বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরিভাবে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব-কে 'ধূর্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক" প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই এই ভারতভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায় বিশেষের মন আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলা যায়। উপরন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রায়শই সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ভেবেছিলেন তিনি 'হিন্দুবাহুবল'-এর পক্ষে সোচ্চার এবং বাঙালি তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার 'মহান ব্রতে' লিপ্ত হয়েছেন।

১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৮৩ সালেই শ্রী কেদার চৌধুরী এর নাট্যরূপ দান করে কোলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হলে একথা পরিস্ফুট হয় যে, বঙ্কিম প্রতিভা সাম্প্রদায়িক কেদাক্ত আবর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর চিন্তাধারা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সংকীর্ণ ও বিপথগামী ছিল।

এক্ষণে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবিভক্ত বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। কোলকাতায় যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই ঠাকুর পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে পরাশক্তি ইংরেজদের বদৌলতে সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে উর্ধ্বমুখে ধাবিত। রবীন্দ্রনাথ যখন কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করছেন তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী পৃষ্ঠপোষকতার একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর নেতৃস্থানীয়রা তখন ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণে বাঙালার নব জাগৃতির দাবিদার এবং 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর লক্ষ্যে একটা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

কৈশোরের প্রান্তসীমায় এসে রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব করলেন যে, স্বীয় অগ্রজ এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 'হিন্দুমেলার' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার প্রচেষ্টা করছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাধারে হিন্দু সমাজ-সংস্কারক ও প্রখ্যাত নাট্যকার হিসাবে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পুরোধা এবং অন্যদিকে উদীয়মান রাজনীতিবিদ ও 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর প্রবক্তা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-কাব্যের 'ব্রিটিশ' শব্দ বদল করে 'মোগল' বসালেন

তাই একথা অনুধাবন করা সঙ্গত হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রবীন্দ্রনাথকে নীরবে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় রচিত সাম্প্রদায়িক নাটকগুলোতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'পুরুবিক্রম' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৭২) রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গান, 'সরোজিনী' (১৮৭৫) নাটকের শেষ অংকে "জ্বল, জ্বল, চিতা। দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।" গান এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজবিরোধী একটি কবিতাকে বদলিয়ে ব্যবহার করেছেন। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের

একটি আইন অনুসারে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি দেওয়া হলে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করেন। ১৮৭৬ সালেই লর্ড লিটন 'নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন', 'অস্ত্র আইন' এবং 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিল্লীর দরবারকে উপলক্ষ করে একটা চমৎকার ইংরেজবিরোধী কবিতা রচনা করেন। কিন্তু রবীবন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮২ সালে তাঁর রচিত চরম সাম্প্রদায়িক 'স্বপ্নময়ী' নাটকে এই কবিতাটি শুভ সিংহের কণ্ঠে ব্যবহার করলেন।

আলোচ্য কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

"তোমারে শুধাই হিমালয়গিরি,
ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা,
কিসের হরষে গাইছে গান?...
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি,
আমরা ধরিব আরেক তান।"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় যেসব জায়গায় "ব্রিটিশ" শব্দ ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেসব জায়গায় দিব্বি "মোগল" শব্দ বসিয়ে স্বীয় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করলেন। পশ্চিম বাংলার গবেষক শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর মতে, "রবীন্দ্রনাথের দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতা অদলবদল করিয়া আশ্রয় পাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটক।" (ভারতে জাতীয় আন্দোলনঃ কলিকাতা ১৯৬৫ : পৃঃ ৮৩)

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটক সম্পর্কে গবেষক ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামীর সভ্যভাষণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "... কিন্তু কাহিনী যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার অবকাশ ছিল কম। এতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। অত্যাচারী শুধু রাজশক্তি নয়, গোটা মুসলমান সমাজই। স্বপ্নময়ী বলছেন :

... দেবমন্দির সকল
চূর্ণচূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদমন্ত্র ধর্মকর্ম করিতেছে লোপ
গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে। (৩/৩)

এই শুভসিংহের উক্তির হুবহু প্রতিধ্বনি। অন্যত্র সুরজমল বলেছেন : "যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়।" (ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী: দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক: ১৩৮৫ সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা)

এ ধরনের বিরাজমান নিদারুণ এক পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সত্ত্বেও মানব প্রেমিক রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচ্ছুরণকে কেউই প্রতিহত করতে পারেনি। উদ্দাম জলরাশির মতো এই প্রতিভা সম্মুখপানে ধাবিত হলো। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের যেসব ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন সেগুলো

হচ্ছে– কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ। এসবের মধ্যে তাঁর রচিত কাব্য সম্ভারকে অগাধ সমুদ্র হিসেবে উল্লেখ যথার্থ হবে। গবেষকরা আলোচনার সুবিধার্থে রবীন্দ্র কাব্যকে সূচনা পর্ব, উন্মেষ পর্ব, ঐশ্বর্য পর্ব, অন্তর্বর্তী পর্ব, গীতাঞ্জলী পর্ব, বলাকা পর্ব এবং অন্তপর্ব এই ৭টি অধ্যায়ে চিহ্নিত করেছেন।

এক্ষণে ধাপেধাপে রবীন্দ্রনাথের মনমানসিকতা কীভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ গড়ে উঠেছিল, তা সঠিকভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপরিহার্য বলে মনে হয়। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজর্ষি' নামক উপন্যাস-এর প্রথমাংশ নিয়ে পাত্র-পাত্রী কিছু অদলবদল করে রচনা করেছেন। 'রাজর্ষি'-এর কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।"

(রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকা এবং 'জীবন স্মৃতি')

১৮৯০ সালে রচিত 'বিসর্জন' নাটকটি স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপরিবারের ভ্রাতৃ কলহের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই তত্ত্ববাহী নাটকটির কোথাও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও হিংসাত্মক প্ররোচনা কিংবা দেশাত্মবোধক কোনও সংলাপ পর্যন্ত নাই। নাটকটির তত্ত্ববাহী বক্তব্য হচ্ছে, প্রেমের পথ ও হিংসার পথ এক নয়। হিংসার পথে দেবতার পূজা হয় না। প্রেমেই কেবলমাত্র তা সম্ভব। কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকের মূল বক্তব্যকে এড়িয়ে শুধুমাত্র সিংহাসনের দাবিদার দুই বৈমাত্রেয় ভাই-এর কলহের হিসেবে পার্শ্বচরিত্র জয়সিংহ এবং রাজপুরোহিতদের সংলাপের জন্য কোলকাতার তৎকালীন পুলিশ নাটকটি লালবাজার থানায় আটক করে। রাজ পুরোহিত রঘুপতির একটি সংলাপ হচ্ছে :

"... কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।
এজগৎ মহা হত্যাশালা।"

অবশ্য পরবর্তীকালে বাধ্য হয়ে 'বিসর্জন' নাটকটির অংশ বিশেষ (ইংরেজ আমলে পুলিশের দৃষ্টিতে আপত্তিকর) বাদ দিলে মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এতসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর মুক্তবুদ্ধি মনমানসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণতার আবরণে সংকীর্ণতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতা তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। মানব প্রেম এবং শাশ্বত প্রকৃতির প্রতি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমকে তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন। তাই তিনি মূল শত্রু পরাশক্তি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়েও তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশে দ্বিধা বোধ করেন।

১৮৯৯-১৯০২ সালে ইংরেজরা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র জাতির স্বাধীনতা হরণ করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হচ্ছে :

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উম্মাদ, রাগিনী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।...
(নৈবেদ্য ৬৪ এবং ৬৫ নং কবিতা)

এই প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। আর বাকি প্রায় সবারই বক্তব্য মোটামুটিভাবে একসূত্রে গাঁথা। একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এঁদের কোথাও কোনো ছন্দ পতন নেই। পরাশক্তির শাসনকে মেনে নিয়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক এক শক্তিশালী বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী গড়ে তোলাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। তাই সে আমলের কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সমাজ সেবক, ধর্মপ্রচারক আর রাজনীতিবিদ সবারই লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন।

তাইতো ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' বছরে ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ৪০টির মতো কৃষক বিদ্রোহের কোনোটাই এঁদের সমর্থন লাভ করেনি : বরং চরম বিরোধিতা পেয়েছে। এঁরা ছিলেন সব সময়েই সমাজ ও শ্রেণী সচেতন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বহু ঘাত-প্রতিঘাতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাঙালি-গুজরাটি-মারাঠা মিলনের মাঝ দিয়ে যখন এঁরা ছত্রপতি শিবাজীর বীরত্ব গাঁথাকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে "হিন্দু রিভাইভালিজম"-এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল, ঠিক তখনই লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত সব কিছুকেই লণ্ডভণ্ড করে দিল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'হিন্দু রিভাইভালিজম'-এর মূল চালিকা শক্তি কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণ হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তরা নিজেদের অস্তিত্ব এবং প্রভুত্ব রক্ষার তাগিদে পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে তাঁদের এতদিনের মিত্রতা বিনষ্ট করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সমসাময়িককালের এই চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন এবং কিয়ৎকালের মধ্যে এই আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ইতিহাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ ছাড়াও কোন্ প্রেক্ষাপটে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল আর বিত্তশালী সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে "হিতাহিত জ্ঞানশূন্য" অবস্থায় মেতে উঠেছিল ইতিপূর্বে তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কোলকাতার টাউন হলে প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সভায় যেসব শ্লোগান উচ্চারিত হয়, সেগুলো হচ্ছে, "সংযুক্ত বাংলা চাই", "ব্যবচ্ছেদ চাই না" এবং "বন্দেমাতরম" ইত্যাদি। এর মাত্র ১৮ দিন পর ২৫শে আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরও একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লিখিত 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এতে তিনি 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' সংক্রান্ত কয়েকটি বিতর্কমূলক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই সে আমলের চরমপন্থী বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের নিকট এই আলোচনা খুব একটা মনঃপুত হয়নি।

অতঃপর ২২শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় 'মিলন মন্দির' তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ৯ই অক্টোবর ছিল হিন্দুদের 'বিজয়া দশমী।' এই দিন কোলকাতার বাগবাজারে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া সম্মেলন' নামে এক ভাষণ দান করেন।

এই ঐতিহাসিক ভাষণের অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ করো। ... যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্টগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।... একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো–

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।...
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যতো ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

(রচনাবলী পৃষ্ঠা : ১০৮৫-১০৮৯)

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সে আমলে বাঙালি বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ যখন সম্প্রদায়গত স্বার্থে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে দারুণভাবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল, তখন ঘটনা প্রবাহে আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করেও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও মনমানসিকতা ছিল বেশ কিছুটা ভিন্নধর্মী। 'বঙ্গদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এসময় রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম মিলনের লক্ষ্যে "রাখী বন্ধন" অনুষ্ঠানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ফলে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন) আইনগতভাবে বঙ্গভঙ্গের দিনটিতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা তাঁদের কর্মসূচীতে "রাখীবন্ধন'-এর অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করেন। এদিন সমগ্র বাংলায় সভা-সমিতি, 'হরতাল' এবং 'অরন্ধন' ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়। "অরন্ধন" অর্থাৎ কোনো গৃহের রন্ধনশালার চুল্লীতে আগুন না জ্বালানোর প্রস্তাবক ছিলেন প্রখ্যাত প্রবন্ধকার আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ঐদিন সকালে 'বন্দেমাতরম' গান গেয়ে প্রভাত ফেরি ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা গঙ্গায় অবগাহন করে। এরপর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে "রাখীবন্ধন" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসময় অসংখ্য পথচারীর হাতে "রাখী" বেঁধে দেন। বিকেলে রোগজর্জর প্রবীণ ব্রাহ্মণনেতা আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে কোলকাতার ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাবেশে প্রস্তাবিত মিলন মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গবেষক হেমেন্দ্রনাথ রচিত 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (২য় খণ্ড পৃ: ৩৩-৩৫) গ্রন্থ মোতাবেক এই অনুষ্ঠানে আনন্দমোহন বসুর লিখিত ইংরেজি ভাষণটি পাঠ করেন আশুতোষ চৌধুরী (প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

মিলন মন্দিরের অনুষ্ঠানের পর এক বিরাট জনতা নগ্নপদে শোভাযাত্রা সহকারে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা পশুপতি বসু মহাশয়ের বাগবাজারের বাসভবনে গমন

করে। এখানে উল্লেখ্য যে, শোভাযাত্রীরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত যে দু'টি গান সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিল, সে দু'টি হচ্ছে:

ক. 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে।'
খ. 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান।'
(গীতবিতান ১, পৃ ২৬৫-২৬৬)

'আমার সোনার বাংলা' গান রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি

কবি রবীন্দ্রনাথ এ সময় মাতৃভূমির বন্দনামূলক অনেক ক'টি সঙ্গীত যে রচনা করেছিলেন তাই-ই নয়, তিনি সব সঙ্গীতের মাধ্যমে গণমানুষের হৃদয়কে জয় করার জন্য সবিশেষ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, এসব সঙ্গীত যেন অচিরেই একটা সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িকভাবে তাঁর রচিত অধিকাংশ সঙ্গীতে অত্যন্ত সার্থকভাবে কীর্তন, বাউল, লালন, রামপ্রসাদী ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হচ্ছে, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।" রবীন্দ্রনাথ সেদিন চিন্তাও করতে পারেননি যে, ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মাত্র ৬৬ বছরের ব্যবধানে কোলকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গীয় রাঢ় অঞ্চলকে বাদ দিয়ে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার সমন্বয়ে বাংলাদেশ নামে এটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হবে এবং প্রকৃত বাঙালি জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি বাংলাদেশ তাঁরই রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করবে। আর এই বাংলাদেশই নতুন উদ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ইতিহাস এবং বাঙালি সংস্কৃতির চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হবে।

তবে তিনি এটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সমসাময়িককালে বাংলা ভাষা-ভাষী এলাকায় কোলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের অবহেলিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে যাচ্ছে তার ফল কোনো অবস্থাতেই শুভ হতে পারে না। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বর্ণহিন্দু সমাজ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার মৌল উৎস এবং এর ঢক্কা নিনাদ হচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ সংকেত। এ জন্যই তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখলেন :

> "মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।...আমরা (বর্ণহিন্দুরা) যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃখের মানুষ, তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা

বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না।...আমাদের পাপই ইংরেজদের প্রধান বল।" (রচনাবলী ১২, পৃঃ ৯০৫-৯১৪)।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারিতেও নেতৃবৃন্দের কোনোরূপ চৈতন্য হলো না বলা যায়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তার আপন গতিতে ধাবিত হলো। এমনকি নরমপন্থী বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদদের শূন্যগর্ভ বাগ্মিতায় সাময়িক উত্তেজনা আর অন্যদিকে সনাতন হিন্দু ধর্মের আবরণে অর্থাৎ কালী মন্দিরে দীক্ষা ও শপথ গ্রহণ অন্তে ভয়ংকর সন্ত্রাসের সূচনা। আন্দোলনের সর্বস্তরেই মানব-প্রেম আর উদার হৃদয়ের মারাত্মক অভাব রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলল। পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় মানসিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন :

> "হিন্দু-পল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে, যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে 'আইডিয়ালাইজ' কোনো আত্মঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আমার ইচ্ছাই হয় না।" (জীবনী ২ পৃঃ ২২৯)।

তা'হলে একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সংগঠন পর্বে এবং প্রারম্ভিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও নানা অর্থবহ কারণে অচিরাৎ তাঁর মধ্যে ব্যাপক মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সহকর্মীদের মধ্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব, এক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের উত্তেজনাময় শূন্যগর্ভ বক্তৃতা, গ্রাম উন্নয়নের সুষ্ঠু প্রস্তাবনার অভাব, রক্তাক্ত সন্ত্রাসের গুপ্ত পদ্ধতি এবং হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তারাজ্যে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হলো। সামগ্রিকভাবে দেশের গণমানুষের কল্যাণের পরিবর্তে শুধুমাত্র কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার বিষয়টাতে তিনি স্বীয় বিবেকের সমর্থন পেলেন না।

তাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯০৫ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক উত্তেজনার সামিল ছিলেন মাত্র মাস তিনেকের জন্য। এর পর তিনি অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং মানুষকে বিস্ময়বিমূঢ় করে স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। এ সময় দেশে বিরাজমান সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মনকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে তার এই মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কালিদাস নাগকে লিখিত এক পত্রে মন্তব্য করলেন, "হিন্দু ধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয়নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমারও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়?...

ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তার

পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। (রচনাবলী ১৩, পৃ: ৩৫৭)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় এক শ্রেণীর বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের উত্তেজনাময় শূন্যগর্ভ বক্তৃতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি এ সবের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "দেশে যদি বর্তমানকালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মতো লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা।...উন্মাদনায় যোগ দিলে কিৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। (জীবনী ২, পৃ: ১৭৫)।

এসব কারণের জের হিসেবে এবং প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝ দিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকস্মিক সিদ্ধান্তে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। এ সময় তাঁর চিন্তা রাজ্যের প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই, 'বিদায়, 'প্রতীক্ষা' এবং 'সব-পেয়েছির দেশ' প্রভৃতি কবিতায়। এসব কবিতায় তিনি অক্ষমতার কথা বলে রাজনীতির বিগত দিনের সহযাত্রীদের নিকট ক্ষমতা প্রার্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করে বলেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে বিগত দিনের রাজনৈতিক আদর্শ মিথ্যা এবং মূল্যহীন। 'বিদায়' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখলেন :

'রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাষা গড়া,
মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া,
আলবালে জলসেচন করা
উচ্চ শাখা স্বর্ণচাপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।"
(রচনাবলী ২, পৃ: ১৯৫-১৯৬)

এখানে উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রথমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ডামাডোল এবং এরই প্রেক্ষাপটে রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন আদর্শগত কারণে এসবের সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং পত্র-পত্রিকাগুলো তাঁকে "ইংরেজ শাসকের পক্ষভুক্ত" চিহ্নিত করে কীভাবে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছিল, এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও তাঁর কিঞ্চিৎ বর্ণনা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ সময় লিখলেন, "দু'বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়ুবিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রুকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।...স্বদেশী আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় তাঁহার এক একটা নতুন গান বা কবিতা বাহির হইত,. আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিস্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই, কিন্তু সে সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের' অনুগ্রহ লইব

না, ইংরেজের শাসনতন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফলাফি করিয়া আসিতেছি। এবং ইংরেজ রাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিস্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ওপথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪, রচনাবলী ১০, পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫)

এ সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর রচিত 'স্বদেশী ধুয়া,' 'জাতীয় একতা' এবং 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি' ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি' নিবন্ধে শ্রী শাস্তরী এ মর্মে মন্তব্য করলেন যে, স্বদেশ প্রেম আদর্শ হিসেবে অতীতকে গৌরবান্বিত করে, উন্নতিবিধানের কথা বলে না এবং যা ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা প্রেম নয়, ব্যাধি।' সমালোচক প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বরীন্দ্রনাথ-এর ভূমিকার প্রতি কটাক্ষ করে মন্তব্য করলেন, "কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু কথাও বা নয় কেন? অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমরা বন্ধ করব কেন? স্বীকার করি, অনেক কথা বাজে খরচ করা হয়েছে, কিন্তু তার সবই কি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে?' (সুমিত সরকারকৃত দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৫৮)

গোত্রান্তরিত রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ জবাবদান

কিন্তু রবীন্দ্র রচনাবলী সঠিকভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও যথাসময়ে এসব সমালোচনার বলিষ্ঠ জবাব দিয়েছেন। সে আমলে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যথার্থ পর্যালোচনা করলে একথা নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানের মাত্র মাস তিনেক সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানো খুবই অর্থবহ ছিল। স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুধু সরে দাঁড়ানোই নয়—রবীন্দ্রনাথ এরপর প্রায় এক বছরকাল নিশ্চুপ ছিলেন। যখন কবি আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন, তখন তাঁর ভিন্ন রূপ—ভিন্ন পথ এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, তিনি এ সময় সম্পূর্ণ ভিন্নদর্শে পথযাত্রী হলেন। রবীন্দ্রনাথের মনন জগতে উত্তরণ হলো। গবেষক ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, "আসলে এমনিভাবে তাঁর মধ্যে দিয়ে কালের আন্তর গরজ অভিব্যক্তি লাভ করে; বলা যায়, এর বিবর্তন ঘটে প্রায় দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পারস্পর্যের পথে।...বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি ও কর্মপন্থা তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ঘৃণা করেছেন, ...স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের সরে দাঁড়ানো নিছক সরে দাঁড়ানো নয়, এ যেন তাঁর গ্রোত্রান্তর। নিঃসন্দেহ যে, এই আন্দোলন যে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে তা থেকে কিছু কিছু সমস্যা উদ্ভূত হয় যা চিন্তাশীল মানুষকে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন করে; এর প্রধান হলো হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা।...এ যেন তাঁর মানপ্রকৃতির অন্য এক অভ্যুদয়। এই নতুন অভ্যুদয়ের আলোকে তিনি ফেলে আসা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের কঠোর নিস্পৃহ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হন।"

এসব ঘটনার প্রায় দশ বছর পরে ১৯১৬ সাল নাগাদ,অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার লাভেরও বছর তিনেক অতিবাহিত হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করলেন তাঁর অনন্য সাধারণ উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'। অতীতে যারা 'নীতিভ্রষ্ট', 'কাপুরুষ' এবং 'পলায়নী' মনোবৃত্তি' হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন, এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি সুতীক্ষ্ণ ভাষায় জবাব দান করলেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ-এর মুখ-নিঃসৃত সংলাপে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্থান পেলো। এর একটি বক্তব্য হলো, "আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি, এতে সকলের অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে, আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিশকে

ভয় করি। পুলিশ ভাবছে, ভিতরে আমার কুমতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি। কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না—চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয়—তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যের উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ।"

এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সন্দ্বীপ-এর মধ্যে। সন্দ্বীপ হচ্ছে নিখিলেশের বন্ধু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখে সন্দ্বীপ হচ্ছে লোভী, বিবেকহীন এবং ইন্দ্রীয়পরায়ণ। বন্ধু নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার প্রতি সন্দ্বীপের দৃষ্টি কামাতুর। সন্দ্বীপের সংলাপ হচ্ছে, 'আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনই দগ্ধ না করে তখনই ছাই হয়ে যায়। যখনই কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয় তখনই পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি"।

অবশ্য ১৯০৮ সালে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও রবীন্দ্রনাথের এই গোত্রান্তরিত চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' বক্তৃতায় এবং 'সদুপায়', 'দেশহিত', 'পথ ও পাথেয়', 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রভৃতি নিবন্ধে একই মনমানসিকতা প্রদর্শনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। রবীন্দ্র রচনাবলী ১২, পৃষ্ঠা নং-৯১৮-৯২০-তে সংকলিত 'দেশহিত' প্রবন্ধে তিনি স্বদেশী রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, "কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে।... অধর্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশে কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তার বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত করলেন। "স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে— নতুন বা পুরাতন যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়? তাঁহাদের প্লান কী? তাঁহাদের আয়োজন কী? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই— ইহা মনুষ্য স্বভাবের ধর্ম— কেবল মদ যোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদে যেন লইয়া যাওয়া না হয়।"

সমসাময়িককালে রবীন্দ্র মনমানসিকতার উত্তরণ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর অরবিন্দু পোদ্দার-এর মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "সেই প্রতিক্রিয়া ব্যাপকতায় এত উপপ্লাবী যে, ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি থেকে ১৯০৭ সনের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় এক বছর তাঁর রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল। আর সেই নীরবতা যখন তিনি ভঙ্গ করলেন, দেখা গেল তাঁর কণ্ঠে অন্য সুর আরেক ভাষা। এ যেন অন্য এক রবীন্দ্রনাথ,

স্বদেশী যুগের ঐশ্বর্যশীল অভিব্যক্তিতে প্রাণবন্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিবেশ, বিশেষত নিছক বাগ্মিতায় অভ্যস্ত নেতৃবৃন্দের মনোভঙ্গির সমালোচনায় তিনি অধিকতর নির্মম ও বলিষ্ঠ এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ অপ্রত্যাশিত রকমের প্রচণ্ড; হিংস্র। অপর পক্ষে, তিনি স্বয়ং এক কল্পনাতীত রাজনৈতিক বন্দরের অভিমুখে সমুদ্রাভিসারে উদ্যোগী" (রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-পৃ: ১৪৬, 'উচ্চারণ' কলিকাতা)

এ সময় রবীন্দ্রনাথের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তাধারার বিশেষণ করে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড: অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় যে সত্যভাষণ করেছেন তা' এক কথায় অপরূপ এবং বস্তুনিষ্ঠ। তিনি লিখেছেন, "বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। সে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, বাঙালি ও ভারতীয় জীবনধারার সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন, শুধু বিদেশী শাসকশক্তির বিরুদ্ধে নিস্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং স্বদেশীক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদী হিংসা, স্বদেশীয়ানার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভলালসা এবং হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি উগ্র হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নিল। রবীন্দ্রনাথ মনের আকাশকে কখনোও খণ্ড খর্ব করে দেখতে চাননি, স্বদেশ প্রেমের স্থলে রক্তশোষী উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেননি, শাসকের বিরুদ্ধে গুপ্ত অভিযানের রক্তাক্ত পরিণাম কোনো দিন মেনে নিতে পারেননি।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৪র্থ সং, পৃ: ৬২৯)

ড: বন্দোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আরও লিখেছেন, "কিন্তু তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বেশিদিন এইভাবে আত্মরসে নিমগ্ন থাকতে পারলেন না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে যুব শক্তি যখন সন্ত্রাসবাদের গোপন গুহায় বিস্ফোরক সঞ্চিত করছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই রাজনৈতিক দলাদলি ও রক্তাক্ত বিদ্বেষের মধ্যে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সন্ত্রাসবাদের চাপা গর্জনকে উপেক্ষা করে খেয়াতরী নিয়ে অকূলে ভাসলেন। ক্লান্ত কবি বলে উঠলেন :

> "বিদায় দেহ ক্ষম আমার ভাই,
> কাজের পথে আমি তো আর নাই।"

এবার কবি দলাদলি, দলভাঙা প্রভৃতি বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিলেন। কারণ তখন তিনি ক্লান্তশ্রান্ত চিত্তে ওপারের দিকে চেয়ে "দুঃখযামিনীর বুকচেরা ধন" প্রত্যক্ষ করলেন–এবার 'চিত্রা' 'কল্পনার' জগত ছেড়ে নতুন জগতের দিকে তিনি খেয়া নৌকা ভাসালেন–এ হলো 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতামাল্যে'র যুগ। একদিকে রূপজগৎ আর একদিকে অরূপজগৎ– এই দুয়ের মাঝখানে 'খেয়ার' জগৎ। খেয়া নৌকা যেমন এ ঘাট থেকে অপর ঘাটে পাড়ি দেয়, তেমনি কবি প্রেম-সৌন্দর্যের জগৎ ছেড়ে ভক্তি ও আধ্যাত্ম সাধনার জ্যোতির্ময়লোকে যাত্রা করেন। (তদেব, পৃ: ৫৯৭)।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিরাজমান অবস্থা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোলকাতা কেন্দ্রিক প্রভাবশালী বর্ণ হিন্দু লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোকপাত করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা 'সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ২৩তম পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্কিমপ্রভাবের রেশ মিলিয়ে যায়নি, রবীন্দ্র প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ

সম্বন্ধেও অনেকের সংশয় ঘোচেনি। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল– এ'রা রবীন্দ্র সাহিত্য ও আদর্শ সম্বন্ধে এই সময় থেকেই প্রতিকূল স্রোতে সমালোচনার তরণী ভাসিয়েছিলেন, কেউ কেউ দুর্নীতির অভিযোগ এনে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সাধনাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিলেন। এর যুগের উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের একচক্ষু নীতি কবিগুরু সমর্থন করেননি। যিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহী নেতা ছিলেন, তিনি এর মধ্যে রক্তাক্ত সন্ত্রাসবাদের গূঢ়চারী গতায়াত দেখে এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করলেন এবং মানুষ তৈরির কাজে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর এই রাজনৈতিক অনীহাকে কেউ কেউ ভীরুতা অপবাদে নিন্দা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সমাজে ব্রাহ্ম মতাদর্শ স্বাভাবিক কারণে হীনবল হয়ে পড়লে এবং সংস্কারকামী হিন্দু সমাজ পুনরুত্থিত হলে তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত মনে করে কেউ কেউ তাঁর সর্ববিধ কর্মের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়লেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলোর বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে দুর্নীতিপূর্ণ অশ্লীলতার অভিযোগ আনলেন, তাঁকে নিন্দা করার জন্য 'আনন্দবিদায়' নামে বিদ্রূপপূর্ণ রঙ্গনাট্য লিখলেন। অবশ্য তার জন্য তিনি সকলের কাছে নিন্দিতও হয়েছিলেন।

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরাণাচারী হিন্দুধর্মের যে পুনরুত্থান ঘটল, তারই মুখপাত্র হিসেবে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিতবাদী' (১৮৯১), সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' (১৮৯০) প্রভৃতি পত্রে হিন্দুধর্ম ও সমাজবিষয়ক কিছু কিছু রক্ষণশীল মত প্রচারিত হতে শুরু করল। অপরদিকে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা আবার বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিছু হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কার, তাকেই যেন বিদ্ধ করতে লাগল। ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান হলে নব্য-হিন্দুধর্মের প্রচারক তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের কেউ কেউ উল্লিখিত হিন্দুসমাজের মুখপত্রস্বরূপ পত্রিকাগুলোতে যোগদান করলেন, যাঁদের অনেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমর্থক ছিলেন না। বিশেষত রবীন্দ্র রচনা এমন একটা সুক্ষ্ম মানসিক অনুশীলন ও স্থিতধী চেতনারসের বস্তু যে, দ্বৈরথ সমরে অভিলাষী সূক্ষ্মবোধহীন ব্যক্তির পক্ষে তার গহনে প্রবেশ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌঁছলে রবীন্দ্রবিরোধী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের বিষোদগার যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তা নয়। একটু পরবর্তীকালে যখন রবীন্দ্র প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো খ্যাতির তুঙ্গ শিখরে উঠেছে, তখনও কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি নিন্দার তূণ থেকে দুটি-চারটি শায়ক নিক্ষেপ করতে লাগলেন। অবশ্য এবার বিরোধ ব্যক্তিগত নয়, সাহিত্যাদর্শ নিয়েই তাঁর সঙ্গে নবীন ও প্রাচীনের দল বিবাদ-বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র এবং নবীনতর সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রসাহিত্য যথেষ্ট বাস্তব নয় এবং তাতে যুগযন্ত্রণা ফোটেনি, এই ধরনের অর্ধসামাজিক প্রশ্ন তুলেছিলেন। এদের কারও কারও সঙ্গে তিনি বিতর্কে অবতীর্ণ হতেও বাধ্য হন।"

রবীন্দ্র-সংকলন থেকে 'শিবাজী উৎসব' কবিতা বাদ হলো

এজন্যই আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার মুল্যায়নকালে দেখতে পাই, যে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে সখারাম দেউস্কর কৃত 'শিবাজীর দীক্ষা' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে যেয়ে শিবাজীর বন্দনা করে 'শিবাজী উৎসব' কবিতা রচনা করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে তাঁর চিন্তাধারার

আমূল পরিবর্তন হওয়ায় কোনো কোনো সংকলন থেকে এই কবিতাটি বাদ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। 'শিবাজী উৎসব' কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ :

'মারাঠার সাথে আজি হে বাঙালি
এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজী
মারাঠার সাথে আজি হে বাঙালি
এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।'

কোনো কোনো সংকলন থেকে আলোচ্য কবিতাটি বাদ দেওয়া ছাড়াও পরবর্তী সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এসব ব্যাপারে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "... তার মধ্যে আবার আজকাল এক উৎপাত জুটেছে, আমার কর্তাদের মাথায় ঢুকেছে ইতিহাস রক্ষা,– কোথা থেকে সব কবর খুঁড়ে এনে হাজির করে বলে আমার রচনা, সে দেখলে লজ্জায় মরে যাই। বলতে ইচ্ছে করে সে তোমার লেখা, কিন্তু তা হবার নয়– ছাপার অক্ষরে একবার কালি পড়লে সে কলঙ্ক আর ঘুচবে না,–ইতিহাস রক্ষা! আরে কাব্যের আবার ইতিহাসের দরকার কি? তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই আছে, ফুলের মূল্য বুঝতে গেলে কি তার শিকড় উৎপাটন করতে হবে? সৃষ্টিকর্তা আপনিও তো তাঁর নিজের রচনা সংশোধন করে চলেছেন। নির্মম হাতে মুছে ফেললেন কত অসমাপ্ত সৃষ্টি। কত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আজকের মানুষ তৈরি হয়েছে,–সে সব চাপা পড়ে গেল, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।" [মৈত্রেয়ী দেবী কৃত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' : ১০ মুদ্রণ: ১৯৮৫ কলিকাতা]

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে'– রবীন্দ্রনাথ

তা'হলে একথা যথার্থভাবে বলা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তপ্ত পরিবেশে কবি রবীন্দ্রনাথের গোত্রান্তর হলো। তাঁর অন্তর্যামী সুদূর দিগন্তের সীমারেখা ছেড়ে অসীমের পানে ধাবিত হলো। দীনতা, হীনতমন্যতা এবং সংকীর্ণতা সবকিছুকেই তিনি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার জটিলতা তাঁর মানস জগতে যে উথাল-পাতালের সৃষ্টি করেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই সংঘাতের পীড়ন থেকে মুক্তিলাভে সক্ষম হলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদাকে– তিনি মানব গোষ্ঠীর অবিভাজ্য চেতনার মাঝে স্বীয় আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা নতুন সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল হলো। তিনি মানবপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের সুগভীর সলিলে অবগাহন করে নবজন্ম লাভ করলেন। অচিরকালের মধ্যে তাঁর লেখনী দিয়ে সৃষ্টি হলো তিন তিনটি অমর কবিতা :

ক) হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে–
খ) যেথায় থাকে সবার অধম দীন হতে দীন
গ) হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুহৃদ শ্রী কালিদাস নাগ মহাশয়কে প্রেরিত পত্রে স্বীয় চিন্তাধারার মর্মবাণী সুস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন, "... শুভ চেষ্টা দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও– যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো, রুদ্ধদ্বারে আঘাত করো, বারম্বার আঘাত করো– কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।" (রচনাবলী ১২ পৃ., ১০০৩)

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, গীতাঞ্জলি পর্বে এসে রবীন্দ্রপ্রতিভা পূর্ণতা লাভ করল। মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, বৈষ্ণববাদ আর সুফী মতবাদের উদারতার সজীব স্পর্শে এই প্রতিভা

সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করল। গবেষক ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে "... আবার এই পর্বটির বৈশিষ্ট্য বিচার করে একে রবীন্দ্র কবি জীবনের আধ্যাত্মপর্বও বলতে পারা যায়। কারণ এই তিনখানি (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্যও গীতালি) গীতিসংগ্রহের মূলকথা কবির সঙ্গে তার ঈশ্বরচেতনার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ। এর আগে 'খেয়া' কাব্যে দেখা গেছে, কবি বস্তুলোকের ঘাট ছেড়ে অন্তর্লোকের সুদৃঢ় যাত্রী হতে চেয়েছেন...গীতাঞ্জলিতে সেই অন্তলোর্কের রহস্য ধরা দিয়েছে। কবি এই গীতি সংগ্রহে অন্তর দেবতাকে প্রিয়রূপে সখারূপে, প্রাণেশরূপে–মানবসম্পর্কের বিভিন্ন রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করলেন।...তীব্র বিরহের আর্তি ও মিলনের পিপাসা আধ্যাত্ম রেণুরঞ্জিত হয়ে এই গীতিনিবেদনকে সত্যকারের কাব্যরূপ দান করেছে। 'চিত্রা' থেকে 'কল্পনা', 'খেয়া' পর্যন্ত জীবনদেবতা, মানসসুন্দরী অন্তর্যামী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কবিমানস বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে অগ্রবর্তী হচ্ছিল, 'গীতাঞ্জলি'তে তারই স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম লক্ষ করা যাবে। যাঁরা কাব্য থেকে ব্যক্তিচেতনার গভীর আধ্যাত্ম উপলব্ধি বাদ দিতে চান, তাঁরা পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য থেকে বঞ্চিত হবেন–রবীন্দ্রনাথকেও যথার্থ ধরতে পারবেন না।...'গীতালি'-তে আধ্যাত্ম চেতনার আর এক ধরনের বৈচিত্র্য দেখা গেল। এটি মূলত গীতিসংগ্রহ–তত্ত্ব নয়, আধ্যাত্ম সাধনাও নয়। কবির প্রাণেশ দেখা দিলেন প্রেমিকের বেশে–এবং উভয়ের মধ্যে লীলারসের সম্পর্ক ফুটে উঠল। তাই কবি সার্থক আনন্দের সুরে বলে উঠলেন, "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।" (বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ৪র্থ সংস্করণ : পৃ: ৫৯৮-৫৯৯)

প্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রবীন্দ্রদর্শন এবং সুফী মতবাদের মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুফী মতবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাদান করলে, বিষয়টা বোধগম্য হবে। সুফীরা সব সময়ের পবিত্র কোরানের সমর্থনকে সম্বল করে জীবন ও ধর্মকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। ভোগে পরিমিতবাদের সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদও প্রশ্রয় পেয়েছে সুফীতত্ত্বে। সুফী ধর্ম হচ্ছে প্রেমের ধর্ম। এ প্রেম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি প্রেম। সৃষ্টি প্রেমেই স্রষ্টা প্রেমের বিকাশ। মরণ নদীর এপারে-ওপারে পরিব্যাপ্ত জীবনের নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধিতেই সুফী সাধনার সিদ্ধি। তাই সুফী সাধকদের বক্তব্য হচ্ছে, 'আত্ম-নিয়োগ হয়ে সবাইকে প্রেম, ভালোবাসা ও প্রীতি দান করো এবং অপরের কল্যাণ কর্মে আত্ম-বিস্মৃত করো।'

এই প্রেক্ষাপটে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে গোত্রান্তরিত রবীন্দ্রনাথ পরিণত হলেন মানব পূজারি হিসেবে। রবীন্দ্র-অন্তরের সবটাই জুড়ে উদ্ভাসিত হলো শাশ্বত প্রকৃতির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম। এ প্রেম বৈদান্তবাদের নিরাকার ঈশ্বরের প্রেম–এ প্রেম বৈষ্ণব ভাবানুলতার প্রেম এবং সবশেষে এ প্রেম হচ্ছে সুফী দর্শনের 'আশিক-মাশুক'- এর প্রেম। বিশেষ কোনো ধর্মীয় অন্ধতা কিংবা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের কুটিলতা ও হানাহানি এবং হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচারণা এ সবকিছুই রবীন্দ্রপ্রতিভাকে আচ্ছন্ন করা দূরের কথা, আর স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারল না। নতুন উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় অপরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন, "কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগ্রাম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছেছিল

আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।...আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সব রকমের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মহান ব্যক্তিত্ব আর বিশাল প্রতিভায় পরিণত হলেন। সার্বজনীন স্বীকৃতির জের হিসেবে তিনি পরিচিত হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হিসেবে। তিনি 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় মানব-প্রেমিকদের প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানালেন,

"যাত্রা কর যাত্রা কর, যাত্রী দল
এসেছে আদেশ"

অত্র পুস্তকের সমাপ্তি পর্বের বক্তব্যগুলো উপস্থাপনকালে প্রথমেই পাঠকদের দেওয়ালে টানানো উপমহাদেশের ম্যাপের দিকে দৃষ্টিপাত করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে দেখা যায় যে, উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকা এবং পূর্বাঞ্চলীয় গাঙ্গেয় বদ্বীপ কেবলমাত্র—এই দু'টি এলাকায় মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণ খুবই সুস্পষ্ট। মধ্যযুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খাইবার গিরিপথ দিয়ে বিজয়ীর বেশে মুসলমানরা এ দেশে আগমন করেছে বলে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এলাকায় মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়েছে। কিন্তু রাজধানী দিল্লী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাতে মুসলমানরা প্রায় ৬/৭শ' বছর পর্যন্ত রাজত্ব করলেও এসব এলাকাগুলোতে ধর্মভিত্তিক জনবসতির চিত্রটি ভিন্নতর কেন? অর্থাৎ এই অঞ্চলগুলোতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা সব সময়েই সংখ্যালঘু কেন? তাহলে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা যখন এ মর্মে দিব্যি মন্তব্য করে থাকেন যে, 'শুধুমাত্র তরবারির জোরেই এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে'—তখন এসব বক্তব্যকে সহজেই সত্যের অপলাপ বলে আখ্যায়িত করা যায়। আসলে এ ক্ষেত্রে সম্ভবত রাজ্য শাসনের বৃহত্তর স্বার্থে দিল্লীর মুসলিম রাজা-বাদশাহের (সম্রাট আওরঙ্গজেব ব্যতিক্রমধর্মী) সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না বললেই চলে। এই উপমহাদেশে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূল কৃতিত্ব হচ্ছে সুফী পীর, ফকির, আউলিয়া আর দরবেশদের।

এক্ষণে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সুফীদের নিরলস প্রচেষ্টায় মধ্যযুগে দুর্গম এলাকা বলে পরিচিত নদী বিধৌত পূর্ব বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। একদিকে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত পাঠান সৈন্যদের বঙ্গীয় এলাকায় আগমন এবং অন্যদিকে সুফীদের বদৌলতে ধর্মান্তরিত বিশাল জনগোষ্ঠী। কালের আবর্তে উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হলো বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়। অচিরেই এঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, এই দেশ—এই মাটি আমার, এই ভাষা—এই সাহিত্য আমার, এখানকার সংস্কৃতি ও লোকাচার সব কিছুই আমার। আমি এ দেশের বাঙালি সন্তান।

পরবর্তীকালে ঘটনাপ্রবাহে আমরা এসবের অপরূপ প্রতিফলন অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছি। বাস্তবকে স্বীকার করতে না পেরে সাত চল্লিশের দেশ বিভাগের সময় আর্যদের উত্তরসুরীর দাবিদার বর্ণ হিন্দুরাই এ দেশ ত্যাগ করেছেন এবং মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের ভার "শরাফত" ও "খানদানী" মুসলমানিত্বের দাবিদার অবাঙালি মুসলমানরাই এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। কেননা ইতিহাসের গতিধারাকে কোনো শক্তিই রুদ্ধ করে রাখতে পারে না।

প্রসঙ্গিক বিধায় এখানে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার জনগোষ্ঠীর জাতিগত পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে যাযাবরের অনিশ্চিত জীবন যাত্রার সমাপ্তিতে কৃষি-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাই হচ্ছে প্রকৃত মানব সভ্যতার প্রথম সূচনা এবং কৃষিই হচ্ছে মানব জাতির ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। এজন্যই পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের বড় বড় নদ-নদীর তীরবর্তী এলাকায় মানবগোষ্ঠী সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছে এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছে। এসব অঞ্চলের মধ্যে মিশরের নীল নদ, মধ্যপ্রাচ্যের ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদী, পাকিস্তানের সিন্ধু নদ এবং মহাচীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং-এর নদী-বিধৌত উর্বর মাটিতে মানুষের প্রথম বসতি ও গৃহস্থালী শুরু

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িককালে না হলেও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের এই সর্ববৃহৎ গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় যে কৃষিভিত্তিক মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই জনগোষ্ঠীই হচ্ছে বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা এবং এঁরা অস্ট্রিক দ্রাবিড় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি ভারতের দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করে তামিলনাড়ু অঞ্চলে আবিষ্কৃত-প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্র ও প্রস্তর নির্মিত কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে বঙ্গীয় এলাকার কৃষি যন্ত্রপাতির আকৃতিগত সাদৃশ্য থেকেই বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম'এ উল্লেখ রয়েছে যে, বঙ্গীয় এলাকার বাসিন্দারা নৌকায় বসবাস করত এবং ধানের চাষাবাদে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গবেষকদের মতে আস্ত গাছ খুদে যে কোন্দা নৌকা এই বাঙালিরা তৈরি করত, তা নিশ্চিতভাবে প্রস্তর যুগের নিদর্শন বহন করেছে।

বঙ্গীয় এলাকার আদি বাসিন্দারা দ্রাবিড়ীয় এবং কৃষি ঐতিহ্য, নবান্নের উৎসব ও নৌকার ব্যবহারের সূত্র ধরে বলা যায়, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত অঞ্চলের সভ্যতা প্রায় হাজার বছরের পুরাতন নব্য প্রস্তর যুগের। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে, "এ দেশে আর্যাভিযানের পূর্বে অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ জাতি বাস করত"। এই প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার আলোকে বঙ্গীয় এলাকায় নদীর তীবরর্তী এলাকায় প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীই হচ্ছে বাঙালি জাতির আদি সূত্র। গবেষকদের মতে যে ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে আমাদের আবাসস্থল, সেই বঙ্গ দেশের (বাংলাদেশের) 'বঙ্গ' শব্দটি প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে। 'বং' শব্দ থেকেই 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। এটি একটি সুপ্রাচীন চৈনিক শব্দ। এ শব্দের প্রাচীনত্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছরের। চীনা ভাষায় বঙ্গ শব্দটির অর্থ হচ্ছে জলাশয়—অর্থাৎ নদীমাতৃক এলাকা। এরপর বহু সংঘাতপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝ দিয়ে 'বঙ্গ' শব্দটি 'বঙ্গদেশ', 'বঙ্গীয় এলাকা', 'সুবে বঙ্গাল', 'বঙ্গ-প্রদেশ', 'পূর্ব বঙ্গ', 'পূর্ব বাংলা' (পূর্ব পাকিস্তান) এবং শেষ পর্যন্ত একটা রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ—এই নামে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে এই মানবগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, ধর্মীয় বোধ এবং চিন্তাধারায় আগ্রাসন, সংমিশ্রণ, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সমন্বয় সাধন হয়েছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় বাঙালি মানবগোষ্ঠীর বসবাস শুরু হওয়ার এক-দেড় হাজার বছর পরে উপমহাদেশে আর্যদের আবির্ভাব ঘটে এবং এদের দৃষ্টিতে দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গীয় এলাকায় তাম্রবর্ণ গাত্রের জনগোষ্ঠী মাত্রই অনার্য। ডক্টর অসিত বন্দোপাধ্যায় তাঁর প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "পশ্চিমী পণ্ডিতেরা বলেন, খ্রিস্টের জন্মের হাজার দেড়েক বছর আগে ইউরোপীয় ভাষাভাষী প্রাচীন আর্যজাতি ইরান ছেড়ে পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। এদের ভাষা ভাষাতত্ত্বের আদি ভারতীয় আর্যভাষা নামে পরিচিত। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রি. পূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রি. পূঃ অব্দ পর্যন্ত।"

তাহলে এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আর্যরা এদেশে আগমনের পর সুজলা-সুফলা এই উপমহাদেশের পুরো এলাকা পদানত করার উদগ্র বাসনায় কয়েক শতাব্দী যাবত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই প্রেক্ষাপটে দাক্ষিণাত্যে ও সিংহল বিজয়ের জন্য আর্য যুবকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আর্যদের নানা গ্রন্থে এ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণী এলাকার অসভ্য ও বর্বর রাক্ষসতুল্য দ্রাবিড় নামীয় অচ্ছুৎ মানবগোষ্ঠীর আবাসস্থল। দক্ষিণদিকের এ ধরনের আগ্রাসন হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ এবং দেবকূল এ সময় আর্যদের সক্রিয়

সমর্থন প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলি নেওয়াজ তাঁর খনার বচন ও কৃষি পুস্তকে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "রাবনের যুদ্ধ আর্য-অনার্যের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। রামায়ণের রচনাকাল শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত মহাভারতেরও পূর্বেকার। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও আর্য-অনার্যেরই অপর একটি মহাযুদ্ধ যাতে অগণিত লোক ক্ষয় হয়েছিল।"

এদিকে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে গৌড় বঙ্গ সুহ্ম সমতট অর্থাৎ বঙ্গীয় এলাকায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর প্রতি আর্য ভূদেবদের বৈরীভাব ও ঘৃণাপোষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের দৃষ্টিতে বঙ্গীয় এলাকার নরগোষ্ঠী হচ্ছে", দেশোহনার্য নিবাস :" এজন্যই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় এলে আর্যদের জাত বিনষ্ট হতো। দুঃসাহসিক আর্য যুবকরা এদেশে যাতায়াত করলে অনার্যের প্রভাব মুক্তির জন্য তাদের কপালে 'ব্রাত্য' এঁকে দেওয়া হতো। এই 'ব্রাত্য'ই হচ্ছে কলঙ্কতিলক। আর্য যুবকদের কপালে কলঙ্কতিলক থেকে অনুধাবন করা সম্ভব হতো যে, এসব যুবকরা অস্পৃশ্য বঙ্গীয় এলাকায় গমন করেছিল। তাই প্রত্যাবর্তনের পর কপালে কলঙ্কতিলক অঙ্কন ছাড়াও প্রায়শ্চিত্তমূলক যাগযজ্ঞাদি 'ব্রাত্যস্তোম' করার পর এঁদের পুনরায় আর্য মণ্ডলে স্থান দেওয়া হতো। আর্যরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের ভাষাকে "পৈশাচী ভাষা' হিসেবে আখ্যায়িত করত। এ সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এ মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, পৈশাচী ভাষায় বিদ্যা চর্চা করলে ভয়াবহ রৌরব নরকে ঠাঁই হবে। অথচ পৈশাচী ভাষাই হচ্ছে বাংলা ভাষার আদি জননী।

এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্গীয় এলাকায় আর্য যুবকের আবির্ভাব ঘটলে, স্থানীয় অধিবাসীরা কুকুর লেলিয়ে হত্যা করত বলে পণ্ডিতরা বর্ণনা করেছেন। এসব অধিবাসীদের চরিত্র সামগ্রিকভাবে নৃশংস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যদের এই উপমহাদেশে আগমন হলেও খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পরে বঙ্গীয় এলাকায় আর্যরা অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং এটাই ছিল আর্যদের জন্য সর্বশেষ এলাকা। কিন্তু এই এলাকায় আর্য ও অনার্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ছাড়াও ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির সংঘাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহের জের হিসেবে এ কথা বলতে হয় যে, বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং সুফী মনীষীদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম প্রচারের পরেও অনার্যদের প্রাচীন আমলের কৃষি-ভিত্তিক সংস্কৃতি, আচার, অনুষ্ঠান, ব্রত ও প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, আর্য হিন্দুরা এসব অনার্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরোধিতা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হন। ফলে অনার্যদের কৃষি-ভিত্তিক বহু আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম হিন্দু ধর্মে প্রবিষ্ট হয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখে। পাকিস্তানি আমলে এসব সাংস্কৃতিক ও কৃষি-ভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানকে 'হিন্দুয়ানী' বলে আখ্যায়িত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এবং জের আজও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকরা এবং এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে সুফী দরবেশরা স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের তেমন একটা বিরোধিতা না করে ধর্মের মূল আদর্শ প্রচারে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন বলেই বিরাট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এ দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য সবকিছুই কৃষি-ভিত্তিক এবং এসবের প্রতি মানুষের অটল শ্রদ্ধা রয়েছে। এরই ফল হিসেবে ধান-দুর্বা-হলুদ দিয়ে নববধূকে বরণ করা এবং নববধূর আগমনে উঠানে ঘড়া থেকে

পানি ঢালা, বিবাহ অনুষ্ঠানে কলাগাছ লাগানো, লাঙ্গল-জোয়াল ও জমিকে সালাম করে চাষাবাদ শুরু করা, সংগৃহীত ফসলকে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করা, ক্ষেত্রে বীজ ছিটানোর আগে কিছু অনুষ্ঠান পালন করা, সন্তানের মুখে ভাত ও হাতে খড়ির অনুষ্ঠান করা, নবান্ন ও হালখাতার উৎসব উদযাপন করা প্রভৃতি আদি ও অকৃত্রিম অনার্য অথচ বঙ্গীয় সংস্কৃতি হাজার হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে আজও পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সুফী আউলিয়া, পীর ফকির ও দরবেশরা বঙ্গীয় এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও বহুল পরিমাণে এদেশী সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে নিয়ে শুধুমাত্র পবিত্র ইসলাম ধর্মের নিরাকার একেশ্বরবাদের মূল আদর্শকে প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন বলেই এরকম অবিস্মরণীয় সাফল্য লাভ করেছিলেন। এজন্যই উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পর প্রায় ১২ শত মাইল ব্যবধানে বঙ্গীয় এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়েছে। গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় সুফী মনীষীদের এ ধরনের ইসলাম প্রচারকে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মরহুম ড. এনামুল হক 'পপুলার ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করে গেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহিরাগত সেন বংশের আদিপুরুষ অবাঙালি সামন্ত সেন কর্ণাটক ত্যাগ করে পূর্ব থেকেই আর্য পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে নবদ্বীপ এলাকায় বসবাস করছিলেন। তাঁর পৌত্র বিজয় সেন গৌড় রাজ্যের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েই দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, সেন বংশের আমলে বঙ্গীয় এলাকার রাজধানী নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। এতে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, বহিরাগত সেন রাজারা গৌড় নগরীকে নিরাপদ মনে করতেন না এবং সব সময়েই স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা অব্যাহত ছিল।

১১৫৮ খ্রি. বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এবং আরও ২০ বছর পরে ১১৭৮ খ্রি. তদীয় পুত্র লক্ষণ সেন বাংলাদেশে বিদেশী সেন বংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু স্থানীয় জনগোষ্ঠী এদের কোনও সময়েই গ্রহণ করতে পারেনি। নবদ্বীপ রাজধানী স্থানান্তরকরণ ছাড়াও ক্ষাত্র বৃত্তিতে বিশ্বাসী এই সেন বংশের রাজত্বে কঠোর হস্তে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রচার করা হয় এবং এই আমলেই পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল থেকে সর্বাধিক সংখ্যক উগ্র চিন্তাধারার ব্রাহ্মণদের আনা হয়। এঁদের বংশধররা আজও পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় 'বিশুদ্ধ রক্তের' বড়াই করছেন। এক কথায় বলতে গেলে বদ্বীপ এলাকায় আর্য বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণদের দ্বারা সেন বংশের রাজত্ব পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মণ্যমতে ঘোরতর আস্থাযুক্ত বিদেশী সেন বংশের রাজ সভাতে উচ্চ সমাজের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেলেও, গণমানুষের সঙ্গে এই শাসনের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। ফলে সেন বংশের রাজত্ব স্বাভাবিকভাবে শাসনদণ্ডের অত্যাচারে ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে 'সেন রাজগণ বিদেশী ছিলেন বলে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। উপরন্তু তারা ঘোরতর ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী ও স্মার্ট সংস্কারপন্থী ছিলেন। সুতরাং তাদের সভায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের একটু বেশি প্রাধান্য হওয়াই স্বাভাবিক।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে ১১৯৯ খ্রি. তুর্কী সেনাপতি ইফতেখার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র সতেরোজন অনুচর নিয়ে অতর্কিতে তৎকালীন বাংলার রাজধানী নবদ্বীপে আক্রমণ করলে কোনোরকম লড়াই কিংবা প্রতিরোধ ছাড়াই অবাঙালি বৃদ্ধ রাজা লক্ষণসেন

পরিবারসহ দুর্গম পূর্ব বঙ্গীয় এলাকায় পলায়ন করেন। ইতিহাসের পাতায় এ ধরনের ভীরুতার ঘটনা বিরল। পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে বিতর্কমূলক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ক্ষাত্র মতে বিশ্বাসী বহিরাগত ও অবাঙালি সেন রাজারা যুগের পর যুগ ধরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর এমন অত্যাচার অব্যাহত রেখেছিল যে, ইফতেখারউদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণের সময় স্থানীয় অধিবাসীদের কেউই রাজা লক্ষণ সেনের পক্ষে অস্ত্র তুলে নেয়নি। সম্ভবত সর্বশেষ সেন রাজা লক্ষণ সেন এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলেই কোনোরকম লড়াই ছাড়াই রাজধানী নবদ্বীপ ছেড়ে তিনি সপরিবারে পলায়ন করেছিলেন। একটা বহিরাগত শাসকগোষ্ঠী যখন নিজেদের কৃতকর্মের জন্য স্থানীয় গণমানুষের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় এবং জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে, তখন এ ধরনের ঘটনা হতে বাধ্য। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। ১১৯৯ খ্রি. নবদ্বীপে রাজা লক্ষণ সেনের পলায়ন কোনও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়।

অবশ্য এর আগে বঙ্গীয় এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে সুফী পীর, ফকির, আউলিয়া ও দরবেশের আগমন শুরু হয়ে গেছে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, মাত্র কয়েক শতাব্দীকালের মধ্যে বঙ্গীয় এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পবিত্র ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করে এবং এর জন্য কোনোরূপ শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নি বলা যায়। সমসাময়িককালে এ দেশে বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্ব এবং হিন্দু ধর্মের কঠোর অনুশাসন এর অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

তাহলে বঙ্গীয় এলাকার হাজার পাঁচেক বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ হিসেবে বর্ণিত করা সমীচীন হবে :

১. অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার
২. বহিরাগত আর্যদের প্রতিহত করার সময়কাল
৩. ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারকাল
৪. পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মণ্যবাদের ছত্র-ছায়ায় আর্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি সংহতির প্রভাবকাল
৫. ষষ্ঠ শতাব্দীতে হুণদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি
৬. সপ্তম শতাব্দীতে আর্য রাজা শশাংক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক মুর্শিদাবাদ এলাকায় সিংহাসন আরোহণ এবং বঙ্গীয় এলাকায় আর্যসংস্কার চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। তাম্র গাত্রবর্ণের স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর রক্তাক্ত বিদ্রোহ।
৭. আর্য পণ্ডিত সমাজের বর্ণিত "মাৎস্যন্যায়"-এর (জোর যার মুলুক তার)-এ সময়কাল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের আখ্যায়িত ৭ম এবং ৮ম শতাব্দীর এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সময়কালই হচ্ছে আসলে বহিরাগত আর্যদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের শতাব্দী।
৮. আর্যরা পরাজিত হলে স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠী কর্তৃক ৮ম শতাব্দীতে নির্বাচনের মাধ্যমে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সেনাপতি গোপাল দেবকে রাজা ঘোষণা এবং বাঙালি পাল বংশের রাজত্বের সূত্রপাত ও গৌড়ে রাজধানী স্থাপন।

৯. প্রায় ৩০০ বছরকাল পাল বংশের রাজত্বের অবসানে কর্নাটক থেকে আগত অবাঙালি ব্রাহ্মণ বিজয় সেন কর্তৃক বাঙলার ক্ষমতা দখল ও নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন।

১০. কয়েক দশকের ব্যবধানে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি ইকতেখার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন অনুচর নিয়ে অতর্কিত রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থনের অভাবে অবাঙালি এবং বহিরাগত বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনের পলায়ন।

১১. ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (পলাশীর যুদ্ধে) ৫৫৮ বছর যাবত বঙ্গীয় এলাকায় পর্যায়ক্রমে পাঠান ও মোগলদের রাজত্বকাল।

১২. ১৭৫৭ খ্রি: থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ১৯০ বছর ধরে ইংরেজের শাসনামল।

১৩. ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি উপনিবেশ শাসনের ২৪ বছরকাল।

১৪. ১৯৭১ সালে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং প্রকৃত জাতির বাঙালি জাতির সম্পূর্ণতা লাভ।

বাংলাদেশে বিশেষ করে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকায় ইতিহাসের সংঘাতবহুল ক্রমবিকাশের ধারায় কীভাবে প্রকৃত অর্থে বাঙালি জাতির (মধ্যযুগের শেষ পাদ থেকে ধর্ম বিশ্বাসে অধিকাংশ মুসলমান) দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটল, তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করা হলো। এক্ষণে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত এলাকাবাসী এবং গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগতভাবে শেষাবধি কারা লাভবান হলো সেই সত্য উদঘাটনের প্রাক্কালে আলোচনার সুবিধার্থে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রেনেসাঁর প্রতি পুনরায় কিছুটা আলোকপাত করা অপরিহার্য মনে হয়।

পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট মার্কসিস্ট লেখক ও সাংবাদিক বিনয় ঘোষ তাঁর রচিত 'বাংলার বিদ্বৎসমাজ' গ্রন্থে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও বিস্তার সম্পর্কে যে বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তা নিশ্চিতভাবে সমর্থনযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "ইংরেজ যুগের প্রথম পর্বে নতুন বাঙালি সম্ভ্রান্ত সমাজ গড়ে ওঠে প্রধানত এই দেউনিয়া-বেনিয়ানি মুচ্ছুদ্দিগিরি ও চলনসই ইংরেজি বিদ্যার উপর ভিত্তি করে। ...কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি পরিবার 'সম্ভ্রান্ত' বলে গণ্য হয়েছেন, দেওয়ানী-বেনিয়ানির অর্থলাভে।...অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে নতুন কলিকাতা মহানগরীতে এইসব হিন্দু বাঙালি পরিবার বিত্ত ও বিদ্যা, উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।...বাংলার এই নতুন বিদ্বৎ সমাজ প্রায় সম্পূর্ণ 'মুসলমানবর্জিত' রূপ ধারণ করল এবং সেই জন্য একে সাধারণভাবে 'বাঙালি বিদ্বৎ সমাজ' না বলে, বিশেষ অর্থে 'বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজ' বলাই যুক্তিসঙ্গত।...হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও হিন্দু বিদ্বৎসমাজের বিকাশের ফলেই রিনেসান্স (সংকীর্ণ অর্থে) ও রিফর্মেশন আন্দোলন হিন্দুসমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল।...সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে পরিণত হল। 'হিন্দু'-প্রীতি ক্রমে 'হিন্দুত্ব'-প্রীতির ভিতর দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতায়' পর্যবসিত হল।...একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের গতি হলো উষরবুদ্ধি অহমিকায় এবং হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মেরই আবেষ্টনের মধ্যে একটি উপ-সম্প্রদায়ের মর্যাদা গেল—আর পাঁচটা উপ-সম্প্রদায়েরই মতো।

...যত দিন গেল মধ্যযুগীয় প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ঊনবিংশ শতাব্দীতে–যে যুগকে আমরা নাম দিয়েছে 'রিনেসান্সের যুগ' জাতিভেদে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিভেদ প্রবণতা, মূর্তিপূজা, বহু-ঈশ্বরবাদ, গোঁড়ামি–এইসব মধ্যযুগীয় ব্যাপারগুলোর একটি অথবা অপরটির কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন 'আধুনিক' বুদ্ধিজীবীরা, যাদের ইংরেজি শিক্ষার ওজন বেশ ভারী।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ আমলে বাংলার কথিত রেনেসাঁ বা নবজাগৃতির সাফাই গেয়ে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এ পর্যন্ত যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত বইগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. সে কাল আর এ কাল : রাজনারায়ণ বসু
২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী
৩. বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি : ড. সুশীল কুমার দে
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) : সজনীকান্ত দাস
৫. বাঙলা সাহিত্যে গদ্য : সুকুমার সেন
৬. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন
৭. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি
৮. বাংলার নবযুগ : মোহিতলাল মজুমদার
৯. সংবাদপত্রে সেকাল : ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
১০. সিলেকশন ফ্রম রাইটিংস অব হরিশ চন্দ্র মুখার্জি : ড. নরেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত
১১. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা : যোগেশচন্দ্র বাগল

এসব গবেষণামূলক বই সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার গবেষক বিনয় ঘোষের মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, 'বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাস পূর্বে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশ লেখাই আংশিক অথবা প্রাসঙ্গিক।...এই ধরনের আরও অনেক গ্রন্থে প্রবন্ধে ও জীবনচরিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের নানাদিক ও নানা বিষয় নিয়ে আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে এর মধ্যে অনেকেই করেননি। শ্রী গোপাল হালদারের দু'একটি প্রবন্ধ এবং অমিত সেনের খসড়া' নোটস অন বেঙ্গলি রেনেসান্স এ বিষয়ে প্রথম দিগদর্শন বলা যায়; কিন্তু তাঁরা কেউ নবজাগৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেননি।" (ভূমিকা বাংলার নবজাগৃতি: ওরিয়েন্ট লংম্যান কলিকাতা)

কিন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়-এর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কিছুটা পুনরুল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও এক্ষণে তাঁর উদ্ধৃতির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর বড়ো কথা পুঁথির যুগের অবসান এবং মুদ্রণের যুগের সূচনা। মুদ্রাযন্ত্র ইউরোপীয় রেনেসাঁকে ত্বরান্বিত করেছিল, বাংলাদেশেও মুদ্রণ শিল্পের ক্রম সম্প্রসারণের ফলে চিন্তাশ্রয়ী মানবজ্ঞান যুগপৎ গভীর ও ব্যাপক হলো। শুধু তাই নয়,

সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের গভীরতর সম্পর্ক স্থাপিত হলো। বিশুদ্ধ সারস্বত আনন্দ যেমন লেখক ও পাঠককে প্রণোদিত করল, তেমনি সমাজও রাষ্ট্রের যাবতীয় ব্যাপার সাহিত্যের মারফত, নানা আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিশেষত সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে বাঙালির জীবনধারাকে উচ্চকিত করে তুলল। ইউরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, রেস্টোরেশন এবং আধুনিকতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ঊনবিংশ শতকের বাঙালি-জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে বিকশিত হতে আরম্ভ করল। একে আমরা সাধারণত বাঙালি জীবনের "ঊনবিংশ শতকী রেনেসাঁস" বলি। ঐতিহাসিকের ভাষায় "সাচ ও রেনেন্সাস হ্যাজনট বিন সিন এনিহোয়ের এলস ইন দি ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি" (বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের রেনেসান্স আর কোথাও দেখা যায় নি)।

পশ্চিম বাংলার অপর এক বিশিষ্ট মার্কসিস্ট গবেষক সুপ্রকাশ রায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় সৃষ্ট কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী তথা মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' (১৯৮০ কলিকাতা) গ্রন্থের ভূমিকায় কমরেড রায় লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি" 'রিনাসান্স' নামে ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর যে আন্দোলনটি চলিয়াছিল তাহাও কৃষক বিদ্রোহগুলোর মতোই তাৎপর্যপূর্ণ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া ভূমিস্তরের অধিকারবলে জমিদার শ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী একদিকে কৃষক-শোষণের ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং অপরদিকে ইংরেজ সৃষ্ট নূতন সমাজের নেতৃত্ব লাভের জন্যই তাহাদের তথাকথিত 'রিনাসান্স' আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল।

এই 'রিনাসান্স' আন্দোলন হইতেই শিক্ষিত 'ভদ্রশ্রেণী' হিসেবে মধ্যশ্রেণী নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কেরানী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে যে ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল, জমিদারশ্রেণীর সহিত মধ্যশ্রেণীর প্রাণপণে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীতে পরিণত হয়। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে এই ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। তাঁহার লক্ষ্য ছিল, এ দেশে এরূপ একটি ইংরেজি-শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টি করা যে শ্রেণীটি উহার উন্নত ইংরেজি শিক্ষার গুণে ভারতবর্ষকে নহে, ইংল্যান্ডকে 'স্বদেশ' ও ইংরেজদের পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিবে এবং কোনোকালেই ইংরেজ শাসনের বিরোধী হইবে না।...

"ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যখন বিহার ও বঙ্গদেশের উপর দিয়া কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী গণ-সংগ্রামের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিদেশী ইংরেজ প্রভুদের শাসনকে 'ভগবানের আশির্বাদ'রূপে বরণ করিয়া ইংরেজি শিক্ষা দানের ভিত্তিতে নিজেদের নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সভ্যশ্রেণীরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্ব প্রথম সাহিত্যের প্রয়োজন। সুতরাং নূতন সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন এই সাহিত্য সৃষ্টিকার্যের প্রধান নায়ক এবং তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়াই মধ্যশ্রেণীর এই 'রিনাসান্স' পূর্ণ বিকশিত রূপ গ্রহণ করিল।...

"এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের দুর্দশার এবং এদেশে ইংরেজ প্রভুদের শোষণ-উৎপীড়নের চিত্র উদঘাটন করিয়া রচিত কোনো সাহিত্যও সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীল দর্পণ' নাটকে কৃষকদের কোনো সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেন নাই, কেবল ইংরেজ প্রভুদের শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষকদের চরম দুর্দশার চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্ট-এর নাম করিয়া ইহার উপরও আক্রমণ করিতে ইতস্তত করেন নাই। মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু সিরাজগঞ্জের ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নাট্যকারের দৃঢ়তায় তাঁহার (বঙ্কিমের) সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।...

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা ও আপোষের নীতি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের 'রিনাসান্স' আন্দোলনেরই অন্যতম অবদান।"

গবেষক সুপ্রকাশ রায় আলোচ্য পুস্তকের অন্যত্র (পৃঃ ১৯৬-৯৭) কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের মনমানসিকতা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরও সুচিন্তিত ও বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, "এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় 'রিনাসান্স' হিন্দু 'রিনাসান্সে' পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দু 'রিনাসান্স' হিন্দু অভিজাত ও হিন্দু মধ্যশ্রেণীরই নবজাগরণ। বঙ্কিমের পর রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক আরব্ধ এই হিন্দু 'রিনাসান্স'কে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ দান করেন।

অথচ ১৯৮৩ সালে এসেও পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপক ও নয়াদিল্লীর 'জহরলাল নেহেরু স্মৃতি তহবিল' সংস্থার রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন গবেষক শ্রী প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম আদর্শের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে সমর্থনসূচক মন্তব্য করে লিখেছেন যে, "মহান বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ বঙ্কিমের আদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'স্বাদেশিকতার ধর্মগুরু' বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্যে হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদ এই দুই-এর মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হিন্দু দর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ থাকায় অনেকে তাঁর চিন্তাধারাকে ধর্মকেন্দ্রিক ও রক্ষণশীল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ তিনি হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারে ব্রতী হয়েছিলেন।...স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৫-১৮৮৩) খ্রি.) ধর্মীয় মতবাদ (হিন্দু) সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। বৈদিক সভ্যতার আদর্শের ভিত্তিতে তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সংস্কারকার্য পরিচালনার জন্য তিনি আর্য-সমাজ নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।...সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।...যদিও হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে সংগ্রামী (হিন্দু) জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল; কিন্তু তিলক্ বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট বলা যায় না। (কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ "আধুনিক ভারত' : পৃঃ বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ : কলিকাতা ১৯৮৩)।

এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট লেখক অশোক মিত্রের বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "ভারতের বুদ্ধিজীবীরা যে নবযুগের অভ্যুদয়কে 'রেনসাঁস' বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন, গ্রামের ওপর তাহার পরিণাম হইল দুঃখজনক। গ্রামে নতুন মধ্যশ্রেণী গজাইয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির ওপর কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রাম্য মহাজনবৃত্তি হইতে উচ্চহারে খাজনা এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ভাগচাষি ও কৃষি-শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া।...প্রকৃত চাষি এবং ভূমি-স্বত্বাধিকারীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ—চুক্তি ও সহযোগিতা নয়।"

সাম্প্রতিককালে পশ্চিম বাংলায় চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী চরম বামপন্থী লেখক প্রয়াত প্রমোদ সেনগুপ্ত মহাশয় 'বাংলার রেনেসাঁ' সম্পর্কে সরাসরি বক্তব্য রেখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, "তারা (রেনেসাঁর দাবিদার) সমাজের সংস্কার চেয়েছিল, সমাজের আমূল পরিবর্তন চায়নি। উপরন্তু, তাদের আন্দোলন ছিল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই তাদের চিন্তার ক্ষেত্রেও ছিল খুব সংকীর্ণ এবং তার সাহসও ছিল খুব দুর্বল। কোনো কোনো বিষয়ে কিছু ভাসা-ভাসা মিল ছিল, থাকলেও ইউরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার রেনেসাঁসের কোনো তুলনা করা চলে না, দুটোর মধ্যে রয়েছে একটা মৌলিক প্রভেদ। ইউরোপের রেনেসাঁস ছিল সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত, আর বাংলার রেনেসাঁস বিকাশ লাভ করেছিল ইংরেজ শাসক শ্রেণী কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত বাংলার সামন্ততন্ত্রের ছত্রছায়ায়। ইউরোপের রেনেসাঁসের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছিল যুক্তিবাদের যুগে। যুক্তিবাদী যুগের বিপ্লবী মতাদর্শ, বস্তুবাদ ধর্মবিরোধী গির্জাবিরোধী চিন্তাই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ঘটিয়েছিল মহান ফরাসি বিপ্লব, আপোষহীনভাবে ধ্বংস করেছিল ফরাসী সামন্ততন্ত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বে।...

...এটাই ছিল বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি। বেঙ্গল রেনসোঁসের চরিত্র ছিল বিপরীত। তার নেতারা [কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী] সমাজ ও ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁরা দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করা বা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেননি।... কৃষক শোষণে তাঁরা ছিলেন ইংরেজ সরকারের অংশীদার, তাই তাঁরা ছিলেন কৃষকদের শত্রু এবং ইংরেজ শাসকদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁরা অনেকেই ভারতে ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের আশির্বাদ বলেই মেনে নিয়েছিলেন।...মোট কথা, এঁরা এঁদের কোনো ঐতিহাসিক কর্তব্যই পালন করতে পারেননি, কোনো মূল সমস্যাও সমাধান করতে পারেননি। তাই এঁদের কোনো মহান কীর্তি নাই, আছে শুধু দম্ভ—জাতিদম্ভ, শিক্ষার দম্ভ, রেনেসাঁসের দম্ভ, নিজেদের শ্রেষ্ঠতার দম্ভ।" (ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, দ্বিতীয় খণ্ড : সুবর্ণ রেখা কলিকাতা : ১৯৮৪)।

এ ধরনের এক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াশীল প্রেক্ষাপটে একটা পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর 'কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলার রেনেসাঁর' মূল্যায়ন করলে যে চিত্রটি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, তা নিশ্চিতভাবে দুঃখজনক ও লজ্জাস্কর বলা যায়। আলোচ্য রেনেসাঁর প্রারম্ভিককালে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সর্বোচ্চ আদালতে দাখিলকৃত স্মারকলিপির অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ :

"ভারতবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, তাহারা ভগবৎ করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে এবং ইংল্যান্ডের রাজা, ইংল্যান্ডের লর্ডগণ ও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভারতবাসিগণের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।" (মেমোরিয়াল টু দি সুপ্রিম কোর্ট, ওয়ার্কস পৃ: ৪৪২)।

উপরন্তু রামমোহন যুগের পরবর্তীতে কয়েক দশক পর্যন্ত উদারপন্থী চিন্তাধারার রোজরিও, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রামতনু, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রাধাকান্ত ভূদেব, রামকৃষ্ণ প্রমুখদের হিন্দুয়ানীর যে ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তারই উত্তরসূরী হিসেবে আর সবাইকে আড়াল করে যখন ধূমকেতুর মতো বাংলা সাহিত্যের সম্রাট এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সেবক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হলো, তখন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী

ছাড়াও কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী অচিরেই বঙ্কিমের কর্মকাণ্ডকেই বাংলার রেনেসাঁর পূর্ণ বিকাশের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করল।

অথচ প্রকৃত সত্য ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে মহল বিশেষ কর্তৃক চিহ্নিত 'আনন্দমঠ'-এর মূল্যায়ন এক্ষেত্রে অপরিহার্য মনে হয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মনমানসিকতা ও বঙ্কিম-দর্শনের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমের বক্তব্য হচ্ছে :

ক. "ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।" (আনন্দমঠ)

খ. "ইংরেজরা এক্ষণে বণিক—অর্থ সংগ্রহেই মন দিয়াছে, রাজশাসনভার লইতে বাধ্য হইবে...ইংরেজ রাজ্য অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।" (আনন্দমঠ)

গ. "সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রুশোণিত সিক্ত করিয়া মাতাকে শথ্যশালিনী করিব।
মহাপুরুষ শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা।" (আনন্দমঠ)

ঘ. 'কে কাহার হাত ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে।" (আনন্দমঠ)

ঙ. "ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।" (আনন্দমঠ)

চ. "অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে ভালোই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।" (আনন্দমঠ)

কোনো রকম লুকোচুরি না করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, এদেশ সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের পদানত হওয়ার ফল শুভ হতে বাধ্য। কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে, ইংরেজরা এদেশে না আসলে সনাতন ধর্মের (হিন্দু ধর্ম) বিজয় কেতন উড্ডীন সম্ভব হতো না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এ মর্মে বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণী সম্প্রদায়কে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের শাসনে হিন্দু ধর্ম নিমজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ শাসনে তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

তাহলে বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়নের পর এ ধরনের মন্তব্য করলে অন্যায় হবে না যে, 'বাংলার রেনেসাঁ'র পূর্ণ বিকাশের হোতা হিসাবে বর্ণিত বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নির্ভেজাল সমর্থক। অবশ্য তিনি ইংরেজের ছত্রচ্ছায়ায় প্রতিক্রিয়াশীল সনাতন হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু শৌর্য-বীর্যের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ইংরেজদের দালালীর পথকে সহজতর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যই বঙ্কিমের মন-মানসিকতা কৃষক বিদ্বেষ, নিম্নশ্রেণী বিদ্বেষ এবং যবন বিদ্বেষ-এ ভরপুর। অভূতপূর্ব প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শ্রেণী এবং সম্প্রদায়-সচেতন ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে বিরল বলা যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক মনে হলেও একথা সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে কোলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি

বর্ণহিন্দুরা রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-প্যারীচাঁদ-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের প্রবর্তিত উদার ও সংস্কারপন্থী পথ পরিত্যাগ করে শ্রেণী ও গোষ্ঠীস্বার্থে 'অত্যন্ত সুবোধ বালকের ন্যায়' বঙ্কিম–বিবেকানন্দ প্রদর্শিত আদর্শকে সাদরে গ্রহণ করে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। এরই ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষপাদে এসে আমরা কোলকাতার বর্ণহিন্দু বাঙালি বুর্জোয়া সমাজে অদ্ভুত জীবনযাত্রা অবলোকন করতে সক্ষম হই। যেসব ইংরেজি শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপক, বিচারক প্রমুখ স্যুট-টাই পরিহিত অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিবেশে ইংরেজিতে দিনভর কথাবার্তা বলা-কওয়া করছেন এবং স্ব স্ব পেশায় অর্থ উপার্জন করছেন, তারাই আবার আস্তাচলে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর স্নানান্তে ধুতি-ফতুয়া পরিধান করে তুলসী তলায় কিংবা গৃহ-দেবতার পদতলে পূজা-আহ্নিক করছেন আর সশব্দে সংস্কৃত ভাষায় বেদের শ্লোক উচ্চারণ করছেন। তখন এঁরা ভিন্ন জগতের অধিকারী।

এই প্রেক্ষিতে গবেষক বিনয় ঘোষ এসব মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "ব্যর্থ হলো মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা দোভাষী হয়ে উঠলেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের রুচি অভিমত নীতিবোধ এবং বুদ্ধিশীলতা ঠিক ইংরেজের মতো হলো না। তাঁরা হয়ে পড়লেন 'দোঁ-আশলা শ্রেণী...মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের এক বিচিত্র মিশ্রণ।" (বাংলার বিদ্বৎসমাজ : প্রকাশ ভবন কলিকাতা ১৯৭৮)।

পশ্চিম বাংলার গবেষক সুপ্রকাশ রায়-এর এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, "ভারতের দুর্ভাগ্য যে, ইংরেজ-সৃষ্ট ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর হস্তে জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ন্যস্ত হইয়াছিল। তাই তাহারা জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইহার বিকৃতি ঘটাইবার এবং জাতীয় আন্দোলনকে ভ্রান্ত পথে অর্থাৎ আপসের পথে পরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।...ইহাদের পক্ষে ইংরেজ শাসনকেই ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করাই ছিল স্বাভাবিক। ইহারাই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া সেই জাতীয় আন্দোলন কখনও বৈপ্লবিক চরিত্র গ্রহণ করে নাই, তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আপসপন্থী রাজনৈতিক সংস্কার-আন্দোলনরূপে পরিচালিত হইয়াছিল।...বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের মূল ঊনবিংশ শতাব্দীর "রিনাসাঁন্স" আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বঙ্গীয় "রিনাসাঁন্সের" নায়কবৃন্দ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ : কলিকাতা : এপ্রিল, ১৯৮০)

কমরেড রায় প্রসঙ্গত আরও লিখেছেন যে, "ব্রিটিশ প্রভুত্বকে ভারত ভূমিতে অক্ষত রাখিয়া শাসকগণের নিকট হইতে কিছু যোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য যে আন্দোলন 'রিনাসাঁন্সের' নায়কগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম নহে"।

সুপ্রকাশ রায়ের এই বক্তব্যের সঙ্গে আরও একটা বিষয়ের সংযোজন এক্ষণে অপরিহার্য মনে হয় এবং কেবলমাত্র সেক্ষেত্রেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবে। "বঙ্গীয় রেনেসাঁর" কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ এবং এর ধারক ও বাহক কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চরিত্রের মূল্যায়নকালে ইতিহাসের এক বিস্ময়কর প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির পর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আলোচ্য ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে সংস্কারপন্থী ও উদার ভাবাদর্শের সব কিছুই কর্পুরের মতো উড়ে গেছে। আর এঁদের

সেই শূন্য হৃদয়ের প্রায় সবটুকুই আপ্লুত হয়ে রয়েছে রাধাকান্ত-ভূদেব-রামকৃষ্ণ বঙ্কিম বিবেকানন্দ প্রমুখের প্রচারিত প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সনাতন ধর্মীয় ভাবাদর্শে। কোলকাতায় তখন নতুনভাবে 'ভবানী পূজা' শুরু হয়ে গেছে আর এই বর্ণহিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখে উচ্চারিত স্লোগান হচ্ছে, "জয়তু শিবাজী"। এঁরা সম্ভবত ভুলেই গিয়েছিলেন যে, এই বঙ্গভূমিতেই বুভুক্ষ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাড়াও বিপুলসংখ্যক বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে সব কিছুই অবলোকন করছে।

তা'হলে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার প্রকৃত অর্থে বাঙালি জাতির (অধিকাংশই ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর "বঙ্গীয় রেনেসাঁর" প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পরিবর্তিত মন-মানসিকতার বর্ণনার পর উত্তর ভারতীয় অবাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপেরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ সমীচীন মনে হয়। যদিও বঙ্গভঙ্গকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তথাপিও আলোচনার সুবিধার লক্ষ্যে এ বিষয়ে কিছুটা পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কোলকাতা বর্ণহিন্দু বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যতম পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে (ইলবার্ট বিল বিরোধী নেতা) আই সি এস-র চাকরি থেকে যে বছর বরখাস্ত করা হয়, ঠিক সে বছর অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে একজন চিফ কমিশনারের অধীনে সিলেট জেলাসহ পৃথক আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়। এ সময় ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল প্রায় ২,৩০,৭৯৮ বর্গমাইল। এরমধ্যে নতুন আসাম প্রদেশের জন্য দেওয়া হলো ৪১,৭৯৮ বর্গমাইল। আসামের লোকসংখ্যা তখন ৪১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৯ জন। তবুও বাংলার আয়তন ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং চট্টগ্রাম থেকে ছোট নাগপুর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ-এর মতো।

মাত্র ৩১ বছরের ব্যবধানে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর যখন পুনরায় অবিভক্ত বঙ্গীয় এলাকা থেকে পূর্ববঙ্গকে (চট্টগ্রাম, ঢাকা ও দার্জিলিং বাদে রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ জেলা) আলাদা করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন প্রদেশের নামকরণ হলো "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" তখনও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন (পশ্চিম সীমানায় ৫টি হিন্দী ভাষাভাষি অঞ্চলকে মধ্য প্রদেশে প্রদান এবং সম্বলপুর ও ৫টি উড়িয়া ভাষাভাষি এলাকা লাভ) ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল। অন্যদিকে নতুন এলাকা যুক্ত হওয়ায় (ইতিপূর্বেই লুসাই পাহাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের এলাকা হচ্ছে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৪০ বর্গমাইল। নতুন প্রদেশের লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লাখ-এর মতো। সমগ্র ইংরেজ শাসিত এলাকার মধ্যে এই একটি মাত্র প্রদেশে শতাধিক বছর ধরে নির্যাতিত বাঙালি মুসলমানরা সবার অলক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। নিম্নে একনজরে এর পরিসংখ্যান দেওয়া হলো :

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ

আয়তন	১০৬৫৪০ বর্গমাইল
জনসংখ্যা	৩ কোটি ১০ লাখ
বাঙালি মুসলমান	১ কোটি ৮০ লাখ
হিন্দু ধর্মাবলম্বী	১ কোটি ২০ লাখ
উপজাতি	১০ লাখ

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, নানাবিধ গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীস্বার্থে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল এবং কোলকাতায় বসবাসকারী হিন্দু জমিদার শ্রেণী ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের আসাম পৃথককরণ-এর বিরোধিতা না করলেও ৩১ বছরের ব্যবধানে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ভয়াবহ রকমের বিরোধিতা করল। এরই জের হিসেবে ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), বিপনীচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অরবিন্দু ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) এবং বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) প্রমুখ চরমপন্থী হিন্দু নেতৃবৃন্দ পরাজিত হলে বঙ্গীয় এলাকায় 'কালীমাতার' সম্মুখে শপথ গ্রহণান্তে 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান উচ্চারণ-এর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়।

ঠিক এমনি এক সময় স্যার সৈয়দ প্রবর্তিত 'আলিগড় চিন্তাধারায়' (আলিগড়স্থ এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ : ১৮৭৭) উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের কিছুসংখ্যক অবাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে অবাঙালি মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণীর রক্ষাকবজের ব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন আলিগড় কলেজের সেক্রেটারি নবাব মহসিন-উল-মূল্‌ক। এ সময় সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া ও বানোয়ারীলাল বিদ্যালয় দু'টির শিক্ষকরাও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার স্বয়ং বিদ্যালয় দু'টির সরকারি অনুমোদন প্রত্যাহারের সুপারিশ সম্বলিত যে পত্র প্রেরণ করেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তা প্রত্যাখ্যান করলে অনতিবিলম্বে গভর্নর ফুলার পদত্যাগ (৩রা আগস্ট ১৯০৬) করায় উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঠিক এমনি এক সময়ে আলিগড় কলেজের তৎকালীন সেক্রেটারি মহসিন-উল-মূলক্ ১৯০৬ সালের ৪ঠা আগস্ট কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ আর্কিবল্ড-এর নিকট প্রেরিত এক পত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নে সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত আক্ষেপপূর্ণ বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "আর্কিবল্ড বড়লাট-এর (লর্ড মিন্টো) ব্যক্তিগত সচিব ডানলপ স্মিথের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেন। ডানলপ স্মিথ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীগণ মুসলমান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব সমর্থন করেন। বড়লাট-এর কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য ডি.ইবেটসন লর্ড মিন্টোকে মুসলমান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দেন এবং তাদের দাবি-দাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে অনুরোধ জানান।...একই সময়ে পূর্ববঙ্গের গভর্নর ল্যান্সলট হেয়ার বড়লাট মিন্টোকে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দিলেন এবং তিনি এই প্রতিনিধি দলকে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রকৃত প্রতিফলন বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন।

"১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং এক দাবিপত্র পেশ করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তর প্রদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি সদস্য যোগদান করেন। সিমলায় প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সংগঠন ও উদ্দেশ্য থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আলিগড় গোষ্ঠীর দ্বারা মুসলিম প্রতিনিধি দল প্রভাবিত হয়েছিল।" (আধুনিক ভারত প্রথম খণ্ড ১৮৮৫-১৯২০ : প: বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ : কলিকাতা : ১৯৮৩)

১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় অনুষ্ঠিত হবে এই মর্মে জানিয়ে দেন, তখন মহসিন-উল-মুল্ক প্রতিনিধি দলের সদস্যদের তালিকা এবং দাবি-দাওয়াসম্বলিত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানে প্রাসঙ্গিক বিধায় মহসিন-উল-মুল্কের পরিচয় প্রদান সমীচীন মনে হয়। উত্তর প্রদেশের এটোয়ার উর্দুভাষী জনাব মহসিন-এর পুরো নাম নবাব সৈয়দ মেহেদী আলী মহসিন-উল-মুল্ক। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সময় ইনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এটোয়াতে কেরানির চাকরি করতেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ এঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "বিদ্রোহীদের হাতে এটোয়ার পতনের পর তিনি কোম্পানির অধীনে সামান্য বেতনের কেরানীর পদটি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বিদ্রোহ অবসানের পর তিনি চাকরিতে পুনর্বহাল হইয়া দ্রুত প্রমোশন পাইতে থাকেন। তাঁহার সর্বশেষ চাকরি ছিল হায়দরাবাদে। মোটা পেনশন এবং লম্বা উপাধিসহ তিনি স্যার সৈয়দের জীবদ্দশায় তথা হইতে এটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেস সম্পর্কে তিনিও স্যার সৈয়দের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তিনিও মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীকে কংগ্রেস হইতে দূরে রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মহসিন-উল-মুল্ক বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৭৮)

এহেন নবাব মহসিন বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য মহামান্য আগা খানের পরামর্শে যে ৩৫ সদস্যের প্রতিনিধি দলের তালিকা প্রণয়ন করলেন, তাতে আশ্চর্যজনকভাবে পাঞ্জাবের কবি আল্লামা ইকবাল, সিন্ধুর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (পরবর্তীতে পাকিস্তানের স্রষ্টা) এবং বোম্বের বদরুদ্দীন তায়েবজীর (নবাব মহসিনের প্রচেষ্টায় ১৯০৩ সালে মোহামেডান এ্যাডুকেশনাল কনফারেন্সের সভাপতি) মতো ব্যক্তিবর্গের নাম অনুপস্থিত। যেসব মুসলিম নেতৃবৃন্দের নাম আলোচ্য সিমলা প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে মহামান্য আগা খান, নবাব ইমদাদুর-মুল্ক নবাব ভিকার-উল-মুল্ক মোস্তাক হোসেন, হেকিম আজমল খান, স্যার আলি ইমাম, স্যার মোজাম্মেল উল্লাহ খান, স্যার রফিকউদ্দিন আহমদ, স্যার সলিমুল্লাহ, স্যার মোহাম্মদ শফি, স্যার আবদুর রহিম, বিচারপতি শাহেদীন এবং নবাব মহসিন-উল-মুল্ক প্রমুখ অন্যতম অবশ্য প্রয়োজনমতো এঁদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আরও বহুসংখ্যক নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

প্রাপ্ত নথিপত্রে দেখা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং রমেশ দত্ত প্রমুখরা ভারতীয় আইন সভায় অতঃপর মনোনয়নের পরিবর্তে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জোরের সঙ্গে উত্থাপন করলে উত্তর প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কেননা সরাসরি যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে (পাঞ্জাব ও বঙ্গীয় এলাকা ছাড়া) অন্তত তাঁদের পক্ষে আইন সভায় আসন গ্রহণ সম্ভবপর হবে না। উপরন্তু তাঁদের মনে এ মর্মে আশংকা ছিল যে, গোখলের সঙ্গে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মাত্রাতিরিক্ত দহরম-মহরম থাকায় এবং ইংল্যান্ডে ১৯০৬ সালের নির্বাচনে উদারনৈতিক দলের বিরাট সাফল্যের জের হিসেবে ইংরেজদের পক্ষে কংগ্রেসের সরাসরি নির্বাচনের দাবি মেনে নেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এজন্যই উত্তর প্রদেশের মুসলিম অভিজাত নেতৃবৃন্দ নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ-সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি নতুন পথের সন্ধান করছিল।

এ ধরনের এক প্রেক্ষিতে বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণলিপি পাওয়ার পর মহামান্য আগা খানকে সম্মুখে রেখে উত্তর প্রদেশের অভিজাত মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ প্রতিটি সিদ্ধান্তের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন বলা যায়। উত্তর প্রদেশের নবাব ভিকার-উল-মূল্‌ক মোস্তাক হোসেন, নবাব ইমাদাদুর মুল্‌ক এবং নবাব মহসিন-উল-মুল্‌ক এই তিনজন মিলিতভাবে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত স্মারকলিপির খসড়া প্রণয়ন করেন। গবেষক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সিমলা প্রতিনিধি দলের মূল দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

ক. সরকারের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ।
খ. বিনা পরীক্ষায় উচ্চ পদগুলোতে মুসলমানদের নিয়োগ।
গ. পৌরসভা ও জেলা পরিষদগুলোতে মুসলমানদের নিয়োগ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি।
ঘ. প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলোতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা।
ঙ. একটি পৃথক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি।

এতসব কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে গবেষকদের মনে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন জাগরূক হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমত সিমলা প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ সদস্যই শুধুমাত্র উত্তর ভারতীয় উর্দুভাষী এলাকা থেকে গ্রহণ করে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলের আল্লামা ইকবাল, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং বদরুদ্দীন তায়েবজীর মতো ব্যক্তিত্বকে বাদ দেওয়া হলো কেন? দ্বিতীয়ত কেন এই প্রতিনিধি দলে কোনো শিক্ষিত ধর্মীয় নেতা ও ব্যবসায়ীকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো না? তৃতীয়ত কেনইবা বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম প্রতিনিধিকে দলভুক্ত করা হলো ?

প্রখ্যাত গবেষক ড. তারাঁচাদ তাঁর রচিত 'হিস্ট্রি অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (৩য় খণ্ড)' গ্রন্থে এ মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, সিমলা প্রতিনিধি দল ছিল উচ্চবিত্ত অভিজাতগোষ্ঠী ও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের যৌথ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে, ড. চাঁদের এই মন্তব্য অসম্পূর্ণ। কেননা এই প্রতিনিধি দল শুধুমাত্র যে, 'আলিগড় মতাদর্শের' অনুসারী উত্তর ভারতীয় ভূস্বামী ও বিত্তশালী 'খান্দানী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল তাই-ই নয়, এঁরা ছিলেন অতিমাত্রায় শ্রেণী-সচেতন ও গোষ্ঠীস্বার্থে নিবেদিত প্রাণ। এঁদের মনে তখন একটাই মাত্র প্রশ্ন যে, কীভাবে প্রস্তাবিত সিমলা বৈঠকের মারফত উত্তর ভারতীয় সংখ্যালঘু উর্দু ভাষাভাষী অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। অবহেলিত মুসলিম জনগোষ্ঠী তো দূরের কথা, এঁরা মুসলিম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কথা পর্যন্ত চিন্তা করেননি। এজন্যই মূল উদ্দেশ্য (পূর্বে বর্ণিত ৫টি দাবি লক্ষণীয়) ব্যাহত হতে পারে আশংকায় আলোচ্য প্রতিনিধি দলে যোগদানের জন্য পাঞ্জাবের আল্লামা ইকবাল, সিন্ধুর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং বোম্বের বদরুদ্দীন তায়েবজীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দকে সেদিন আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানানো হয়নি। এঁদের মনে ভয় ছিল যে, ইকবাল-জিন্নাহ-তায়েবজীর মতো রাজনৈতিক সচেতন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানালে বড়লাটের জন্য প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে যেতে পারে।

অবশ্য এখানে যে কেউ-ই এ মর্মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, এই-ই যখন অবস্থা তখন বঙ্গীয় এলাকার ক'জনা নেতা আলোচ্য প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হলো কীভাবে? জবাবে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, সিমলা প্রতিনিধি দলের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য এ সময় বাংলার মুসলমানদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। এখানে উল্লেখ্য

যে, ভারত উপমহাদেশের বিগত প্রায় দু'শ বছরের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সব সময়েই উপমহাদেশের মোট মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের আবাস এই বাংলায়। ১৯০৬ সালে উপমহাদেশের মোট ৬২ মিলিয়ন (প্রণব চট্টোপাধ্যায়কৃত 'আধুনিক ভারত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) মুসলমান জনসংখ্যার ১৮ মিলিয়নের বসবাস ছিল নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে'। এজন্যই সেদিন সিমলা প্রতিনিধি দলে গুটি কয়েক বাঙালি মুসলমান নেতা অন্তর্ভুক্ত করে ১৮ মিলিয়ন বাঙালি মুসলমানের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে প্রস্তাবিত আলোচনাকালে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে যাতে প্রনিনিধি দলের পক্ষে বলা সহজ হয় যে, বাঙালি মুসলমানরাও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক হলেও এখানে বলতে হচ্ছে যে, সেদিন উত্তর প্রদেশের মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ শ্রেণীগত স্বার্থে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, তাঁরা বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি মোটেই আমল পর্যন্ত দেননি। এক্ষণে সত্যের খাতিরে ইতিহাসের সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর অবতারণা করতে হচ্ছে।

এটা এমন একটা সময় যখন নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠনের প্রায় বছর খানেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এটা এমন একটা সময় যখন কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী এবং পূর্ববাংলার হিন্দু জমিদার সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ রদের লক্ষ্যে এক 'মরণপণ আন্দোলনে 'ঝাঁপিয়ে পড়েছে; এটা এমন একটা সময় যখন বাঙালি বর্ণহিন্দু যুব সম্প্রদায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করে কালীমাতার সম্মুখে শপথ গ্রহণের পর সন্ত্রাসবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে এবং এটা এমন একটা সময় যখন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বাঙালি মুসলমানদের ছাড়াও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমর্থনের ব্যাপারগুলো (গবেষক সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকৃত 'ইন সার্চ অব এ রেভল্যুশনারি ইডলজি' গ্রন্থের বক্তব্য "কিন্তু শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ই স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন তা নয়, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ তফসিলী হিন্দুরাও বিশেষত নমঃশূদ্র জাতি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ ছিলেন, কারণ তাঁরা উচ্চবর্ণে হিন্দুদের শোষণে জর্জরিত ছিলেন এবং এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) পত্র-পত্রিকাগুলোতে পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছিল না। ঠিক এমনি এক সময়ে বাঙালি মুসলমানদের নেতা নবাব সলিমুল্লাহ এবং নবাব আলী চৌধুরী গেলেন উত্তর প্রদেশের মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য।

নবাব সলিমুল্লাহ আর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাঁরা এ মর্মে বললেন যে, প্রস্তাবিত সিমলা বৈঠকের জন্য প্রণীত প্রতিবেদনে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইনসভাগুলোতে রিজার্ভ আসন তথা পৃথক নির্বাচন এবং সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের কোটার প্রবর্তন ইত্যাকার ব্যাপারগুলো সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের সমস্যাগুলো কিছুটা ভিন্নতর। ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও নবগঠিত "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে" বাঙালি মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়...সংখ্যাগুরু (১২ মিলিয়ন হিন্দু : এক মিলিয়ন উপজাতি : ১৮ মিলিয়ন মুসলমান)। তাই নবগঠিত "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের" অধিকাংশ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু ও পূর্ব বাংলার বর্ণহিন্দু জমিদারদের মোকাবেলায় এই নবগঠিত প্রদেশের "স্থায়িত্বকরণ"। বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠকের জন্য প্রণীত স্মারকলিপিতে ১৮ মিলিয়ন বাঙালি

মুসলমানদের এই প্রাণের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সলিমুল্লাহ ও নবাব আলী চৌধুরী বহু প্রচেষ্টা করেও সফল হতে পারলেন না।

অবস্থাদৃষ্টে একথা বলা যায় যে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ক্ষেত্রে আরও গবেষণা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সে আমলের প্রকৃত ঘটনা প্রবাহের মূল্যায়নের লক্ষ্যে আমাদের জানা দরকার যে, শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ তথা উত্তর ভারতীয় উর্দু ভাষাভাষী সংখ্যালঘু অবাঙালি মুসলমানদের সম্প্রদায়গত ও গোষ্ঠীস্বার্থে বঙ্গীয়-এলাকার বিশেষ করে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ—'এর বিশাল বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করে কেমন করে তা' ব্যবহার করা হয়েছিল। কথাটা আরও সোজাসুজিভাবে বললে বলতে হয় যে, উপমহাদেশের ইতিহাসে যখন এক সংকটপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল, ঠিক তখন আলোচ্য অবাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ গার্জিয়ান-এর ভূমিকা গ্রহণ করেও কীভাবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্থাৎ নবগঠিত প্রদেশের স্থায়িত্বকরণ-এর প্রশ্নটি জলাঞ্জলি দিয়েছিল, তার বিস্তারিত তথ্য অবশ্যই জানতে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার গবেষক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ সমীচীন হবে। তিনি লিখেছেন, "এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দ বিশেষত ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী এই দাবিপত্রে (বড়লাটের জন্য প্রণীত স্মারকলিপি) বঙ্গভঙ্গের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগা খাঁর বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি।" (আধুনিক ভারত : ১ম খণ্ড : প: বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ : কলিকাতা ১৯৮৩)

তাই একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মহামান্য আগা খার নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করে সংখ্যালঘু মুসলমানদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত যে স্মারকলিপি পেশ করেছিল, তাতে বঙ্গীয় এলাকার সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের মূল দাবি 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের স্থায়িত্বকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য।

তবে এই বৈঠকে লর্ড মিন্টো কর্তৃক প্রতিনিধি দলের উত্থাপিত প্রস্তাবগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অন্তত দু'টি বিষয়ে সাফল্য অর্জিত হয়। প্রথমত ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিনিধি দলকেই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিভূ বলে স্বীকৃতিদান করলেন। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস ও সম্প্রদায়গত নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করার ফলে স্বভাবতই মুসলমানদেরকে ভারতে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদা দেওয়া হলো। সবার অলক্ষেই এর ফল হলো সুদূরপ্রসারী।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এ ব্যাপারে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী মহল তীব্র ভাষায় বহু বাদানুবাদ করলেও সমসাময়িককালে এঁদের মধ্যে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত অধিকাংশ নেতা বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পর্কিত আন্দোলনে ব্যস্ত থাকায় বিষয়টিকে বিশেষ আমলই দেয়নি। সে আমলে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত দু'টি বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকা যথাক্রমে 'এ্যাডভোকেট', ও 'হিন্দুস্থান রিভিউ'-এ সিমলা বৈঠকের ফলাফলে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। আগা খা'র নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল

বড়লাটের কাছে যে স্মারকলিপি প্রদান করেছিল, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হলে যখন দেখা গেল যে এসব দাবি-দাওয়ার মধ্যে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর "স্থায়িত্বকরণ"-এর প্রশ্নটি অনুপস্থিত, তখনই কোলকাতার প্রভাবশালী বাঙালি বর্ণহিন্দু মহলে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এঁদের মনে এ মর্মে আশার আলো দেখা দিল যে, তা'হলে আন্দোলন চালিয়ে গেলে বঙ্গভঙ্গ রদ সম্ভব হবে এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও পূর্ব বাংলার জমিদারিগুলোতে আবার সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত—এমনকি মারাঠী চীৎ ভবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত গোপাল কৃষ্ণ গোখলেও সিমলা বৈঠকের ফলাফলকে অভিনন্দিত করে। অন্যদিকে স্বাভাবিকভাবেই 'লন্ডন টাইমস্' পত্রিকা তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে (১লা অক্টোবর ১৯০৬) সিমলা বৈঠকের সাফল্য কমনা করে। কেবলমাত্র বৃহত্তর রাজনীতি সম্পর্কের সচেতন কোলকাতার "অমৃতবাজার পত্রিকা"১৯০৬ সালের ৪ঠা অক্টোবরে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তীব্র ভাষায় সিমলা বৈঠকের সমালোচনা করে। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ এসময় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা গঠনের দাবির প্রশ্নে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে তাঁরা তখন সিমলা বৈঠকের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। এ জন্যই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন (সভাপতি দাদাভাই নওরোজী) অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই অধিবেশনে আশ্চর্যজকভাবে সিমলা বৈঠকের কোনো উল্লেখ ছিল না।

অন্যদিকে বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় উর্দু ভাষাভাষী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলীগড় বৈঠকের শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তাঁরা একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন যে, অতঃপর উত্তর ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব হবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি সর্বভারত ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র এ ধরনের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই আলোচ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

আগা খান ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্য নবাব স্যার সলিমুল্লাহ নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর রাজধানী ঢাকা নগরীতে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'মোহামেডান এ্যাডুকেশন্যাল কনফারেন্স-এর বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করলে পরিস্থিতি 'আলীগড় চিন্তাধারার' অনুসারীদের পক্ষে প্রবাহিত হয় বলা যায়। গবেষক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ বর্ণিত উত্তর প্রদেশের "বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী" ব্যক্তিত্ব নবাব মহসিন-উল-মূলক্ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলেন না। মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের শেষদিন অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার শাহবাগের নবাবদের বাগান বাড়িতে বিকেলের চা-নাস্তার সময় ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়। গবেষক ও সাংবাদিক মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ এ সম্পর্কে লিখেছেন, "অধিবেশনের শেষে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মহসিন-উল-মূলকের প্রস্তাবক্রমে (সমর্থক-হেকিম আজমল খাঁ) বহু প্রতীক্ষিত মুসলিম লীগ জন্ম লাভ করে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন নওয়ার ভিকার-উল-মূল্ক। ইহার গঠনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হয় তাঁহার (মহসিন-উল-মূল্ক) ও নওয়াব ভিকার-উল-মূল্ক-এর উপর। (আমাদের মুক্তি সংগ্রাম : পৃষ্ঠা ১৭৪ : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৮)।

এখানে দু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত শুরু থেকেই 'মুসলিম লীগ' নামের এই প্রতিষ্ঠানের একটি সর্বভারতীয় চরিত্র দেওয়ার লক্ষ্যে ১৮ মিলিয়ন বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ-এর রাজধানী ঢাকায় এর জন্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা (ঢাকা সম্মেলনেও ইকবাল-জিন্নাহ-তায়েবজীকে আমন্ত্রণ করা হয়নি) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, এর পরবর্তী ৪১ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আর কোনো অধিবেশন আহ্বান করা হয়নি। দ্বিতীয়ত ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলেও শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'মুসলিম লীগ'এর নাম ও চারটি উদ্দেশ্য ঘোষণা এবং পরবর্তী বৎসরে অধিবেশন করাচীতে অনুষ্ঠিত হবে—এই সিদ্ধান্তটুকু ছাড়া ঢাকায় আর কিছুই হয়নি।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের ঘোষিত চারটি মূল লক্ষ্যের উল্লেখ করা হলো :

ক. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমানদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করা এবং সরকারি বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হতে দেওয়া।

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলমানদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হতে দেওয়া।

গ. জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করা।

ঘ. উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো কোনো অবস্থাতেই ক্ষুণ্ন না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মিত্রতা সম্ভব—কিন্তু রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপন সম্ভব নয়।

১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হওয়ার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছয় বছরের কর্মকাণ্ডের সমীক্ষা করলে বিস্মিত হতে হয় বৈকি। ১৯০৭ সালে নবাব মহসিন-উল-মূল্কের মৃত্যু হলে নবাব ভিকার-উল-মূল্ক একাকীই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। স্যার পীর ভাই-এর সভাপতিত্বে করাচীতে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে এ মর্মে এক "অদ্ভুত" সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরবর্তী ছয় বছর অর্থাৎ ১৯১২ সাল পর্যন্ত মহামান্য আগা খান এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। অবশ্য আগা খান দেশের বাইরে থাকলে কিংবা অনুপস্থিত থাকলে অন্য কেউ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন।

তাহলে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, উত্তর প্রদেশ তথা উত্তর ভারতীয় সংখ্যালঘু অভিজাত অবাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিমলা বৈঠকে ভাইসরয় লর্ড মিন্টো যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেসব আইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা লাভ না করা পর্যন্ত 'আলীগড় আন্দোলনের' অনুসারীরা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে রাজি ছিলেন না এবং এ জন্যই অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এঁরা এঁদের গার্জিয়ান মহামান্য আগা খানকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের জন্য স্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছিলেন। এ সময় মুসলিম লীগের প্রধান কার্যালয় প্রথমদিকে আলীগড়ে ও পরে লক্ষ্মৌতে অবস্থিত ছিল।

বাংলাদেশের গবেষক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্‌র মতে, "দীর্ঘ ছয় বছর এরূপে লীগ অল্প কয়েক ব্যক্তির পকেট প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বিরাজ করে। মওলানা মোহাম্মদ আলীই ইহাকে কোটারি মুক্ত করিয়া ১৯১২ সালে ইহার দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন।"

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন গবেষক প্রণব কুমার চ্যাটার্জীর এতদ্‌সম্পর্কিত কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "মুসলিম লীগের প্রতি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলোতে সমর্থন জানানো হয়। ইংলিশম্যান (স্টেটসম্যান) ও টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলিম লীগের আনুগত্য ও নির্ভরশীলতায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। নতুন দলটি ভারতে শান্তি রক্ষা করতে পারবে কিনা, এই বিষয়ে লন্ডনের টাইমস্ পত্রিকা সংশয় প্রকাশ করে।...কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এই সঙ্ঘের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। ব্রিটিশ বিরোধী মুসলমান উলেমা সম্প্রদায়ও এই সংগঠনের গুরুত্ব বোঝেননি। মুসলিম লীগ মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে আনুগত্যের নীতি গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকার নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সূচনা করলেন তার ফলে কংগ্রেস পরিচালিত ঐক্যবদ্ধ(?) ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পথে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হল।...কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে, নরমপন্থী দলের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যও মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়। এই সংস্কার আইনে মুসলমান সম্প্রদায়কে আইন সভায় পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করে ইংরেজ সরকার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান ও বিদ্বেষ গড়ে তুলতে সহায়তা করলেন।...এইভাবে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো আইনে যে "দুই জাতি তত্ত্বের" বীজবপন করা হলো, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো ভারত বিভাগ (১৯৪৭)।"

সামগ্রিকভাবে সমসাময়িককালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গবেষক প্রণব চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে বহুলাংশে সত্যের অপলাপ করেছেন। আলোচ্য সময়ে কিছুদিন পর্যন্ত উত্তপ্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর সোচ্চার হয়েছে। গভীর লজ্জা ও বেদনাপীড়িত হৃদয়ে বিশ্ব কবি লিখেছেন, "মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব, শনির ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। ...কেননা, আমি এই বলি, দেশকে শাদাভাবে, সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না–চীৎকার করে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়–তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা, এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ।" (রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব : ড. অরবিন্দ পোদ্দার : কলিকাতা ১৯৮২)

ইংরেজ ভারতে যখন এ ধরনের এক উত্তপ্ত পরিবেশ বিদ্যমান এবং যখন 'আব্দার-অভিমান-আবেদনের' শতাব্দী অতিক্রম করে বাঙালি বর্ণহিন্দু আর মারাঠী, ব্রাহ্মণ যুবকরা সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেছে; ঠিক তখনই অর্থাৎ ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হলো। ১৯০৬ সালে মহামান্য আগা খা-এর নেতৃত্বে উত্তর ভারতীয় অবাঙালি মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে যে প্রতিনিধি দল ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাত করে ৫ দফা দাবি করেছিলেন, অবশেষে ১৯০৯ সালে তা' আইন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা লাভ করল। পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ সময়কার রাজনৈতিক চিন্তাধারা

দুর্বল থাকা সত্ত্বেও এরা কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে মর্লে-মিন্টোর সংস্কার আইন গ্রহণ করে নিল। কিন্তু এঁদের মনে তখন বিরাট প্রশ্ন—নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর স্থায়িত্বকরণের বিষয়টি সিমলা ডেপুটেশনের স্মারকলিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি কেন? উপরন্তু 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে' বাঙালি মুসলমানরা তো সংখ্যালঘু নয়—সংখ্যাগুরু।

পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে 'আলীগড় চিন্তাধারা'র বিজয় সূচিত হওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিনের জন্য উত্তর ভারতীয় মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্যম হারিয়ে ফেলে। কেননা এতদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য উত্তর প্রদেশের অভিজাত মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য 'মুসলিম লীগ' নামের প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। এক্ষণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হলে তা নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য হতে আর বাধা থাকার কথা নয়।

এ সম্পর্কে গবেষক ডঃ শীলা সেন-এর মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন, "পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত হিন্দু বিরোধী ও ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের নীতি বহাল রাখা সম্ভব হলো না। ঢাকার নবাব, আগা খা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে সরে এলেন এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন তরুণ মুসলমান নেতারা মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। শীঘ্রই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, মহম্মদ আলী প্রমুখ নেতারা মুসলিম লীগ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন; এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী উলেমা সম্প্রদায় মুসলমান রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হলেন। এইভাবে ক্রমশ মুসলিম লীগে নেতৃত্ব ও সংগঠনের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা গেল, মুসলিম লীগে উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অবসান হলো এবং সাংগঠনিক ভিত্তি আরও সম্প্রসারিত হলো। (মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল : দিল্লী ১৯৭৬)

তাহলে ড. শীলা সেন বর্ণিত কোন্ প্রেক্ষিতে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ এবং মহামান্য আগা খাঁর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহ বিলুপ্ত হয়, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা সমীচীন মনে হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, সিমলা প্রতিনিধি দলের প্রণীত স্মারকলিপিতে নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর স্থায়িত্বকরণের বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় নবাব সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন এবং নিগৃহীত বাঙালি মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি এ কথাও বলা অন্যায় হবে না যে, তিনি নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব একটা নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন যে, ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অন্তত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নবগঠিত প্রদেশের স্থায়িত্বকরণের প্রশ্নে ব্যাপক সাড়া জাগানো সম্ভব হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যখন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আইন সভায় সদস্য নির্বাচনের চিন্তা-ভাবনা করছে, ঠিক তখনই উত্তর ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটি কুক্ষিগত করে নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বার্থে 'প্লাটফর্ম' হিসেবে ব্যবহার করছে।

এ ধরনের এক চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে ১৯০৯ সাল নাগাদ মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর স্থায়িত্বকরণ সম্পর্কিত বিষয় অনুপস্থিত থাকায় বর্ণহিন্দু বাঙালিদের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফায় দারুণ উৎসাহে বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন শুরু হয়। আশ্চর্যজনক হলেও বলতে হয় যে, এ সময় ইংরেজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম

সম্প্রদায় তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমানদের সমর্থনে এগিয়ে আসেননি বা সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করেননি।

এই পরিস্থিতিতে ভারতে নয়া ভাইসরয়ের আগমন হলো। লর্ড মিন্টোর স্থলে ১৯১০ সালে বড়লাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন লর্ড চার্লস হার্ডিঞ্জ ১৮৫৮-১৯৪৪। ইনি পেশায় ছিলেন একজন কূটনীতিবিদ এবং উদারনৈতিক দলের সমর্থক। হার্ডিঞ্জের সঙ্গে অচিরেই মধ্যপন্থী কংগ্রেসী মারাঠা নেতা গোখলের প্রকাশ্য-বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এমনকি লর্ড হার্ডিঞ্জ এ সময় স্বীয় ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে গোখলেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় তরুণ ভারতীয় নেতা গান্ধীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, ইংরেজদের সঙ্গে তার একটা সমঝোতা করার লক্ষ্যেই সেদিন "ইসলিংটন" মিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে গোখলে মনোনীত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ গবেষক পারসিভিয়াল স্পিয়ার-এর মতে, কংগ্রেস-ভারত সরকারের এই 'মধু-চন্দ্রিমা' পরবর্তী প্রায় ৫ বছর অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস সমর্থক বড়লাট হার্ডিঞ্জ ১৯১০ সালের ১৯ই নভেম্বর বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুপারিশ করে লন্ডনে একটি গোপনীয় চিঠি লিখলেন তৎকালীন ভারত সচিবকে। এরপর সবকিছু গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলেও দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ জানতেই পারেনি।

কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে, ভারত সরকার তখন দিল্লীতে আকস্মিকভাবে রাজধানী স্থানান্তরের প্রশ্নে কোলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার জন্য আতঙ্কিত ছিল।

এদিকে উপমহাদেশে দ্রুত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ 'হতভম্ব' হয়ে পড়েন এবং মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁর সমস্ত আস্থা বিনষ্ট হয় ও 'নিজ হাতে গড়া' এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহের বিলুপ্তি ঘটে। এমনকি নবাব সলিমুল্লাহ ক্ষোভে ও দুঃখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'দিল্লী দরবার' চলাকালীন সময়ে তা পরিত্যাগ করেছিলেন।

এজন্য একথা বলা যায় যে, সেদিন সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ কোনোরকম অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় যেখানে মুসলিম লীগের প্রতি নবাব সলিমুল্লাহর আগ্রহের সমাপ্তি ঘটেছিল; সেখানে মুসলিম লীগ থেকে মহামান্য আগা খা'র সরে পড়ার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উত্তর প্রদেশের অবাঙালি মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থার লক্ষ্যে যে আগা খা একদিন সিমলা ডেপুটেশনের নেতৃত্বদান করেছিলেন, ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো সংক্রান্ত আইনে সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় আগা খা মুসলিম লীগের সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। আবারও বলতে হচ্ছে যে, 'আলীগড় ডেপুটেশনে'র কাছে পূর্বে বর্ণিত ৫ দফা দাবিই ছিল মুখ্য এবং তাঁদের মানস-হৃদয়ে বাঙালি মুসলমানদের প্রাণের দাবি 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'-এর 'স্থায়িত্বকরণের" দাবির কোনো স্থান ছিল না। এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য।

পাঠকবৃন্দ, এক্ষণে অত্র পুস্তকে বর্ণিত চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী ও নানাবিধ কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে এ মর্মে একটা সমীক্ষার প্রয়োজন যে, নিম্নে বর্ণিত সম্প্রদায়ের হিসেবে কারা বেশি লাভবান হলো?

ক. উত্তর ভারতীয় অবাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়

খ. পূর্ব বঙ্গীয় এলাকার অবহেলিত মুসলমান জনগোষ্ঠী এবং

গ. কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের নেতৃত্বের মানব-গোষ্ঠী।

উত্তর ভারতীয় অবাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়

বঙ্গীয় এলাকার সংখ্যাগুরু ও সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমানদের দাবির প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা না করে ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টোর সংস্কার আইনের মাধ্যমে এরা যে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল, মাত্র ৩৮ বছরের মাথায় ১৯৪৭ সালের আগস্টে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্বাধীন ভারতে এঁদের কোনো 'রক্ষাকবচ' নেই। গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শের বাস্তবায়নের মোকাবিলায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এঁদের জীবন এখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মতোই সংগ্রামবহুল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান অর্জিত হবার প্রাক্কালে উত্তর ভারতীয় এলাকা থেকে যেসব মুসলমানরা তৎকালীন পাকিস্তানে 'হিজরত' করে 'শরাফত' ও 'খান্দানী'র দাপট প্রদর্শন করেছিল, ১৯৫১ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে এদের প্রভাব দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে তৎকালীন পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণ-হত্যার মোকাবিলায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এদের অধিকাংশই সেই হানাদার বাহিনীর মদদ জুগিয়েছিল। ফলে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর এঁরা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। বাংলাদেশে আজ 'শরাফত' আর 'খান্দানীর' মিথ্যা গর্ব ও অহমিকার স্থান পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।

অন্যদিকে পাকিস্তানে (প্রাক-একাত্তরের পশ্চিম পাকিস্তান) এঁরা এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছে। একমাত্র করাচী শহর ছাড়া আর কোথাও এঁদের জন্য কোনও স্থান নেই। এমনকি সেই করাচীতেও অহরহ দাঙ্গা সংগঠিত হচ্ছে। সবই নিয়তির বিধান হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া এঁদের কোনও গত্যন্তর নেই।

পূর্ব বঙ্গীয় এলাকার অবহেলিত মুসলমান জনগোষ্ঠী

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা পরাজিত হবার পর থেকে ১৭৬৩ সালে গিরিয়ার যুদ্ধে নবাব মীর কাসিমের পরাজয় পর্যন্ত মাত্র ৬ বছর সময়কালের মধ্যে নবাবদের বিশাল সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে সেনাবাহিনীর জীবিত পদস্থ সামরিক কর্মচারী ছাড়াও বহু মুসলমান বেসামরিক কর্মচারীরা বঙ্গীয় এলাকায় পরিত্যাগ করে। অতঃপর একদিকে কোলকাতা নগরীর সমৃদ্ধি এবং অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা নগরীর গুরুত্ব দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বহু বিত্তশালী মুসলিম পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতীয় এলাকায় গমন করে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত ও ১৮৪২ সাল নাগাদ ফার্সির পরিবর্তে অফিস-আদালতে ইংরেজি ভাষা চালু এবং পরবর্তীতে লাখেরাজ সম্পত্তির দলিল প্রদর্শন সম্পর্কিত নির্দেশ জারি হওয়ার প্রেক্ষিতে বঙ্গীয় এলাকার মুসলিম মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী সম্প্রদায় হয় দেশত্যাগ, নাহয় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে বিশাল বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় সম্পূর্ণভাবে "অদৃশ্য" হয়ে যায়। এটাই ছিল বাঙালি মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে "দুঃসময়।" এসময় বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের বুক থেকে নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবলুপ্তি হওয়ার নানা ধরনের কুসংস্কার এই জনগোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অবশেষে ওয়াহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ইংরেজ শাসিত এলাকাকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা করলে সত্যিকার অর্থে বাঙালি মুসলমানরা ইংরেজি শিখতে শুরু করে এবং এখান থেকেই নতুনভাবে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের যাত্রা শুরু। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলমানরা আর কোনও গোপন, সন্ত্রাস কিংবা রাজপথের আন্দোলন করেনি। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আদিতে বাঙালি এবং ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান—এই বিশাল মানবগোষ্ঠীকে ইংরেজরা শাসন ও শোষণ করছে; কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু জমিদাররা ঘৃণা-অবহেলা-শোষণ করেছে এবং উত্তর ভারতী অবাঙালি মুসলিম অভিজাত শ্রেণী এঁদের 'প্রতারিত' ও 'ধোকা' দিয়েছে।

কিন্তু সময়ের দূরত্বে ১৮৭১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনাবহুল একশত বছর অতিক্রান্ত হবার পর আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর বৃহত্তম বঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার বঞ্চিত ও অবহেলিত বিশাল বাঙালি জনগোষ্ঠী স্বাধীন ও সার্বভৌম হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় এঁরা শুধু স্বাধীন ও সার্বভৌম তাই-ই-নয়, এঁদের রক্তবলয় খচিত নিজস্ব জাতীয় পতাকা ছাড়াও এঁদের রাষ্ট্র ভাষা হচ্ছে হাজার বছরের ঐতিহ্য বহনকারী বাংলা ভাষা। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা হচ্ছে বাংলা। তবে আজ সগর্বে বলতে চাই যে, বাংলা ভাষা, বাংলা লোকাচার আর বাংলা সংস্কৃতি-সভ্যতা সবকিছুর গার্জিয়ান আমরাই। আমরাই হচ্ছি বাংলাদেশের প্রায় ১০ কোটি আদি ও অকৃত্রিম সন্তান— বাংলাদেশের বাঙালি এবং আমাদের অধিকাংশ ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান। নদী-বিধৌত এই বাংলায় বাঙালিত্ব সুফী-দর্শনের অপরূপ মিশ্রণ হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এ ধরনের বিবর্তন বিরল।

এ জন্যই আমরা ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে অত্র এলাকায় চাঞ্চল্যকর বিষয় অবলোকন করেছি। ভয়াবহ আন্দোলনের মাধ্যমে যে বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও জমিদার শ্রেণী ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গকে রদ করেছিল, তারাই আবার ১৯৪৭-এ এসে বাংলাকে খণ্ডিত করেছে। ফলে ১৯৪৭ সালে আর্যদের উত্তরসূরীর দাবিদাররা এ দেশ ত্যাগ করেছে এবং ১৯৭১ সালে 'শরাফত' ও 'খান্দানী' মুসলমানিত্বের শ্লোগান উচ্চারণকারী অবাঙালিরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখন প্রায় ৪৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের বাঙালিদের দায়িত্ব একটাই এবং তা হচ্ছে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিজেদের গড়ে তোলা।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের মানবগোষ্ঠী

সবশেষে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের নেতৃত্বের মানবগোষ্ঠী সম্পর্কের মূল্যায়ন। এদেশে ইংরেজ আগমনের পর উপমহাদেশে সর্বপ্রথম একমাত্র এঁরাই একটা সম্পূরক শক্তি হিসেবে অর্থবহ ভূমিকা পালন করেছে। যেখানে মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিমদের শাসনামলে এই বর্ণহিন্দুরাই ছিল সম্পূরক শক্তি, সে ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের শুরুতে এঁরা সহজেই নতুন 'মুনিবকে' মেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্র পুস্তকে এতদসম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এরই জের হিসেবে এঁরাই সর্বপ্রথম পরিগণিত হয়েছিলেন এই উপমহাদেশের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসেবে। কীভাবে এসব সম্ভব হয়েছিল, তারও বিস্তারিত তথ্যাদি ইতিপূর্বে বর্ণিত করেছি। এই বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা কোন্ প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর মূল শর্ত 'স্বাধীনতা' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও বাংলার রেনেসাঁর দাবিদার

হিসেবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল তারও কথাবার্তা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন হচ্ছে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান।

অন্যান্য সবকিছুর কথা ছেড়ে দিলেও বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফলগুলো একটা পরিচ্ছন্ন ও উদার হৃদয়ে মূল্যায়ন করা অপরিহার্য মনে হয়। কারণ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণার পর দেশ-বিদেশে এ মর্মে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এর ফলে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীর বিজয় সূচিত হয়েছিল। এমনকি বহু পণ্ডিত ব্যক্তির রচিত গ্রন্থেও এই বিজয়গাঁথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এতগুলো বছর পরে প্রকৃত ইতিহাস বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা আন্ত ফলাফলগুলো তো ভিন্ন রকম মনে হচ্ছে। নিম্নে সংক্ষেপে সে কথাগুলোই উপস্থাপিত করলাম :

ক. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে এলাকা দেওয়া হয়েছিল যশোর-কুষ্টিয়া থেকে ছোট নাগপুর পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫৪ মিলিয়ন। কিন্তু ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন দাঁড়াল চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত ৮৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার মতো। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণাকালে উড়িষ্যা ও বিহার অঞ্চল কেটে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এর রাজধানী স্থাপিত হলো পাটনায়।

খ. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হলে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করলেন যে, পুনর্গঠিত বাংলা প্রেসিডেন্সিতে অবাঙালিরা সংখ্যাগুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এঁরা বুঝতেই পারলেন না যে, ১৯১১ সালে যেভাবে বাংলাকে যুক্ত করে অবিভক্ত বাংলা সৃষ্টি করা হলো, তাতে বাঙালি মুসলমানদের জনসংখ্যাই সংখ্যাগুরু হয়ে দাঁড়াল।

গ. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ইংরেজ ভারতের রাজধানী কোলকাতাতেই নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে কোলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে গেল। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকে ইংরেজ আমলের শুরু হিসেবে চিহ্নিত হলে ইংরেজদের মোট রাজত্বকাল হলো ১৯০ বছরের মতো। এর মধ্যে ১৫৪ বছর পর ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলো। তাহলে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের হাত থেকে বিশাল ইংরেজ ভারতের রাজধানীটা চলে গেল সুদূর দিল্লীতে।

ঘ. বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার সময় পর্যন্ত ইংরেজ ভারতের সমস্ত রকমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কোলকাতায় এবং রাজনীতির নেতৃত্বে ছিল বাঙালি বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তশালীদের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের স্বদেশী আন্দোলন চলাকালে সবার অলক্ষেই অবাঙালি নওরোজী-তায়েবজী গোখলে-তিলক-মেহতা-রানাডে-লাজপত-সাভারকার প্রমুখের অভ্যুদয় হলো। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই যে ১৯১১ সাল নাগাদ বর্ণহিন্দু বাঙালিদের হস্তচ্যুত হলো, তা আজও পর্যন্ত পুনরুদ্ধার হয়নি।

ঙ. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। কিন্তু মাত্র একানব্বই দিনের মাথায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়ে ১৯০৬ সাল থেকে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। প্রায় বছর খানেক পরে কবিগুরু রবীন্দ্র যখন আবার লেখনী ধরলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ এক ভিন্নাদর্শের অনুসারী। রবীন্দ্রনাথ তখন মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। স্বদেশী আন্দোলনের নামে বিরাজমান সাম্প্রদায়িকতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। অচিরেই রবীন্দ্রনাথের গোত্রান্তর হলো। তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রচনা করে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্ব কবি হিসেবে পরিণত হলেন।

চ. সবচেয়ে লক্ষণীয় ঘটনা হচ্ছে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার সময়েও শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাকালে টেবিলের একদিকে শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ এবং অন্যদিকে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিবৃন্দের দেখা যেত। কিন্তু (১৯০৬ সালেই মুসলিম লীগের জন্ম) বাংলার রাজনীতিতে নতুন করে তৃতীয় পক্ষের অভ্যুদয় হয়েছে। এঁরা বাঙালি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার।

ছ. ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে আলোচ্য তৃতীয় পক্ষ শুরু করল 'কোটার রাজনীতি'। ১৯১১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের দূরত্ব মাত্র ৩৬ বছরের মতো। এই ৩৬ বছরের মাথায় আলোচ্য তৃতীয় পক্ষ অবিভক্ত বাংলাসহ পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে বসলো। এর জবাবে বাংলা কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে কোলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু আর বিত্তশালীরা অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ভাগ করার দাবি উত্থাপন করল। শেষ পর্যন্ত বিভক্ত বাংলার শতকরা সাড়ে বাষট্টি ভাগ নিয়ে গঠিত হলো পূর্ব বাংলা আর বাকিটুকু হচ্ছে আজকের পশ্চিম বাংলা (ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। কোথায় ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের পর ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল সম্বলিত বাংলা ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি আর কোথায় ১৯৪৭ সালে হাজার তিরিশেক বর্গমাইল-এর পশ্চিম বাংলা।

সমাপ্তিতে শুধু এ কথাটাই বলতে চাই যে, নদীমাতৃক বাংলাদেশের সেই অবহেলিত বাঙালিরা কিন্তু এখন স্বাধীন। এঁদের নিজস্ব পতাকা রয়েছে; এঁদের জাতীয় সঙ্গীত বাংলায় পরিবেশিত হচ্ছে আর এঁদের রাষ্ট্র ভাষাও বাংলা। এই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী এখন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাহলে অন্যদিকে পশ্চিম বাংলার সেই বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের পরিণতিটা কোথায় যেয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাই লক্ষণীয়। ভারতে কিন্তু সেই 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হয়নি। এঁদের রাষ্ট্র ভাষা হচ্ছে হিন্দী আর এই এঁরা হচ্ছেন ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৮/৯ ভাগের মতো। এঁরা এখন নিজস্ব স্বকীয়তা পর্যন্ত হারাতে বসেছেন। তাহলে ইতিহাসের বিচারে লাভবান কারা হলো?

কোলকাতা কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

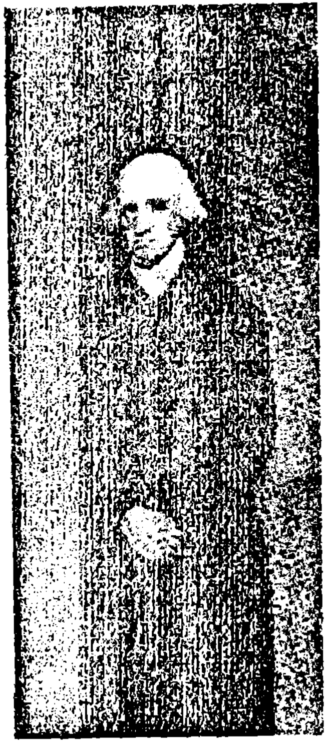

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮)

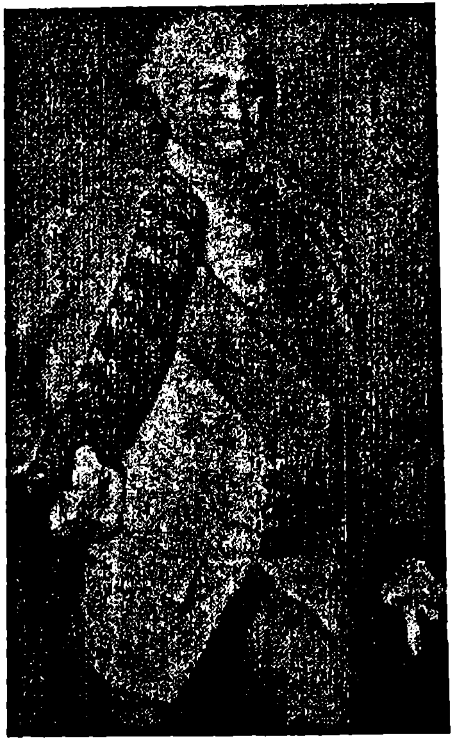

লর্ড ক্লাইভ (১৭৫২-১৭৭৪)

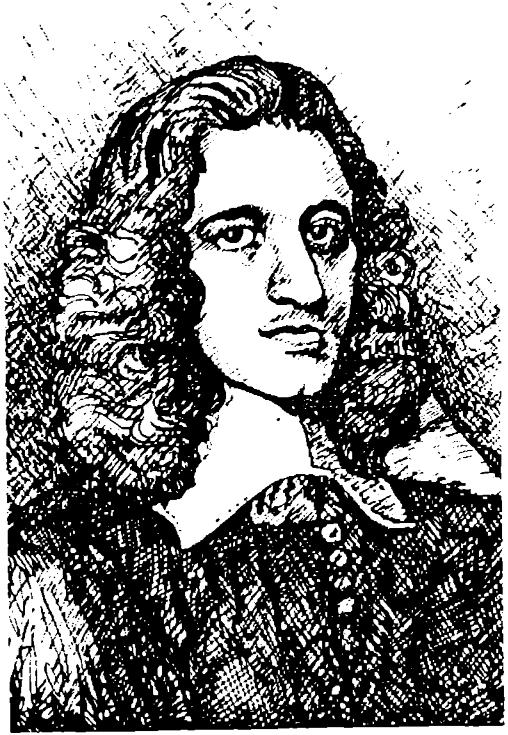

জব চার্নক (১৬৩১-১৬৯৩)

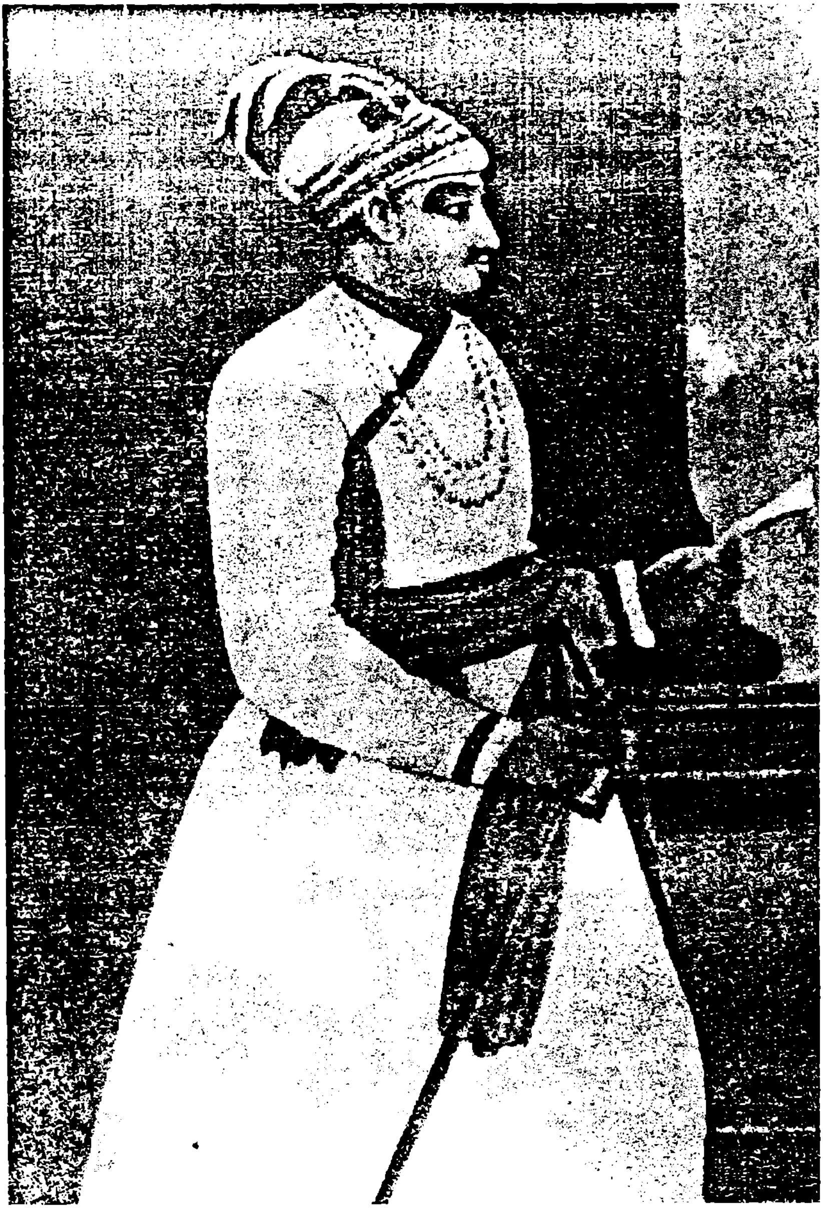

নবাব সিরাজদ্দৌলা (১৭৩০-১৭৫৮)

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৬০-১৮৪২)

লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিশ (১৭৩৮-১৮০৫)

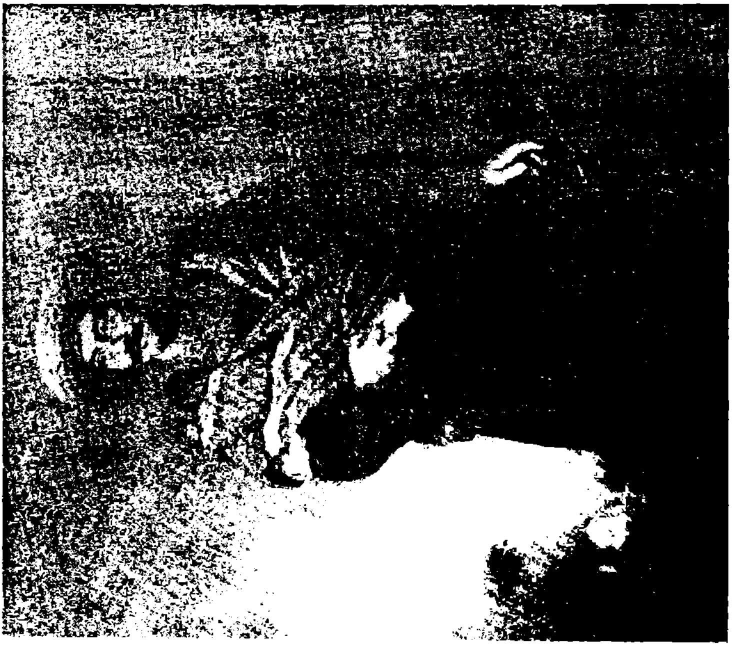

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

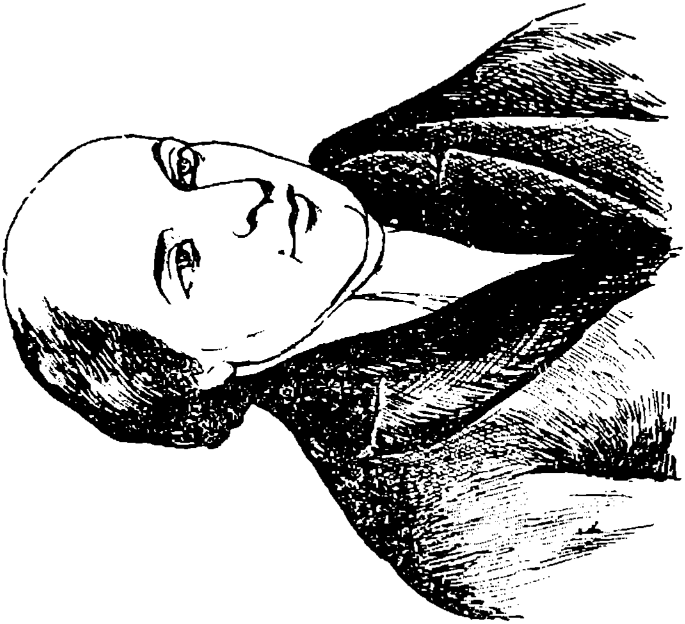

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪)

ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির মিতের

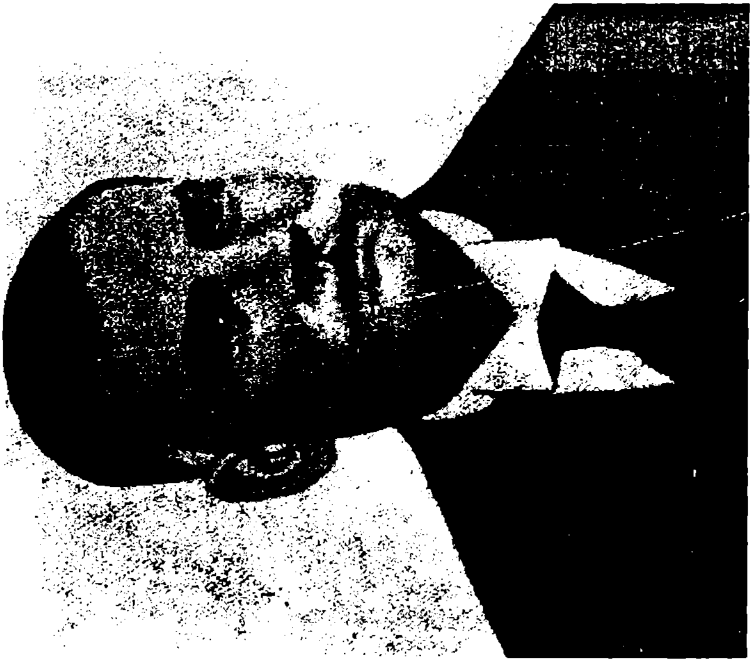

সৈয়দ আলী ইমাম

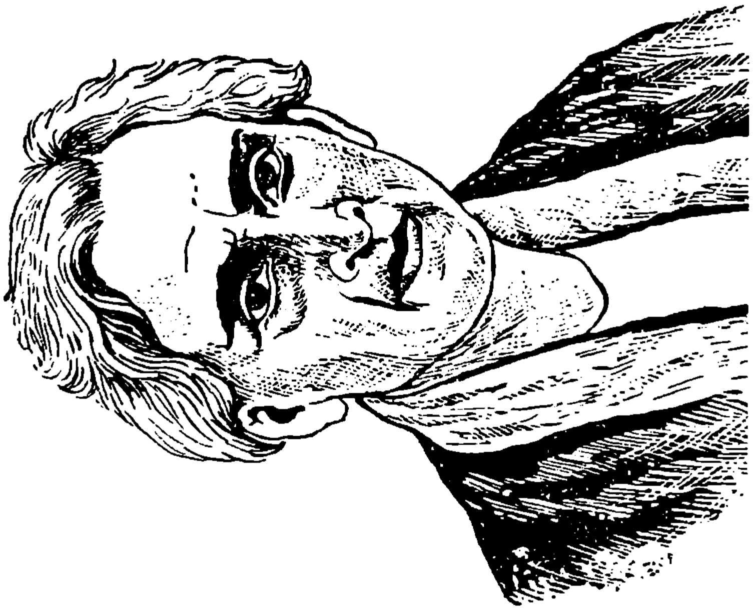

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী

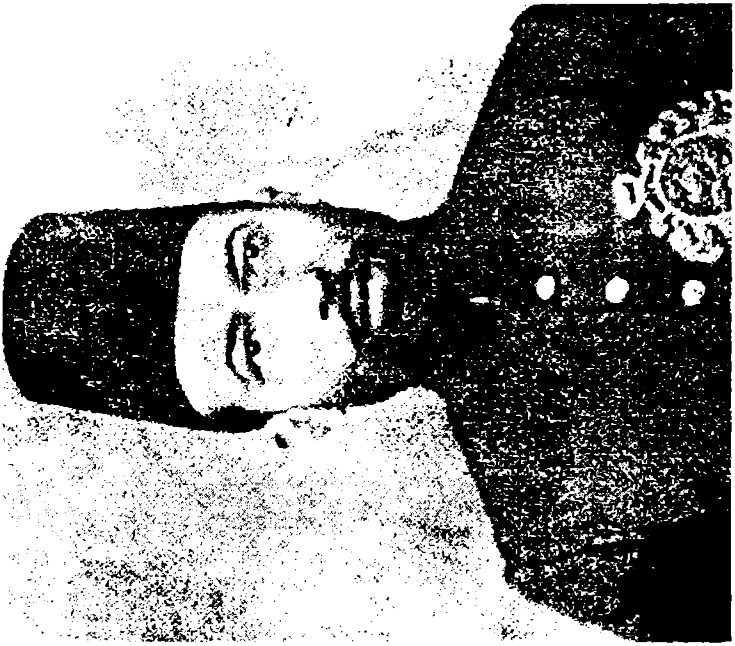

হেকিম আজমল খান

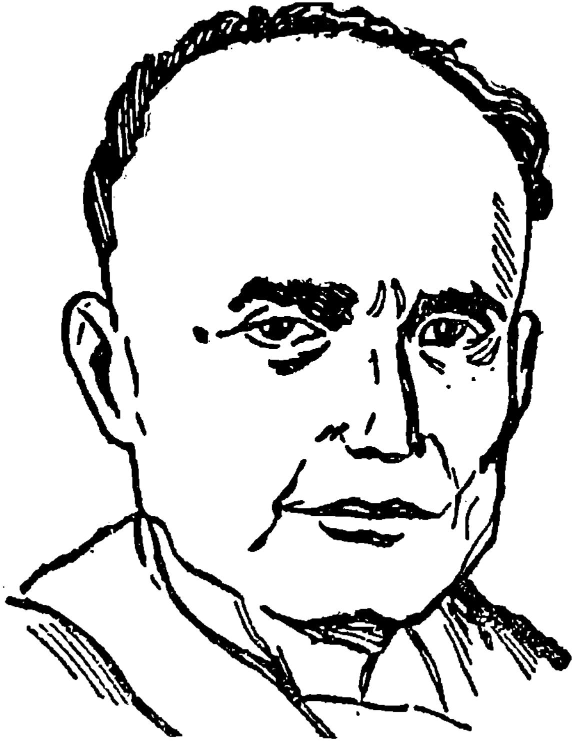

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২৩-১৮৯১)

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)

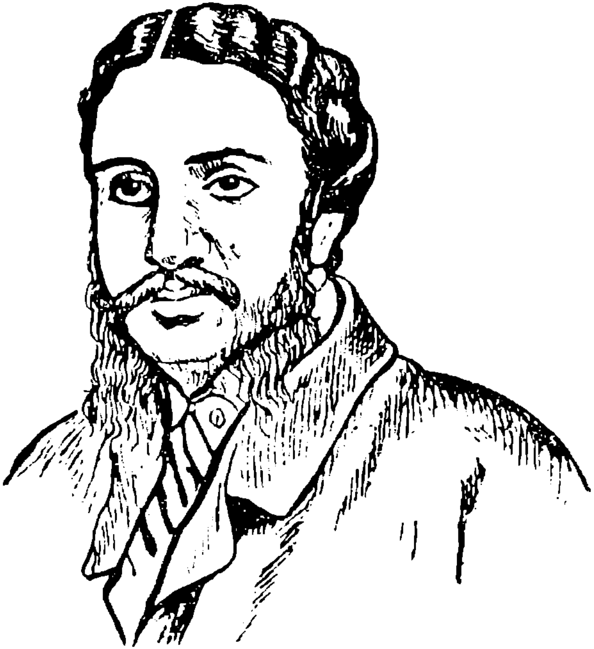

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮৩৪-১৮৭৩)

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯১)

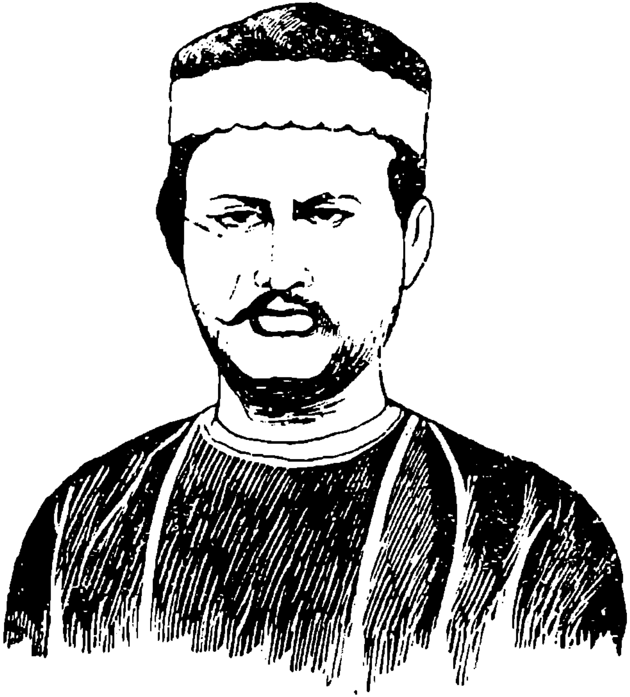

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

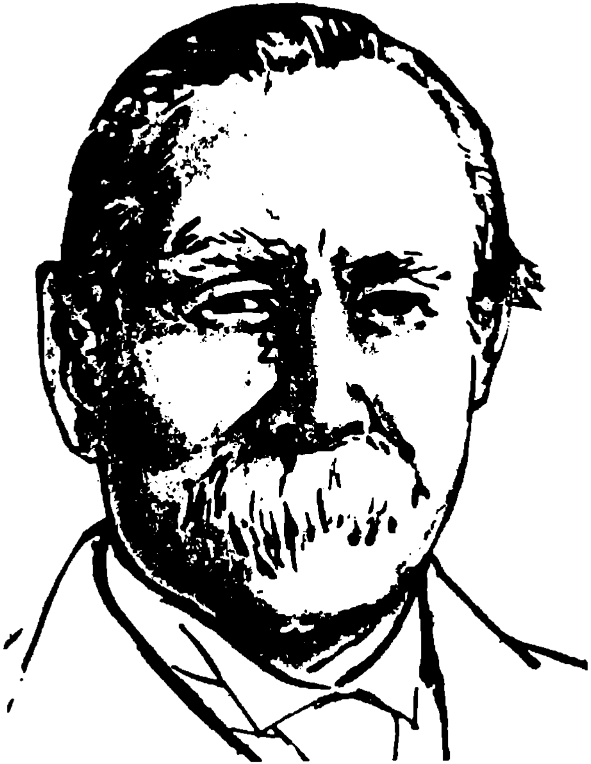

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২)

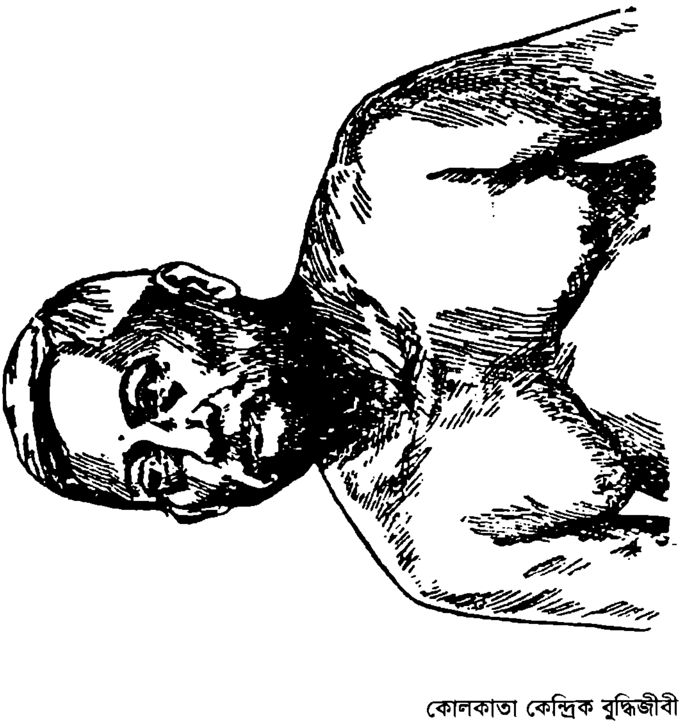

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

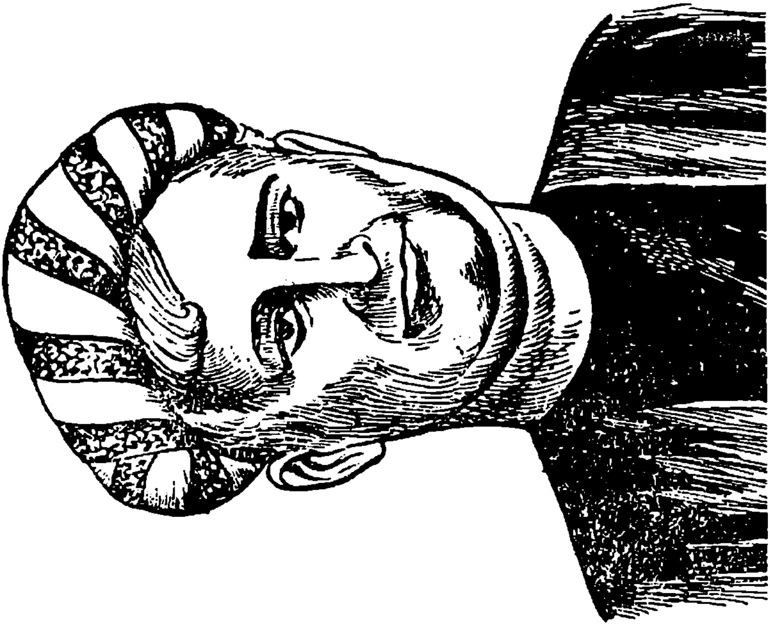

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫)

স্যার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

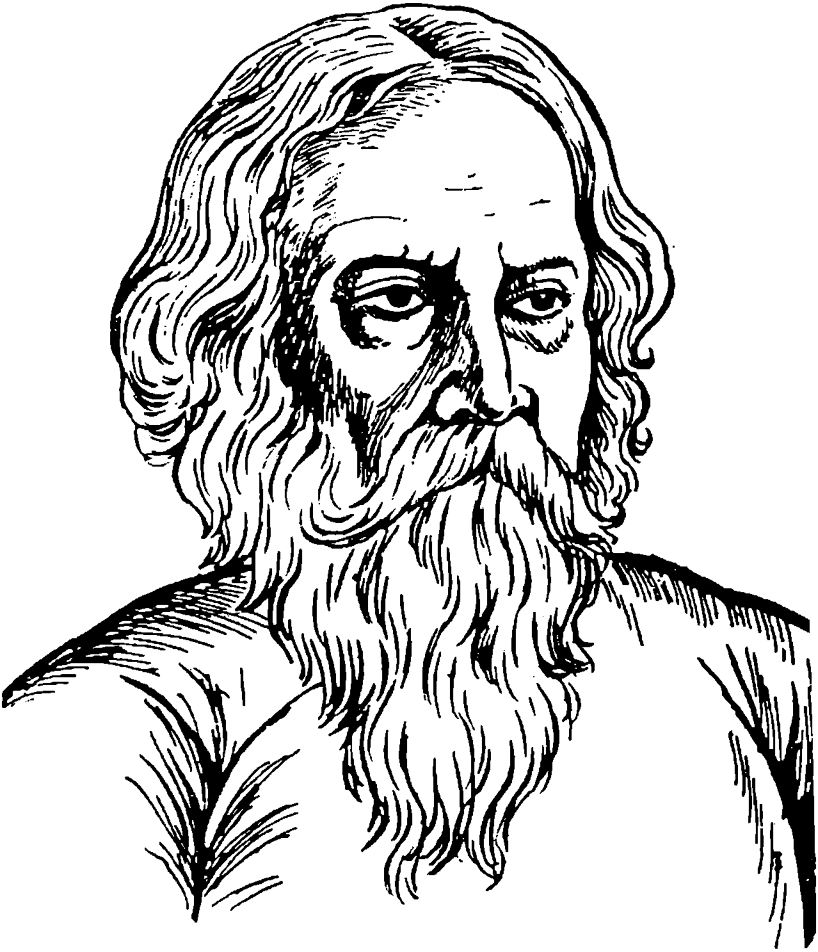

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

নবাব সলিমুল্লাহ্ (১৮৬৬-১৯১৫)

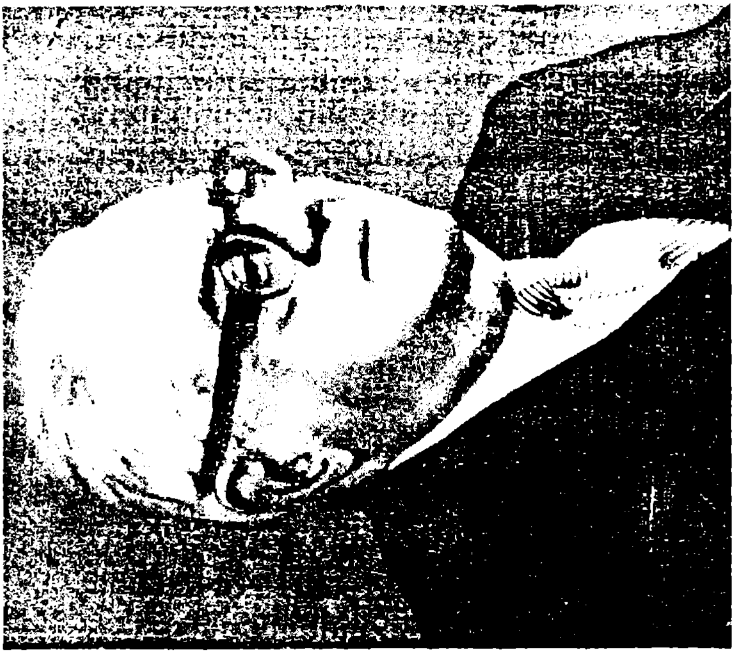

আগা খান (১৮৭৭-১৯৫৭)

১৯০৫-এর পূর্ববর্তী অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সী

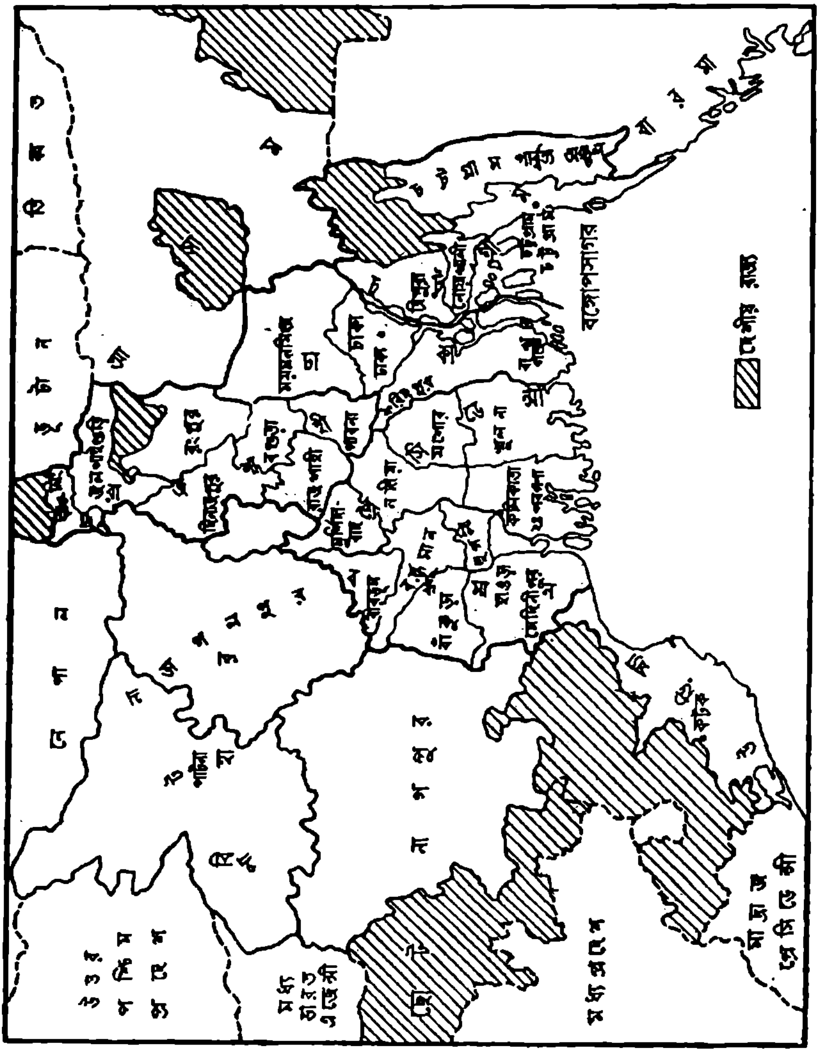
তিব্বত
ভুটান
নেপাল
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ
মধ্য ভারত এজেন্সী
মধ্যপ্রদেশ
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী
ছোট নাগপুর
বিহার
পাটনা
জলপাইগুড়ি
রংপুর
দিনাজপুর
বগুড়া
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
পাবনা
ঢাকা
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
নদীয়া
বর্ধমান
বাঁকুড়া
হাওড়া
মেদিনীপুর
যশোর
খুলনা
কলিকাতা
২৪ পরগনা
ফরিদপুর
ত্রিপুরা
নোয়াখালী
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল
বঙ্গোপসাগর
কটক
দেশীয় রাজ্য

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ (১৯০৫-১১)

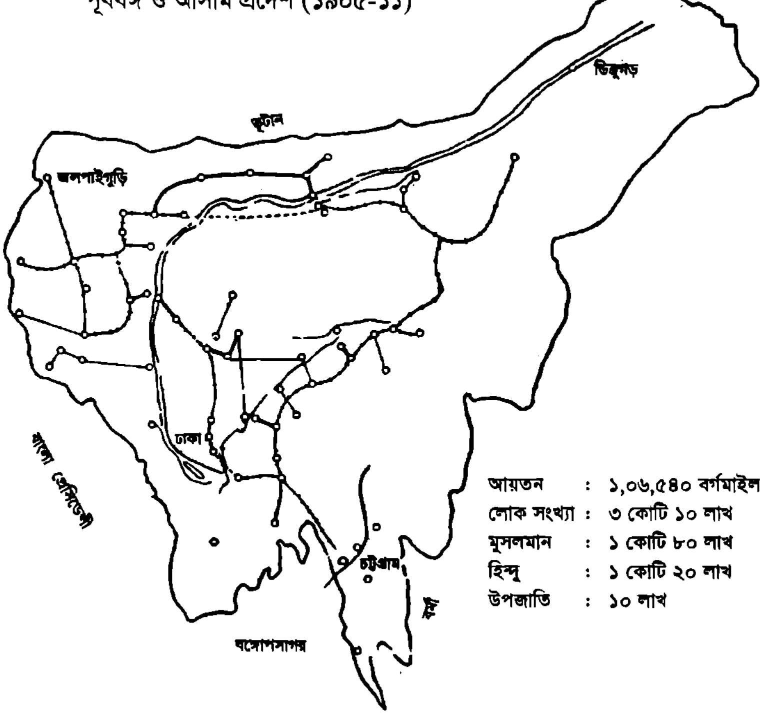
ডিব্রুগড়
ভুটান
জলপাইগুড়ি
ঢাকা
বাংলা প্রেসিডেন্সী
চট্টগ্রাম
বঙ্গোপসাগর

আয়তন : ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল
লোক সংখ্যা : ৩ কোটি ১০ লাখ
মুসলমান : ১ কোটি ৮০ লাখ
হিন্দু : ১ কোটি ২০ লাখ
উপজাতি : ১০ লাখ

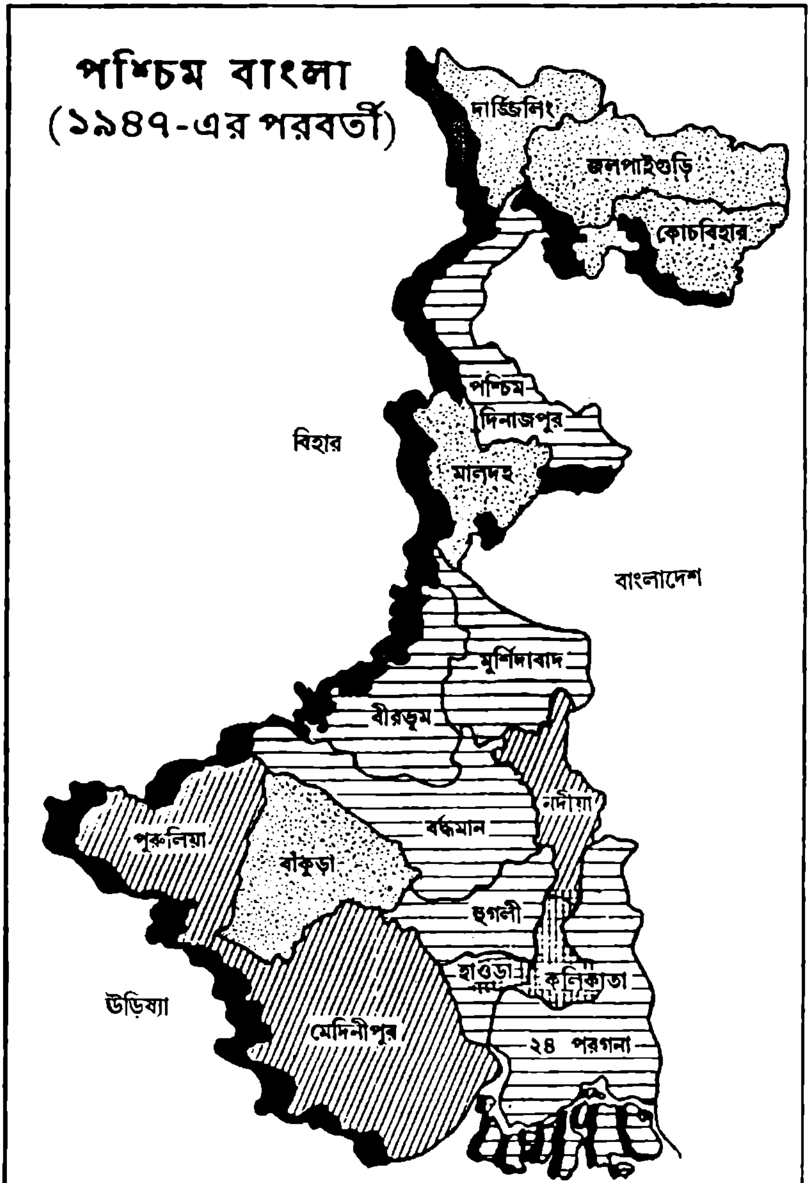

পশ্চিম বাংলা
(১৯৪৭-এর পরবর্তী)

দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
পশ্চিম দিনাজপুর
বিহার
মালদহ
বাংলাদেশ
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
নদীয়া
পুরুলিয়া
বর্দ্ধমান
বাঁকুড়া
হুগলী
হাওড়া
কলিকাতা
উড়িষ্যা
মেদিনীপুর
২৪ পরগনা
বঙ্গোপসাগর

১৯৭১ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ

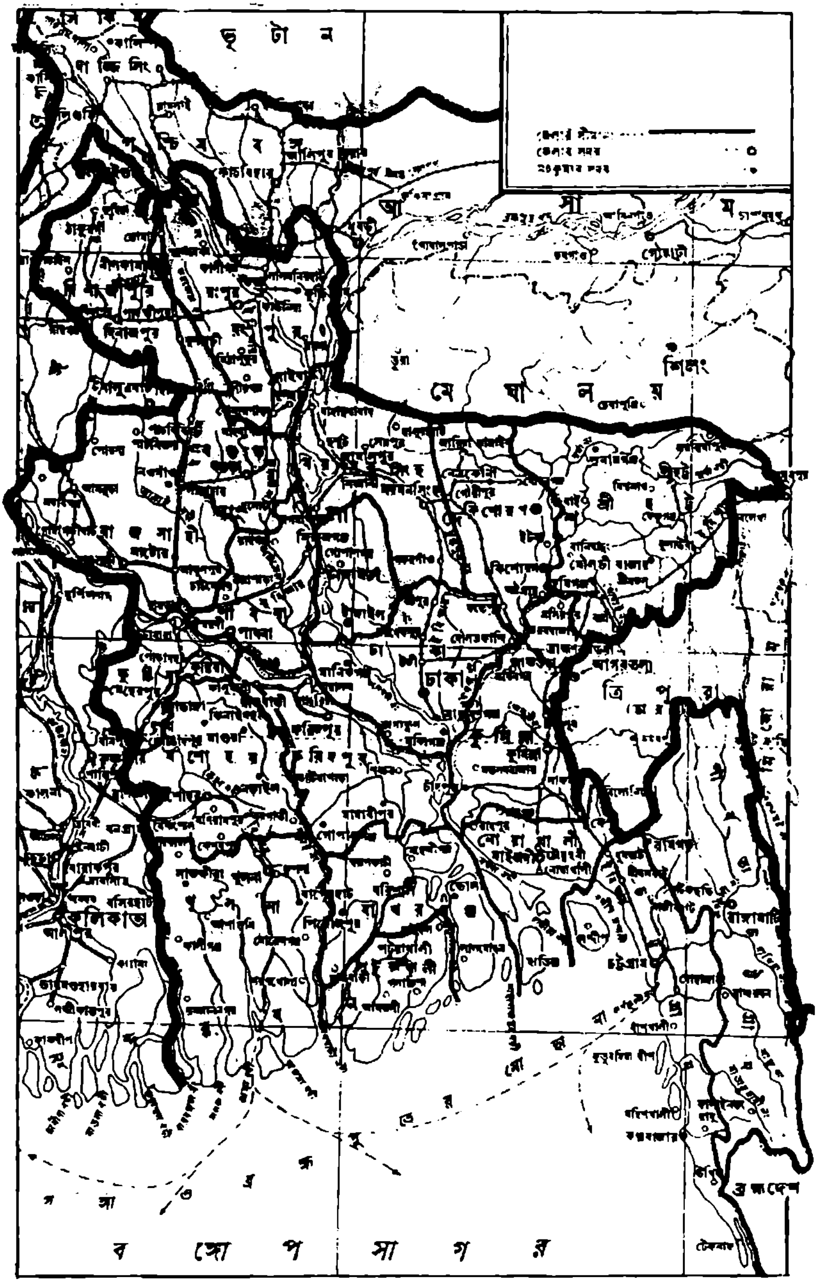
জেলার সীমানা
জেলার সদর
মহকুমার সদর
ভূটান
দার্জিলিং
কুচবিহার
আসাম
গোয়ালপাড়া
গৌহাটী
শিলং
মেঘালয়
তুরা
দিনাজপুর
রংপুর
বগুড়া
রাজশাহী
নাটোর
পাবনা
ময়মনসিংহ
কিশোরগঞ্জ
নেত্রকোনা
জামালপুর
টাঙ্গাইল
সিলেট
মৌলভী বাজার
হবিগঞ্জ
ঢাকা
কুমিল্লা
আগরতলা
ত্রিপুরা
কুষ্টিয়া
যশোহর
ফরিদপুর
খুলনা
বরিশাল
নোয়াখালী
ভোলা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
রাঙ্গামাটি
বান্দরবান
কক্সবাজার
কুতুবদিয়া দ্বীপ
মহেশখালী
মুর্শিদাবাদ
কলিকাতা
ব্রহ্মদেশ
বঙ্গোপসাগর

সংযোজন : কয়েকটি ঐতিহাসিক নথিপত্র

জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে এ, ও, হিউমের বক্তব্য, ৩০শে এপ্রিল ১৮৮৮

প্রথমেই এই ধারণা ব্যক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, ভারতের মঙ্গল সাধনের জন্য কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সুদৃঢ় ফলশ্রুতি হলো কংগ্রেস আন্দোলন। কংগ্রেস সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভের জন্য প্রথমে জানা প্রয়োজন কী কী মূল আদর্শের উপর ভিত্তি করে সেই সংস্থা (যা সম্প্রতি জাতীয় দলের সঙ্গে একত্রিত হয়েছে) পরিচালিত হচ্ছে– যে আদর্শের উপর কংগ্রেস ও অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছে।

এই মূল আদর্শগুলো কী কী সেই বিষয়ে আমি আপনাদের নিকট আলোচনা করার সুযোগ নেব। এটা মনে রাখা ভালো যে, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো রকম ভুল-ভ্রান্তি না থাকা বাঞ্ছনীয়। জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎগণ যে মূল উদ্দেশ্যগুলো দিয়ে পরিচালিত হয়েছেন তাহল তিন ধরনের : "প্রথমত, ভারতীয় জনসমষ্টির বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী সকল উপাদানগুলোকে একটি জাতীয় সভায় পরিণত করা;

"দ্বিতীয়ত, নবজাগ্রত জাতিকে মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রম অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করা;

"তৃতীয়ত, ভারতের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ও বৈষম্যমূলক অবস্থার সংশোধন করে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য সুসংহত করা।"

মর্লো মিন্টো সংস্কার সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্নকে লিখিত গোপালকৃষ্ণ গোখলের পত্র, ৩ ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল।

সংস্থার নির্দেশ সম্পর্কে আমার মতামত কী এই চিঠিতে আপনাকে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং এই জন্য এই চিঠি লিখছি। এই বিষয়ে দীর্ঘ পত্রাঘাতে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলমান ব্যতীত সমস্ত দেশের অন্য সকল গোষ্ঠীর নিকট এই নির্দেশ গভীর ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। বস্তুতপক্ষে, সংস্কার প্রস্তাবের গুণাবলী নির্দেশনামার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে দোষক্রটিগুলো সহজেই ধরা পড়ে এবং যে কেউ রিপোর্ট পড়লেই বুঝতে পারবেন। সকলের নিকট এটা সহজেই অনুমেয় যে, ভাইসরয়ের পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা শুধুমাত্র বৈষম্যমূলকই নয়, তা গুরুতররূপে বৈষম্যমূলক। বোম্বাইয়ের কথাই ধরা যাক, বোম্বাই থেকে ভাইসরয়ের পরিষদের চারজন সদস্য পাঠাবার কথা– এদের মধ্যে একজন ভূস্বামী সম্প্রদায় থেকে, একজন বোম্বাই আইন পরিষদের মুসলমান সদস্যদের মধ্যে থেকে এবং বাকি দু'জন মুসলমান সদস্য সমেত অন্যান্য বেসরকারি সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। ভূস্বামী সদস্য পর্যায়ক্রমে সিন্ধু ও প্রেসিডেন্সি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হবেন এবং এর ফলে পর্যায়ক্রমে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু সদস্য পাঠানো হবে। এইভাবে ভূস্বামী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অধিক অংশ মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া হলো এবং প্রেসিডেন্সি প্রদেশের বাকি অংশটুকু যা সবদিক থেকেই সিন্ধু প্রদেশ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সিন্ধুর সমতুল্য ধরা হলো। প্রথমবারের আসনটি সিন্ধুকে দেওয়া হলো। ফলে পরবর্তী তিন বৎসর যাবৎ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্ব করবেন মুসলমানগণ। এছাড়া, নতুন বোম্বাই কাউন্সিলে

সাতজন মুসলমান সদস্য থাকবেন এবং তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র ভোটে একজন মুসলমান প্রতিনিধি পাঠাবেন। পরিশেষে, স্থানীয় পরিষদের সকল বেসরকারি সদস্যগণ দু'জন সদস্য পাঠাতে পারবেন। এই সদস্যদের সংখ্যা মোট ২৮ জন, ২১ জন নির্বাচিত ও সাতজন সরকার কর্তৃক মনোনীত। নির্বাচন নীতি হবে পৌনঃপুনিক অর্থাৎ একজন সদস্য তার দু'টি ভোটই একজন প্রার্থীকে দিতে পারবেন। সুতরাং ২৮ জন সদস্যদের মোট ৫৬টি ভোট থাকবে এবং যে কোনো প্রার্থী উনিশটি ভোট সংগ্রহ করলে দু'টি পদের একটি দখল করতে পারবেন। সাতজন মুসলমান সদস্য এই উনিশটি ভোটের চৌদ্দটি নিজেদের মধ্যেই জোগাড় করতে পারবেন। তারা যদি দু'জন ইউরোপিয় সদস্যের (৪টি ভোট) ভোট নিজেদের দিকে টানতে পারেন এবং সাতজন মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে একটি ভোট পান, তাহলে দুইটি আসনের একটি তাদের সুনিশ্চিত। এটা কোনোমতেই অমূলক নয় যে, আগামী তিন বৎসর ভাইসরয়ের পরিষদে বোম্বাই থেকে যে চারজন সদস্য পাঠানো হবে তার তিনজনই মুসলমান প্রতিনিধি হবেন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মোট জনসংখ্যার মাত্র এক পঞ্চমাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে, স্যার ফিরোজশাহের মতো ব্যক্তিও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি কয়েক দিন আগেই আমাকে বলেছেন যে, সমস্ত বিষয়টি থেকে তিনি সরে আসবেন। এছাড়া পাঞ্জাবের কথা ধরা যাক। পাঞ্জাব থেকে তিনজন সদস্য ভাইসরয়ের পরিষদে পাঠানো হবে এবং এটা অস্বাভাবিক নয় যে, প্রথম থেকেই ও পরবর্তী কালেও তিনজন সদস্যই মুসলমানদের হাতে থাকবে। হিন্দুদের সম্ভবত কোনো প্রতিনিধি থাকবে না এবং কোনো সময় হয়তো একজন থাকবে। কিন্তু তারা (হিন্দুরা) প্রদেশের মোট জনসদস্যদের প্রায় অর্ধেক এবং শিক্ষা, অর্থ ও জনসেবার দিক দিয়ে তারা খুবই উচ্চমানের। পূর্ববঙ্গেও পরিস্থিতি একই প্রকার নৈরাশ্যজনক।

বদরুদ্দীন তায়েবজীকে লিখিত সৈয়দ আহমদ খানের পত্র,
২৪ জানুয়ারি ১৮৮৮ সাল।

মাদ্রাজের কংগ্রেস অধিবেশন আপনার প্রধান ভূমিকা গ্রহণের ফলে হিন্দু জনগণ আনন্দিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক।

আমি জানি না "জাতীয় কংগ্রেস" কথাটি বলতে কী বোঝায়। এটা কি ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতের বহু বর্ণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট জনগণ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত অথবা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এক ও অভিন্ন? আমার মতে, এটা অসম্ভব এবং এটা যখন অসম্ভব তখন একটি জাতীয় কংগ্রেস নামক সংগঠন সম্ভব নয় অথবা এটা সকল জনগণের পক্ষে সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে না।

আপনি মনে করেন অপ্রাসঙ্গিক জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাই যে, এই কার্যকলাপ শুধুমাত্র আমার নিজস্ব সম্প্রদায়ের পক্ষেই নয়, ভারতের পক্ষেও ক্ষতিকর।

আমি যে কোনো ধরনের ও প্রকারের কংগ্রেসের বিরোধী– কারণ তা ভুল আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতকে একটি অভিন্ন জাতিরূপে গণ্য করে।

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন সম্পর্কে লর্ড মর্লোর বক্তব্য,
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সাল

মুসলমানগণ তিনটি জিনিস দাবি করেছে। আমার মনে হয় তারা একটি প্রতিনিধিবর্গ পাঠাবেন এবং আমি খুব ভালো করেই জানি তাদের মনে কী আছে। এই সকল ব্যবস্থাপক

সভার সমস্ত বিভাগে তারা তাদের নিজেদের প্রতিনিধিবর্গের দাবি করেছে। ঠিক সাইপ্রাসের মতো যেখানে, আমি মনে করি, মুসলমানগণ নিজেদের দ্বারাই জয়লাভ করেছে। তারা নয়টি ভোট পেয়েছে এবং অ-মুসলমানরা পেয়েছে তিনটি ভোট। সুতরাং বোহেমিয়ায়, সেখানে শুধু জার্মানদের ভোটাধিকার আছে এবং তাদের নিজেদের নিবন্ধগ্রন্থ আছে। অতএব আমরা পূর্ববর্তী কোনো নজীর এবং উপমা ছাড়াই পৃথক নিবন্ধগ্রন্থের পরিকল্পনা নিইনি। দ্বিতীয়ত তারা তাদের সংখ্যা সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যাপারে আরো অধিকসংখ্যক সদস্যপদ চায়। এই দু'টি দাবিতে আমাদের পুরোপুরি মত আছে এবং ইহা পূরণ করার অভিপ্রায় আছে। তৃতীয় দাবিটি হলো যে, যদি ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে কোনো হিন্দু থাকে— যার সম্পর্কে আমার আসন লাভের পূর্বেই কোনো বক্তব্য পেশ করা আমার পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ—তাহলে সেই ভাইসরয়ের পরিষদে দু'জন ভারতীয় সদস্য থাকবে এবং তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মুসলমান হবে। ঠিক, যেহেতু আমি তাদের বলেছি এবং এখন মহামান্য কর্তৃপক্ষকে বলছি।

মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য, ৩১ ডিসেম্বর ১৯১২ সাল।

৩১ ডিসেম্বর ১৯১২ আগা খার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যার মধ্যে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যগুলো অনুমোদিত হয় :

১. ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি ভারতবাসীর আনুগত্যের মনোভাব বৃদ্ধি ও রক্ষা করা।
২. ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত ও বর্ধিত করা।
৩. মুসলমান সম্প্রদায় ও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সংহতি বৃদ্ধি করা।
৪. উপরি-লিখিত উদ্দেশ্যগুলো ব্যাহত না করে ভারতীয় জনগণের মধ্যে জনসেবার আদর্শ প্রচার করে ও জাতীয় ঐক্য সুসংহত করে এবং এই উদ্দেশ্য ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতে সাংবিধানিক উপায়ে বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর সুষ্ঠু সংস্কার সাধন করা এবং ভারতের পক্ষে উপযুক্ত স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া।

সূত্র :

(ক) দি ইভেলুশন অব ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান ১৮৫৮-১৯৪৭ : সম্পাদনা সি, এইচ, ফিলিপস।
(খ) দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট : সম্পাদনা বি, এন, পান্ডে।
(গ) পাকিস্তানের সৃষ্টি ১ম খণ্ড : সম্পাদনা এস, এস, পীরজাদা।

ভারতীয় কংগ্রেসের জন্ম থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সভাপতি ও সম্পাদকের নাম

স্থান ও বছর	সভাপতির নাম	সম্পাদকের নাম
বোম্বাই ১৮৮৫	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী	এ ডব্লিউ হিউম
কলিকাতা ১৮৮৬	দাদাভাই নৌরাজী	এ ডব্লিউ হিউম
মাদ্রাজ ১৮৮৭	বদরুদ্দিন তায়েবজী	এ ডব্লিউ হিউম
এলাহাবাদ ১৮৮৮	জর্জ ইউল	এ ডব্লিউ হিউম
বোম্বাই ১৮৮৯	স্যার ডব্লিউ ওয়েডারবার্ন	এ ডব্লিউ হিউম
কলিকাতা ১৮৯০	স্যার পি মেহতা	এ ডব্লিউ হিউম
নাগপুর ১৮৯১	পি আনন্দ চার্লু	এ ডব্লিউ হিউম
এলাহাবাদ ১৮৯২	উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী	এ ডব্লিউ হিউম
লাহোর ১৮৯৩	দাদাভাই নৌরজী	এ ডব্লিউ হিউম
মাদ্রাজ ১৮৯৪	এ ওয়েব	এ ডব্লিউ হিউম
পুনা ১৮৯৫	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	এ ডব্লিউ হিউম
কলিকাতা ১৮৯৬	আরত্রিম সিয়নী	এ ডব্লিউ হিউম
অমরাবতী ১৮৯৭	সি শংকরন নায়াব	এ ডব্লিউ হিউম
মাদ্রাজ ১৮৯৮	আনন্দমোহন বসু	এ ডব্লিউ হিউম
লক্ষ্মৌ ১৮৯৯	রমেশচন্দ্র দত্ত	এ ডব্লিউ হিউম
লাহোর ১৯০০	এন জি চন্দ্রাভারকর	এ ডব্লিউ হিউম
কলিকাতা ১৯০১	দিনশা ওয়াচা	এ ডব্লিউ হিউম
আহমেদাবাদ ১৯০২	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	এ ডব্লিউ হিউম
মাদ্রাজ ১৯০৩	লালমোহন ঘোষ	এ ডব্লিউ হিউম
বোম্বাই ১৯০৪	স্যার হেনরী কটন	এ ডব্লিউ হিউম
বারানসী ১৯০৫	গোপালকৃষ্ণ গোখলে	এ ডব্লিউ হিউম
কলিকাতা ১৯০৬	দাদাভাই নৌরজী	এ ডব্লিউ হিউম
সুরাট ১৯০৭	রাসবিহারী ঘোষ	এ ডব্লিউ হিউম
মাদ্রাজ ১৯০৮	রাসবিহারী ঘোষ	এ ডব্লিউ হিউম
লাহোর ১৯০৯	মদনমোহন মালব্য	এ ডব্লিউ হিউম
এলাহাবাদ ১৯১০	স্যার ডব্লিই ওয়েডারবার্ন	এ ডব্লিউ হিউম
কলিকাতা ১৯১১	বিষেণনাথ ধর	এ ডব্লিউ হিউম

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। সংক্ষেপে এ ডব্লিউ হিউম। মি: হিউম আদিতে স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। ইনি প্রথমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। সুদীর্ঘ ৩০ বছরকাল ভারতে চাকরির পর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ অন্তে মি: হিউম ভারতেই বসবাস করেন। তৎকালীন ইংরেজ বড়লাট লর্ড

ডাফরিন-এর সম্মতিক্রমে ইনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংগঠন করেন এবং স্বয়ং এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক নির্বাচিত হন। মিঃ হিউম একনাগাড়ে আমৃত্যু ২৬ বছরকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

কংগ্রেসের জন্ম থেকে বঙ্গভঙ্গ রদ পর্যন্ত বড়লাট ও ভারত সচিবদের নাম

বড়লাটদের নাম	সময়কাল
লর্ড ডাফরিন	১৮৮৪-৮৮
লর্ড ল্যান্সডাউন	১৮৮৮-৯৪
লর্ড এলগিন (দ্বিতীয়)	১৮৯৪-৯৯
লর্ড কার্জন	১৮৯৯-০৪
লর্ড এমপথিল	১৯০৪
লর্ড কার্জন (পদত্যাগ)	১৯০৪-০৫
লর্ড মিন্টো	১৯০৫-১০
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৯১০-১৬

ভারত সচিবদের নাম	সময়কাল
লর্ড কিমবার্লি	১৮৮২-৮৫
লর্ড র‍্যানডলফ্ চার্চিল	১৮৮৫-৮৬
লর্ড কিমবার্লি (ফেব্রু: আগস্ট)	১৮৮৬
লর্ড ক্রস	১৮৮৬-৯২
লর্ড কিমবার্লি	১৮৯২-৯৪
স্যার ফাউলার	১৮৯৪-৯৫
লর্ড হ্যামিলটন	১৮৯৫-০৩
ডব্লিউ ব্রডরিক	১৯০৩-০৫
লর্ড মর্লো	১৯০৫-১০
লর্ড ফ্রু	১৯১০-১৫

কালপঞ্জী (১৮৭১-১৯১১)

১৮৭১ খ্রি. : আবদুল্লাহ্ নামক জনৈক পাঞ্জাবি ওহাবী কর্তৃক কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (অস্থায়ী) মিঃ নর্মান হত্যা (২০শে সেপ্টেম্বর)। আবদুল্লাহর ফাঁসি– মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী কর্তৃক অত্র ভূখণ্ডকে দারুল ইসলাম হিসেবে ঘোষণা পূর্বক কলিকাতা থেকে ফতোয়া জারি এবং ইংরেজি শেখার জন্য বাঙালি মুসলমানদের প্রতি আহ্বান।

১৮৭২ খ্রি. : শের আলী খান নামক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগকারী জনৈক পাঠান ওহাবী কর্তৃক আন্দামান দ্বীপে ইংরেজ বড়লাট লর্ড মেয়োকে হত্যা (৮ই ফেব্রুয়ারি)। ১১ মার্চ শের আলী খানের ফাঁসি। ওহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি।

১৮৭৩ খ্রি. : ৭ই ডিসেম্বর 'নীল দর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয়। মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক রচনা– পৃথক আসাম প্রদেশ গঠন।

১৮৭৫ খ্রি. : ইংরেজ যুবরাজ এডওয়ার্ড-এর (পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলিকাতায় আগমন এবং অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ভবানীপুরের খ্যাতনামা উকিল এবং ব্যবস্থাপক পরিষদের অন্যতম সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক স্বগৃহে আমন্ত্রণ ও কুলমহিলাদের দ্বারা বরণ।

১৮৭৬ খ্রি. : মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি দান। পাঞ্জাবে দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু—ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট জারি—অস্ত্র আইনের প্রবর্তন—নাট্যনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন বলবৎ।

১৮৮২ খ্রি. : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশ।

১৮৮৫ খ্রি. : বোম্বাই-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত (২৮ শে ডিসেম্বর)। সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি এবং সম্পাদক এ ডব্লিউ হিউম।

১৮৮৬ খ্রি. : সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' স্থাপন।

১৮৮৬ খ্রি. : কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (ডিসেম্বর), জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতসভার সংযুক্তি।

১৮৮৮ খ্রি. : এলাহাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন– কংগ্রেসের মোকাবিলায় স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।

১৮৯২ খ্রি. : ভারতীয় কাউন্সিল আইন– প্রাদেশিক আইন পরিষদে ভারতীয় বেসরকারি প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ।

১৮৯৫ খ্রি. : পুণায় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন।

১৮৯৭ খ্রি. : দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ– পুণায় প্লেগ মহামারী—চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ কর্তৃক ব্রিটিশ অফিসার হত্যা– লোকমান্য তিলকের বিচার ও কারাদণ্ড (২২ জুন)।

১৮৯৮ খ্রি. : স্যার সৈয়দ আহম্মদ-এর মৃত্যু।

১৯০০ খ্রি. : কলকাতা পৌরসভা আইন।

১৯০৪ খ্রি. : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন—লর্ড কার্জনের পদত্যাগ।

১৯০৫ খ্রি. : লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত (জুলাই) এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠন (১৬ই অক্টোবর) স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা।

১৯০৬ খ্রি. : সিমলায় বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ জন মুসলিম নেতার বৈঠক এবং দাবিপত্র দাখিল।–স্যার সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকায় মোহামেডান এ্যাডুকেশনাল কনফারেন্স-এর অধিবেশন–ঘরোয়া বৈঠকে মহসিন-উল-মূল্‌খের প্রস্তাবক্রমে মুসলিম লীগের জন্ম–আগা খান পরবর্তী ৬ বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত।– কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯০৭ খ্রি. : সুরাটে জাতীয় কংগ্রসের অধিবেশনে মধ্যপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে তীব্র বিরোধ– সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত হয়ে অশ্বিনী কুমার ও বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখের কংগ্রেস ত্যাগ।–পাঞ্জাব থেকে লাল লাজপত রায় ও অজিত সিংহকে নির্বাসন।– প্রায় একবছর নিশ্চুপ থাকার পর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনমানসিকতায় মানব প্রেমের দর্শন।– মহসিন-উল-মূল্‌খের মৃত্যু।

১৯০৮ খ্রি. : মোজাফ্‌ফরপুরে ইংরেজ বিচারক কিংসফোর্ডের বদলে ব্যারিস্টার কেনেডি পত্নী ও কন্যাকে হত্যা করার পর ধৃত হবার প্রাক্কালে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা এবং ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

১৯০৯ খ্রি. : মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা সংক্রান্ত মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তন।– লন্ডনে মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক ভারত সচিবের ব্যক্তিগত সচিব স্যার কার্জন উইলি হত্যা। – মদনলালের ফাঁসি।

১৯১০ খ্রি. : হিন্দুসভা (পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভা) প্রতিষ্ঠা।

১৯১১ খ্রি. : দিল্লীর দরবার– বঙ্গবিভাগ রদ–পৃথক উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ গঠন ও চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত যুক্তবঙ্গের সীমানা নির্ধারণ– কলিকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর।

বিশিষ্ট ব্যক্তি পরিচিতি

প্রথম যুগের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ :

দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭) : উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা ও মনীষী। তিনি ছিলেন পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত। জনপ্রিয়তার জন্য তিনি ভারতবাসীর নিকট "ভারতের মহান বয়স্ক ব্যক্তি" ন৯ম১০ (বঅপদ হীদ ওঅপ নি পদজঅ) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নরমপন্থী ও ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতবাসীর মঙ্গল বিধানের জন্য তিনি বিভিন্ন সংস্কারের দাবি জানান। তিনি তিনবার জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন (১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৯০৬)। ভারতে ব্রিটিশ অপশাসনের চরিত্রটি তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন।

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) : উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

ফিরোজ শাহ মেহতা (১৮৪৫-১৯১৫) : জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানরূপে বোম্বাইয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বোম্বাই আইন পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে তাঁর কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ফিরোজ শাহ মেহতা শাসন সংস্কারের দাবি তুলে ধরেন। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বোম্বাই ক্রনিক্যাল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬) : কলকাতা হাইকোর্টের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (বোম্বাই, ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রি.) সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হন। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের কংগ্রেসের সপক্ষে বিভিন্ন কার্যকলাপে লিপ্ত হন।

দীনশা ওয়াচা (১৮৪৪-১৯৩৬) : বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় পার্শী জাতীয়তাবাদী নেতা। বোম্বাইয়ের সূতীবস্ত্র শিল্পের অন্যতম প্রধান সংগঠক জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী সাধারণ সম্পাদক (১৮৯৬-১৯১৩)। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তীকালে উদারপন্থী রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক ও জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে বরোদা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য সম্পর্কে মননশীল অনুসন্ধান করেন এবং ভারতের শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ উদঘাটন করেন।

সি. শঙ্করণ নায়ার (১৮৫৭-১৯৩৪) : প্রখ্যাত আইনজীবী ও নরমপন্থী নেতা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের অ্যাডভোকেট-জেনারেল পদে মনোনীত হন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। শিক্ষা দপ্তরের সদস্যরূপে স্যাডলার কমিশন নিয়োগ করেন (১৯১৭ খ্রি.)। জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) : আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে আইসিএস থেকে পদত্যাগ করেন (১৮৭৪)। বাংলা তথা ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতসভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে

কলকাতায় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনি দুইবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন (১৮৯৫ ও ১৯০২)। রাজনীতিতে নরমপন্থী হয়েও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতারূপে অবতীর্ণ হন। জনপ্রিয়তার জন্য তিনি রাষ্ট্রগুরু" ও "বঙ্গের মুকুটহীন রাজা" বলে অভিহিত হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় উদারনৈতিক পরিষদের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে শাসন-সংস্কার আইন সমর্থন করেন এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) : কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন (১৯০৬-১৯২১)। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নরমপন্থী। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাটি অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু এই অধিবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল (১৮৬৬-১৯১৫) : প্রথমে শিক্ষাব্রতীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পুণার ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন রাণাডের মন্ত্রশিষ্য। তিনি পুণার সার্বজনিক সভার সচিব নিযুক্ত হন। পরে বোম্বাই আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যরূপে অসাধারণ রাজনৈতিক পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার পরিচয় দেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইন রূপায়ণে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আন্দোলন সমর্থন করেন। দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে "সার্ভেন্ট্স্-অব-ইন্ডিয়া" নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) : উত্তর প্রদেশের খ্যাতনামা আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী নেতা। বহু দিন যাবত উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ ও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ :

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) : চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ ছিলেন লোকমান্য তিলক। পুণায় ফার্গুসন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮৫)। কেশরী ও মারহাট্টা নামক দুইটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত জাগ্রত করেন। মহারাষ্ট্রে গণপতি ও শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে দেশপ্রেম সঞ্চার করেন। জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের জন্য তিলক ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কারাবরণ করেন এবং ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিলক পুনরায় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠান করেন। তিলকই প্রথম ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ গ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর বিখ্যাত উক্তি : "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার এবং আমরা তা অর্জন করব"।

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) : বাংলার বরিশালের বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী ও জননেতা। জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা থেকেই তিনি কংগ্রেসের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁর নেতৃত্বে বরিশাল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের দুর্গে পরিণত হয়। রাজনীতি কার্যকলাপের জন্য ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে বিতাড়িত হন।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) : প্রথমে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, কিন্তু ক্রমশ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের প্রতি আসক্ত হন। বিপিনচন্দ্র ছিলেন একজন সুবক্তা, লেখক ও তীক্ষ্ণ সাংবাদিক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টব্দে ইংল্যান্ডে গিয়ে জাতীয়তাবাদী কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

লালা লাজপত রায় (১৮৬৫-১৯২৮) : পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় প্রথমে আর্য-সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ক্রমে জাতীয়তাবাদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতায় পরিণত হন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কারারুদ্ধ হয়ে মান্দালয়ে প্রেরিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সাইমন

কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালনা করবার সময় পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হন এবং এর ফলে তাঁর প্রাণহানি হয় (১৭ই নভেম্বর, ১৯২৮)।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) : ইংল্যান্ডে শিক্ষাজীবন কাটিয়ে বরোদায় কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। বরোদায় থাকাকালীন ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনামূরক প্রবন্ধ লেখেন। শীঘ্রই বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম" পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্দীপিত করেন। মানিকতলা বোমার মামলায় জড়িত হয়ে কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হন।

মুসলমান ও অন্যান্য রাজনীতির নেতৃবৃন্দ : স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) : উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় মুসলমান সমাজে নবজাগরণের পথিকৃৎ, ব্রিটিশ প্রশাসনে প্রথমে করণিক ও পরে সাব-জজ (১৮৩৭-১৮৭৬) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন (১৮৭৮-১৮৮৩)। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ও জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের বিকল্প সংস্থারূপে "ইউনাইটেড প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন" স্থাপন করেন।

নবাব মুস্তাক হুসেন ভিকার-উল-মূলক (১৮৪১-১৯১৭) : উত্তর প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলমান নেতা। হায়দ্রাবাদ প্রশাসনে যুক্ত ছিলেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সক্রিয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আলিগড় কলেজের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯০৯-১৯১৩)।

হাকিম আজমল খান (১৮৬৫-১৯২৭) : দিল্লীর প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা, সুধী সম্প্রদায়ভুক্ত। চিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সদস্য এবং মুসলমান রাজনীতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। রাওলাট সত্যাগ্রহ ও খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা। দিল্লীতে "জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া" নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ।

মাজহার-উল-হক (১৮৬৬-১৯৩০) : বিহারের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য সাধনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন।

বদরুদ্দীন তায়েবজী (১৮৪৪-১৯০৬) : বোম্বাইয়ের শীর্ষস্থানীয় মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতা বদরুদ্দীন তায়েবজী ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ১৯০৩ সালে মোহামেডান এ্যাডুকেশনাল কনফারেন্সে যোগদান করেন ও সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) : জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিউম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডবাসী ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ভারতে রাজনৈতিক সমিতি গঠনের কাজে উদ্যোগী হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কাল তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতবাসীর পরম মিত্র হিউম ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শোষণমূলক নীতি ও আচরণের তীব্র সমালোচক ছিলেন।

স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন (১৮৩৮-১৯১৮) : ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে আইসিএস রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৯ ও ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ভারতীয় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে ব্রিটেনে জনমত গঠন করেন।

বিশিষ্ট ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ :

লর্ড ডাফরিন (১৮২৬-১৯০২) : ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কানাডার গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ১৮৮৪-১৮৮৮ সময়কালে ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০-১৯০০) : আই সি এস; বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য (১৮৮১-১৮৮৭)। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

লর্ড জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) : ইটন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। ভারতের বড়লাট (১৮৯৮-১৯০৫), ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিব (১৯১৯-১৯২৪), তাঁর শাসনকালে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন গড়ে উঠে।

লর্ড জন মর্লে (১৮৩৮-১৯২৩) : উদারপন্থী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী। উদারনৈতিক ভারত সচিব (১৯০৫-১৯১০), ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শাসনসংস্কার আইন রূপায়ণে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভাইকাউন্ট পদে নির্বাচিত হন।

লর্ড মিন্টো (১৮৪৫-১৯১৪) : কানাডার গভর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৮৯৮-১৯০৪), ভারতের বড়লাট (১৯০৫-১৯১০)।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৫৮-১৯৪৪) : বৈদেশিক দপ্তরে যোগদান করেন (১৮৮০)। স্থায়ী অধস্তন-সচিব, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ (১৯০৬); ভারতের বড়লাট (১৯১০-১৯১৬)।

এডউইন সামুয়েল মন্টেগু (১৮৭৮-১৮২৪) : উদারনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতা, ব্রিটিশ সংসদের সদস্য (১৯০৬-১৯২২)। সংসদীয় অধস্তন-ভারত সচিব (১৯১০-১৯১৪), ভারত সচিব (জুন ১৯১৭ মার্চ ১৯২২), ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইনের মুখ্য রূপকার।

চেমসফোর্ড প্রথম ভাইকাউন্ট (১৮৬৮-১৯৩৩) : ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। কুইনসল্যান্ডের গভর্নর (১৯০৫-১৯০৯), নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর গভর্নর (১৯০৯-১৯১৩), ভারতের বড়লাট (১৯১৬-১৯২১) এবং ফার্স্ট লর্ড অব অ্যাডমিরালটি ১৯২৪।

স্যার সিডনি রাওলাট (১৮৬২-১৯৪৫) : ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন, পরবর্তীকালে বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন; ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধকল্পে গঠিত সরকারি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কুখ্যাত রাওলাট আইন বলবৎ হয়।

স্যার মাইকেল ও ডায়ার (১৮৬৪-১৯৪০) : ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আইসিএস-এ যোগদান করেন। পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নররূপে (১৯১৩-১৯১৯) দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ভারতীয় বিপ্লবী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

ভারতে হিন্দু বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ :

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে (১৮৪৫-১৮৮৩) : মহারাষ্ট্রে রামোজি, কোল প্রভৃতি উপজাতিদের সংগঠিত করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলেন। তিনিই প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাদাম ভিকাজী কামা (১৮৬১-১৯৩৬) : বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত। ইউরোরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে প্রথম ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। লন্ডনে 'ইন্ডিয়া হাউস' নামক বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে প্যারিসে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) : বিখ্যাত মারাঠা বিপ্লবী। মহারাষ্ট্রে 'অভিনব ভারত' নামক বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে লন্ডনে এসে বৈপ্লবিক ভারতের সঙ্গে যুক্ত হন। আন্দামানে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন। পরবর্তীকালে "হিন্দু মহাসভা" নামক রাজনৈতিক দলের সভাপতি ছিলেন।

ড. ভুপেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) : প্রখ্যাত বিপ্লবী ও বুদ্ধিজীবী। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবী সমিতি।

তথ্য নির্দেশিকা

লেখকের নাম	**বই-প্রবন্ধের নাম**	**প্রকাশকাল ও স্থান**
অতুল সুর, ড:	আঠারো শতকের বাঙালা ও বাঙালি	১৯৮৫, কলিকাতা
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বাংলা নাটক ও গিরিশ যুগ	১৯২৫, কলিকাতা
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	রঙ্গালয়ের ত্রিশ বছর	১৯৭২, কলিকাতা
অমলেন্দু দে ড:	বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ	কলিকাতা
অমলেশ ত্রিপাঠী ড:	এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ	বোম্বাই
অরবিন্দ পোদ্দার, ড:	বঙ্কিম মানস	১৯৫১, কলিকাতা
অরবিন্দ পোদ্দার, ড:	রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	১৯৮২, কলিকাতা
অসিতকুমার, বন্দোপাধ্যায়, ড:	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (৪র্থ সংস্করণ)	১৯৭৮, কলিকাতা
আনিসুজ্জামান, ড:	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য	১৯৬৪, ঢাকা
আবুল কালাম আজাদ	ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম	১৯৬৪, কলিকাতা
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী (১ম খণ্ড) (ইংরেজি অনুবাদ, এইচ ব্লচম্যান)	১৯৪৮, কলিকাতা
আমীর আলী	দি স্পিরিট অব ইসলাম	১৯৪৯, লন্ডন
আর মুনির	দি মেকিং অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া	১৯৫১, ম্যানচেস্টার
আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড:	বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)	১৯৬০, কলিকাতা
ইউ এন গুহ	কাছাড়ের ইতিবৃত্ত	১৯১১, ঢাকা
ই এ গেইট	হিস্ট্রি অব আসাম	১৯০৬, কলিকাতা
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত	সংবাদ প্রভাকর	২০শে জুন, ১৮৫৭, কলিকাতা
এ আর মল্লিক	ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান	১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
এ এইচ এন নুরুজ্জামান	রাইজ অফ দি মুসলিম মিডল ক্লাস এ্যাজ এ পলিটিক্যাল ফ্যাক্টর ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান (১৯৫৮-১৯৪৭)	১৯৬৪
এ এল সেলভনকর	প্রবলেমস অব ইন্ডিয়া	
এডোওয়ার্ড থমসন এবং জিটি গ্রান্ট	রাইজ এন্ড ফুলফিলমেন্ট অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া	১৯৬২, এলাহাবাদ
এম আর তরফদার, ড:	হোসেন শাহী বেঙ্গল	১৯৬৫, ঢাকা
এম এন দাস, ড:	ইন্ডিয়া আন্ডার মর্লে অ্যান্ড মিন্টো	কলিকাতা
এম ক্ষবীর	নবাব সলিমুল্লাহ এ্যান্ড্‌মুসলিম পলিটিক্স	১৯৭৭, ঢাকা
এম কে ইউ মোল্লা	দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম	১৯৮১, রাজশাহী
এম কে ইউ মোল্লা	নবাব খাজা সলিমুল্লাহ	১৯৭০, রাজশাহী
এল ফ্রেজার	ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এ্যান্ড আফটার	১৯১১, লন্ডন
এস এন দত্ত	বাঙালির বিড়ম্বনা	১৯০৬, সিলেট
এস গোপাল, ড:	ব্রিটিশ পলিসি ইন (১৮৮৫-১৯০৫)	ইন্ডিয়া বোম্বাই

লেখকের নাম	**বই-প্রবন্ধের নাম**	**প্রকাশকাল ও স্থান**
এস জেড এইচ জায়েদি	দি পার্টিশন অব বেঙ্গল এন্ড ইটস এ্যানালমেন্ট	১৯৬৪
কাউন্টেস মিন্টো	ইন্ডিয়া, মিন্টো এ্যান্ড মর্লি	১৯৩৪, লন্ডন
কাজী আবদুল ওদুদ	শাশ্বত বঙ্গ	১৯৮৩, ব্রাক প্রকাশনী, ঢাকা
কাজী এ মান্নান	আধুনিক বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনা	১৯৬১, রাজশাহী
কার্জন লর্ড	ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া	১৯২৫, লন্ডন
কার্ল মার্কস	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	১৮৫৩, নিউইয়র্ক
কার্ল মার্কস	ফিউচার রেজাল্টস অব ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া	
কালিকারঞ্জন কানুনগো, ড:	রাজস্থান কাহিনী	১৯৬৮, কলিকাতা
কালী প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়	বাংলার নবাবী আমল	কলিকাতা
কে এম ধর	পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	১৯০৯, ময়মনসিংহ
কে এন মজুমদার	ঢাকার বিবরণ	১৯১০, ময়মনসিংহ
কেদারনাথ মজুমদার	ময়মনসিংহের ইতিহাস	কলিকাতা
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	‘পৌরাণিক নাটক’ প্রবন্ধ	কলিকাতা
গোপাল হালদার	বাঙালি সংস্কৃতির রূপ	১৯৭৫, ঢাকা
গোপাল হালদার	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	১৯৭৮, ঢাকা
গৌরী শংকর ভট্টাচার্য	সম্বাদ ভাস্কর	২০শে জুন, ১৮৫৭, কলিকাতা
চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	রবি-রশ্মি	কলিকাতা
জে আর ম্যাকলেইন	দি ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাশনালিস্ট ট্যাক্‌টিকস্‌ (১৮৯৭-১৯০৫)	১৯৬১
জে ডি ইন্ডিয়া	দি রিয়াল ইন্ডিয়া	১৯০৮, লন্ডন
জেমস্‌ টড্‌, কর্নেল	এ্যানালস অ্যান্ড এনটিকস অব রাজস্থান	১৯৭১, নয়াদিল্লী
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার	আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান	১৮৭১, লন্ডন
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার	ইন্ডিয়ান আম্পায়ার (সংশোধিত সংস্করণ)	১৮৯৩, লন্ডন
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার	বেঙ্গল এম এস রেকর্ডস (১ম খণ্ড)	১৮৯৪, লন্ডন
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার	দি ইন্ডিয়ান মুসলমান	পুনর্মুদ্রিত ১৯৪৫, কলিকাতা
তপন রায় চৌধুরী	দি ইন্ডিয়ান ইকনমি	বোম্বাই
তারাচাঁদ, ড:	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)	কলিকাতা
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়	জেল দর্পণ	১৮৭৫, কলিকাতা
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়	চা-কর দর্পণ	১৮৭৫, কলিকাতা
দীনবন্ধু মিত্র	নীল দর্পণ	১৮৬০, কলিকাতা
নবাব এ লতিফ	বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা	৩০শে জানুয়ারি, ১৮৬৮, কলিকাতা

লেখকের নাম	বই-প্রবন্ধের নাম	প্রকাশকাল ও স্থান
নবাব এ লতিফ	এ শর্ট একাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ (অনুবাদঃ আবু জাফর শামসুদ্দিন)	১৯৬৮, ঢাকা
নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ	বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব)	১৯৪৯, কলিকাতা
নুরুল্লা এন্ড নায়েক	স্টুডেন্টস হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া	১৯৫৬, লন্ডন
পট্টভি সিতারা মিয়া	হিস্ট্রি অব দি ন্যাশনাল কংগ্রেস	১৯৪৬, এলাহাবাদ
পাকিস্তান পাবলিকেশন্স	স্ট্রাগল অব ইন্ডিপেন্ডেন্স	১৯৫৮, করাচী
পারসিভাল স্পিয়ার, অধ্যাপক	এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া-২	১৮৩৭, লন্ডন
পি ই রবার্টস	হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (৩য় সংস্করণ)	১৯৫২, লন্ডন
পি সি ঘোষ	ডি ডেভেলপমেন্ট অফ দি ইন্ডিয়ান কংগ্রেস	১৯৬০, কলিকাতা
পি সেন	বাংলা ইতিহাস সাধনা	১৯৫৩, কলিকাতা
পুলিন দাস, ডঃ	বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক	১৯৮৩, কলিকাতা.
পূর্নেন্দু পত্রী	পুরানো কলকাতার কথাচিত্র	১৯৮২, কলিকাতা
প্রভাত কুমার গোস্বামী, ডঃ	দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক	সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৭৮, কলিকাতা
প্রমথ গুপ্ত	মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী	কলিকাতা
প্রমোদ সেন গুপ্ত	নীলবিদ্রোহী ও বাঙালি সমাজ	কলিকাতা
প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	পল্লীগ্রাম দর্পন	১৮৭৩, কলিকাতা
প্লেফেয়ার	দি গারোজ	১৯০৯, লন্ডন
ফকির চাঁদ বসু	শিবাজীর অভিনয়	কলিকাতা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা	বসুমতি সংস্করণ, কলিকাতা
বরুণ কুমার চক্রবর্তী, ডঃ	টডের রাজস্থান ও বাঙলা সাহিত্য	১৯৮১, কলিকাতা
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি	১৯২০, কলিকাতা
বি আর নন্দ	গোখেল	১৯৭৭, দিল্লী
বিনয় ঘোষ	বাংলার বিদ্বৎ সমাজ	১৯৭৮, কলিকাতা
বিনয় ঘোষ	বাংলার নব জাগৃতি (২য় সংঃ)	ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৪, কলিকাতা
বি মুখার্জি	দি হুগলী এ্যান্ড ইট্স রিজিয়ন	১৯৪৮
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়	সংবাদপত্রে সেকালের কথা	কলিকাতা
ভিনসেন্ট এ স্মিথ	দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া (৩য় সংঃ)	১৯৬৭, লন্ডন
মজুমদার, রায় চৌধুরী এন্ড দত্ত	এ্যা এ্যাডভান্স হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া	১৯৬৫, নিউইয়র্ক
মন্মথনাথ ঘোষ	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ	কলিকাতা
মন্মথ রায়	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা	১৯৬৫, কলিকাতা
মনোমোহন গোস্বামী	রোশিনারা (শিবাজী)	১৯০১, কলিকাতা
মর্লে, লর্ড	রিকালেকসনস	১৯১৭, লন্ডন
মীর মোশাররফ হোসেন	জমিদার দর্পণ	১৮৭৩, কলিকাতা
মুখার্জী এ্যান্ড মুখার্জী	দি স্বদেশী মুভমেন্ট (১৯০৫-০৬)	১৯৫৮, কলিকাতা
মুজাফফর আহমদ	আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি	১৯৭৭, ঢাকা
মোঃ আবদুর রহিম	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	১৯৭৬, ঢাকা

লেখকের নাম	**বই-প্রবন্ধের নাম**	**প্রকাশকাল ও স্থান**
মোঃ আবদুল্লাহ	স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা	১৯৮২, ঢাকা
মোঃ এনামুল হক, ডঃ	হিস্ট্রি অব সুফীজম ইন বেঙ্গল	১৯৭৫, ঢাকা
মোঃ ওয়ালিউল্লাহ	আমাদের মুক্তিসংগ্রাম	১৯৭৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়	বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	কলিকাতা
যোগেন্দ্র ঘোষ	কেরানী দর্পণ	১৮৭৩, কলিকাতা
যোগেশ চন্দ্র বাগল	মুক্তির সন্ধানে ভারত	কলিকাতা
রজনী পাম দত্ত	ইন্ডিয়া টু ডে (নব সং)	১৯৭৯, কলিকাতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্র রচনাবলী (সংকলন)	বিশ্বভারতী
রমেশচন্দ্র মজমুদার, ডাঃ	স্ট্রাগল ফল ফ্রিডম	বোম্বাই
রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ	জীবনের স্মৃতিদ্বীপে	১৯৭৮, কলিকাতা
রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ	বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ	১৯৭২, কলিকাতা
রাজকুমার চক্রবর্তী	সন্দ্বীপের ইতিহাস	কলিকাতা
রেভারেন্ট জেমস্ লং	বেঙ্গল সোশ্যাল সাইন্স সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা	২০শে জানুয়ারি ১৯৬৯, কলিকাতা
লর্ড রোনাল্ডস হে	লাইফ অব লর্ড কার্জন	১৯২৮, কলিকাতা
শিবনাথ শাস্ত্রী	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ	১৯৫৫, কলিকাতা
শীলা সেন ডঃ	মুসলিম পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া	কলিকাতা
সখারাম গণেশ দেউস্কর	দেশের কথা	১৯০৩, কলিকাতা
সখারাম গণেশ দেউস্কর	শিবাজীর দীক্ষা	১৯০৪, কলিকাতা
সজনীকান্ত দাস	রবীন্দ্রনাথ, জীবন ও সাহিত্য	১৯৬১, কলিকাতা
সতীশচন্দ্র মিত্র	যশোর-খুলনার ইতিহাস	কলিকাতা
সি জে হ্যামিলটন	দি ট্রেড রিলেশনস্ বিটুইন ইংল্যান্ড এ্যান্ড ইন্ডিয়া (১৬০০-১৮৮৬)	১৮৮৬, কলিকাতা
সি বাকল্যান্ড	বেঙ্গল আন্ডার লেঃ গভর্নরস (১-২ খণ্ড)	১৯০১, কলিকাতা
সুকুমার সেন, ডঃ	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (৪র্থ সংস্করণ)	১৯৬২, কলিকাতা
সুপ্রকাশ রায়	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	১৯৮০, কলিকাতা
সুপ্রকাশ রায়	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	১৯৮০, কলিকাতা
সুফিয়া আহমেদ	সাম আসপেকটস অব দি হিস্ট্রি অফ দি মুসলিম কম্যুনিটি ইন বেঙ্গল	১৯৬০,
সুমিত সরকার, ডঃ	দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল	১৯৭৩, দিল্লী
স্যার এস এন ব্যানার্জী	নেশান ইন দি মেকিং	১৯২৫, লন্ডন
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	হিন্দু প্যাট্রিয়ট	১৮৭৩, কলিকাতা
হারানচন্দ্র চাকলাদার	ফিফটি ইয়ার্স এগো	ডন ম্যাগাজিন, জুলাই ১৯০৫, কলিকাতা

নির্ঘণ্ট

অ
অতুলসুর, ডঃ— ১০৭, ১৩২
অনুশীলন সমিতি— ২২১
অবাঙালি মুসলমান— ১৬১, ২৪১
অবাঙালি মুসলিম নেতৃবৃন্দ
উত্তর ভারতীয়— ২১২, ২৫৩-৬৪
সিমলা প্রতিনিধিদল— ২৫৪-৫৮
অবাঙালি মোল্লা মওলবী— ৯৪
অভিনব ভারত সংঘ— ২১৯
অভিনয়,
মঞ্চে মহিলাদের— ৫৭
অমৃতবাজার পত্রিকা
সিমলা বৈঠক সম্পর্কে— ২১৮
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর
উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী— ১৪২-৪৩
অস্ত্র আইন— ৫৮
আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন— ১৬০

আ
আইন পরিষদ গঠন ও ভোটাধিকার— ১৬৬
আত্মীয় সভা— ১২২
'আনন্দমঠ' – ৩১, ১৪৯-৫১, ১৮৫, ২২৬
কৃষক বিদ্রোহের চিত্র— ১৯৫
আনিসুজ্জামান, ডঃ— ৭৫, ৯৫, ১৬, ৯৯, ১০০, ১৫৬, ১৫৮
আফগান সমস্যা— ১৯৩
আবদালী, আহমদ শাহ— ৮৫
আব্দুর রহিম, স্যার— ১৪৩, ১৬০, ১৬৬
আবদুল ওদুদ, কাজী— ৭৫, ৭৭, ৮০, ৯৩, ৯৯
আব্দুল ওহাব, আল্লামা— ৮১-৮২, ৮৬
আব্দুল লতিফ, নওয়াব— ৩০, ৭১, ৮১, ৯২, ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১১৪, ১৪২, ১৬০, ১৬৭
আবদুল্লাহ রসুল, ব্যারিস্টার— ২০৯, ২১২
আমীর আলী, সৈয়দ— ৮১, ৯৬, ৯৭, ১১৪, ১৪৩, ১৬০
আম্বালা ষড়যন্ত্র মামলা— ৯২
আর্যবান্ধব সমাজ— ২১৯
আর্য সমাজ— ১৫১, ১৯০
আলি ইমাম, স্যার— ১৬৬
আলী, এনায়েত— ৮৭
আলী, বেলায়েত, মওলবী— ৮৭
আলীগড় আন্দোলন— ৯৫, ১৬৫
'আশরাফ ও আতরাফ' শ্রেণী, গঠন— ১১৫
আসাম— ১৭২
অসমীয়া ভাষা— ১১২
আসাম প্রদেশ— ১৫৮, ১৭২-৭৩, ১৯৭-৯৮
লোকসংখ্যা— ২৫৩
শিক্ষা পরিসংখ্যান— ১৬৯
আহমদউল্লাহ, মওলানা— ৯০
আহমদ রফিকউদ্দিন, স্যার— ১৬৬

ই
ইউরোপীয় অন্যান্য ঔপনিবেশিক জাতি— ১০৭-১০৮
ইউল, জর্জ (কংগ্রেস সভাপতি)— ১৯৮
ইংরেজ— ৫০, ৫১, ৭০, ৭১, ৮০, ৮৫, ৯০, ১০৮
ভারতবর্ষে আগমন— ২৪, ১০১
ইংরেজ ঐতিহাসিক— ১৯২, ১৯৫
ইংরেজ শাসন
বাংলায়— ৭৫, ১৯৪
ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ— ১৮৫
বড়লাট ও ভারত সচিবদের নাম— ২৯৩
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী— ৫৮, ৫৯, ৭৯, ৮৩, ৯৪, ১১৬, ১৮৬, ২০০
রাজত্ব— ১৬৪

কোলকাতা-২০

ভারতে ইংরেজ রাজত্বের
বিপদমুক্ত সময়– ১৮৬-৮৭
ইংরেজ সরকার– ২১, ৫৪, ১৭৪
নীতি– ৮০
ইংরেজ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ– ১৯৪-৯৫, ১১৪
ইংরেজি ভাষা চালু করার দাবি– ৭৪, ১৩৫
ইংরেজি ভাষার প্রবর্তন (ফারসির পরিবর্তে)– ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ১৩৫, ১৬১, ১৯০
ইংরেজি শিক্ষা– ১৩৫-৩৬
ইংল্যান্ড
শিল্প বিপ্লব– ২১
ইকবাল, মহাকবি, আল্লামা– ২১১, ২৫৫, ২৫৬
'ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এন্ড আফটার'– ১৯৮, ১৯৯
ইন্ডিয়া নিউজ– ৫৭
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন– ৪৭, ৫২, ৫৯, ৯৬, ১৪০, ১৫৮
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট (১৮৯২)– ১৭৪
ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (১৮৬১)– ১৮৬
ইন্ডিয়ান মিরর– ১৯১
ইমদাদুল মূলক, নওয়াব – ১৬৬
ইয়ং বেঙ্গল– ৪৫, ৯৫, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১৩৯, ১৪০, ১৬৫, ১৯০
ইলবার্ট বিল– ৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৮৮
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি– ২৪, ৬৯, ৭৮, ১০৫, ১০৮, ১১৮, ১১৯, ১৫৬-৫৭, ২২৩
এজেন্সি হাউস– ২৪-২৬, ১০৬
কর্তৃপক্ষ– ৬৮
কর্মচারী– ৬৭, ১০৫, ১১৬
কোলকাতার বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক– ১০৮
শাসনকাল– ২১
শাসনামালে সরকারি ছুটি– ১০৮
ইসলাম
উদারপন্থী– ১৮
সুফিদের প্রভাব– ২৪১, ২৪৩-৪৫
ইসলামাবাদী, মনিরুজ্জামান– ২১২

ঈ

ঈশ্বরগুপ্ত, কবি– ৩৫, ৩৬, ৫৫, ১২৫, ১৩০

উ

উইলিয়াম উইলবারফোর্স– ১১৯
উইলিয়াম ওয়ার্ড, স্যার, চিফ কমিশনার, আসাম)– ১৭২-৭৩, ১৯৮
উইলিয়াম কেরী– ১০৯-১১০
উইলিয়াম জোনস, স্যার– ১২২, ১৩০
উড, ব্যারিস্টার– ১২৮
উড়িষ্যা
শিক্ষা পরিসংখ্যান– ১৬৯
উৎমানজাই, পাঠান উপজাতি – ৯১
উনবিংশ শতাব্দী– ২৪৭
উদার ও সংস্কারপন্থী ভাবধারা– ১৯২
উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী– ৩৩, ১৮৯
বাংলা নাটক– ৫২-৫৪
বাংলার রেনেসাঁ– ৩২-৩৫, ৪৩, ৪৬, ৬২, ১০২, ১৩৬, ১৯২, ২৪৬-৫০
উর্দু (ভাষা)– ১১৫, ২১২

এ

এ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন– ১২৪
এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন– ১২৩, ১২৪
এগ্রিকালচার এ্যান্ড হর্টিকালচার
সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া– ৪৫, ১২৩
এডওয়ার্ড, যুবরাজ (সম্রাট, সপ্তম)– ৫৭, ৫৮
সম্বর্ধনা– ১৫৯
'এনকোয়ারার'– ১২৪
এনেস্টি, ব্যারিস্টার (ওয়াহাবী বিদ্রোহী পক্ষের কৌশলী)– ১৮৪
'এ্যানালস এন্ড এ্যানটিক্স অব রাজস্থান'– ৫০, ৫১, ৫৩, ৬৩, ৬৫, ৯৬
এলগিন, ভিক্টর আলেকজান্ডার ব্রুস, লর্ড (গভর্নর জেনারেল)– ১৭৩, ১৮৮
এলেনবারো, লর্ড– ৩০, ৭১, ১৬১
এ্যালফিনস্টোন, মাউন্ট স্টুয়ার্ট– ১১৯
এশিয়াটিক সোসাইটি– ১২২, ১৩০-৩১

ঐ

ঐতিহাসিক নাটক– ৫৩, ৫৪

ও

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (সাহিত্যিক ও সাংবাদিক)-- ৭৭, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ১১৭, ১১৮, ১৮৪, ২২০

ওয়াহাবী আন্দোলন– ৮০, ৮৪, ৯৭, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১৬২, ১৮৪
ইতিহাস– ৮১-৮২, ৮৫, ৮৬-৯৩, ৯৪
ওয়াহাবী বিপ্লবী– ২১৮
ওয়েডারবার্ন, ডব্লিউ, স্যার (কংগ্রেস সভাপতি)– ১৯৮, ২১৫
ওয়েলেসলি, রিচার্ড, লর্ড– ১১৯
ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি সোসাইটি– ১২৩

ক

কংগ্রেস, ভারতীয়, জাতীয়– ৪৭, ৬০-৬১, ৬৬, ৯৬, ১১৩, ১১৮, ১৪০, ১৫৬, ১৬০, ১৭৩-৭৫, ১৮২-৮৪, ১৯২, ২১৫, ২৫৫
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য– ১৮২-৮৩, ২১৫, ২৮৯
সভাপতি ও সম্পাদক মণ্ডলী– ১৯৮, ২১৫, ২৯২
কটন, হেনরি জন স্টেড্‌ম্যান, স্যার (চিফ কমিশনার, আসাম)– ১৭৩, ১৯৮, ২১৫
কমন্স সভা– ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১৫৭
কমরেড মুজাফফর আহমদ– ১৪০, ১৮৫

কর্মার্শিয়াল এ্যান্ড প্যাট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন– ১২৩
কর্নওয়ালিশ, লর্ড– ৬৯, ১০৮
এবং বর্ণহিন্দু নব্য জমিদার শ্রেণী– ১০৯
কার, সিডান– ১৬০
কার্জন, লর্ড জর্জ ন্যাথনিয়াল– ৬১, ১৭৩-৭৪, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৭, ২০০, ২০২, ২১৫-১৬
কার্পেন্টার, কুমারী– ১২৯
কালচার
বাবু কালচার– ৩৩, ১৩২
সাহেবী কালচার– ৩৩
বাবু সমাজ– ১০২, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪

কিপলিং (ইংরেজ কবি)– ১৮৭
কুশারী, পঞ্চানন, – ১৩২
কৃষক তন্তবায়ের সংগ্রাম– ৬৯, ১৯৪
কৃষক বিদ্রোহ– ৩৪, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৫৫, ৬৯, ৭০, ১৫২, ১৯০, ১৯৪, ১৯৫, ২২৯
কৃষ্ণমোহন– ১২০
কেদার চৌধুরী– ৫৩
কোলকাতা– ২২৪
ক্রমবিকাশ– ১৮৭, ১৯০
ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী– ১৩৭
মাদ্রাসা– ১৩৫
সংবাদপত্র– ৫৭-৫৮
সংস্কৃত কলেজ– ১৩১
হাইকোর্ট– ১৯৭
কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী– ৩১-৪১, ৪৬-৪৭, ৫১, ৫৫-৬৪, ৭২-৭৫, ৮০, ৯৪-৯৫, ১০২, ১০৬-১০৮, ১১০-১৫, ১১৮, ১২০-২৩, ১২৭-২৮, ১৩৬-৪২, ১৪৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬৪-৬৫, ১৬৭, ১৬৯-৭১, ১৭৫, ১৭৮, ১৮২-১৮৫, ১৮৯-৯৬, ২০৪, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৬, ২৪৬, ২৫০, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৫, ২৬৭
কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়– ১১১, ১৩৬, ১৩৭, ১৯০, ১৯৩-৯৪
উত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রদেশভিত্তিক পরিসংখ্যান – ১৬৯
কোলহৎকার, ভাস্কর রাম, পণ্ডিত (মারাঠা সেনাপতি)– ১৭৫-৭৬
ক্যানিং, লর্ড (গভর্নর জেনারেল)– ১৮৬-৮৭
'ক্যালকাটা' বাবুজ'– ১৩৭
ক্যালকাটা মেডিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি– ১২৩
'ক্যালকাটা রিভিউ'– ৩৪, ৬৯
ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু এ্যানিমেলস– ৪৫
ক্যাকাটা স্কুল সোসাইটি– ১২৩
ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি– ১২
ক্যালকাটা স্টেটসম্যান– ১১৩
কমন্স সভার আইন– ১০৯-১০, ১১৮

ক্ষ

ক্ষুদিরাম (বিপ্লবী)– ২২১

খ

- খাজা আতিকুল্লাহ– ২০৯
- খান, আগা– ১৬৬, ২১১-১২, ২৬০
- সিমলা ডেপুটেশনে
- লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ– ২৫৪-৫৫
- খান আজমল, হেকিম– ১৬৬, ২৫৯
- খান, আবদুল গফফার খান– ৯১
- খান, আলিবর্দী, নবাব– ১৭৬
- খান বাহাদুর নবাব আমীর হোসেন– ৯৭
- খান, মোজাম্মেল, স্যার– ১৬৬
- খান, সৈয়দ আহমদ, স্যার– ৮১, ৯২, ৯৬-৯৯, ১১৮, ১৪৩, ১৬০, ১৬৫, ২৯০
- এবং রামমোহন রায়– ১০০
- খ্রিস্টধর্ম (ভারতে প্রচার)– ১০৫-১০৭, ১২০

গ

- গঙ্গারাম, কবি– ১৭৬
- গণপতি পূজা– ১৮০
- গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (১৯০৯)– ১৬৬
- গারোদের বিদ্রোহ– ১৯৫
- গিরিজানাথ, দিনাজপুরের মহারাজা– ২০৫
- গোখলে, গোপাল কৃষ্ণ (কংগ্রেস নেতা)– ৬০, ৬৩, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ২১৫, ২১৯, ২৮৯
- গোপাল হালদার– ১৫৩, ১৯৩
- গোস্বামী, প্রভাত কুমার, ডঃ– ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৬, ১৫৯, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ২২৫, ২২৭
- গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ– ১৯০
- গোস্বামী, মনোমোহন (নাট্যকার)– ১৭৯
- গোহত্যা নিবারণী আন্দোলন– ৯৫
- গৌড়ীয় সমাজ– ১২৩
- গৌরী শংকর, পণ্ডিত– ৩৬
- গ্রান্ট, চার্লস– ১১৯
- গ্লাডস্টোন (ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, উদারপন্থীদের নেতা)– ১৮৮

ঘ

- ঘোষ, অরবিন্দু– ২১৪
- ঘোষ, গিরিশচন্দ্র (নাট্যকার)– ৫১-৫৪, ৬৪, ১৮০-৮১
- ঘোষ, বিনয়– ৩৩, ৪৬, ৬২, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৪, ১০০, ১০২, ১০৩, ১১১, ১১৬, ১২৭, ১৩১, ১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৭, ২০৮, ২২৩, ২৪৬, ২৫২
- ঘোষ, মতিলাল– ২০৫
- ঘোষ, মন্মথ নাথ,– ৫৪, ১২৭
- ঘোষ, মনোমোহন– ১৩০
- ঘোষ, রামগোপাল– ৪৫, ১২০, ১২৩-১২৪
- ঘোষ, রাসবিহারী– ২১৫
- ঘোষাল, জয়নারায়ণ– ১৩৩
- ঘোষাল, রাজা কালী শংকর– ১২২

চ

- চক্রবর্তী, তারাচাঁদ– ১২৩, ১২৪
- চক্রবর্তী, বিহারী লাল– ১২৭
- চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন– ৫২
- চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার– ২০৪, ২০৫, ২১৮, ২৫৪
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র– ১৭, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৫১-৫৩, ৬৪, ৯৫, ১০১, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০, ১৪৩-৫২, ১৮৫-৮৬, ১৯০-৯২, ১৯৫, ২০৭-০৮, ২২৫-২৬
  - বঙ্কিম সাহিত্য– ১৫০-৫১, ২০৭
  - রচনাবলীর মূল্যায়ন– ১৪৬
  - এবং জাতীয়তাবাদ– ২২৩
  - এবং বঙ্গীয় রিনাসান্স– ২৪৯-৫১
- চন্দ্র, হরেন্দ্র– ১২৮
- চাকলা বিদ্রোহ (পার্বত্য চট্টগ্রাম)– ৬৯
- চারলু পি, (কংগ্রেস সভাপতি)– ১৯৮
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত– ৬৯, ৭৭
  - ও জমিদারি প্রথা– ২৩
  - প্রবর্তন– ২৭
  - ফলাফল– ২৮-২৯
- চেম্বারলেন, নেভিল, স্যার– ৯১-৯২
- চৌধুরী, আলিমুজ্জামান (ফরিদপুর)– ২০৯
- চৌধুরী, নবাব আলী (ময়মনসিংহ)– ২১১, ২৫৭
- চৌধুরী, নুরুন্নবী (আইসিএস)– ২৭৫
- চৌধুরী, সূর্যকান্ত (ময়মনসিংহের মহারাজা)– ২০১

ছ
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর– ৬৭
ছোটনাগপুর– ১৬৯, ১৭০

জ
জব চার্নক– ১০০-১০১
জমিদার– ৮৩
অত্যাচার– ৪২, ৮৫
কৃষক বিদ্রোহ– ১৯৫
নতুন বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণী– ২৭-২৮, ৭৭, ২১০, ২১৪, ২১৬-১৭
'জমিদার দর্পণ'– ১৯৬
জমিদার সভা– ১৯০
জাতীয়তাবাদ– ৪৮, ৪৯, ৫৬, ৬১, ৯৫, ১৪৩-৪৪, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫
বাঙালি জাতীয়তাবাদ– ৩১, ৩৩-৩৪, ৫৪
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ– ৫১, ৫২, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৬৬, ১৫৪, ১৬৭, ১৭৪, ১৭৯-৮২, ১৯৩, ২২৩, ২৪৯
জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা– ১৪০, ১৫৬, ১৯১
জিন্নাহ, মুহাম্মদ আলী– ২১১, ২৫৫, ২৫৬
জেমস, লং ফাদার– ৩৯, ৪০, ৪১
জৌনপুরী, মওলানা কেরামত আলী– ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১১৪, ১৪৩, ১৬১, ১৬২, ২২৩
জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা– ১২৪
জ্ঞানসন্দীপন সভা– ১২৪

ট
টড, জেমস, লে: কর্নেল– ৫০-৫১, ৬৩-৬৬
টমাস, ডা:– ১০৯-১১০
টিচার্স সোসাইটি– ১২৪
টেম্পল, রিচার্ড, স্যার– ১২৮
টোরী দল– ১১৯, ১২০, ১২১

ঠ
ঠাকুর পরিবার, (জোড়া সাঁকোর)– ২৬, ২২৩, ২২৬
ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ– ৪৮, ৯৫, ২২৪
ঠাকুর, গোপী মোহন– ১২২
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ– ৪৮-৪৯, ৫২-৫৪, ৬১, ৭২, ৯৫, ১৫৬, ২২৪-২৬
ঠাকুর, দর্প নারায়ণ– ২৬
ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ– ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩০, ১৯০
ঠাকুর, দ্বারকানাথ– ২৬-২৭, ১২৩, ১৩৬
ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ– ৯৫
ঠাকুর, নটেন্দ্রনাথ– ৫২
ঠাকুর, প্রশান্ত কুমার– ৭৪, ১৩৫
ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার– ১২২, ১২৩
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ– ৩১, ৪৬, ৫২, ১৭৮, ১৯৬, ২১৩, ২১৪, ২২৩-৪০, ২৬১, ২৬৭
এবং আধ্যাত্মবাদ– ২৩৯
'আমার সোনার বাংলা' গান – ২৩১
এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ – ২২৬-২৭
দাঙ্গার বিরুদ্ধে– ২১০
এবং বঙ্কিমচন্দ্র– ২২৫-২৬
এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন– ২৩২-৩৮
'মিলন মন্দির' ও 'রাখী বন্ধন'– ২২৯-৩০
এঁর সমালোচনা– ২৩৩-৩৭
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে– ২৩১-৩২
এবং স্বদেশী আন্দোলন– ২৩২, ২৩৪
ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ– ৪৮, ২২৪

ড
ডাফ স্কুল– ১৩৬
ডাফরিন, আভা ফ্রেডারিক টেম্পেল, লর্ড– ৪৭, ৫৯, ৭২, ১৩৯, ১৫৬, ১৬০, ১৮৩, ১৮৮
ডালহৌসি লর্ড– ৯০
ডিরোজিও, হেনরি লুই– ৯৫, ১২০, ১২৩
ড্রামাটিক পারফরমেন্স কন্ট্রোল বিল– ৪৪, ৫৮

ঢ
'ঢাকা গেজেট'– ১৭৩

ত
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা– ১২৫, ১৯০
তত্ত্ববোধিনী সভা– ১২৪-২৫
তর্ক পঞ্চানন, দুর্গাপ্রসাদ, পণ্ডিত– ১২৩, ১২৫
তর্কবাগীশ, গৌরীশংকর, পণ্ডিত– ১২৫

তর্করত্ন, রামনারায়ণ– ৫৫
'তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া'– ৯৬
তাইয়েবজী, বদরুদ্দীন– ১১৮, ১৬৫, ২১১, ২৫৫, ২৫৬, ২৯০
তিতুমীর– ৮২, ৮৪-৯৫
বিদ্রোহ– ৬৯, ৮০, ১৯৫
মতবাদ– ৮৪
তিলক, বাল গঙ্গাধর– ৬০, ৬৩, ৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ২১৫, ২১৯
ত্রিবেদী, রামেন্দ্র সুন্দর– ২০৫, ২৩০, ২৩৩

থ
থিয়েটার
ন্যাশনাল (কলিকাতা– ৫১-৫৩, ৫৭

দ
দত্ত, অক্ষয় কুমার– ৪৬, ১২৫, ১২৭
দত্ত, অশ্বিনী কুমার (স্বদেশী আন্দোলনের নেতা)– ২০৫
দত্ত, চূড়ামণি– ১৩৩
দত্ত, মাইকেল মধুসূদন– ৪০, ৪৬, ৫০-৫২, ৫৬, ৬৪, ১২৬, ২২৯
দত্ত, রসময়– ১৩১
দশসালা বন্দোবস্ত– ২৩-২৪, ৬৮, ৭৭
'দারুল ইসলাম (ভারতবর্ষ)– ৯৬, ৯৭
'দারুল হরব' (ভারতবর্ষ)– ৮৩, ৮৭
দাস, উপেন্দ্রনাথ– ৫৮
দাস কালী প্রসন্ন– ২১৪
দাস, পুলিন, ডঃ– ১৭০, ১৮০, ১৮২, ১৯০
দি ইংলিশম্যান– ৪০, ৪১, ৫৩
দি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন– ১০০
দিল্লী
ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী– ১৯৭
দ্বিজাতিতত্ত্ব– ২১২
উন্মেষ– ২৬১
দুদুমিয়া, পীর (মুহাম্মদ মহসিন)– ৮০, ৮৩, ৮৪
দুর্ভিক্ষ– ১৫৭, ১৫৯, ১৭১
ইংরেজ-ভারতে দুর্ভিক্ষের খতিয়ান– ১৮৯
'দূরবীন'– ৯৪
শদে, রামদুলাল– ১৩১
দেউস্কর, সখারাম গণেশ– ১৫৭, ১৭৮, ১৮০, ১৯২
দেব, গোপীমোহন– ১৩১
দেব নবকৃষ্ণ, মহারাজ– ১০৭
দেব, রাজা রাধাকান্ত,– ৫৬, ৭৪, ১২০, ১২৮, ১৯৬
দেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস– ৪৫, ৪৬
'দেবী চৌধুরানী'
কৃষক বিদ্রোহের চিত্র– ১৯৫

ধ
'ধর্মসভা'– ১২৪, ১৩১

ন
নওরোজী, দাদাভাই– ২১৫
নন্দী, কৃষ্ণকান্ত (কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা)– ১৩২
নন্দী, মনীন্দ্র (কাশিমবাজারের মহারাজা)– ২০১
নবীনচন্দ্র– ৪৬
নর্থব্রুক, (গভর্নর জেনারেল)– ১৮৭
নর্মান, জাস্টিস, (হত্যা)– ৯২, ১০৩, ১৩০, ১৬২, ২১৮
নাগা উপজাতি (বিদ্রোহী)– ১৫৭, ১৭২
নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)– ৫০, ৫৮, ১৫৮, ২০৬
নায়েক বিদ্রোহ (মেদেনীপুরে– ১৯৪
নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা– ১৯৪
'নীল কমিশন' (ইন্ডিগো কমিশন)– ৩৭
নীলকর (সাহেব)– ৬৯, ৮৩, ৮৪, ১০০
অত্যাচার– ২২
নীলকুঠি স্থাপন– ২১
নীলচাষ
বাংলাদেশে আরম্ভ – ২১
বাধ্যতামূলক– ২১-২২
নীল চাষিদের বিদ্রোহ– ২২-২৩, ৩৪, ৬৯, ৭০, ৯৪, ১৯৪, ১৯৫
'নীল দর্পণ'
কৃষক বিদ্রোহের চিত্র– ১৯৫
নূরুলউদ্দিনের বিদ্রোহ (রংপুর)– ১৯৪
'ন্যাশনাল স্কুল'– ২১৪

প

পত্রী পূর্ণেন্দু– ১৩৩/১৭৫
পাকিস্তান– ১৭১
পাগলপন্থী আন্দোলন (করমশা'র নেতৃত্বে)– ১৯৪
'পার্থিনন'– ১২৩-১২৪
পারসিভাল স্পিয়ার– ৫৯, ১০৫, ১১৮, ১৩৯, ১৬০, ১৬৪, ১৭৪, ১৮৮
পাল, বিপিনচন্দ্র– ১৮৪, ২১৪
পিট, উইলিয়াম– ১১৯
পিন্ডারি– ৮৫, ৮৬
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ– ২১২, ২৬৭
পরিসংখ্যান– ২১০-১১, ২৫৩-৫৪
সৃষ্টি– ২০৩
স্থায়ীকরণ প্রসঙ্গ– ২১২, ২১৫, ২১৭, ২৫৭
পোদ্দার, অরবিন্দু, ডাঃ– ২০১-২০২, ২০৫, ২২৩, ২৩৪-৩৫
'প্রচার' (বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত)– ১৯০
প্রজাবিদ্রোহ (যশোর খুলনার)– ১৯৪
প্রভাত কুমার. ডঃ– ৬৫

ফ

ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ– ৬৯
ফাদকে, বাসুদেব, বলবন্ত (সন্ত্রাসবাদী)– ২১৯
ফারায়েজী আন্দোলন– ৬৯, ১৯৫
ইতিহাস– ৮২
ফিয়ার, জে বি, বিচারপতি– ৩১, ৭১, ১০৩, ১৩০
ফুলার, জোসেফ ব্যাম্পফিলডার, স্যার (পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের গভর্নর)– ১৯৮, ২০৩
পদত্যাগ– ২১৫-১৬
হত্যা প্রচেষ্টা– ২২১
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ– ১১০
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব– ১২৮
ফ্রেসার, এ্যান্ড্রু হেন্ডারস, স্যার (বঙ্গভঙ্গের পরামর্শদাতা)– ১৯৮, ১৯৯, ২০০
ফ্রেসার. ল্যোভাট– ১৯৮, ১৯৯

ব

'বঙ্গ দর্শন'– ৪১, ৪৪, ৭২, ১৫৬, ১৯০
'বঙ্গবাসী'– ১৯১
বঙ্গভঙ্গ– ১৭১-৭৩, ১৮৫, ১৯৪, ১৯৬-২০৩
উদ্দেশ্য– ২০৩
প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া– ২০০-২০১
প্রাক্কালে অভিনীত নাটক– ২০৬
বাঙালি মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি– ২০৯-১০
বিরোধী আন্দোলন– ২০১-২০৫, ২০৯-১০, ২১৩-১৪, ২১৭, ২৩০, ২৩২, ২৩৬, ২৫৪-৫৫
বঙ্গভঙ্গ রদ– ২১২-১৩, ২১৬
ফলাফল– ২৬৬-৬৭
বঙ্গভাষা প্রকাশিত সভা– ১২৫
বঙ্গরঞ্জিনী সভা– ১২৪
বঙ্গহিত সভা– ১২৪
বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা– ১২৯-৩০
বড় বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ– ১২৮-২৯
বন্দোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ,– ১২২
বন্দোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র– ৬৬
বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ডঃ– ৪৮, ১০৯, ১২৬, ১৩৩, ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ২৩৬, ২৩৯, ২৪২, ২৪৭
বন্দোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন– ১০১
বন্দোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র– ৪৮, ৫২
বন্দোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন (রেভারেন্ট)– ১২৩, ১২৮
বন্দোপাধ্যায় তারিণীচরণ– ১২৪
বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ– ১২৪
বন্দোপাধ্যায়, ভবানীচরণ– ১২৩
বন্দোপাধ্যায়, রঙ্গলাল– ১২৭
বরাট, অঘোরচন্দ্র– ৫১, ৬৪
বর্মা– ১৬৯, ১৭০, ১৯৮
বসু, আনন্দমোহন– ২০৪-২০৫, ২১৩, ২৩০
বসু, কুঞ্জ বিহারী– ৫২
বসু, চন্দ্রনাথ– ৯১
বসু, নন্দকিশোর– ১২২
বসু, ফকির চাঁদ (নাট্যকার)– ১৭৯
বসু, রাজনারায়ণ– ৪৭, ৯৫. ১৫৬, ১৯০, ১৯১
বসু, সতীশচন্দ্র– ২২১
বাংলাদেশ
নামের ক্রমবিকাশ– ২৪২

স্বাধীন ও সার্বভৌম– ১৭-১৯, ৩৪, ১০৪, ১৭১, ২৩১
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– ১৭১, ২৪১
বাংলা গদ্য সাহিত্য– ৫২
বাংলা নাটক (উনবিংশ শতাব্দীর)– ৫২-৫৭, ৬৪
'বাংলা নাটকের মুক্তি'– ৪৪-৪৫, ১৩০
বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে প্রচার -- ৯৪
বাংলার ইতিহাস– ১৭, ১৮
আদিপর্ব– ২৪৫-৪৬
বাংলার মুসলমান (অবস্থা)– ৩০-৩১, ৬৭-৭৫, ৭৭-৮১, ৯৩-৯৫, ১০৩-১০৫, ১১১, ১১৬-১৭
বাঙালি– ১৭, ১৮, ৫০, ৬৫, ১১৩
জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য– ১৯
বাঙালি মুসলিম
স্বাতন্ত্র্যবোধ– ২৪১
বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত– ৭৬, ৯২, ৯৩, ১০৪, ১১০-১১, ১১৫, ১১৭-১৮, ১২১-২২, ১৬০-৬৫, ১৬৭, ১৯২, ১৯৭, ২০৮, ২১০, ২২৩
বিলুপ্তির কারণ– ১৬১-৬২
বাঙালি মুসলমান– ২৯, ৩৩, ৫৪, ৫৯, ৭১-৭৮, ৮৭, ৯৩-৯৪, ৯৬, ১০০, ১০৩, ১১০, ১১২, ১১৬, ১২১, ১২৪, ১৪৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭০, ২১২, ২১৭, ২৩১
মনমানসিকতা– ৩০, ২০৭-০৮
সমস্যা– ২৫৭
বাঙালি হিন্দু– ২৫, ৭৭, ৭৯, ১১২
শিক্ষা (পরিসংখ্যান)– ১৬৯
সরকারি চাকরিতে– ১৩৭-৩৮
বাঙালি হিন্দু বিত্তশালী এবং সুবর্ণ শ্রেণী– ৪৭, ৬৮, ৬৯, ১০০-১০২, ১৭৫
বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজ– ১০৮, ১১৬, ১৬৩, ১৬৪-৬৫, ২০৮, ২৪৬
বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী– ৩৩-৩৭, ৪৪, ৪৭-৪৮, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৭, ৭১, ৭৯, ১২২, ১৩৫, ১৪৫, ১৫৫. ১৬০, ১৬৪, ১৮০
বাগল, যোগেশচন্দ্র– ৪৭, ১৮৪, ২১৪
বার্নসডন– ১০৯-১১০
বালাকোটের লড়াই– ৮৯
বিজ্ঞানদায়িনী সভা– ১২৪
বিদ্যাবিশারদ, কালীপ্রসন্ন– ২০৫
বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র– ১২৫
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র– ৪৬, ৫২, ৯৬, ১১৫, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৪৫, ১৬৫, ১৯১, ২২৯
শিক্ষানীতি সম্পর্কে– ১১২, ১৫৫
এবং বিধবা বিবাহ– ১৪৯, ১৮৫
বিদ্যোৎসাহিনী সভা– ১২৫-২৬
বিদ্রোহ, ইংরেজদের বিরুদ্ধে– ২১
বিধবা বিবাহ আন্দোলন– ১২৬, ১৪৯, ১৮৫-৮৬
বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট (১৯০৪)– ১৯৩
বিহারী লাল– ৪৬
বীটন সোসাইটি– ৪৫
বীরভূম-বাঁকুড়ার বিদ্রোহ– ১৯৪
ব্রিটিশ
পার্লামেন্ট– ২২৩
ভারত সম্পর্কে চিন্তাধারা– ১১৯
শাসক– ৭০, ৭৪
সরকার– ১১৩
সরকারের নীতি– ৭০
ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি– ১৯০
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন– ৩৬, ৪৫, ৪৭, ১১৮, ১৩৭, ১৪০, ১৯০, ২১৪
ব্রিটেন
ভারত সম্পর্কে চিন্তাধারা– ১১৯
বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি– ১৭১-৭২, ১৫৭, ১৫৮, ১৭০, ২৬৭
আয়তন– ১৬৮, ১৭২, ১৯৭-২০০, ২০৩, ২০৪, ২৫৩
পৌরসভার সংখ্যা– ১৯৯
লোকসংখ্যা– ২০০
বেঙ্গল-ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি– ৪৫
বেঙ্গল ল্যান্ড লর্ডস এসোসিয়েশন– ৯৬, ১৪০
'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন– ৩০, ৪৫, ৭১, ৭২, ১০২
বেথুন সোসাইটি– ১২৫, ১২৬
বেন্টিংক, উইলিয়াম, লর্ড– ১২০, ১২৪, ১৩৫, ১৮৯
বোলকি শা'র বিদ্রোহ (বাখরগঞ্জ)– ১৯৪
ব্যানার্জী, ডব্লিউ সি (উমেশচন্দ্র)– ৭২, ১১৩, ১৮৩

ব্যানার্জী, নন্দলাল– ২২২
ব্যানার্জী, রাধাকান্ত– ১৩৫
ব্যানার্জী সুরেন্দ্র নাথ– ৪৭, ৫৯, ৬৩, ১৪১, ১৫৮, ১৭৩, ১৭৪, ১৯৪, ২০৪, ২০৫
ব্রাহ্ম সমাজ– ৪৫, ১২১
ভারতবর্ষীয়– ১৯০
আদি– ১৯০

ভ

ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ, ডঃ– ৪৯
'ভদ্রলোক সম্প্রদায়'– ১৮৫
ভবানী পূজা– ১৭৬-১৮০
ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৬)– ৫৮, ১৫৮, ১৬০
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন
'নতুন শ্রম শিল্পযুগের সূচনা'– ১৮৭
রেলপথ স্থাপন– ১৩৬, ১৬৩-৬৪, ১৮৮
শিক্ষানীতি– ১৩৮-৩৯
শিক্ষা পরিসংখ্যান– ১৩৮
'ভারত-সংস্কার' পত্রিকা– ৫৭
ভারত সভা– ১৫৬, ১৫৮
ভিক্টোরিয়া, মহারাণী– ৫৮
ঘোষণা– ৫৯
'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি– ১৫৯
ভিকারউল মুল্ক, নওয়াব– ১৬৬, ২১১
ভোঁসলে রঘুজী (মারাঠা নেতা)– ১৭৫

ম

মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন– ১২৩
মজুমদার, রমেশচন্দ্র– ৩৬
মনরু, কর্নেল থমাস– ৭৯
মর্লে, জন– ১৬৬
মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন– ২১২-১৩, ২১৬, ২৮৯
মল্লিক, আজিজুর রহমান ডঃ– ৬৭, ৭৩, ৭৫-৭৭, ৮০, ৮৩, ১১৬, ১২২, ১৬১, ১৭০
মহসিন উল মূলক– ১৬৫-৬৬, ২১১, ২৫৪-৫৫
মহারাষ্ট্র
বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে– ১৭৫
সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত– ১৮৪
মার্শম্যান-- ১০৯-১১০
মারাঠা (জাতি)– ৬০, ৮৫
বর্গীয় হামলা– ১৭৫-৭৬
বর্গীয় হামলা, মহারাষ্ট্র পুরাণ– ১৭৭-৭৮
ব্রাহ্মণ– ১৭৫, ১৮৪, ১৮৬
মালব্য, মদনমোহন– ২১৫
মিত্র অশোক– ২৪৯
মিত্র, কিশোরী চাঁদ– ৩৬, ১২৭, ১৯৬
মিত্র, কৃষ্ণকুমার,– ২০৪-২০৫
মিত্র, দীনবন্ধু– ৩৭, ৩৯, ৪০, ৫১, ৫২, ২২৯
'নীল দর্পণ'– ৩৭-৪৪
মিত্র,নবগোপাল– ৯৫
মিত্র, প্যারীচাঁদ– ৪৫, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১৩০
মিত্র, বরদাকান্ত– ৫১, ৬৪
মিত্র, রাজেন্দ্রলাল– ১২৫, ১৩০
মিত্র, রামচন্দ্র– ১৩০
মিন্টো, লর্ড– ১৬৬, ২১২, ২১৬
আগা খাঁ ডেপুটেশনের সাক্ষাৎ– ২৫৪
মিল, জেমস– ১১৯
মীর কাসেম, নওয়াব– ১১৫
মীরজাফর– ৬৮, ১১৫
মুকুন্দ দাস, কবি– ২০৫, ২০৬
মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র– ৪৫
মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ– ৫১, ৬৪
মুখোপাধ্যায়, জগদানন্দ– ৫৭, ১৫৯
মুখ্যোপধ্যায়, দক্ষিণামোহন– ৩৫
মুখোপাধ্যায়, বৈদনাথ– ৭৩, ১১২, ১২৩
মুখোপাধ্যায়, ভূদেব– ৪৬, ৯৫, ১২১, ১২৭
মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র– ৩৬, ৩৮, ৩৯, ১৯৬
মুর্শিদ কুলী খাঁ– ২৩, ১০১
মুস্তফা কামাল (তুরস্ক)– ৮০
মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ– ১০০
মুসলিম জনগোষ্ঠী (বাঙালি) পূর্ববঙ্গীয় – ২৬৪, ২৬৭
মুসলিম বিদ্বেষ– ৫৩, ৬০, ৭০
মুসলিম মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজ– ৯৯, ১০২
মুসলিম লীগ– ১৬৭, ১৯৭, ২১২
উদ্দেশ্য– ১৬৭, ২৬০, ২৯১
জন্ম– ১৬৬, ২১১, ২৫৯
প্রতিক্রিয়া– ২৬১

রাজনৈতিক দর্শন– ১৭০
মুসলিম শিক্ষা– ৭১-৭২, ৭৬-৭৭, ১০৪, ১১৩-১১৪
মুসলিম সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ– ১০৪, ১১০, ১১৩
মুসলমান/মুসলিম সম্প্রদায়– ৭২, ৭৫, ৮০, ৯৯, ১০২, ১১৪-১১৬, ১১৮, ১৩৯
উত্তর ভারতীয় অবাঙালি– ১১৫-১৬, ২১২
ইংরেজ শাসকদের সাথে অসহযোগিতা– ১০৩, ১১৭
সহযোগিতা– ৯৬, ৯৭, ১০৫
মেকলে, লর্ড– ১৩৫, ১৩৮, ১৮৯
মেটকাফ, চার্লস, স্যার– ৭৯, ১২০
মেদিনীপুরের কৃষক বিদ্রোহ– ৬৯, ১৯৪
মেয়র্স কোর্ট– ১৩৪
মেয়ো, লর্ড, বড়লাট– ১০৪
হত্যা– ৯২, ১০৩, ১৬২, ১৮৭
মেহেদী আলী, সৈয়দ– ১৬৫
মোল্লা, এম কে ইউ– ১৭২, ১৯৯, ২০৯
মোহাম্মদ আলী, মওলানা– ২৬০
মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স– ১৬৫, ১৬৬, ২৫৯
মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন– ২০৮
মোহামেডান ভিজিলেন্স এসোসিয়েশন– ২০৮
মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি– ৯৬, ৯৭, ১০০, ১১৮
মোহামেডান সাহিত্য সভা– ২০৯
মোহামেডান সোশ্যাল রিফরমার– ১০০
ম্যাকন, জন, স্যার– ৭২, ৭৯-৮০
ম্যাকেনজি, আলেকজান্ডার, স্যার (লেঃ গভর্নর, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি)– ১৭৩
ম্যালকম, জন, স্যার– ১২০

য

যুগান্তর (সন্ত্রাসবাদী সংগঠন)– ২২১

র

রঙ্গলাল, কবি– ৬৪
রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্র দর্শন এবং সুফীবাদ– ২৩৯
রবীন্দ্র প্রতিভা– ২০৬, ২২৩, ২২৭, ২৩৮-৪০
রবীন্দ্র মনমানসিকতা– ২২৮, ২৩৬-২৩৮
রবীন্দ্র সাহিত্য– ২৩৭-৩৮
রবীন্দ্র সাহিত্যে মুক্তবুদ্ধি
মনমানসিকতা– ২২৫, ২২৮
রহমান, মিজানুর (মাহেনও)– ৯৪
রহমান মুজিবুর (আইসিএস)– ১৭৫
রাজপুত (জাতি)– ৫০-৫১, ৫৩, ৬০, ৬৪-৬৬, ৯৬
রাজবল্লভ– ১৩২
রাজেন্দ্রলাল– ৪৬
রাধাকান্ত– ৪৬, ১৯০
রাধামাধব– ১৩১
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব– ৯৫, ১২১, ১৩৯, ১৪৫, ১৫১, ১৫৩, ১৯০-১৯১, ২০৮
রামকৃষ্ণ মিশন– ৪৫
রামু খাঁর বিদ্রোহ (পার্বত্য চট্টগ্রামে)– ১৯৪
রায়, ডি এল– ৬৪
রায়, ব্রজেন্দ্র কিশোর– ২০১
রায়, রমাপ্রসাদ– ১২৪
রায়, রাজা রামমোহন– ৪৫-৪৬, ৯৫, ১২১-১২৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৫
এবং সৈয়দ আহমদ– ১০০
রায়, লালা লজপত– ১৯১, ২১৯
রায়, সুপ্রকাশ– ১৩৬, ১৪৪, ১৫০, ১৫৩-৫৪, ১৮২, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৭
রায়, হরলাল– ৪৮, ৫২
রায়ান, এডোয়ার্ড, বিচারপতি– ১২৩
রিপন, জর্জ রবিনসন (ভাইসরয়)– ৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৮৭-৮৮
'রিফর্মার'– ১২৪
রিসলে, হার্বার্ড (ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব)– ২০০
রেনেসাঁ/নবজাগরণ/নবজাগৃতি– ৩২-৩৫, ১৯২
রেনেসাঁর কারণ– ৭৪
'রিনাসান্সে'র নায়কগণ– ১৮৮
'বঙ্গীয় রিনাসান্স'– ১৪৪, ২০৭-০৮
'হিন্দু রিনাসান্স'– ১৪৪, ২০৮, ২৪৯'
রিনেসান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলন– ১৬৫
বাংলার রেনেসাঁ এবং ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় রেনেসাঁ– ৩৩, ২৪৭-৪৯. ২৬৫-৬৬
রেশম চাষিদের সংগ্রাম– ১৯৪

ল
লং, রেভারেন্ড, জেমস– ৩০, ৭২, ৮১, ১১৪, ১২৬, ১২৯-১৩০, ১৮৭
লক্ষণ সেন– ৪৮
লরেন্স, জন ব্যারণ (ভাইসরয়)
এবং পাঞ্জাবের রায়ত– ১৮৭
লাখেরাজ (ওয়াক্ফ) সম্পত্তি– ৭৫, ১১৫, ১৬১
হস্তান্তর– ৭৭-৭৮
লালা, হংসরাজ– ১৯১
লাহিড়ী, রামতনু– ১২০, ১২৩-১২৪
লিটন, এডোয়ার্ড রবার্ট বুলার, লর্ড– ৫৮, ৫৯
এবং দুর্ভিক্ষরোধ– ১৮৭
লিটারেরি সোসাইটি– ১২৩
লেডিস সোসাইটি– ১২৩
লেনিন, ভি আই – ১৯৬
ল্যান্সডাউন, লর্ড– ১৮৮

শ
শফি মোহাম্মদ, স্যার– ১৬৬
শরীয়তউল্লাহ, হাজী– ৮০, ৮২-৮৪
শশধর, তর্কচূড়ামনি– ১৯১
শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ, ডঃ– ৯৪
শাস্ত্রী, শিবনাথ– ২৬, ৩৫, ১৩৭, ২৩৪
শাহ আবুদল আজিজ, মওলানা– ৮৬
শাহ ইসমাইল– ৮৬, ৯০
শাহেদীন, বিচারপতি– ১৬৬
শিকদার, রাধানাথ– ১২৩
শিখ– ৮৬, ৯০
শিখ-ওহাবী যুদ্ধ– ৮৮-৮৯
শিবাজী– ৬৬, ১৭৫
'শিবাজী উৎসব'– ৬০, ৬৬, ৯৫-৯৬, ১৬৬, ১৭০, ১৭৬, ১৯২
'শিবাজী' নাটক– ১৭৯, ১৮১
শিবাজী বন্দনা– ১৭৮-৮১
শিল্পপতি, গুজরাটি-মারাঠি– ৬৩, ৯৬
বোম্বের– ৬৩, ৬৬
শিল্প স্থাপন (ব্রিটিশ ভারতে)– ১৬৪
শোর, জন, স্যার– ৬৮, ৭৭

স
'সংবাদ প্রভাকর'– ৩৬, ৫৫, ১২৫, ১২৮, ১৯৬
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের সূচনা– ৫৮
সতীদাহ প্রথা– ১১৯, ১৮৬
নিষিদ্ধকরণ– ১২৩
সঞ্জীবনী সভা– ২২৪
সন্ত্রাসবাদ– ৬২, ৮৪
বাংলায়– ১৮৪-৮৫
সূত্রপাত– ১৯৭
সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী– ১৪০
হিন্দু সন্ত্রাসবাদ– ১৮৪
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন– ২১৪, ২১৮, ২২৯
দমননীতি– ২১৪, ২২২
বাংলায়– ২২০-২২
মহারাষ্ট্রে উৎপত্তি– ২১৮-১৯
সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ– ৬৯-১৯৪
সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (উত্তর বঙ্গের)– ১৫০, ১৯৪
'সম্বাদ ভাস্কর'– ৩৬, ৫৫, ৫৬, ১২৫, ১২৮, ১৮৮, ১৯৬
সমশের গাজীর বিদ্রোহ (ত্রিপুরা)– ৬৯, ১৯৪
সরকার, অক্ষয়চন্দ্র (সম্পাদক 'নবজীবন')– ১৯১
সরকার, সুমিত, ডঃ– ২০০, ২১০, ২১৪, ২২১
সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা– ১২৪
সরস্বতী, দয়ানন্দ– ৯৫
সমিউল্লাহ, নওয়াব, স্যার– ১৬৬, ১৯৭, ২০২, ২১১, ২৫৭
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন– ২০৪-০৫, ২০৯-১০, ২১৩-১৫, ২২১
সাঁওতাল বিদ্রোহ– ১৯৫
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা– ১২৪-২৫
সাভারকার গণেশ– ২১৯
সাভারকার, বিনায়ক দামোদর (মারাঠা নেতা)– ২১৯-২০
সাম্প্রদায়িকতা– ৪৯, ৫১, ৫৬, ১৪০, ১৫১, ২০৮, ২৫৬
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা– ২১০, ২৫৪
সায়ানী, রহমতুল্লাহ– ১৬৫

সিং, রণজিৎ– ৮৮, ৯০, ১৫৭
সিংহ, কালী প্রসন্ন– ৫৫, ১২৫-২৮, ১৩৯
সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ, (পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা)– ১৩২-৩৩
সিংহ, রানা প্রতাপ– ৬৪, ৬৬, ১৭৮
সিপাহী বিদ্রোহ (বিপ্লব)– ৩৪-৩৭, ৪৩, ৫১-৫২, ৫৫-৫৬, ৭৬, ৮০, ৯০, ৯৪, ৯৬, ১০০, ১২৮, ১৩৭, ১৮৮, ১৯৫-৯৬
পরবর্তী অবস্থা– ৯৮-৯৯
সিমলা ডেপুটেশন– ১৬৬, ২১১-১২
মূল্যায়ন– ২১৭-২১৮
সিয়নী, আর, এ (কংগ্রেস সভাপতি)– ১৯৮
'সিয়ারুল মোতা আখেরীন'– ১১৫
সিরাজী, আসাদুল্লাহ– ২১২
সিরাজী, ইসমাইল হোসেন– ২০৯
সুপ্রিম কোর্ট– ১৩৪, ১৩৫
সুফি দর্শন– ১১৫
প্রভাব– ১০৪
সুহৃদ সমিতি– ১২৭-২৮
সেন, কেশবচন্দ্র– ১৩০, ১৫৫, ১৯০, ১৯১
সেনগুপ্ত অমলেন্দু– ১৫৫
সেন, গৌরী– ১৩২
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী– ৮০, ৮২, ৮৫-৮৭, ৯২
জেহাদ, শিখদের বিরুদ্ধে– ৮৭-৯০
মতবাদ– ৮৭
সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ– ৪৫
স্কুল বুক সোসাইটি– ৭৪
স্বদেশী আন্দোলন– ২৫৭
স্বামী দয়ানন্দ– ১৫১, ১৯০
স্বামী বিবেকানন্দ– ৪৫, ৪৬, ৯৫, ১২১, ১৪৫, ১৫১-৫৫, ১৯০, ২০৮
এবং সাম্যবাদ– ১৫২
দর্শন– ১৫৩-৫৪
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ– ১৯১
হক, এম আজিজুর রহমান– ১০৪
হাতিখেদা বিদ্রোহ (ময়মনসিংহে)– ১৯৪
হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ– ২৮, ৬৭, ৮৭, ৯৪, ১০৩, ১৮৬, ১৮৭
হার্ডিঞ্জ, লর্ড, গভর্নর জেনারেল– ২১২
*হিউম, এ্যালান অক্টাভিয়ান (আইসিএস এবং কংগ্রেস সম্পাদক)– ৪৭, ৭২, ১৫২, ১৫৬, ১৮২-৮৩, ১৯৮, ২১৫, ২৮৯, ২৯২
হিন্দু– ৩৩, ৫১, ৭৬, ৭৯-৮০, ১১৬
নারীমুক্তি– ১২৭
বনেদী– ১০১
ব্রাহ্মণ– ১৮২
ভক্তি দর্শন– ৫৩
লেখক– ১৮১, ১৯২, ২০৭
সংস্কারপন্থী দর্শন– ১৩৯, ৪০
সংস্কৃতি– ১৯১
সমাজ– ১১৭, ১৩১
সুবর্ণ বণিক শ্রেণী– ২৪, ২৭
'হিন্দু পেট্রিয়ট'– ৩৮, ৩৯, ১৫৯
হিন্দু (প্রেসিডেন্সি) কলেজ– ৭৩, ৭৬, ১১২-১৩, ১২২, ১৩৬
হিন্দু মেলা– ৪৭-৪৯, ৫২, ৭২, ৯৫-৯৬, ১৪০, ১৫৬, ১৯১, ২২৪
হিন্দু রিভাইভালিজম– ৫১, ৫৩, ৬০, ৬৬, ৯৫-৯৬, ১৪০-৪১, ১৪৭, ১৬৫, ১৭০, ১৮৬, ১৯১-৯২, ২০৮, ২২৬, ২২৯, ২৩৭
সমর্থক পত্র-পত্রিকা– ১৯০-৯১
হেমচন্দ্র– ৪৬
হেয়ার, ডেভিড– ১২৩
হেস্টিংস, ওয়ারেন, লর্ড– ৩১, ৬৫-৭১, ৭৮, ১৩৫, ১৫৭
হেস্টিংস, মার্কুইস অব– ৮৫
'হেসপারাস'– ১২৪
হোসেন, মীর মোশাররফ– ৪২, ৫২, ৫৩, ৮১, ১১৪
'জমিদার দর্পণ'– ৩৭, ৪১-৪৪

---

* ২৯২ পৃষ্ঠায় 'এ ডব্লিউ' স্থলে 'এ ও' (এ্যালান অক্টাভিয়ান) পড়তে হবে।

অসংখ্য দেশ। দেখেছেন বিচিত্র মানুষ, প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন বহু রুদ্ধশ্বাস চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রবাহের, সাক্ষী ছিলেন বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের। বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন। বঙ্গবন্ধুর উষ্ণ সান্নিধ্য ও ভালবাসা তার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর সদ্য মুক্ত স্বাধীন যশোরের মাটিতে পদার্পণ এবং ১৯ তারিখে সরাসরি মুজিবগর থেকে সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ঢাকা প্রত্যাবর্তন। আর সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি এবং নিয়মিত রণাঙ্গন পরিদর্শন শেষে একই সঙ্গে লেখক, কথক ও ভাষ্যকার হিসেবে বেতারে সাড়া জাগানো 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান পরিচালনা। সাধারণ মানুষের মনের কথাকে, সুপ্ত আশা ও স্বপ্নকে তিনি জীবন্ত ও মূর্ত করে তুলে ধরেছিলেন সেদিনের সেই বিপন্ন ও অসহায় কিন্তু বীরত্বব্যঞ্জক মুহূর্তে। চোখা হাস্য পরিহাসে, রঙ্গ রসিকতায় আদি ও অকৃত্রিম ঢাকইয়া বুলিতে দিশাহারা ছিল হানাদার বাহিনীর শিবির।

শত্রুমিত্র সব মহলে সমান জনপ্রিয়। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য, সদালাপি, সারাক্ষণ হাসি-খুশি, চরম আড্ডাপ্রিয়, কাশফুল মাথা এম আর আখতার মুকুল যে-কোনও আড্ডায় মধ্যমণি হয়ে উঠতে সময় নেন না পলকমাত্র। একাই একশ। অতিরিক্ত সিগারেট ফোঁকার ফলে ঈষৎ ঘুর্ঘুরে গলায় যেমন আছে জলদগম্ভীর ডাক, তেমন আছে বুক কাঁপানো বাঘের হাঁক। ফুরফুরে মজলিশি মেজাজ, যার সঙ্গে বৈদগ্ধ ও অসামান্য স্মৃতিশক্তির বিরল সমন্বয় তার আলাপচারিতাকে করে তোলে খাপখোলা তরবারির মতো শাণিত ও ঝকঝকে। কুশাগ্র বাক্যবাণ তার প্রধান আয়ুধ হলেও মনে হয় এখনও অনেক অব্যক্ত কথা, অনেক তথ্য, অনেক রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন মনের গভীর গোপন চোরা কুঠুরিতে।

সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বই, পত্র-পত্রিকার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে। এসবের মাঝে দুই আদুরে নাতনি কুন্তলা আর কুয়াশা যারা একমাত্র কিছুটা সমীহ আদায় করে নিতে পারে অমন আদুরে জাঁদরেল দাদুটির কাছ থেকে।

দুই কন্যা কবিতা ও সঙ্গীতা, দুই পুত্র কবি ও সাগর। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর ৯ মাস একনিষ্ঠভাবে সংসার ধর্ম পালনের পর তার বিদুষী গৃহিনী ডক্টর মাহমুদা খানম ১৯৯২-এর ১৯ মার্চ জান্নাতবাসী হয়েছেন। বড় ছেলে কবি তার একমাত্র প্রিয় বন্ধু ও সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী। বাপবেটার এমন জুটি বুঝি আর দু'টি হয় না সচরাচর।

কোন সীমিত পরিসরে এম আর আখতার মুকুলের কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃত্তান্ত তুলে ধরা এক কথায় অসম্ভব। সিংহ রাশির জাতক এম আর আখতার মুকুল মানেই সংগ্রামী জীবন-সংগ্রামের জীবন। আপোষহীন, অসীম সাহসী এক বীর যোদ্ধা।

–বেলাল চৌধুরী